বীরভূম জেলা সংখ্যা

১৪১২

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

ফেব্রুয়ারি ২০০৬ □ মাঘ ১৪১২

প্রধান সম্পাদক সুখেন্দু দাস

সম্পাদক অজিত মণ্ডল

প্রথম পটচিত্র প্রাচীন মস...

দ্বিতীয় পটচিত্র বীরভূম প্রকৃ...

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা অসীম রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বীরভূম জেলাপরিষদ, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক,

পাপান ঘোষ দেবাশিস ব্যানার্জি

প্রকাশন

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রণ

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১২

দাম : ষাট টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

বিতরণ শাখা

সফদর আলি খান

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১

দূরভাষ ২২৪৩ ৬২৯৫

বিষয়সূচি

সুরুলে টেরাকোটা মন্দিরের কাজ ছবি পাপান ঘোষ

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইলেকট্রনিক প্যানেল ছবি : পাপাই ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য শিল্পী : সোমনাথ হোর ও কলাভবন শান্তিনিকেতন

॥ সম্পাদকীয় ॥

BIRBHUM DISTRICT

তাপমাত্রা : গরমের সময়—মার্চ-মে মাস, যখন সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ৪১-৪২° সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৮° সেলসিয়াস।

শীতের সময়—নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাস, যখন সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ২৫-৩১° সেলসিয়াস, আর সর্বনিম্ন গড়ে ১০° সেলসিয়াস।

বর্ষার সময়—জুন-সেপ্টেম্বর মাস, যখন সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ৩৭° সে. আর সর্বনিম্ন ২৩° সে.

নদ-নদী : ময়ূরাক্ষী, অজয়, বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী ও হিংলো। এই সব নদী ছাড়া ছোট-বড় আরও কয়েকটি নদী জেলার বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জমির আয়তন (আনুমানিক হিসাবে)

বনভূমি : ১৫,৯৩০ হেক্টর, ১৫৯.২৬ বর্গ কি.মি.

কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি : ৩,৩২,৯০৫ হেক্টর

পতিত জমি : ৫,৩৩৬ হেক্টর

সরকারি খাস জমি : ২৫,৪৫৫ হেক্টর

জলা জমি (পুকুর ও বিলসহ) : ৪০,৩৪৫ হেক্টর

চাষবাসের কাজে যে সেচ ব্যবস্থা বর্তমান—ময়ূরাক্ষী জলাধার বাঁধ, চারটি ব্যারেজ সমন্বিত।

প্রধান ফসল : ধান, বিভিন্ন তৈলবীজ আর আলু, কিছু শাক-সবজি উল্লেখযোগ্য।

জেলার লোক সংখ্যা : মোট লোকসংখ্যা— ৩০,১৫,৪২২

পুরুষ-১৫,৪৭,১০৩ মহিলা-১৪,৬৮,১২৩।

পুরুষ-৫১.২৯% মহিলা-৪৮.৭১%

শিশু	কিশোর	যুব	মধ্যবয়স্ক	বৃদ্ধ
৩,৬১,৮২৭ (৫ বছর পর্যন্ত)	৮,১৪,১১ (১৬ বছর নীচে)	৮,৭৪,৪১৪ (৩০ বছরের নীচে)	৭,৮৩,৯৫৮ (৬০ বছরের নীচে	১,৮০,৯১৬ (৬০ বছরের উর্ধ্বে)

গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন—২,৭,৫৬,৬৬৮জন-৯১.৪৩%

শহরাঞ্চলে বসবাস করেন—২.৫৮,৫৫৮জন-৮.৫৭%

জেলার উন্নয়ন অঞ্চল (ব্লক) : ১৯টি

(ক) **সিউড়ি মহকুমা :** সিউড়ি ১নং ও ২নং, মহঃ বাজার, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর, রাজনগর, খয়রাশোল।

(খ) **বোলপুর মহকুমা :** ইলামবাজার, বোলপুর, শ্রীনিকেতন, নানুর, লাভপুর।

(গ) **রামপুরহাট মহকুমা :** ময়ূরেশ্বর ১নং ও ২নং, রামপুরহাট ১নং ও ২নং, নলহাটি ১নং ও ২নং, মুরারই ১নং ও ২নং।

পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা : ১৯টি

গ্রাম পঞ্চায়েত : ১৬৯, গ্রাম সংখ্যা-২৪৬৭, গ্রাম সংসদ-২১৩৮ (যার মধ্যে ২২৩২টি গ্রামে মানুষজন বাস করে থাকেন)

পৌরসভার সংখ্যা : ৬, সিউড়ি, দুবরাজপুর, বোলপুর, রামপুরহাট, নলহাটি, সাঁইথিয়া।

বিধানসভার আসন : ১২টি, নানুর তফসিলি কেন্দ্র, বোলপুর, লাভপুর, দুবরাজপুর, রাজনগর তফসিলি কেন্দ্র, সিউড়ি, মহঃবাজার, ময়ূরেশ্বর তফসিলি কেন্দ্র, রামপুরহাট, হাসান তফসিলি কেন্দ্র, নলহাটি ও মুরারই।

লোকসভার আসন : ২টি।

মহকুমা : ৩টি ; শহর—৯টি ; থানা—১৮টি।

জেলা সদর : সিউড়ি

প্রধান উল্লেখযোগ্য সড়ক ব্যবস্থা :

পানাগড়-মোরগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে। রাস্তার দৈর্ঘ্য সারফেস-২৪১৩ কি.মি. আনসারফেস-৪৬৭৪ কিমি.

রেলপথ :

- নলহাটি আজিমগঞ্জ লাইনের নলহাটি-লোহারপুর পর্যন্ত ১৮.৭৭ কি.মি.
- হাওড়া-সাহেবগঞ্জ লুপলাইনের বোলপুর থেকে রাজগ্রাম পর্যন্ত ১০৬ কি. মি.
- সাঁইথিয়া-অন্ডাল শাখা লাইনের সাঁইথিয়া ভীমগড় পর্যন্ত ৫০ কি.মি.। এ ছাড়াও ১৯১৭ সালে তৈরি আহমেদপুর-কাটোয়া ন্যারোগেজ লাইনের আহমেদপুর থেকে দাসকল গ্রাম পর্যন্ত ২৬.৫৫ কি. মি.। এ জেলার রেলপথের দৈর্ঘ্য মোট-২০১.৩২ কি. মি.

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : ৮৮৮৩

ভারি শিল্প : ১ (বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প) :

জেলার শিক্ষা-সংস্কৃতি চিত্র :

এই জেলায় টোল, চতুষ্পাঠি, মক্তবের পাশাপাশি আধুনিক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। ১৮২৩ সাল নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেট গ্যারেট শিশুদের জন্যে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবনা করেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় একটি একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৪৫-১৯৪৬ সাল নাগাদ, অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩৬টিতে। ১৯৪৭ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষিত হয়।

বীরভূম ইনডোর স্টেডিয়াম, সিউড়ি

বর্তমানে শিক্ষার চিত্রটি ঃ

বর্তমান সাক্ষরতার হার : ৬১.১৬ শতাংশ (পুরুষ : ৭১.৫৭ মহিলা : ৫২.২১)

মাধ্যমিক স্কুল	ঃ	২৫৬টি
উচ্চমাধ্যমিক স্কুল	ঃ	১১০টি
জুনিয়ার হাইস্কুল	ঃ	৮৬টি
জুনিয়ার হাইমাদ্রাসা	ঃ	১০টি
সিনিয়র মাদ্রাসা	ঃ	৪টি
হাইমাদ্রাসা	ঃ	১৪টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঃ	২৩৭টি
শিশুশিক্ষা কেন্দ্র	ঃ	৪৯৫টি
অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	ঃ	২৪০৭টি
মহাবিদ্যালয়	ঃ	১২টি
বিশ্ববিদ্যালয়	ঃ	১টি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (বোলপুর-শান্তিনিকেতন)

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ ১২৭টি ; বেসরকারি-১টি

জেলা গ্রন্থাগার : ১টি

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঃ ২টি

পলিটেকনিক ঃ ১টি

আই.টি.আই ঃ ১টি

সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্র

সিনেমা হল : ২৬টি

সাংস্কৃতিক কেন্দ্র : ১০টি

পত্র-পত্রিকা : দৈনিক-১, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক-১৮টি সাহিত্য পত্রিকা ৪০টি, নাটকের ২টি

নাট্য সংস্থা : ২৫টি

ডাকঘরের সংখ্যা ঃ ৪৭৭টি।

পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিস ঃ ১৬টি

হিমঘরের সংখ্যা ঃ ১৩টি

ব্যারেজ ঃ ৫টি

ব্যাঙ্কের সংখ্যা : বাণিজ্যিক ১৭৪টি (২০০২ সালে)
টুরিস্ট লজ : ২টি (সরকারি)
১০০ বছরের অধিক পুরাতন মন্দির : ৪৯টি
সতী পীঠ : ৫টি
রেজেস্ট্রিকৃত সাহিত্য সংস্থা : ১টি (বীরভূম সাহিত্য পরিষদ)
স্বাস্থ্য : হাসপাতাল ১০টি (গ্রামীণ হাসপাতাল সহ)
সরকারি হাসপাতাল—৩টি
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—১৯টি
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৫৯টি। বর্তমানে মোট ৭৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লিনিক, ডিস্পেনসারি ২৬টি। [২০০২ সালে]
পরিবার পরিষেবা কেন্দ্র—৪২৮টি (২০০৩ সালে)
পশু হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র : রাজ্য পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৭টি, ব্লক পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র—১৯টি, অতিরিক্ত ব্লক পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র—১৭টি।
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র : ১৬৫টি

দর্শনীয় স্থান : আমদপুর (বোলপুর), অঙ্গরা (বোলপুর), বক্রেশ্বর, নলহাটি, লাভপুর (অট্টহাস, ফুল্লরামন্দির, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভিটা ও তাঁর সৃষ্টিধন্য 'ধাত্রীদেবতা' হাঁসুবাক, নীলকুঠি ; সাঁইথিয়া (নন্দিকেশ্বরী), কঙ্কালীতলা, জয়দেব-কিন্দুবিল্ব, দুবরাজপুর (মামা-ভাগ্নে পাহাড়), বীরচন্দ্রপুর, নানুর (চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত), চণ্ডীদাস যেখানে বাঁশুলি মন্দির আছে সেই উঁচু ঢিবিতে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে আছে। নানুরে ঢিবির উপর ১৪টি শিবমন্দির মূল বাঁশুলি মন্দির সহ বর্তমান।) কোটাসুর, শান্তিনিকেতন, সুরুল, সুপুর, রাজনগর, পাথরচাপুরী, মল্লারপুর, মহম্মদবাজার, মাড়গ্রাম, হেতমপুর, মঙ্গলডিহি, ঘুড়িষা, কীর্ণাহার, (সিউড়ি থানা) উঁচকরণ, ইটান্ডা, দাসকলগ্রাম, বেলুটি (নানুর থানায় নাতিউচ্চ ঢিবি আছে)।

কুটিরশিল্প : কাঁসা, পেতল, গালা, শোলার ও বাঁশের কাজ। কাঠের কাজ, তাঁত বোনা, মুরগি পালন, চামড়ার কাজ, হাতে তৈরি কাগজ ইত্যাদি বাণিজ্যিক ভাবে করা হয়ে থাকে। কুটিরশিল্পে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় হল তাঁত শিল্প। এ ছাড়া মাটি ও বেতের কাজও যথেষ্ট জনপ্রিয়। নতুন ধরনের কুটিরশিল্পের মধ্যে বেশি করে চোখে পড়ে কাঁথা-ফোড়ের শাড়ি, বাটিক ইত্যাদি। এগুলি বেশির ভাগই বোলপুর শান্তিনিকেতন ঘিরে গড়ে উঠেছে। চামড়ার তৈরি জিনিসও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। লোহাশিল্পের কাজ বীরভূম জেলার প্রায় সব গ্রামেই হয়। লোহাশিল্পীদের তৈরি নানা ধরনের বঁটি, দা, কড়াই, হাতা ছাড়াও গরুর গাড়ির চাকার বেড়, লাঙ্গলের ফলা এবং দরজার নকশা করা হাতল, কড়া, তালা-চাবি ইত্যাদি শিল্পসামগ্রী আমরা বাজারে দেখতে পাই।

ছোট শিমুলিয়ার নকশা করা কুনকের শিল্প-সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। এখানকার গ্রামের সোনাশিল্পীরা বেশ ভালো সোনার কাজ করছেন এবং দেশ-বিদেশে তাঁদের শিল্পকর্ম সমাদৃত হচ্ছে।

লোক-সংস্কৃতি : বোলান ও পাঁচালি, ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজের পূজা, মিগের রাত ও অম্বুবাচী, মঙ্গলচণ্ডী, মনসার ভাসান। পঞ্চমী পূজা, ভাদু ও ভাঁজো, ডাক সংক্রান্তি, 'মুঠ' সংক্রান্তি নবান্ন, ইতু সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি, শীতলা ষষ্ঠী, মকর সংক্রান্তি ও মেলা, বীরাচারী রায়বেঁশে বীরভূমের লোকসংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হাবুগান, পটের গান, বহুরূপী এবং বাউল ও ফকিরদের গানে বীরভূমের রাঙামাটির আকাশ বাতাস আলোড়িত হয়ে ওঠে।

মেলা : বীরভূমে সারা বছরই বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার জীবন অতিবাহিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা—জয়দেব মেলা, যা প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে ইলামবাজার ব্লকের অজয় নদের তীরে অবস্থিত কেন্দুবিল্ব গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সারারাতব্যাপী লোকসংগীতের আসর। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে কংকালী দেবীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আদিত্যপুরের নিকটে তিনদিনব্যাপী মেলা বসে। কংকালীতলা ৫১ পীঠের ১টি পীঠ। পৌষউৎসব বা পৌষমেলা প্রতি বছর ৭ই পৌষে প্রত্যূষে ছাতিমতলায় উপাসনার মধ্যে দিয়ে পৌষ উৎসবের সূচনা হয়। মেলার তিন দিনই মেলা প্রাঙ্গণে বসে লোকসংস্কৃতির আসর। সাঁওতালদের খেলাধূলা এবং ৮ই পৌষ সন্ধ্যাবেলায় বাজি পোড়ানো এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এ ছাড়া পাথরচাপুরীর মেলা, নানুরে চণ্ডীদাসের 'মিলন মেলা', মুলুকের মেলা, ধর্মরাজের মেলাগুলিও বীরভূমের অন্যতম জনপ্রিয় মেলাগুলির অন্যতম।

বীরভূম জেলার গৌরব : কবি চণ্ডীদাস, কবি জয়দেব, সাঁওতাল বিদ্রোহী নেতা সিধু-কানহু, বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধক বামদেব, নোবেল অর্থনীতিবিদ্ ড. অমর্ত্য সেন, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল প্রমুখ।

সূত্র : District Statistical Hand Book 2003 'বীরভূমি বীরভূম' বীরভূম জেলা বইমেলা কমিটি, ২০০৩-০৪ প্রকাশিত 'স্মরণিকা', মহকুমা সাক্ষরতা সমিতি এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত। মহকুমা পরিচয়, বোলপুর, জেলা বীরভূম ইত্যাদি।

* ***লেখক*** · মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বোলপুর, বীরভূম

শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার-উদ্‌বোধন

অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হল শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম। কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিন-কার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেননি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম, দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হল। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায়নি। সে কথার আলোচনা এখন থাক।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ।

খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয়নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে প্রত্যাশা সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই

শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ, লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট ও তাঁর স্ত্রী ডরোথি ও আশ্রমিকবৃন্দ

তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনীসন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই-সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক, অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করিনি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এ দিক-ও দিক করলেই কানে ধরে তাকে সায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে ; তাতে সময় লাগে বেশি, কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে, কিন্তু দুটো-একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্‌বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে, কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে

প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না, একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে-সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দ-প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ—জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়—তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো-একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তা হলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, 'এ আমি বিক্রি করব না।' এই-যে আপন মনের সৃষ্টির আনন্দ, যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব নাকি? এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তা হলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ-প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করিনি। আমরা জানি, যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজন-দরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বন্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাব-বশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারি নি—তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমত তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারী তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে এঁকে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা-ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপন উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সব-শেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৫৩২

উপরে ও নিচে পারাগ্রামে উদ্ধার প্রাপ্ত পুরাকীর্তি   ছবি : মানস দাস

প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বীরভূম

প্রকাশচন্দ্র মাইতি

বর্ধমান বিভাগের সবচেয়ে উত্তরের জেলা হল বীরভূম. এই জেলার অবস্থান ২৪°৩৫'০০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১'১৪" থেকে ৮৭°০৫'২৫" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ত্রিভূজাকৃতি এই জেলার উত্তর এবং পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা, পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান. অজয় নদ এবং বর্ধমান এই জেলার দক্ষিণ সীমারেখা। এই জেলা আয়তনে ৮৫৫০.৯৪ বর্গ কিলোমিটার। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সময়ে এই জেলা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য আয়তনে ছোট ও বড় হয়েছে।

বাংলায় প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চার সূচনা :

বীরভূম জেলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি পর্যায়ের আলোচনার আগে পশ্চিমবঙ্গে কিভাবে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়েছিল তা জানা আবশ্যক বলে মনে হয়। ১৮৬৫ সালে ভ্যালেনটাইন বল (Vallentine Ball) (ভূতত্ত্ববিদ) নামে এক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী প্রথম একটি প্রস্তর যুগের

ইচিন্দা থেকে প্রাপ্ত মধ্যাশ্মীয় যুগের ক্ষুদ্রাস্ত্র

হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। এর পর প্রায় ১০০ বছর প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চা নিয়ে সেভাবে কেউ কাজকর্ম করেনি। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) প্রাক্তন অধীক্ষক (কলকাতা চক্র) ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী (V. D. Krishnaswami) ও পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল প্রয়াত ডঃ শ্রীমতি দেবলা মিত্র একযোগে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কংসাবতী, কুমারী ও জাম নদী উপত্যকায় অনুসন্ধানের কাজ করেন এবং বেশ ভালো সংখ্যার নিম্ন ও মধ্য পুরা প্রস্তর (Lower and Middle Palaeolithic) যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাচীনতা নিয়ে যে বিতর্ক আগে ছিল তার অবসান হয় পর পর আরো কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার হওয়ার পর। এই মহৎ কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। ডঃ অশোককুমার ঘোষ ঝাড়গ্রাম-বেলপাহাড়ী অঞ্চলে অনুসন্ধানমূলক কাজ শুরু করেন। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের তদানীন্তন অধিকর্তা প্রয়াত ডঃ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্তও এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ৬০ ও ৭০-এর দশকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ও বিহারিনাথ পাহাড়ের সন্নিহিত অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদী উপত্যকা অঞ্চল, পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, আরষা, কংসাবতী ও কুমারী নদী উপত্যকা অঞ্চল ও বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক কাজ (Exploration Work) করেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রস্তর যুগের সভ্যতা যে বিকশিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময়ে এই চর্চা

ডঃ পরেশচন্দ্র দাসগুপ্তও এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। তিনি ৬০ ও ৭০-এর দশকে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া ও বিহারিনাথ পাহাড়ের সন্নিহিত অঞ্চল, মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা নদী উপত্যকা অঞ্চল, পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, আরষা, কংসাবতী ও কুমারী নদী উপত্যকা অঞ্চল ও বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ব্যাপক অনুসন্ধানমূলক কাজ (Exploration Work) করেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গেও প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রস্তর যুগের সভ্যতা যে বিকশিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইচিন্দা থেকে প্রাপ্ত মধ্যাশ্মীয় যুগের ক্ষুদ্রাস্ত্র

আরো গতিশীল হয়। ১৯৯০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকর্তা ডঃ গৌতম সেনগুপ্তের পরিচালনায় নানা অঞ্চলে অনুসন্ধান ও উৎখননের কাজ চলছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বহু প্রত্নতত্ত্ব অনুরাগী গবেষক প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চায় ব্রতী হয়েছেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্যরা হলেন— অশোককুমার ঘোষ (১৯৬২-৬৯), অনিলচন্দ্র পাল (১৯৯০), এ. এস. দানি (১৯৬০), এ. নন্দী (১৯৮২), অশোককুমার দত্ত (১৯৮২, ৮৩, ৮৪, ৯১, ৯৫), অরুণকুমার দত্ত (১৯৭৬), বি. বি. লাল (১৯৮৫), ডি. সি. দশারাম (১৯৮২), ডি. কে. ভট্টাচার্য (১৯৮২-৮৩), ধরনী সেন (১৯৬১-৬৩), দিলীপকুমার চক্রবর্তী (১৯৮১-৮৪)। জি. এল. বাদাম (১৯৭৯-৮৮), এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া (১৯৭৪), জে. এন. পাল (১৯৮৪), এম. ভট্টাচার্য (১৯৮৭), এম. চ্যাটার্জি (১৯৬৩), এম. ভি. এ. সাস্ত্রী (১৯৬৮), পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৫) রূপেণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৮৯), বেরা রায় (১৯৮৭), এস. ব্যানার্জি (১৯৮২), এস.

বিশ্বাস (১৯৮২), এস. এন. রাজগুরু (১৯৯৮), এস. আর দাস (১৯৬৮), ভি. বল (১৮৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮০, ৮৯) ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী (১৯৫৭, ১৯৫৯) প্রমুখ।

ভূবিন্যাস ও নদনদী : রাঢ় বাংলার মাটি ও শিলার যে বৈশিষ্ট্য মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে দেখা যায় সেই একই রকম মাটি ও শিলার বিন্যাস বীরভূম জেলাতেও লক্ষ করা যায়। এই জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ খয়রাশোল, দুবরাজপুর, সিউড়ি, রামপুরহাটের বিভিন্ন অঞ্চল ছোটনাগপুর মালভূমির বর্ধিত অংশ বিশেষ, এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লোহিত রং-এর মৃত্তিকা বা ল্যাটেরাইট-এর প্রাধান্য রয়েছে, তেমনি গাঙ্গেয় সমভূমি রাজমহল শিলা, নিস্ প্রভৃতিরও সমারোহ লক্ষণীয়। এই জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলি হল ময়ূরাক্ষী, অজয়, কোপাই, ব্রাহ্মণী, ত্রিপিতা, গোমরী বাসালী, পাগলা, দ্বারকা, বামিনী, কুলীয়া, প্রভৃতি।

চন্দ্রমণী থেকে প্রাপ্ত কুড়ুল

বীরভূম জেলার ভূতাত্ত্বিক স্তর বিন্যাস

(মাটির উপর থেকে নিচু)

বর্তমান	পলিমাটির আস্তরণ
টার্শিয়ারি	ল্যাটেরাইট, উদ্ভিদ জীবাশ্ম
মায়েসিন	কাদামাটির আস্তরণ ফেরো-গেনাস এবং ফালসপ্যার বেলেপাথর এবং কাদা-মাটির আস্তরণ
মধ্য থেকে	
উচ্চ জুরাসিক	রাজমহল ট্রাপ
উচ্চ গণ্ডোয়ানা	গ্রিট, আয়রন স্টোন,
মধ্য ট্রায়াস	বেলেপাথর, শামুক,
জুরাসিক	ফায়ার ক্লে, কয়লাযুক্ত পাথর

বীরভূম জেলার ভূতাত্ত্বিক বিন্যাসে আর্কিয়ান যুগ থেকে পরবর্তী সব যুগের আস্তরণ লক্ষনীয়। আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট নিস্, বায়োটাইট সিস্ট, পেগমেটাইট বিভিন্ন পাথরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর পরবর্তী যুগ পার্মিয়ান, জুরাসিক, ব্যাসাল্ট ট্রাপ, টার্শিয়ারি ও মায়োসিন যুগের প্রস্তরের চিহ্নও বর্তমান, ল্যাটেরাইটের প্রাধান্য দেখা যায় যা টার্শিয়ারী মায়োসিন যুগে, সবার উপরে প্রাচীন পলি মাটি যা মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগের চিহ্ন বহন করে।

—অসংগতি—

আর্কিয়ান	গ্রানাইট, নিস, সিস্ট এর সহিত পিগমাটাইট এবং কোয়ার্জ দানা

বীরভূম জেলার ভূতাত্ত্বিক বিন্যাসে আর্কিয়ান যুগ থেকে পরবর্তী সব যুগের আস্তরণ লক্ষনীয়। আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট নিস্, বায়োটাইট সিস্ট, পেগমেটাইট বিভিন্ন পাথরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এর পরবর্তী যুগ পার্মিয়ান, জুরাসিক, ব্যাসাল্ট ট্রাপ, টার্শিয়ারি ও মায়োসিন যুগের প্রস্তরের চিহ্নও বর্তমান, ল্যাটেরাইটের প্রাধান্য দেখা যায় যা টার্শিয়ারী মায়োসিন যুগে, সবার উপরে প্রাচীন পলি মাটি যা মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগের চিহ্ন বহন করে। যাই হোক এই স্তরায়নগুলির মধ্যে প্লাইস্টোসিন যুগের স্তরায়ন প্রস্তর যুগীয় নিদর্শন বহন করছে। প্রধান প্রধান পাথরের

চন্দ্রমণী থেকে প্রাপ্ত কুড়ুল
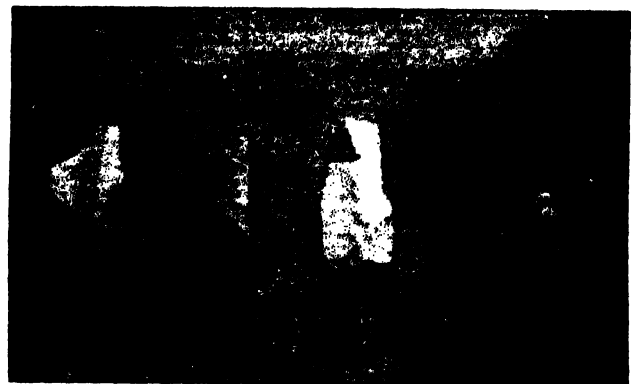
জীবধরপুর থেকে পাওয়া মধ্যাশ্মীয় অস্ত্র

মধ্যে গ্রানাইট, রাজমহল ট্রাপ পাথর, বেলেপাথর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ গাছপালা : সারা জেলায় মোটামুটি সবুজের সমারোহ বিদ্যমান এবং এর মাঝখানে ধান, বিভিন্ন সবজির সঙ্গে সঙ্গে বাবলা, বেল, আঁতা, কাঁঠাল, নিম, বাঁশ, পেঁপে, লেবু, বট, অশ্বত্থ, আম, সজল, আমড়া, জাম, তেঁতুল, অর্জুন, আকাশমণি, শিরিশ, গুলমোহর, বট, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লতাপাতার মধ্যে কাঁটানটে, লজ্জাবতী, কচুরিপানা, ঝাঁঝি, কলমি, কেদার দম, শুশনি, পানিফল প্রধান। কাঁটা জাতীয় গাছের মধ্যে তাল ও খেজুর, বিভিন্ন শস্য ও সবজির মধ্যে ধান, গম, পেঁয়াজ, আলু, আখ, পাট, সরষে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নলহাটি, রামপুরহাট, মহম্মদবাজার, সিউড়ি, রাজনগর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, ইলমবাজার ও বোলপুরে বনাঞ্চল দেখা যায়। জঙ্গলে শাল, খয়ের, জাম, পিয়াল, শিমূল, পলাশ, কেন্দ, আমলকি, গমর, মহুয়া, কুসুম হল প্রধান প্রধান গাছপালা।
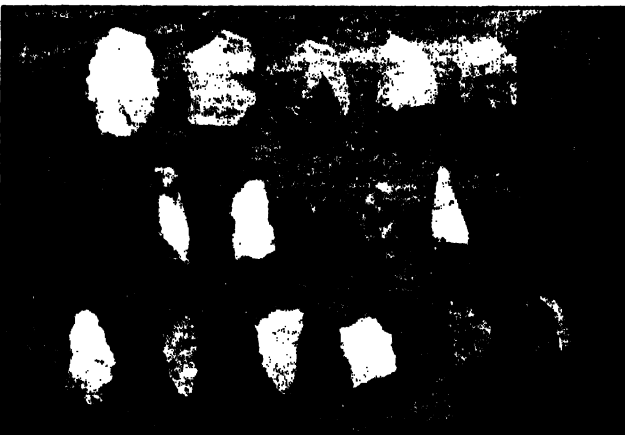
নলাটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র ও অস্ত্র তৈরীর নমুনা পাথর

পশুপাখি : বিভিন্ন রকমের বন্য জন্তু জানোয়ার বীরভূমের জঙ্গলে দেখা যায় তার মধ্যে চিতা, ভালুক, নেকড়ে, শিয়াল, উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রকমের পাখির মধ্যে পায়রা, হাঁস, মুরগি ও নানা রকমের ছোট পাখি উল্লেখযোগ্য, নদী ও পুকুরের মিষ্টি জলে রুই কাতলা, মৃগেল, কৈ, মাগুর জাতীয় মাছ পাওয়া যায়।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস :

বীরভূম জেলার প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাস চর্চার আগে। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনাও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। মানুষের সৃষ্টি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বছর আগে (৪০,০০,০০০)। যতদূর জানা গেছে পূর্ব আফ্রিকাই ছিল আদি মানবের প্রথম বিচরণ ভূমি, তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আদি মানবের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মানব ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিভাজন এরূপ :— (১) অস্ট্রোলোপিথেকাস (Austrolopithecus)-এর আনুমানিক সময়কাল ৪০ লক্ষ বছর, প্রথম মানব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পূর্ব

জীবধরপুর থেকে পাওয়া মধ্যাশ্মীয় অস্ত্র

আফ্রিকায় (২) হোমো হাবেলীজ (Homo-habalis) সময়কাল ২ লক্ষ ৫০ হাজার বছর, প্রথম জীবাশ্ম পাওয়া গেছে কেনিয়া এবং তানজানিয়ার অলডুভাই গর্জে (Olduvai Gorge), এখান থেকে পাথরের হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়েছে। (৩) হোমো ইরেকটাস (Homo-erectus) এর সময় কাল হল ৪ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর, এই প্রজাতির জীবাশ্ম (Fossil) পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ অঞ্চলে, এই প্রজাতির মানব জীবাশ্মের এর সাথে অ্যাসুলিয়ান (Acheulian) হাতকুঠার পাওয়া গেছে। (৪) হোমো সেপিয়ান্স Homo-sapeiens বা Homo-Sapeiens Neanderthalensis সময়কাল হল ১ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর, এই প্রজাতির মানব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে সারা ইউরোপ

এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায়. (৫) হোমো-সেপিয়ানস-সেপিয়ানস (Homo-Sapeiens-Sapeins) বা বর্তমান মানুষ, সময়কাল হল—আফ্রিকায় ১ লক্ষ বছর, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ১ লক্ষ থেকে ৯০ হাজার বছর, ইউরোপ ও এশিয়া অঞ্চলে ৪০ হাজার বছর, অস্ট্রেলিয়ায় ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার বছর (বিতর্কিত) আমেরিকায় ১৪ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর (বিতর্কিত) এবং এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে একমাত্র আন্টার্কটিকা ও সাহারা মরুভূমি ছাড়া সারা পৃথিবীতে।

ভারতের মানব বিবর্তনের সব পর্যায় ছিল বা ছিল না কোনওটাই সুনিশ্চিত বলা যাবে না পর্যাপ্ত নমুনার অভাবে, তবে পশ্চিম ভারতের নর্মদা অঞ্চলে হোমো-ইরেক্টাস জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যার আনুমানিক সময়কাল হল ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর। প্রশ্ন হল পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমসহ যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে সেখানে কি আদি মানবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে ? এখনো অব্দি তার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। যদিও
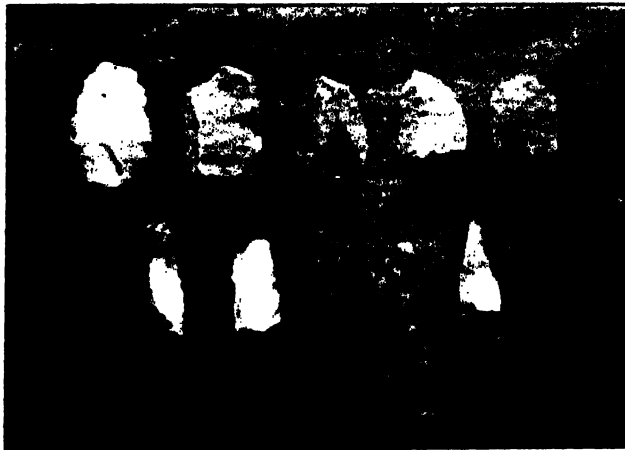
নলাটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র ও অস্ত্র তৈরীর নমুনা পাথর

ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যার মধ্যে বীরভূমও আছে—প্রচুর পরিমাণে নিম্ন, মধ্য পুরা প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে, কিন্তু জীবাশ্ম নেই—এটা হয় না, দরকার হল—ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখননের। আদি মানবের জীবাশ্ম পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, যেখান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে।

জলবায়ু : জেলার জলবায়ু মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় গরমের সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২৬° সেন্টিগ্রেট থেকে ৩৯.৭° সেন্টিগ্রেট-এর মধ্যে থাকে। তবে কোনো কোনো সময় এপ্রিল থেকে জুনেতে ৪৫°—৪৬° সেঃ হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ১২° সেন্টিগ্রেটে দাঁড়ায়। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৩০৩.৭ মিলিমিটার বা

নলাটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র ও অস্ত্র তৈরীর নমুনা পাথর

৫১.৩৫"। চৈত্র মাসের শেষে এবং বৈশাখে বেশ কয়েকবার কালবৈশাখি ঝড় আসে।

বীরভূম নামের উৎপত্তি : বীরভূম জেলার নামের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন বীরভূম নামের উৎপত্তি বীরভূমি থেকে অর্থাৎ বীরের ভূমি থেকে এসেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, বীর রাজাদের শাসিত ভূমি হল বীরভূম। সাঁওতালি ভাষায় বীর মানে হল জঙ্গল, কথিত আছে অতীতে পুরো বীরভূম জঙ্গলে ভরা ছিল তাই কেউ কেউ বলেন জঙ্গলে ভরা ভূমি হল বীরভূম। কিছু ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায় বীরভূম রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করত। তবে বেশির ভাগ সময়ে এক বিশেষ ধর্মের রাজারা এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন। সেই সকল রাজাদের মধ্যে বীর, মান, সিং, ঢাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন এবং এই রাজাদের পদবি অনুযায়ী মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ও বীরভূম নামের উৎপত্তি হয়েছে সেইভাবে বীর

নলাটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার

জীবধরপুর থেকে প্রাপ্ত নিম্ন পুরা প্রস্তর যুগের হাত কুঠার

রাজাদের শাসিত অঞ্চল বীরভূম নামে পরিচিত। নাম যেভাবেই হোক না কেন জেলার সংস্কৃতি বিবর্তনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমস্ত সাংস্কৃতিক পর্যায়ের চিহ্ন এই জেলায় দেখা যায়।

বীরভূম জেলার **জীবধরপুর** হল উল্লেখযোগ্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল। ১৯৬৩ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) পরিচালনায় অনুসন্ধানের কাজ করা হয়। এই প্রত্নস্থলটি ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী। এই জায়গা থেকে ASI ৪টি হাত কুঠার আবিষ্কার করে।এই প্রত্নস্থল থেকে মধ্য প্রস্তর যুগের ও মধ্যাশ্মীয় যুগের কিছু প্রস্তর হাতিয়ারও পাওয়া গেছে। দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত নিদর্শনই মাটির উপর থেকে পাওয়া, এইগুলি স্তর বিন্যস্ত স্থান থেকে পেলে মোটামুটি এর গুরুত্ব অনেক বাড়ত। যাই হোক আদি মানবের বাসস্থান এই স্থানে অথবা এই প্রত্নস্থলের কাছাকাছি ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
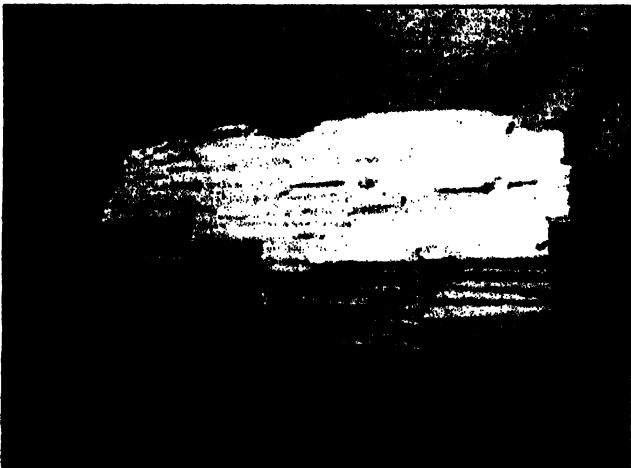
কামারপুর থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ জীবাশ্ম (কাঠ)

এই জেলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি পর্বের একটি বিষয় আলোচনা আবশ্যক মনে হয়, যেটা হল জেলার প্রাচীন পলি মাটির নিদর্শন বেশির ভাগ অঞ্চলেই দেখা যায়। এই প্রাচীন পলিমাটির সঙ্গে লাল রং-এর ক্যালকারাস ও চুনাপাথর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রাচীন পলিমাটির অঞ্চল মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগে হয়েছিল। এই জেলার ভূতাত্ত্বিক স্তর বিন্যাসের একটি সুস্পষ্ট চিত্র মেলে-যা টার্শিয়ারি থেকে মায়োসিন-প্লাইস্টোসিন-হলোসিন পর্যন্ত দেখা যায়। 'জীবধরপুর' ছাড়া অন্য প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে **'নলহাটি'**, যেখান থেকে কিছু Pebble Tool ও Flake Tool পাওয়া গেছে। 'দেবী ললাটেশ্বরী' পাহাড় থেকে মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের নিদর্শন পাওয়া গেছে, 'জল চিপস্ কুঠী' থেকেও (শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন রাস্তার উপরে) একই পর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। 'শ্যামবাটি' (উত্তর বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস),

বীরভূম জেলার জীবধরপুর হল উল্লেখযোগ্য প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল। ১৯৬৩ সালের ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) পরিচালনায় অনুসন্ধানের কাজ করা হয়। এই প্রত্নস্থলটি ময়ূরাক্ষী নদী তীরবতী। এই জায়গা থেকে ASI ৪টি হাত কুঠার আবিষ্কার করে।এই প্রত্নস্থল থেকে মধ্য প্রস্তর যুগের ও মধ্যাশ্মীয় যুগের কিছু প্রস্তর হাতিয়ারও পাওয়া গেছে।

'গিরিডাঙ্গাল' (দুবরাজপুর থানা) থেকে কিছু মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ পাওয়া গেছে, 'বক্রেশ্বর' (থানা দুবরাজপুর) ও 'কৃষ্ণনগর' থেকে কিছু ফ্লেক টুল (Flake tool) পাওয়া গেছে।

মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের নিদর্শন স্থলগুলি হল 'শ্যামবতী' 'বল্লভপুর', (বোলপুর থানা)। 'বক্রেশ্বর' এবং 'গিরিডাঙ্গাল' (দুবরাজপুর থানা) ও 'জীবধরপুর (সিউড়ি থানা) 'নলহাটী', ও 'কৃষ্ণনগর'।

মধ্যাশ্মীয় (Mesolitlic) প্রত্নস্থলগুলি হল 'চিনপাই' (থানা-দুবরাজপুর) 'হেতমপুর' (থানা-দুবরাজপুর) সিউড়ি (থানা-সিউড়ি) 'সেকেদা' 'মকদমপুর' (থানা-ময়ুরেশ্বর) 'ডঙ্গালপুর' এবং 'মালদি' (থানা-মহম্মদবাজার)। এই সকল প্রত্নস্থল থেকে Blade, Point, Scraper, Fluted Core পাওয়া গেছে। সমস্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র ল্যাটেরাইট স্তরে পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারের ভূতপূর্ব অধিকর্তা প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধানমূলক কাজ চালান ও ৬০ ও ৭০-এর দশকে। তাঁর আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল ও নিদর্শনের সংখ্যা নিচে দেওয়া হল। এগুলি বর্তমানে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার সংরক্ষিত সংগ্রহে (Reserve Collection) এ রাখা আছে।

	প্রত্নস্থলের নাম	নিদর্শনের সংখ্যা
(১)	বল্লভপুর (শান্তিনিকেতন)	৮০টি
(২)	বেলুটি	২টি
(৩)	বোলপুর	৫৬টি
(৪)	চিপুকুঠি	১৮২টি
(৫)	দুবরাজপুর পাহাড়	৮টি
(৬)	গিরিডঙ্গাল (দুবরাজপুর থানা)	৯১৭টি
(৭)	জিবধরপুর (থানা-সিউড়ি)	৩৩টি
(৮)	জিবধরপুর ডঙ্গাল	৩টি
(৯)	কোটাসুর	৩টি
(১০)	কুমারপুর	৩৬টি
(১১)	ললাটেশ্বরী	৬২টি
(১২)	ললাটেশ্বর	২০৪টি
(১৩)	ললাটেশ্বরী টিলা (নলহাটি)	৩০টি
(১৪)	ললাটেশ্বরী (চিন্ময়ী পাহাড়)	১৩২টি
(১৫)	নলহাটি	৩১৮টি
(১৬)	শ্যামবতী	৪টি
(১৭)	সেকেন্দা (মকদমপুর, ময়ূরেশ্বর)	৯২টি
(১৮)	তাড়ালপুর / তাড়ারপুর	১৭টি
(১৯)	বিকালগ্রাম	৬টি
		মোট-২২৯৫টি
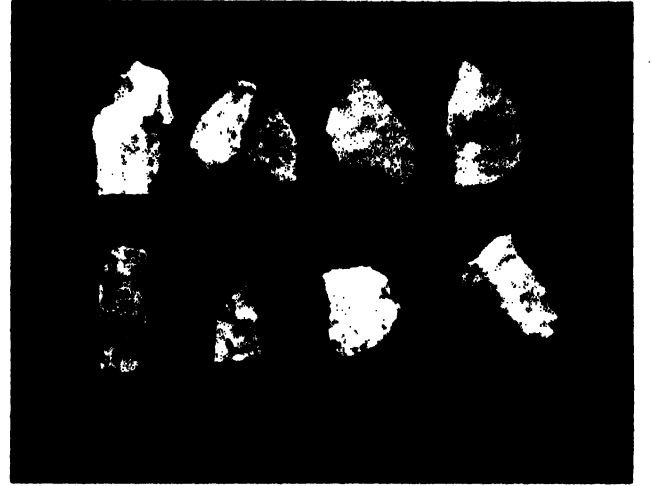
চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, চাঁছুনি উপাদান ও পাথরের নমুনা

মোট ২২৯৫টি প্রস্তর নিদর্শন জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার বিভাগ আবিষ্কার করে। এর মধ্যে প্রস্তর যুগের মোটামুটি সব পর্যায়ের অস্ত্র আছে। যদিও মধ্যাশ্মীয় (Mesolithic) সংস্কৃতির আয়ুধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চা বড়ই দুর্বল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শুধু মাত্র ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব (Historical Archaeology) নিয়ে চর্চায় বা আলোচনায় বেশি আগ্রহী। যা প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চার চেয়ে খুবই সহজ, কারণ এই সময়ের লিখিত উপাদানের সহজলভ্যতা। মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের শুরু নিম্ন 'প্লাইস্টোসিন' যুগ থেকে যা আনুমানিক সময়কাল প্রায় ৪০ লক্ষ বছর। এই চল্লিশ লক্ষ বছরের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বেশির ভাগ সময়টাই 'প্রাগৈতিহাসিক পর্ব' যে সময়

চিপকুঠি থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র
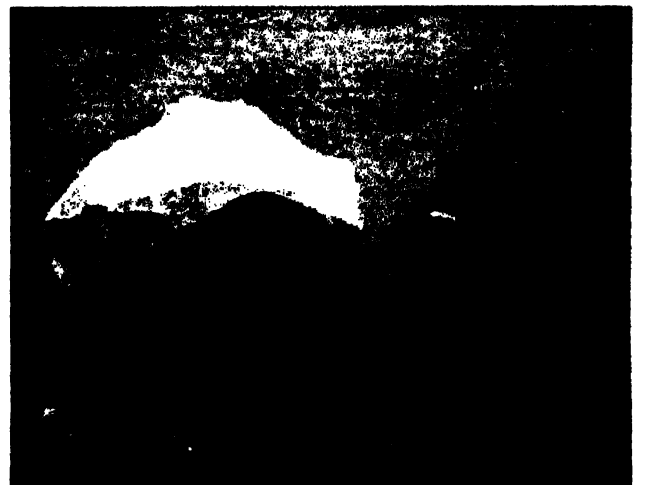
চিপকুঠি থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর যুগের চাঁছুনি ও পাথরের নমুনা

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

মানুষ চারিদিকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতো এবং তখন তারা না জানতো কৃষি কাজ, খাদ্য উৎপাদন, বা ধাতুর ব্যবহার, শুধু মাত্র বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্য শিকার ও খাদ্য সংগ্রহই ছিল মূল কাজ। প্রস্তর যুগের একেবারে শেষপর্যায়ে এসে ছিল নব্য প্রস্তর যুগ যে যুগে মানুষ আস্তে আস্তে পশুপালন, খাদ্য উৎপাদন এবং বসবাসের জন্য ঘর বাঁধতে শিখেছিল। সেই সময়টা খুব বেশি নয় তা আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে। তারপর মানুষ অনেক সময় পেরিয়ে শিখল লিখতে, যা আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগের ঘটনা। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সভ্যতার একটি হল 'সিন্ধু সভ্যতা', যে যুগে মানুষ লিখতে শিখল, ধাতুর ব্যবহার শিখল, ব্যবসা বাণিজ্য শিখল, পাথর এবং কাঁচা ইট ও পোড়া ইটের সাহায্যে বাড়ি ঘর তৈরি করে শহর কেন্দ্রীক জীবন

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

গড়ে তুলল। কিন্তু যে লিপি এই যুগের মানুষ লিখল তা এখনো পড়া সম্ভব হয়নি। তাই পণ্ডিতরা এই যুগকে প্রায় ঐতিহাসিক যুগ (Proto Historic Age) বলে অভিহিত করেন। তারপর এল আদি ঐতিহাসিক যুগ, যে যুগে মানুষ পাথরের বা ধাতুর উপর ও বিভিন্ন লিপির খাদ খোদাই করে লিখল—তার রাজা-বিগ্রহের বর্ণনা বা বিভিন্ন রাজনির্দেশ ইত্যাদি, যাকে আমরা বলি ঐতিহাসিক যুগ। ভারতবর্ষে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ব্রাহ্মীই হল প্রথম লিপি যা পড়া সম্ভব হয়েছে। এই লিপির সময়কাল খ্রীস্ট পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী যা অশোকের ব্রাহ্মী বা Early Brahmi নামে পরিচিত। তা হলে ঐতিহাসিক যুগের সময়কাল হল মাত্র ২৪০০ বছর। আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপ্তি হল ৪০,০০০০০ থেকে ২৪০০ বাদ দিলে থাকে ৩৯,৯৭৬০০ বছর। এই বিশাল সময় কালের ইতিহাস লেখা কি খুব সহজ ? শুধুমাত্র মানুষের

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা
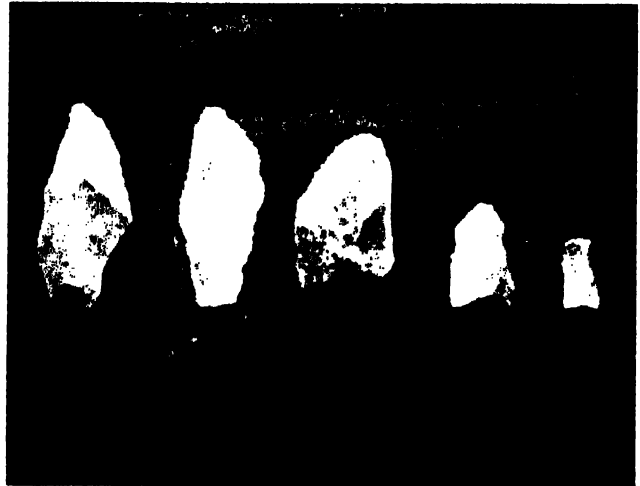
ব্যবহৃত প্রস্তর নিদর্শন ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি চর্চা ভারতবর্ষে খুবই সীমিত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) Pre Historic Branch (নাগপুর) আছে বটে তবে দীর্ঘদিন যাবৎ তেমনভাবে অনুসন্ধান ও উৎখননের কাজকর্ম নেই বললেই চলে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেরও একই অবস্থা (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া)। দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধুমাত্র পুনার 'ডেকান কলেজ', বরোদার 'এম এস ইউনিভারসিটি' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিভাগ কিছু কাজকম করেছে (যা আগে উল্লেখিত হয়েছে) বাকি আছে আরোও অনেক কাজ তা করার মতো প্রত্নবিজ্ঞানী ও গবেষক হাতে গোনা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে খুবই সীমিত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য ও খননের কাজ হয়েছে। শুধুমাত্র একটি

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল উৎখনিত হয়েছে যা হল দুর্গাপুরের কাছে 'বীরভানপুর'। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তদানীন্তন কর্মাধ্যক্ষ B. B. Lal এই প্রত্নস্থলে উৎখনন করেন। আর যে সকল প্রত্নস্থল উৎখনিত হয়েছে তাকে উৎখনন না বলাই ভালো। ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান ও উৎখনন কাজ চালাচ্ছে। বর্তমান অধিকর্তা ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। রাজ্যে জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস হাতে নিয়েছে ও কর্মসূচি নিচ্ছে তাতে রাজ্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক কার্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডঃ সেনগুপ্তের নির্দেশে পুরুলিয়া, বলরামপুর, বাঘমুণ্ডি, আরসা প্রভৃতি অঞ্চলে এই অধিকারের পক্ষ থেকে ১৯৯৩ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয়, অনুরূপভাবে

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

১৯৯৫ সালে দার্জিলিং জেলার কালিম্পং অঞ্চলেও অনুসন্ধানের কাজ করা হয়, নবা প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন এই অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলে, এছাড়াও মালদা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতায় বিজ্ঞান ভিত্তিক গতিশীল উৎখনন ও অনুসন্ধান চলছে গত ২৮ বছর ধরে। এ বছর ২৪ পরগনা (দঃ) ও মুর্শিদাবাদে প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ম পরিকল্পনা চলছে।

বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে নিদর্শন হল নবাশ্মীয় যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শন। নবাশ্মীয় প্রত্নস্থলগুলি হল পোতান্ডা, (সিউড়ি থানা) যেখান থেকে ৪টি নবাশ্মীয় হাতকুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে উল্লেখনীয় যে নবাশ্মীয় যুগকে তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে পৃথক করা কঠিন, কারণ—সব জায়গার মত এখানেই সমস্ত নবাশ্মীয় নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি পর্যায়ের তামা ও ব্রোঞ্জের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটু আলোচনা দীর্ঘায়িত করা দরকার বলে মনে হয়। অনেকে প্রশ্ন করেন পশ্চিমবঙ্গে কি হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে বা সম্ভাবনা আছে ? এর উত্তরে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ তথা বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা অঞ্চলে এর সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল তাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'হরপ্পা সভ্যতা' বলা হয়। এর বিস্তার উত্তরে আফগানিস্তানের 'মান্ডা' থেকে দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের 'দায়ামাবাদ' পশ্চিমে 'সুতকানদোর' (পাকিস্তান) থেকে পূর্বে উত্তরপ্রদেশের 'আলমগিরপুর' পর্যন্ত। এই সীমারেখার বাইরে এখনো পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতার কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত দেশ ভাগের পর, হরপ্পা সভ্যতার বেশির ভাগ অঞ্চলটাই পাকিস্তানে চলে গেছে। ভারতবর্ষে যদিও সিন্ধু
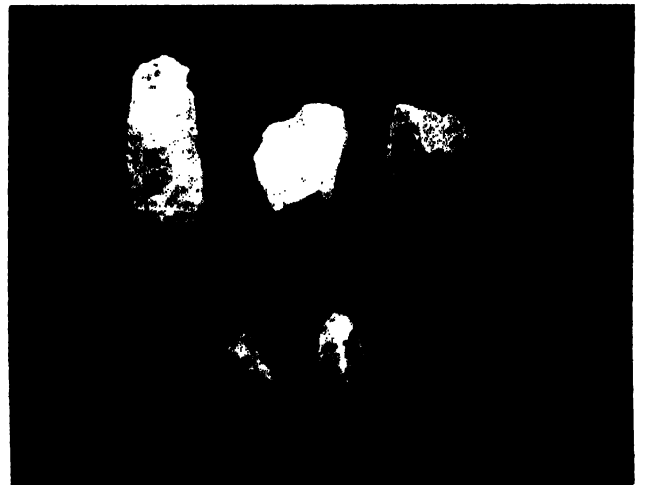
চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা
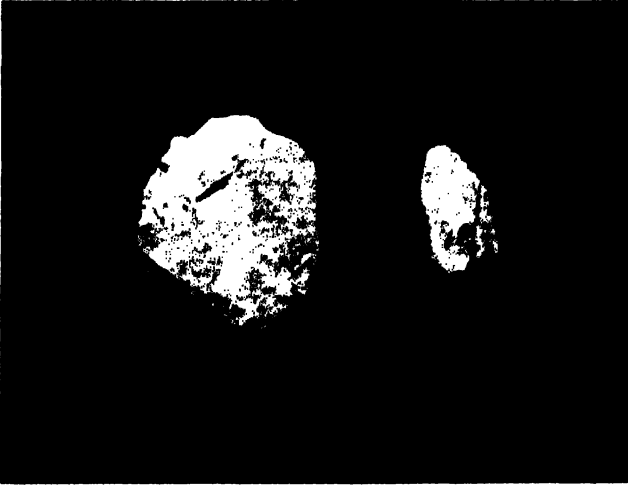
চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার ও পাথরের নমুনা

সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নস্থলের অভাব নেই। যে কটি আছে তার মধ্যে দেশলপুর, সুরকোটাডা, লালঘঞ্জ, কুন্তাসীল রংপুর, লোথাল, রোজদি, কালিমনগান, গুলাস, সিসয়াল, মিতাথল, গনেশ্বর, যোধপুর, নোহ, কুরাদা, বাগোর, গিলুন্দ, বালাথাল, আহার, কায়াথা, নাভদাতোলী, পাদ্রী, প্রভাস পাটন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিয়ানার 'রাখিগড়ি' ও গুজরাটের ধলাবিরা সবচেয়ে বড়। রাখিগড়ি দিল্লির খুব কাছে এবং 'ধলাবিরা' গুজরাটে কচ্ছের রানের 'খাদির' দ্বীপে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যকলাপকে রাজনীতির মাঝখানে এনে গৈরিক বসনধারী RSS, BJP, ও তার অনুগতরা সিন্ধু সভ্যতার নাম পাল্টে 'সরস্বতী সভ্যতা' করার প্রয়াস নিয়েছিল, যদিও এ প্রচেষ্টা রোখা গেছে কেন্দ্রে পালা বদলের ফলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের সুযোগ নিয়ে কিছু ধামাধারী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দেশের ইতিহাসও পাল্টাতে

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

দ্বিধাবোধ করে না তা সকলেরই জানা। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী পরিস্থিতি যেমন দেশকে টুকরো টুকরো করার পক্ষে যথেষ্ট। সাম্প্রদায়িকতার রং লাগাতে প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রেও কিছু ধামাধারী প্রত্নতাত্ত্বিক 'সরস্বতী' নামটা ঢোকাতে ব্যস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা গুজরাটে কোনো নতুন 'হরপ্পা প্রত্নস্থল' আবিষ্কৃত হলে তাকে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা না বলে 'সরস্বতী সভ্যতা' বলতো, যুক্তি হল বর্তমান 'ঘর্ঘরা' নদীর (অতীতে সরস্বতী) মূলস্রোত কচ্ছের রানে হারিয়ে গেছে। এই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতা 'হরপ্পা সভ্যতা' নয় তা হল 'সরস্বতী সভ্যতা', যদিও এই নদী ও এর কাছে অন্যান্য নদী তীরবর্তী অঞ্চলে 'হরপ্পা পরবর্তী সভ্যতা'র (Late Harappa) বিকাশ হয়েছিল। 'সরস্বতী' হল হিন্দু ধর্মের এক দেবী, তাহলে ভারতীয় গেরুয়াধারীদের ধর্মীয় ভাবাবেগ গড়ে তোলা সহজ

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

হবে। নাম বদলের চেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে, তার জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে, কিন্তু নাম বদল করে সভ্যতার মহত্ব প্রমাণ করা যায় কি? প্রশ্ন ছিল পশ্চিমবঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার সম্ভব কিনা? তার উত্তর হল— 'একদিকে যেমন সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এক উন্নত নগর কেন্দ্রীক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, দ্বারকেশ্বর, অজয়, রূপনারায়ণ, ময়ূরাক্ষী, শাল, বক্রেশ্বর, কুনুর ও কাঁসাই নদী অববাহিকাতেও একটি সময়ে (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ) গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ একই সঙ্গে হয়েছিল যা এখানে তাম্র প্রস্তর বা তাম্রাশ্মীয় (Chalcolithic) সভ্যতা বলে পরিচিত। তেমনি সুদূর রাজস্থানের আহার, বিহারের চিরান্দ, ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং বীরভূমের মহিষদলের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই অঞ্চলের ভীষণভাবে

মিল আছে। বীরভূম জেলার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উৎখনিত তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল হল 'নানুর' ও 'মহিষদল'। বেশির ভাগ প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাম্রাশ্মীয় বলার পরিবর্তে 'নবাশ্মীয় তাম্রাশ্মীয়' সভ্যতা বলতে পছন্দ করেন। কারণ নবাশ্মীয় হাতিয়ার তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি পর্যায়ে পাওয়া গেছে। অন্যান্য 'নবাশ্মীয় তাম্রাশ্মীয়' প্রত্নস্থলগুলি হল কিরনাহার (নানুর থানা) বেলুটি সরস্বতীতলা (বোলপুর থানা) গিরিডাঙ্গাল (দুবরাজপুর থানা) চণ্ডীদাস নানুর (নানুর থানা) ইত্যাদি। উৎখনিত দুটি প্রত্নস্থলের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ও আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর বর্ণনা দেওয়া হল।

মহিষদল (২৩°৪৩′ উঃ ৮৭°৪১′ পূর্ব)

এই প্রত্নস্থলটি বোলপুর থানার কোপাই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (ASI) পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬৪ সালে উৎখনন শুরু করে। প্রায় ২ মিটার পুরু মাটির
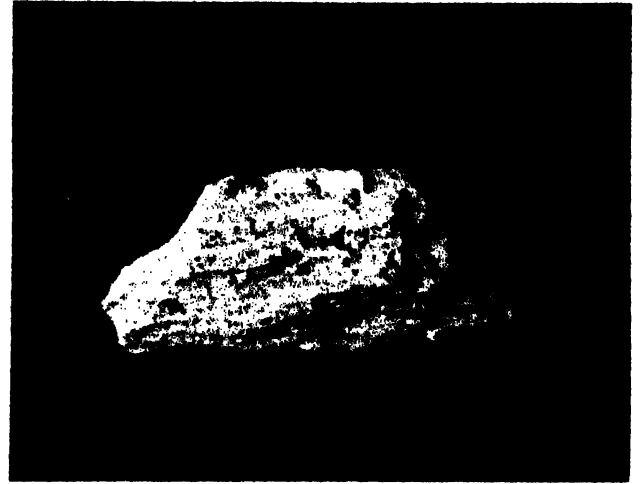
চিলকুটী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

আস্তরণের ভিতরে স্তর বিন্যস্ত অবস্থায় বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে দুটি পর্যায়ের সংস্কৃতিক বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রথম পর্যায়—তাম্রাশ্মীয় যুগের দুটি বাসস্থানের বিন্যাস লক্ষ্য করা গেছে—দুটি পর্যায়েই মাটির মেঝে (Floor) পাওয়া গেছে, মেঝেগুলি দুরমুশ করে শক্ত করা। মাটির সঙ্গে পোড়ামাটির নুড়ি, ছাই, কঞ্চির ছাপযুক্ত মাটির ঢেলা, পোড়া তুষের মাটির প্রলেপ দেওয়া প্লাস্টার পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত এই স্তর থেকে প্রত্নবস্তুগুলি হল মধ্যাশ্মীয় পাথরের নিদর্শন—Blade, Scraper, Lunate, নবাশ্মীয় হাতকুঠার, তামার তৈরি হাত কুঠার, তামার তীরের ফলা, মাছ ধরার বড়শি, এগুলির সঙ্গে কিছু পোড়ামাটির মূর্তি যেমন Games man, হাড়ের তৈরি চিরুনি, হাড়ের সূচ, হাড়ের চুড়ি, মূল্যবান পাথরের তৈরি পুঁতি, স্টিয়াটাইট terracotta Phalluts, বিভিন্ন রং-এর মৃৎপাত্র-মূলত

চিলকুটী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

কালো ও লাল রং-এর মৃৎপাত্র (Black & Red Ware), এই মৃৎপাত্রগুলি কিছু সাদা রং চিত্রিত এবং চিত্রন ছাড়া দু রকমেরই পাওয়া গেছে। গাঢ় লাল রং এর মৃৎপাত্রগুলি কিছু চিত্রিত আবার কিছু চিত্র ছাড়া। কিছু মৃৎপাত্রের উপরিতল কাঁচা অবস্থায় আঁক কাটা চিত্র এবং তারপরে পোড়ান হয়েছে। বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্রের মধ্যে নালী যুক্ত পাত্র, Carinated Bowls, Splayed out rim যুক্ত মৃৎ পাত্র ইত্যাদি। বেশ ভালো পরিমাণে পোড়া চালের নমুনাও পাওয়া গেছে, যা উপরি তলের মেঝেতে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে মনে হয়। এই চালগুলি এক জায়গায় সঞ্চিত ছিল। পরবর্তীকালে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, মাটিতে গর্ত করে চালের সঞ্চয় ভাণ্ডারেরও (Granery) প্রচলন ছিল। এই পর্যায়ের এটি সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে কার্বন ১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমটি
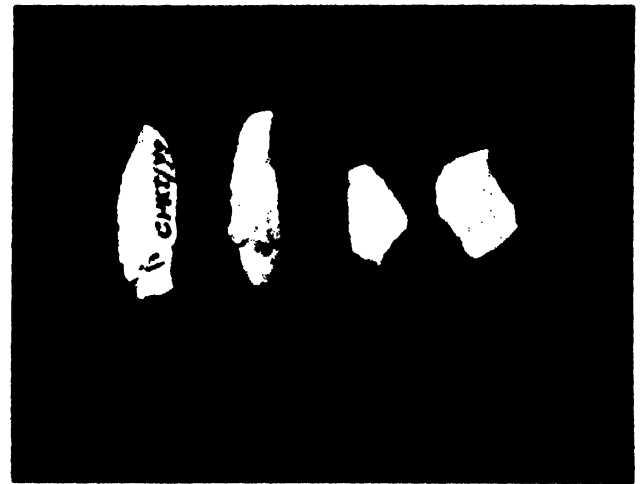
চিলকুটী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা
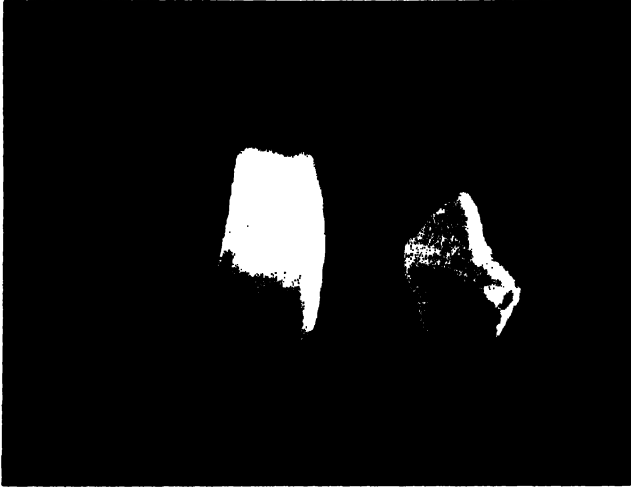
চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

৩২২৫ ± ১০৫ বছর, দ্বিতীয়টি ২৯৫০ ± ১০৫ বছর, তৃতীয়টি ২৭২৫ ± ১০০ বছর। সময়কালগুলি মোটামুটি ১৩৮০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৮৫৫ খ্রীঃ পূঃ এর মধ্যবর্তী।

পর্যায়-২ প্রথম পর্যায়ে ধারাবাহিকতা রেখে ২য় পর্যায়ও রচিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য মৃৎপাত্রের রং-ছিল হলদেটে, কালো রং দিয়ে চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র। মৃৎপাত্রের সঙ্গে পাওয়া অন্য নিদর্শন হল পাথরের ক্ষুদ্রাস্ত্র, মাটির তৈরি পুঁতি, কম মূল্যবান পাথরের (Semi Precious Stone) তৈরি পুঁতি পোড়ামাটির হাতি ইত্যাদি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লৌহ নির্মিত নিদর্শনসমূহ এই যুগেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। লোহার তৈরি জিনিসের মধ্যে তীরের ফলা, বর্শার ফলা, ছেনি, পেরেক, লোহা গলানোর অবশিষ্টাংশ (Iron slag) ইত্যাদি। কার্বন-১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে এর প্রথম ব্যবহারের সময়কাল পাওয়া গেছে। বাংলা

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাস্ত্র, উদ্ভিদ জীবাশ্ম ও পাথরের নমুনা

তথা পূর্ব ভারতে লৌহ যুগের সূচনায় সময়কাল সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় এই অঞ্চল থেকে। ৬৯০ খ্রীঃ পূঃ (২৫৬৫ ± ১০৫) থেকে এই অঞ্চলে লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল।

চণ্ডীদাস নানুর

অপর উৎখনিত নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল হল নানুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীদাস নানুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রধান কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এই প্রত্নস্থলের খননকার্য শুরু করেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চল শাখা ১৯৬১ এবং ১৯৬৩ সালে পুনরায় উৎখনন করে। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সবকটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিহ্ন উদঘাটিত হয়েছে, তাম্রাশ্মীয় যুগের কালো ও লাল (BRW) রঙের মৃৎপাত্রসহ

চিপকুঠী থেকে প্রাপ্ত উচ্চপুরাপ্রস্তর যুগের চাঁচনী

ধূসর রঙের মৃৎপাত্র সাদা রং চিত্রিত কালো ও সাদা মৃৎপাত্র, লালা রং-এর চিত্রিত মৃৎপাত্র ও স্ট্যাম্প নকশা করা মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎখনিত নিদর্শন হল ছুরির ধার যুক্ত মাটির পাত্র, মধ্যাশ্মীয় হাতিয়ার প্রভৃতি।

উপরে উল্লিখিত দুটি উৎখনিত প্রত্নস্থল ছাড়া অন্যান্য আরও কিছু তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি হল সুরাট রাজার ঢিবি (থানা-বোলপুর), কিরনাহার (নানুর) বেলুটি (সরস্বতীতলা বোলপুর), মন্দিরা (অজয় নদীর তীরবর্তী), জয়দেব (কেন্দুলির নিকটবর্তী) (ইলমবাজার থানা) প্রভৃতি। গৈরিক রংয়ের মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে জসপুর (দুবরাজপুর থানা) গিরিডঙ্গাল (দুবরাজপুর), কোটাসুর, আরাইপুর, বাসরা, বাতিকার, বাহারিয়া, গোপালনগর, কেওড়া, কুষ্ঠিকড়ি, মঙ্গলডি, নাচনশালা, বেড়গ্রাম, গোরাপাড়া, হারটিকা, হাসরা, কেয়ারা,

কুর্মিঠা শালকানা (সিউড়ি) থেকে কিছু শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গেছে যাতে তাম্রাশ্মীয় যুগের 'বাচ্চাদের সমাধির' Child Burial বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি ছাড়াও সুপুর, তাসপুর, ঘুরিষা, চেলা, জুঁই গ্রাম, হাতুইকড়া, প্রভৃতি অঞ্চলগুলি প্রধান।

উপরিউক্ত প্রত্নস্থলগুলি থেকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সঙ্গে অজয় তীরবর্তী বর্ধমান জেলার পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে। পাণ্ডু রাজার ঢিবির দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতি মহিষাদলের পর্যায়-১'এর সমসাময়িক। মোটামুটি কার্বন-১৪ পরীক্ষায় যে সময় পাওয়া গেছে তা হল ১০১২ ± ১২০ খ্রীঃ পূঃ। অন্য দুটি উৎখনিত প্রত্ন ক্ষেত্র হল হরাইপুর বা যক্ষেরডাঙ্গা এবং বাহিরী। প্রথমটি ASI তত্ত্বাবধানে উৎখনিত হয়। এখান থেকে তাম্রপ্রস্তর ও পরবর্তী যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টি থেকে প্রথম পর্যায়ে তাম্রপ্রস্তর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একইভাবে লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল। তৃতীয় আর একটি প্রত্নক্ষেত্র হল—হাট-টিকরা এখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় উৎখনন হয়েছিল। এখান থেকেও তাম্রপ্রস্তর ও লৌহযুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বীরভূম জেলার সাংস্কৃতি বিবর্তন সুদূর অতীতে অর্থাৎ প্রস্তর যুগে সূচিত হয়েছিল যা প্রায় লক্ষাধিক বছর আগের। এখান থেকে নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগ (Lower Palaeolithic) থেকে লৌহযুগের সব নিদর্শনই পাওয়া গেছে। পুনরায় উল্লেখ করা দরকার, শুধু বীরভূম বা পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক চর্চার আগ্রহ ভীষণ রকম কম। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র বর্ধমানের 'বীরভানপুর' ছাড়া কোন প্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্র উৎখনিত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের 'কলকাতা সার্কেল' এখনো কোন প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থল উৎখননে আগ্রহ দেখায়নি। এখনো সঠিকভাবে আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় পশ্চিমবঙ্গের ঠিক কোথায় প্রস্তর যুগের মানুষ বসবাস শুরু করে ছিল। আবিষ্কৃত প্রস্তর নিদর্শনের স্থলগুলিকে কি প্রাথমিক প্রত্নস্থল বলা যায় (Primary Site)? যদি বলা যায় তাহলে সে সকল প্রত্নস্থলের নাম কি ? আবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শনগুলির স্তরায়ন কি (Stratigraphy)? প্রস্তর যুগের মানুষের দেহাবশেষ কি আবিষ্কৃত হয়েছে ? সেই সময়কার জীব-জন্তু ও গাছপালার নমুনাগুলি সঠিক কি ? আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এখনো বাকি। ভারতবর্ষের মানচিত্রেও একই সমস্যা প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি পর্ব নিয়ে, প্রথম থেকে প্রাগৈতিহাসিক চর্চার যে ঘাটতি ছিল এখন আরও প্রকটিত হচ্ছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বহুদিন যাবৎ শুধুমাত্র 'হরপ্পা' সংস্কৃতি নিয়ে পড়ে আছে। কয়েকটি সার্কেল তাদের কাজের সীমারেখা ধরে রেখেছে 'আদি ঐতিহাসিক' (Early Historic) ও 'ঐতিহাসিক' (Historic) যুগ নিয়ে। প্রাগৈতিহাসিক পর্ব নিয়ে চর্চা করার আগ্রহ কবে আসবে কেউ জানেন না। 'চন্দ্রকেতুগড়ের' মত একটি প্রত্নস্থল প্রায় ধ্বংসের পথে চলেছে। ১৯৫৬—৬৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ধারাবাহিকভাবে উৎখনন চালিয়ে প্রতি বছরই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি পর্যায়ের উল্লেখ করেছে। ASI কলকাতা সার্কেল শুধুমাত্র ২০০০ সালে উৎখননের উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু অল্পদিন পরেই তা বন্ধ হয়ে গেছে, এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রত্নক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে 'বিশ্ব-ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রত্নস্থল' (World Heritage Monument) আছে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে বাংলার পোড়ামাটির শিল্প (যা পৃথিবী খ্যাত) সমৃদ্ধ 'বিষ্ণুপুরের মন্দির'গুলি বা মালদা জেলার 'গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য'গুলিকে বিশ্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রত্নস্থল (World Heritage Monument) হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার সুপারিশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার বা ASI-এর সে রকম চিন্তা নেই। দার্জিলিং এর 'টয় ট্রেন' বা 'সুন্দরবন' নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পে সমৃদ্ধ Temple Terracotta Art-এর স্থলকে Heritage Site হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। বীরভূমের কোন প্রত্নস্থল World Heritage Monument না হলেও রাঢ় বাংলার একটি জেলার শিল্পশৈলী বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে স্থান পেতে পারে।

'বীরভূম' জেলার সমস্ত মানুষকে এই জেলার সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস চর্চায় উদ্যোগী হতে হবে, আর যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ক্ষেত্রানুসন্ধানীরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা যেন থেমে না যান। এই জেলায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল, গ্রাম ছাড়া এই রাঙ্গামাটির পথ ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চলতে থাকুক। বীরভূম জেলার অজানা ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হোক। জেলায় যেভাবে সরকারি প্রচেষ্টায় ও লাখো লাখো যুবকের প্রতীকি রক্ত দানের আন্তরিকতায় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ-এর চিমনিতে ধোঁয়া এসেছে, যেভাবে শিল্পায়নে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, জোয়ার এসেছে, সেইভাবে অতীতে বীরভূম জেলার সংস্কৃতি যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তা উদঘাটিত হোক সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সকলের নিঃস্বার্থ সহযোগিতায়।

: সংযোজন :

বীরভূম জেলার রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত প্রত্নস্থল :—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১) শিবমন্দির, সুপুর, থানা-বোলপুর, ২) কালীমন্দির, ইটান্ডা-'ঐ'৩) নবরত্ন মন্দির, ইলমবাজার, থানা-ইলমবাজার, ৪) গৌরাঙ্গ মন্দির, ইলমবাজার, থানা-ইলমবাজার, ৫) মোতিচুর মসজিদ, রাজনগর, থানা-রাজনগর, ৬) শিবমন্দির, রামনগর, থানা-ময়ূরেশ্বর, ৭) দেওয়ানজি শিবমন্দির, হেতমপুর, থানা-দুবরাজপুর, ৮) চন্দ্রনাথ শিবমন্দির, হেতমপুর, থানা-দুবরাজপুর, ৯) শিবমন্দির, পাঁচরা, থানা-খয়রাশোল, ১০) আদিনাথ শিবমন্দির, রাসা, থানা-খয়রাশোল, ১১) বিষ্ণুমন্দির, হাতসেরান্দি, থানা-নানুর, ১২) শিবমন্দির (কালীমন্দিরের কাছে) গনপুর, থানা-মহঃ বাজার, ১৩) শিবমন্দির (রঘুনাথ ?) ঘুড়িষা, থানা-ইলমবাজার, ১৪) মালেশ্বর শিবমন্দির, মল্লারপুর, থানা-ময়ূরেশ্বর, ১৫) কালীমন্দির, পাথরকুচি, থানা-খয়রাশোল, ১৬) চাঁদরাই মন্দির (ধর্মঠাকুর) উচ্‌কাবন, থানা-নানুর, ১৭) শিবমন্দির (৪টি একথাথে), উচকারন, থানা-নানুর, ১৮) বন্দিশ্বর শিবমন্দির বন্দিরবন, থানা সিউড়ি

কেন্দ্রীয় সরকার

১) ভদ্রেশ্বরের দুটি ঢিবি, ২) কুবিলাসপুর ধর্মরাজ মন্দির, ৩) কুন্দলি, রাধাবিনোদ মন্দির, ৪) বাঁসুলি মন্দির ও ঢিবি, নানুর
৫) দামোদর মন্দির, সিউড়ি

তথ্যসূত্র :

১। 'Pre-historic Study in Eastern India'—A. K. Ghosh, ২। IAR—59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 85, ৩। Archaeological Discoveries in West Bengal—Directorate of Archaeology, West Bengal., ৪। State of Pre-historic Culture in Radha Bengal—M. Bhattacharjee., ৫। 'Birbhanpur a Microlithic site in Damodar Valley, West Bengal—Ancient India-Vol-IV ৬। The context of Microliths at Paruldanga, Santiniketan—ME Vol-IV., ৭। Palaeolithic Industries of West Bengal—A. K. Ghosh., ৮। Excavation of Pandurajar Dhibi—P. C. Dasgupta., ৯। 'The chalcolithic background of West Bengal—N. C. Ghosh., ১০। Proto-history of West Bengal—P. C. Dasgupta., ১১। Pre-history of West Bengal—Amita Roy., ১২। Chalcolithic stage at Mongalkot—Amita Roy., ১৩। 'পুরাবৃত্ত ১'—প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার কর্তৃক পরিচালিত রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের কীপার (Keeper), প্রতীপকুমার মিত্র, আমার সহকর্মী বাদলচন্দ্র দাস, সুব্রত নন্দী, মিন্টু চক্রবর্তী, শিবরন নন্দী, শ্রীমতি সুমিতা গুহ সরকার, অমল রায়, (অধীক্ষক) ভাস্কর ভট্টাচার্য্য আমার কন্যা কুমারী প্রজ্ঞা মাইতি ও তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের সাগর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। সবশেষে আমার সহধর্মীনী শ্রীমতী শিউলি মাইতিকে।

লেখক পরিচিতি : প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারে 'অনুসন্ধান সহায়ক'। আলোক চিত্র : সুমিতা গুহ সরকার

বীরভূম প্রকৃতি : দ্বারবাসিনী

অজয় নদী—এখানেই কেন্দুলীর মেলা হয়

ছবি : [illegible] ঘোষ

বীরভূম জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি

মলয় মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গকে যদি একটা পরিবার ধরা হয়, তাহলে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা হল উনিশ। এই উনিশটি জেলা এক একটি এক এক ধরনের। কেউ উঁচু নিচু ভূমিরূপ নিয়ে সন্তুষ্ট, কেউ বা ঢালা সমতল ভূমিতে ঠাসা, কারও শরীরের এখানে-ওখানে ঘন জঙ্গল, কারও বা সমস্ত জমি চাষিদের দখলে। জন্ম ইতিহাসে কোনো জেলা সরল সুন্দর-সুখকর, আবার কোনো কোনো জেলা ঐতিহাসিকদের কাছে আকর্ষণীয়। বীরভূম জেলা হল এই উনিশজনের একজন। পশ্চিমের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গায়ে গা লাগিয়ে সে হাত-পা ছড়িয়ে অবস্থান করছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থিত এই জেলা নিজের দখলে রেখেছে প্রায় ৪,৫৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গা।

পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি তৈরি হবার সময় ভূ-আলোড়নের কিছু প্রভাব পূর্বদিকে বীরভূম জেলাতেও লক্ষ করা যায়। ঢেউ খেলানো ভূমিরূপ তৈরি হয়। তাই জেলার পশ্চিমভাগে ভূ-আলোড়নে

ঢেউ খাওয়া উঁচু-নিচু ভূমিভাগের নিচে মুখ বুজে পড়ে রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম পাথরের স্তর। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় জেনেছেন যে বীরভূম জেলার পশ্চিম অংশের এক বিরাট অঞ্চলে প্রায় নব্বুই কোটি বছরের পুরনো আরকিয়ান (Archean) যুগের পাথর পাওয়া যায়। একদম নিচের এই পুরনো এবং শক্ত আগ্নেয় শিলার ওপর অবিন্যস্তভাবে পশ্চিম বীরভূমের কোনো কোনো অংশে রানিগঞ্জের কয়লাস্তরের বিচ্ছিন্ন অবক্ষেপণ পাওয়া যায়। ভূ-তাত্ত্বিকদের ভাষায় যাকে তাংশুলি বেসিন (Tangsuli Basin) অবক্ষেপণ বলা হয়। জেলার হিংলো ও অজয় নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় পাঁচ বর্গকিলোমিটার এলাকায় কিছু নিম্ন থেকে মধ্যমানের কয়লা পাওয়া যায়।
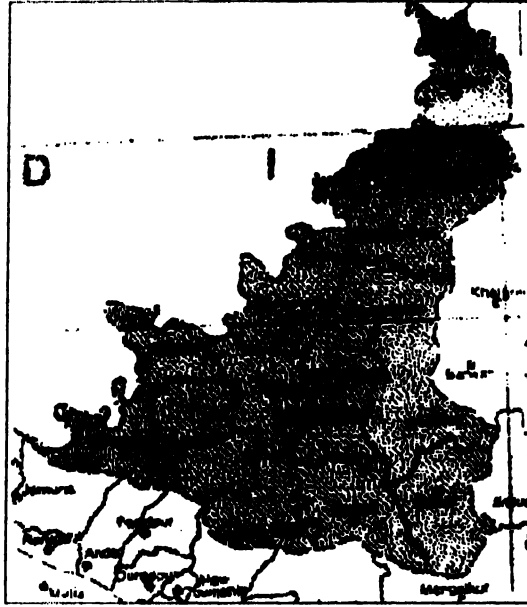
জেলার উত্তর অংশে পাওয়া যায় জুরাসিক যুগের আগ্নেয় শিলা। ছেঁড়া ছেঁড়া কালচে খয়েরি রঙের চাদরের মতো এই পাথরের স্তর। শিয়ালডাঙ্গা, বারামাসিয়া, সাগর বান্দি, মালুটি প্রভৃতি গ্রামগুলির উঠোনে, মাঠে, নদীর বুকে এরা উঁকি মেরেছে মাটির ভেতর থেকে। কোথাও ধাপের সৃষ্টি করেছে, আবার কোথাও ছোটখাটো পাহাড় হয়ে ধরা দিয়েছে খোলা আকাশের নিচে। দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের জন্মবৃত্তান্ত অনেকটা এই জাতীয়। যদিও কথিত আছে যে লঙ্কেশ্বর রাবণ ও তার মামা কালনেমী তাঁদের অদূরদর্শীতার জন্য পাথর হয়ে যান এখানে। প্রচ্ছন্ন অর্থে সীতা হল কৃষির প্রতীক আর প্রস্তররূপে মামা ও ভাগ্নে অর্থাৎ কালনেমী ও রাবণ এখানে কৃষির অন্তরায়।

এই জুরাসিক আগ্নেয় শিলা আবার অনেক জায়গাতেই ল্যাটারাইটের শক্ত পুরু স্তরের নিচে চাপা পড়ে আছে, যেমন পাচামি, পশ্চিম কাপাসডাঙ্গা, সাগর বান্দি পশ্চিম নলহাটিতে। ল্যাটারাইট অনেক জায়গাতেই টারসিয়ারি অবক্ষেপণের ফাঁকে ফাঁকে এমনটি বক্সাইট্ কাদার সঙ্গে মিলেমিশে এক নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করেছে। জেলার সালাক-মাকড়ুমনগর-সাইকারদহ, মহম্মদ বাজার-খাইরা-কুমারপুর প্রভৃতি অঞ্চলকে ভূবিজ্ঞানীরা এই ধরনের ল্যাটারাইট ভূমিরূপের আদর্শক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

পশ্চিমের এবং উত্তরের উঁচুনিচু অংশটুকু বাদ দিলে জেলার বাকি অঞ্চলটি সমতলভূমির অন্তর্গত। যেখানে পুরনো পলি অর্থাৎ ভাঙ্গর (Bhangar) এবং নতুন পলি বা খাদার (Khadar) পলির অবক্ষেপণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই জেলার ভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। যার ফলে জেলার সমস্ত নদীই প্রধানত এই ঢালকে অনুসরণ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত। পশ্চিমদিকের থানাগুলির গড় উচ্চতা ২৫০ থেকে ৩৭৫ ফুটের কাছাকাছি। যেমন রাজনগর থানার ভূমির গড় উচ্চতা ৩৭৬ ফুট, খয়রাশোলের গড় উচ্চতা ৩৬৬ ফুট এবং দুবরাজপুর থানার ৩০০ ফুট গড় উচ্চতা। অন্যদিকে পূর্বের থানাগুলির গড় উচ্চতা যথাক্রমে লাভপুর এবং নানুর থানায় ১০০ ফুট। উত্তরের মুরারই থানার গড় উচ্চতাও হল ১০০ ফুট। জেলার মধ্যিখানে পড়ে থাকা সিউড়ি থানার গড় উচ্চতা যেমন ২৬১ ফুট, তেমনি আবার দক্ষিণের ইলামবাজারের উচ্চতা ২১৭ ফুট। অন্যদিকে দক্ষিণের বোলপুর থানার সাদামাটা সমতল ভূমিরূপের গড় উচ্চতা ১০০ ফুট।

এই জেলা কর্কটক্রান্তি অক্ষাংশের সংলগ্ন হওয়ায় জলবায়ু উপ-ক্রান্তিয় জলবায়ুর ন্যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষামুখর তিন-চার মাস এবং শীতের জলীয়বাষ্পহীন শুষ্ক শৈত্যপ্রবাহ সারা বছরকে প্রধানত তিনটি ঋতুতে ভাগ করে রেখেছে। মার্চ মাসের শেষ থেকে জুনের মাঝামাঝি হল গ্রীষ্মকাল। যে সময় সর্বোচ্চ গড় দৈনিক তাপমাত্র ৩৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং দৈনিক গড় সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যায়। এই সময় অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এবং আশপাশ অঞ্চলের আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার মুখে কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত ঘটে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে গরম হাওয়া পাগলের মতো ছুটতে থাকে জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। যাকে জেলার মানুষরা 'লু' বলে থাকেন।

জুন মাসের শেষ থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ষাকাল। সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাতের ৭৮ শতাংশ বৃষ্টিই হয় এই কয়েকমাসে। এই ক্ষুদ্র জেলার মধ্যে আবার সমস্ত অঞ্চলে একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না। গত তিরিশ বছরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে জেলার পশ্চিমাঞ্চলে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। মহম্মদবাজার থানায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪২৪ মিলিমিটার, রাজনগর থানায় সারা
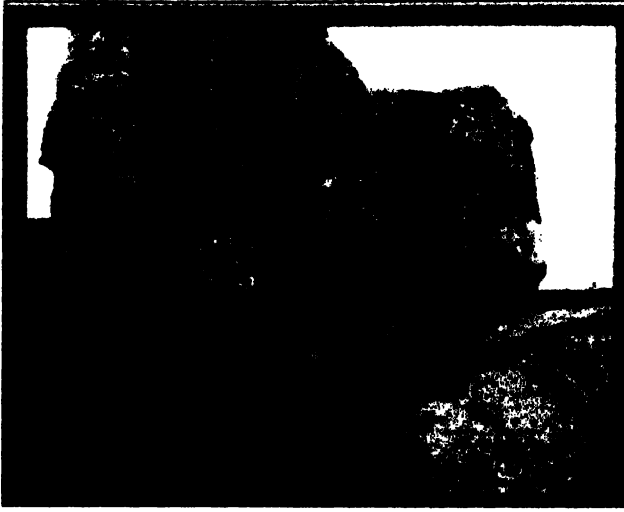
মামা-ভাগ্নে পাহাড়

বছরের গড় বৃষ্টিপাত ১৪০৫ মিলিমিটার যেমন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি উত্তরের নলহাটি থানার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হল ১১১২ মিলিমিটার এবং পূর্বের নানুর থানা পায় ১২১২ মিলিমিটার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত। এছাড়া প্রতি বছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণও এক থাকে না, যথেষ্টই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এই গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের সম্ভবনার তারতম্য সর্বাধিক পাওয়া যায় পশ্চিমের দুবরাজপুর থানায়, খয়রাশোল অঞ্চলে এবং উত্তরের মুরারই থানা অঞ্চলে। স্বভাবতই প্রতিবছর বর্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন এই অঞ্চলের মানুষরা আগামী গ্রীষ্মের খরার ভয়াবহতার আশঙ্কায়।

ভূমিরূপের ঢাল ধরে বৃষ্টির জল এবং ভৌম জলস্তরের জোগানকে সম্বল করে এই জেলার মানচিত্রকে পশ্চিম থেকে পূর্বে ফালাফালা করে কেটেছে বেশ কয়েকটি নদ ও নদী। জেলার মধ্যিখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নদী বা মোর নদী। দক্ষিণাঞ্চল দখল করেছে কোপাই বা শাল নদী, বক্রেশ্বর নদী, হিংলো নদী, কুয়ে নদী এবং একদম দক্ষিণ সীমানায় পড়ে আছে অজয় নদ। জেলার উত্তর অংশে আছে ব্রাহ্মণী, গামবী, বানশলই, পাগলা, দ্বারকা নদী। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের পাহাড়ের ঝরনা থেকে, কোনো কোনো নদী আবার মাঠের বৃষ্টির জলে জন্ম নিয়ে পূর্বের ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে। অনেক ছোট নদী ভাগীরথীতে পৌঁছবার আগেই দম হারিয়ে কাছাকাছি বড় নদীতে বা বিলে গিয়ে মাথা লুকিয়েছে। যেমন বক্রেশ্বর, কোপাই, চিংলো, পাগলা, বাবলা, কুয়ে নদী। শুধুমাত্র বর্ষার কয়েকমাস বৃষ্টির জলে এবং ভৌমজল স্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক সম্পূর্ণ নদীর সম্মান পায় এইসব ছোট ছোট নদী, জেলার মানচিত্রকে জলের আলপনায় সুন্দর করে তোলে। তখন, নদী-ঘাট, নদী-পাড়, নৌকোপথ এসব কথার মানে খুঁজে পায় নদীপারের মানুষরা। কিন্তু ওই কয়েকমাসই। তারপর সারা বছর জেলার প্রায় সমস্ত নদীই হয়ে ওঠে একফালি বালির মরুভূমি। শ্রীহীন নৌকো ডাঙ্গায় পড়ে রোদ্দুরে পুড়তে থাকে, রাখাল ছেলেরা পায়ে হেঁটে তুড়ি মেরে পার করে দেয় বড় বড় নদী। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হল এই অদ্ভুত চরিত্রের নদীগুলির বন্যা। সম্প্রতিকালের গবেষণায় দেখা গেছে যে বীরভূম জেলায় বন্যার চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে গেছে। হঠাৎ করে ঢেউ জাগানো বন্যায় জেলার মানুষ বুঝে উঠতে পারছেন না—এবার বন্যার ঝাপটা কতটা এবং কোনদিক থেকে আসবে ইদানীংকালের বন্যা অনেক গ্রামকে মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছে, বহু চাষের জমিকে বালিস্তরে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র ২০০০ সালের বন্যায় জেলার ৫,৪০০ একর চাষ জমি বালির তলায় চাপা পড়েছে। গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, অতীতের কয়েক দশক বাদে যে অতিমাত্রায় বন্যা হত, এখন তা দেখা দিচ্ছে প্রায় প্রতি তিন-চার বছর অন্তর। ফলে বন্যার গতি-প্রকৃতি নিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে উঠছেন জেলা প্রশাসনও।

জেলার পশ্চিমে খয়রাশোল এবং মহম্মদ বাজার থানা অঞ্চলের আর্টেজীয় কূপগুলি শুধুমাত্র পর্যটকদের আকর্ষণ করে না, এগুলি জেলার ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এছাড়া জেলার বক্রেশ্বর নদীর ডানতীরে এক ঝাঁক শালফিউরাস উষ্ণ প্রস্রবন (Sulphurous Spring) পশ্চিমবঙ্গকে এক অন্য মাত্রায় এনে দিয়েছে। বক্রেশ্বরের এই বহ্নিকুণ্ড ও অগ্নিকুণ্ডতে সালফেট, ক্লোরাইড, সোডিয়াম আয়নস্, র‍্যাডন, এমনকি আরগন জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

কোনো অঞ্চলের মাটির চরিত্র নির্ভর করে সেই অঞ্চলের অনেকগুলি ভৌগোলিক কারণের ওপর। যার মধ্যে সেই অঞ্চলের শিলার চরিত্র এবং অবক্ষেপিত পলির প্রকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীরভূম জেলায় সাধারণত তিন ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়। জেলার পশ্চিমপ্রান্তে বিশেষ করে খয়রাশোল, দুবরাজপুর, রাজনগর, মহম্মদবাজার, রামপুরহাট প্রভৃতি ব্লকের বিভিন্ন অংশে ল্যাটারাইট জাতীয় লাল কাঁকুড়ে মাটি পাওয়া যায়। এই মাটিতে লোহার পরিমাণ বেশি থাকে। এই মাটিতে জৈব পদার্থ এবং কাদার পরিমাণ কম থাকায় অনুর্বর এবং ক্ষয়প্রবণ হয়। বোলপুর ও ইলামবাজার ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে এই মাটি দেখা যায়। অন্যদিকে টার্সিয়ারি যুগের ভারি ও হালকা ধরনের পলিমাটি, অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং বিভিন্ন নদী উপত্যকা থেকে দূরবর্তী স্থানে পাওয়া যায়, যাকে ভৌগোলিক ভাষায় 'ভাঙ্গর' বলা হয়। এই মাটিতে কাদার ভাগ বেশি হওয়ায় জল ধারণ ক্ষমতাও বেশি। বালুকণার আকার

অপেক্ষাকৃত মোটা। জেলার নানুর, লাভপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট প্রভৃতি ব্লকে এই দোঁআশ মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া নদী উপত্যকা ও বন্যা প্লাবিত নদীর নিম্ন প্রবাহ অঞ্চল নবীন ও সূক্ষ্ম পলি মাটি দ্বারা আবৃত। ভৌগোলিক ভাষায় এই 'খাদার' মাটি খুবই উর্বর।

একদা জঙ্গলে ঠাসা বীরভূম জেলা আজ মানুষের চাহিদার সঙ্গে অপস করে কয়েক জায়গায় ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু খুচরো জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে জেলার বনভূমি বলতে এখন শুধুমাত্র ১৩৭ বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চল পাওয়া যায়। যার মধ্যে ১১৬ বর্গকিলোমিটার শাল জঙ্গলের দখলে, বাকি ২১ বর্গকিলোমিটার জঙ্গল হরেক রকম আঞ্চলিক বিভিন্ন গাছের ঠাসবুনোট। সম্প্রতি নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যৌথ বনসংরক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া জঙ্গলকে বনবিভাগ ও স্থানীয় মানুষরা ফিরিয়ে এনেছেন। এই প্রকল্পের মধ্যে ইলামবাজার এলাকার ১৪ বর্গকিলোমিটারের চৌপাহারি জঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার মধ্যে জেলাতে ভূমিসংরক্ষণের আওতায় প্রায় ৭০ শতাংশ নতুন সৃষ্ট বনভূমি পড়ে। সম্প্রতি বনবিভাগের উদ্যোগে ভূমি ও জল সংরক্ষণের প্রচেষ্টাতে বহু নতুন প্রজাতির গাছ বীরভূম জেলার মাটিতে শিকড় গেড়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অজয় নদীর বাঁধ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো বীরভূমেও জনবসতি সমস্ত মানচিত্র জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমিরূপের ঢাল, বনভূমি, নদী উপত্যকার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আপস করে এবং রেল পথ, রাস্তা, শহর, গঞ্জকে সঙ্গে নিয়ে কোনো কোনো অঞ্চলে অধিক জনবসতি গড়ে উঠেছে। স্বাধীনোত্তরকালে জেলার ১৯৬১ সালের ১৪,৪৬,১৫৮ জনসংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে বাড়তে ২০০১ সালে এসে জনসংখ্যা হয়েছে ৩০,১২,৫৪৬ জন। আদমসুমারী অনুযায়ি জেলায় কয়েক দশক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেমন ১৯৭১ সালের ১৭,৭৫,৯০৯ জনসংখ্যা ১৯৮১ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ২০,৯৫,৮২৮ এবং ১৯৯১-এ জনসংখ্যা হয় ২৫,৫২,২১০ জন। অতএব বিগত ৪০ বছরে দ্বিগুণের চেয়ে বেশি জনসংখ্যার চাপ জেলার ভৌগোলিক পরিবেশকে সহ্য করতে হচ্ছে। এই জনসংখ্যায় পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের থেকে কিছুটা বেশি, যেমন ২০০১ সালে পুরুষ জনসংখ্যা হল ১৫,৪৫,৭৬৫ অন্যদিকে মহিলারা হলেন ১৪,৬৬,৭৮১ জন। বীরভূম জেলায় ছয়টি পৌরসভাসেবিত শহর আছে, যেমন রামপুর-হাট, সাঁইথিয়া, আহমেদপুর সিউড়ি, দুবরাজপুর এবং বোলপুর। এই পৌরসভাসেবিত শহরগুলির জনসংখ্যা বাদে মোটামুটিভাবে বাকি ২৭,৫৪,০৬৭ জনকে ধরা হয় গ্রামীণ জনসংখ্যা। নিময় মেনে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে জনঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারেও ঠিক তালে বেড়েই চলেছে। ১৯৬১ সালে জনঘনত্ব যেখানে ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩২০ জন মানুষ, সেখানে ২০০১ সালে জনঘনত্ব গিয়ে ঠেকেছে ৬২০ জন প্রতি বর্গকিলোমিটারে। সমীক্ষায় জানা যায় যে মোট জনসংখ্যার ৬২.১৬ শতাংশ সাক্ষরতার তালিকাভুক্ত। চিত্রটি পুরুষদের ক্ষেত্রে কিছুটা আশাব্যঞ্জক, কারণ মোট পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে ৭১.৫৭ শতাংশ মানুষকে বিবেচনা করা হয় সাক্ষর বলে। অন্যদিকে মোট মহিলা জনসংখ্যার মাত্র ৫২.২১ শতাংশ সাক্ষর। সাক্ষরতার চিত্রটি কিছুটা উন্নয়নের সহায়ক হলেও জেলার কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোট ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪২১ জনকে কর্মজীবী মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় ২০০১ সালে। এই সংখ্যার মধ্যে পুরুষ কর্মজীবীর সংখ্যা হল ৭,২৩,১৪৭ জন। অতএব সঙ্গত কারণেই মহিলা কর্মজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণের দাবি উঠে আসতেই পারে।

বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদ, সরল সাদাসিধে মানুষ, জেলার প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা, নতুন প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প আগামী দিনে এক সমৃদ্ধ এবং সুন্দর বীরভূম জেলার আশা জাগায়। এখন শুধু অপেক্ষা এক সামগ্রিক পরিকল্পনার, সকলের জন্য সকলকে নিয়ে।

লেখক · ভূগোল অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

কাজের সন্ধানে বীরভূমের শ্রমজীবী মানুষ — ছবি : পাপান ঘোষ
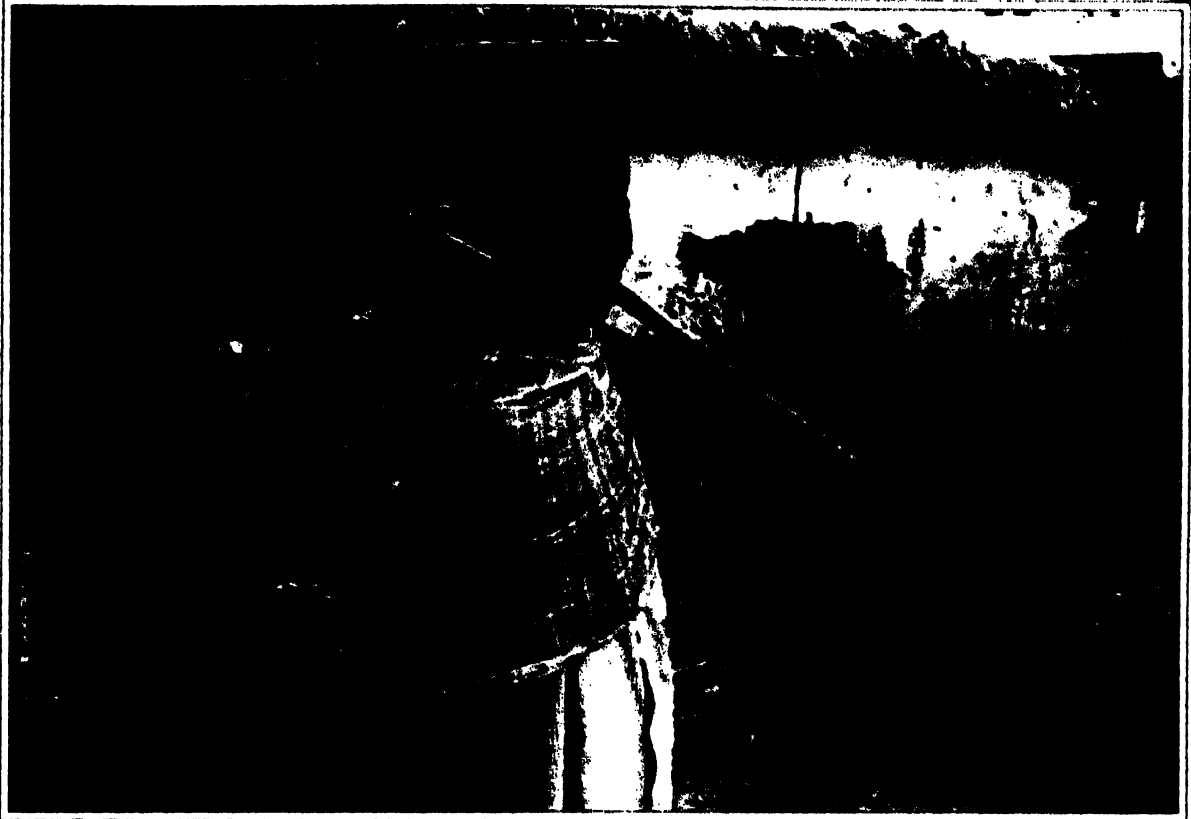
ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনীতি : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (১৭৬৫—১৮৭১)

রঞ্জন গুপ্ত

ভূমিকা :

ব্রিটিশ অধিকারের অব্যবহিত আগে বীরভূম ছিল রাজনগরের প্রবল প্রতাপান্বিত এক পাঠান জমিদার বংশের অধীন তদানীন্তন বাংলার বৃহত্তম জমিদারি এটি, আয়তনে সুবা বাংলায় চতুর্থ ছিল এর স্থান। ধর্মে মুসলমান এবং জাতিতে পাঠান হলেও ধর্মীয় সংকীর্ণতার কলুষ স্পর্শ করেনি এঁদের। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁদের পরাক্রমশালী পূর্বপুরুষ বদি-উজ-জামান-খাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রতি মৌখিক আনুগত্য ও বার্ষিক কর প্রদান করে কার্যত স্বাধীনভাবেই তাঁরা তাঁদের বিস্তৃত জমিদারি শাসন করতেন। পশ্চিম থেকে আগত হানাদারদের প্রতিরোধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাঁরা। নবাবী বাংলার শান্তি সমৃদ্ধি প্রতিরক্ষার এঁরা ছিলেন অন্যতম সহায়ক ও অংশীদার। আলিবর্দির শাসনকালে বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধির লোভে আগত মারাঠা-বর্গীদের উপর্যুপরি হানাদারি, লুণ্ঠন ও

অত্যাচারের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিল চাকলা বীরভূম। বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১) সমগ্র বাংলার সঙ্গে বীরভূমের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য—তথা সামগ্রিক অর্থনীতির অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে। আলিবর্দি পরিবারের সঙ্গে বীরভূমরাজের ছিল বিশেষ হৃদ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার কলকাতা অভিযানে বীরভূমরাজ আসাদ-উজ-জামান খাঁ তাঁর দুই ভাইকে সৈন্যসহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে ইংরেজদের সঙ্গে বীরভূম রাজাদের প্রত্যক্ষ বৈরী সম্পর্কের শুরু। পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী সেই বোধ তাকে তীব্রতর করে। দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মীরজাফর, মীরকাশিমকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করার যে প্রচেষ্টা হয় তার সামনের সারিতে ছিলেন বীরভূমরাজ আসাদ-উজ-জামান খাঁ। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি সুবা বাংলার দেওয়ানি লাভ করলো। ক্রমে স্বাধীনতা হারিয়ে বীরভূম সহ সমগ্র বাংলা বাঁধা পড়লো দ্রুত প্রসারণশীল ব্রিটিশ বণিক-পুঁজির কঠিন কুটিল জালে।

বীরভূমের অর্থনীতি : কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য

ঔপনিবেশিক বীরভূমের অর্থনৈতিক চালচিত্রকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। প্রতিটি ভাগ বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। বর্তমান নিবন্ধ তারই এক সংক্ষিপ্ত সারাংশ মাত্র।

কৃষি : রেনালের জরিপ অনুযায়ী ১৭৬০ সালে বীরভূমের আয়তন ছিল ৩,৮৫৮ বর্গ মাইল। (সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ১৮৫৬ সালে খণ্ডিত বীরভূমের আয়তন দাঁড়ায় ১,০৮০ বর্গ মাইল—আগের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র। পরেও অবশ্য একাধিকবার এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে। এই বিশাল জেলার ভূপৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিলাময়, পাথুরে অথবা ল্যাটারাইট। ল্যাটারাইট পাহাড়-টিলার মধ্যবর্তী উপত্যকায় অথবা তাদের তরঙ্গায়িত ঢালু পৃষ্ঠদেশে ছিল চাষবাসের সীমিত সুযোগ। পশ্চিম বীরভূমের সমগ্র ও মধ্য বীরভূমের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে আবৃত—শাল, অর্জুন, পলাশের অরণ্য। মধ্য বীরভূমের কিছুটা ও পূর্ব বীরভূম সাধারণভাবে সমতল ; পাথুরে বন্ধুর মৃত্তিকা স্তরের এখানে ক্রমাবসান ; মাটি উর্বর, ঈষৎ কাঁকর-মেশানো ধূসর। বস্তুতপক্ষে এ অঞ্চল ক্রমশ উর্বর গাঙ্গেয় সমতলে মিশেছে। ঝোপঝাড়, জঙ্গল কম-বেশি এখানে আছে ; তবে জমি সাধারণভাবে আবাদী বা আবাদযোগ্য। অসংখ্য দীঘি-পুষ্করিণী খানা-খন্দ থেকে জল ছেঁচে চাষ চলে। উল্লেখ করা যেতে পারে খরা-মন্বন্তর ও দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নৈরাজ্যের পরেও ১৭৮৮ সালে, কালেক্টরের প্রেরিত তালিকা অনুযায়ী জেলায় বৃহৎ ও মাঝারি মাপের দীঘি-পুষ্করিণীর মোট সংখ্যা ছিল, ৮,১৮৮টি যার মধ্যে ৫,০৯০টি ছিল গ্রামের ব্যক্তি মালিকাহীন সাধারণ সম্পত্তি। এমনকী, উনিশ শতকের মধ্যভাগে অনাদরে-অবহেলায় বহু পুকুর হেজে-মজে গেলেও, জেলায় কৃষি-পুকুরের সংখ্যা রেভেনিউ সার্ভেয়ার শের উইলকে বিস্ময়াভিভূত করে। তাঁর বিবরণ অনুসারে পরগনা দুরি মৌড়েশ্বরের দক্ষিণাংশে রয়েছে বহু গ্রাম, আর 'প্রতিটি গ্রাম বেষ্টন করে আছে এক ডজন থেকে একশ পুষ্করিণী যেগুলো জলসেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।' পরগনা আকবরশাহীতে তো পুকুর পড়বে 'প্রতি পদক্ষেপে।' পুকুর ছাড়া কৃত্রিম খাল বা কাঁদরের জলও চাষের কাজে লাগতো। বৃষ্টি ও নদীর জলে চাষ হত সীমিত পরিমাণে। এইভাবে সমগ্র জেলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জমিতে চাষবাস হত, বাকি দুই তৃতীয়াংশ ছিল ঘন থেকে হালকা বনের অধিকারে। বীর (জঙ্গল) ভূমি নামটি সার্থক।

এই বিশাল জেলার ভূপৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিলাময়, পাথুরে অথবা ল্যাটারাইট। ল্যাটারাইট পাহাড়-টিলার মধ্যবর্তী উপত্যকায় অথবা তাদের তরঙ্গায়িত ঢালু পৃষ্ঠদেশে ছিল চাষবাসের সীমিত সুযোগ। পশ্চিম বীরভূমের সমগ্র ও মধ্য বীরভূমের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে আবৃত—শাল, অর্জুন, পলাশের অরণ্য। মধ্য বীরভূমের কিছুটা ও পূর্ব বীরভূম সাধারণভাবে সমতল ; পাথুরে বন্ধুর মৃত্তিকা স্তরের এখানে ক্রমাবসান ; মাটি উর্বর, ঈষৎ কাঁকর-মেশানো ধূসর। বস্তুতপক্ষে এ অঞ্চল ক্রমশ উর্বর গাঙ্গেয় সমতলে মিশেছে।

বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিল ডাকাত, ঠেঙ্গাড়ে ও অন্যান্য সমাজবিরোধীদের গোপন ঘাঁটি। আবার এসব বনই গিজ গিজ করত বাঘ-ভালুক, হাতি, হায়না ও নানা হিংস্র ও অহিংস্র জন্তু-জানোয়ারে। এখানকার নানা জাতের বিষাক্ত সাপ ও অতিকায় পাইথন লোকপ্রসিদ্ধ। বাস্তবিক, এই সব সমাজবিরোধীদের দল ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের পাল ছিল সুস্থির জনপদসৃষ্টি ও কৃষি বিস্তারের পথে দুস্তর বাধা।

হিংস্র জীবজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্য আর পাথুরে ল্যাটারাইট বেলে ও পাললিক ভূমির ওপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূবে, কিছুটা বা দক্ষিণ

ক্যাপ্টেন ডব্লু এস শেরউইল কৃত বীরভূম জেলার মানচিত্র (১৮৪৯ থেকে ১৮৫২)
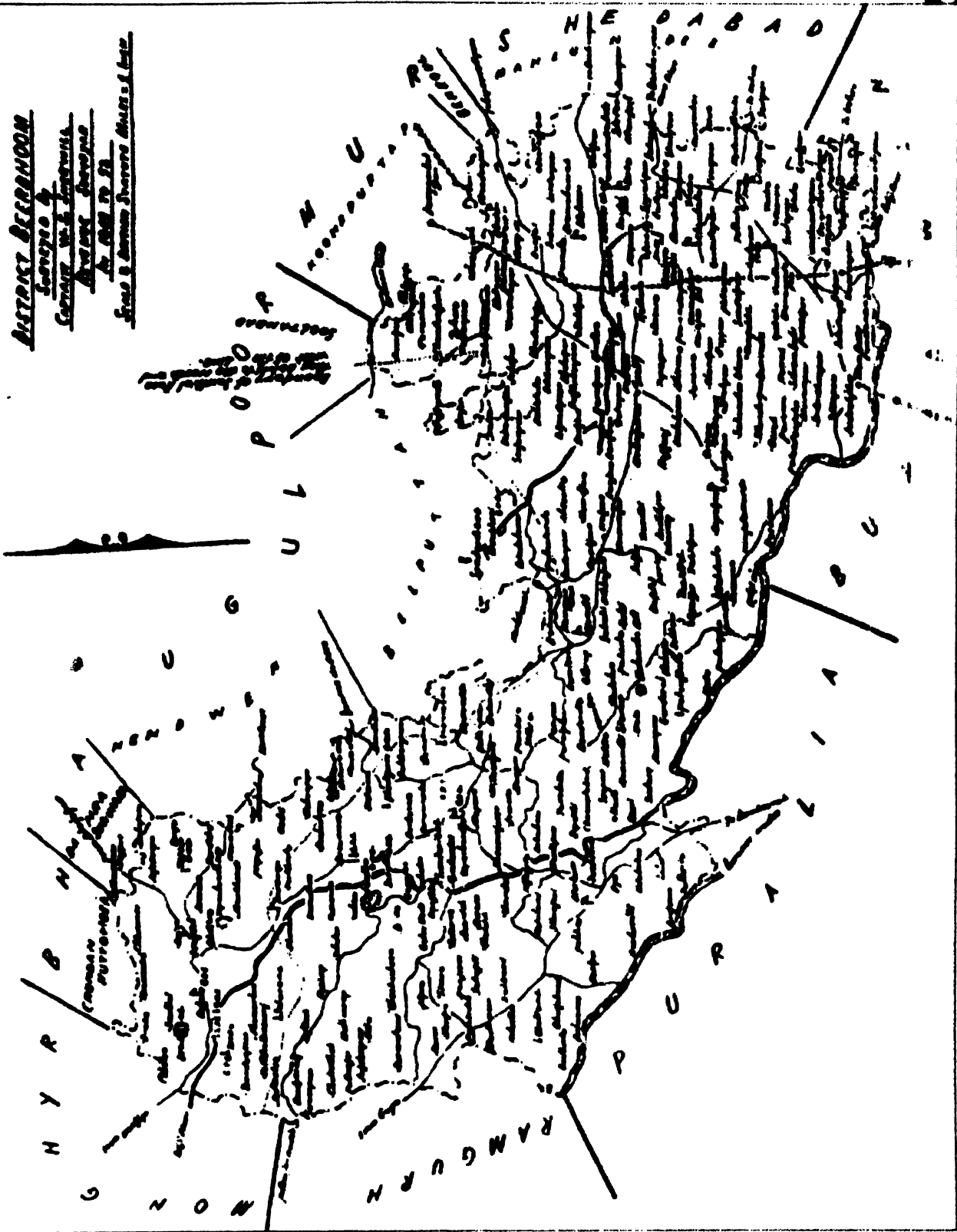
দিক হেলে, বয়ে যায় অজয় ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মাণী, কোপাই কি হিংলোর মতো গোটা কয়েক নদী আর পাহাড়ি স্রোতস্বিনী। বর্ষায় প্রচণ্ড বেগে নিচে নেমে এসে তারা দুধার বন্যায় ভাসায়। বছরের বাকি সময় পশ্চিম ও মধ্যভাগের পশ্চিমাংশে শুকনো ধূধূ বালিতে ছোট-বড় পাথরের চাঁই বুকে নিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে তারা। এদের ভেতর অজয় আর ময়ূরাক্ষীই কেবল নদী নামের যোগ্য। সমতলে পৌঁছে তারাও নাব্য থাকে জুনের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। দু-চার বছর পর পর এরাই আবার বন্যা ডেকে আনে। বন্যায় বালি জমে নদীর বুক অগভীর হয়, অগভীর নদী পরবর্তী বন্যাকে সুনিশ্চিত করে। এর ফলে দুপারের গ্রাম-জনপদ ভেসে যায়, লোকজন গবাদি পশু মরে, নিঃস্ব-নিরাশ্রয়ের সংখ্যা বাড়ে আর বালি-চাপা পড়ে শস্য-স্নিগ্ধ বহু উর্বর জমি বন্ধ্যা হয়ে যায় দীর্ঘকাল বা চিরকালের মতো। আবার এই অজয়-ময়ূরাক্ষীরই পাড়ে পাড়ে অধিকাংশ ক্ষেত-খামার জনপদ, শহর-গঞ্জ ও রেশম উৎপাদন কেন্দ্র।

বন্যা না হলে খরা। দু-চার বছর অন্তর তীব্র খরা, বন্যা এবং খরা পালাক্রমে জেলাকে ভাসায়, পোড়ায়।

ছিয়াত্তরের মহামন্বন্তরের (বাং ১১৭৬/ইং ১৭৭০) পশ্চাদপটে ছিল উপর্যুপরি তিন বছরের সাধারণ থেকে তীব্রতম খরা। মন্বন্তরে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাঢ়বাংলা। বীরভূম তারই এক বিধ্বস্ত অংশ। মন্বন্তরের প্রাথমিক আঘাত, ১৭৬৫ সালের ৬০০০ গ্রামের মধ্যে ১,৫০০টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে মহামারিতেও বহু মানুষ মরে। জনমানবহীন পড়ে থাকে বহু একদা-সমৃদ্ধ গ্রাম-গঞ্জ-শহর। চাষী-রায়তের অভাবে শূন্য। পতিত পড়ে থাকে হাজার হাজার বিঘা জমি। জনশূন্য জনপদ ও পতিত জমি অরণ্য গ্রাস করে। মানুষ মরলেও, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিধ্বস্ত হলেও, সরকারের রাজস্বের চাহিদা কমে না। বরং বাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৭২৮ সালে জেলার শান্ত, সমৃদ্ধ বছরে সদর খাজনা ছিল ৩,৬৬,৫০৯ সিক্কা টাকা; ১৭৬৯ সালে সম্পূর্ণ শস্যহানির বছরে সদর খাজনা বেড়ে ধার্য হয় ৭,২৫,০০০ সিক্কা টাকা। দুর্ভিক্ষের বছরে বর্ধিত সদর খাজনার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৬৮,৪০০ টাকা; আর পরের বছর (১৭৭১) ইংরেজ সুপারভাইজর হিগিনসনের ভাষায় পরিস্থিতি যখন বর্ণনাতীত ভয়ংকর, সদর খাজনা ৮,১১,৮৭৯ টাকায় উঠে যায়। পরিণামে মন্বন্তরের মৃত মানুষরা মরে বাঁচে। বাড়তি রাজস্বের খাঁড়া তাদের ওপর পড়ে বলে বেঁচে থাকা মানুষের অবস্থা হয় মরারও বাড়া। শোষণে-অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ জমিদার ও কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহে লিপ্ত হয় (১৭৬৫-'৯৩)। নিঃস্ব হওয়া জমিদার, দায়িত্বহীন লোভী সরকার, বিপর্যস্ত অর্থনীতি। জেলার এই পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলার সঙ্গে বীরভূমে প্রবর্তিত হয় ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কৃষি তথা সামগ্রিক অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ছিল এর ঘোষিত উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের প্রাক্কালে জেলায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের একটি ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যায়। অতি শ্লথ ও খঞ্জ গতিতে অগ্রসর হতে হতে এর স্পষ্ট ও কিঞ্চিৎ আশাব্যঞ্জক একটা রূপ ফুটে ওঠে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে।

বলা বাহুল্য, জেলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভরশীল ছিল কৃষি বিকাশের ওপর। আবার সেচব্যবস্থার সংরক্ষণ ও বিস্তার পুরনো বাঁধগুলোর সংস্কার ও নতুন বাঁধ নির্মাণ করে বন্যারোধ করতে না পারলে কৃষির প্রাণ সঞ্চারের আশা আকাশকুসুম মাত্র। দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচ্য সময়-সীমার মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি বহুলাংশে অবহেলিতই থেকে গিয়েছিল। অরণ্যের পরিকল্পিত উৎপাদন ও পতিত জমির পুনরুদ্ধার কৃষির উন্নতির জন্য ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা কৃষি-শ্রমিক, গবাদি পশু এবং কৃষি সরঞ্জামের প্রতিকারহীন দুষ্প্রাপ্যতা। মন্বন্তরে জেলার পঁচিশ শতাংশেরও বেশি লোকক্ষয় হয়। এই ক্ষয় অর্ধশতাব্দীর পরেও দীর্ঘকাল অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। প্রয়োজনের তুলনায় চাষের বলদ, মোষ ও লাঙ্গলের সংখ্যা ছিল অনেক কম। গবাদি পশুর সংখ্যাল্পতা সারের গুরুতর অভাব সৃষ্টি করে। তাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি প্রায়শ হ্রাস পেত। তাছাড়া ছিল জমি—বিশেষত বাণিজ্যিক ফসলের জমির ওপর ধার্য জমিদারদের ক্রমবর্ধমান হারে খাজনা। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম শ্রেণির তুলো, আখ ও তুঁত জমির বিঘাপ্রতি খাজনা ছিল যথাক্রমে ৪ টাকা, ৪ টাকা ৬ আনা ১৪ গণ্ডা ২ কড়া এবং ৫ টাকা। আর পান বরোজের খাজনা ছিল প্রায় আকাশচুম্বী আবোয়াসহ বিঘাপ্রতি ২৩ টাকা। জমিদারের লোভের কাছে বলি প্রদত্ত বাণিজ্যিক ফসলী জমি।

এতগুলো প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আলোচ্য কালপরিধির মধ্যে জেলাব্যাপী,—এমনকী অরণ্যাবৃত পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের কোন কোন অংশে কৃষির বিস্তার ঘটে। কৃষি-শ্রমিকের অভাব অংশত মেটায় সাঁওতাল আদিবাসী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে আগত পাহিকস্ত (বহিরাগত) রায়তরা। বিশেষ সুবিধাভোগী পাহিকস্ত রায়তদের আগমন অবশ্য সমসুবিধাবঞ্চিত খুদকস্ত (স্থায়ী বাসিন্দা) রায়তদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বিক্ষোভ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। ১৮০২ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে কৃষিজমির বিস্তার ঘটে উনপঞ্চাশ শতাংশ। কিন্তু সে অনুপাতে জনপদ ও জনসংখ্যা বাড়েনি। এমনকি প্রাক-মন্বন্তরকালের গ্রামের সংখ্যা পরবর্তী ৮০ বছরেও অধরাই থেকে যায়।

জেলার প্রধান ফসল ধান। ১৮৫১ সালে ধানই ছিল সমস্ত কৃষি উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ। ধানের চাষ ক্রমেই বেড়ে চলছিল। ১৮৭১ সালে জেলার সমগ্র কৃষিজমির ১৫/১৬ অংশে ধান চাষ হতো। গম ও ভুট্টা জেলার— বিশেষত পূর্বাঞ্চলের

গৃহস্থালী ও চাষের সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে

ছবি : পান্নান ঘোষ

মানুষ বিশেষ পছন্দ করত না। তাই এদের চাষও হত অতি সীমিত পরিমাণে। জেলার কালেক্টর দুটি নতুন সবজি—বেগুন, পেঁয়াজ, আলু চাষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। বেগুনের পরীক্ষা সফল হলেও আলুতে সাফল্য আসেনি। শীতের শেষে এবং বসন্তের শুরুতে ছোলা ও সর্ষের চাষ হত। চাষ হত আখ, তুলো ও তুঁতের মতো কিছু অর্থকরী ফসলের। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনি, সুতিবস্ত্র ও রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এসব কাঁচামাল চাষের বিস্তার ঘটে। প্রসঙ্গত আখের চাষ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ইংল্যান্ডে পানীয় হিসেবে চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং ১৭৯১ সালে ফরাসি উপনিবেশ হাইতিতে কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের ফলে সেখান থেকে চা, চিনি আমদানি বন্ধ হয়। চিনির চাহিদা মেটাতে বীরভূমসহ বাংলায় চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তৎপর হয় ইংরেজ কোম্পানি। সুতরাং আখের চাষও বাড়াতে হবে। ১৭৯২ সালে কোম্পানির পরিচালকবর্গ প্রেরিত এক চিনি উৎপাদক-বিশেষজ্ঞের মতে বীরভূমের আখ 'ভারতের অন্য যেকোন (অঞ্চলের) আখের তুলনায় অশেষ মূল্যবান এবং শক্ত দানা অত্যন্ত সুগন্ধ চিনি উৎপাদনের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।' চাহিদার চাপে আখের চাষ অবশ্য বাড়ে, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর ত্রিশের দশকে চিনির আন্তর্জাতিক বাজার পড়ে যাওয়ায় চাষীরা আখের চাষ কমাতে বাধ্য হয়। জেলার কৃষিতে নীল একটি নতুন সংযোজন। ইংরেজ পুঁজি নীলের সূত্রপাত ঘটিয়ে চাষে সহকারী ভূমিকা এবং পণ্য উৎপাদনে মুখ্য শক্তি হিসাবে নিজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান অক্ষুণ্ণ রাখে। জমির মালিকানার সুবিধা নিয়ে দেশীয় জমিদার পত্তনীদাররাও নীলচাষ ও উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে অর্থকরী ফসল চাষের পরিমাণ নির্ভর করত আন্তর্জাতিক বাজারের তেজি-মন্দার ওপর।

কৃষির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্তারের ফলে সাধারণ চাষী রায়তের আর্থিক সমৃদ্ধি ও জীবনের নিরাপত্তা এসেছিল ভাবার কারণ নেই। বরং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সমাজের নিম্নবর্গের দারিদ্র্য ও অসহায়তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিজমির বিস্তার জমিদার-জোতদারদের জবরদস্তিরই দ্যোতক। কঠোর শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসল থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হত তারা। খরা, অতিবৃষ্টির মতো প্রকৃতির খেয়ালিপনা তো ছিলই। তার ওপর ছিল জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের নানাবিধ অবৈধ আদায় এবং জমিদার-পত্তনীদার ও আমলাদের বহুমুখী দুর্নীতিমূলক শোষণ। জমির খাজনা ছিল অত্যধিক। তার সঙ্গে ছিল উচ্চহারে বহু বিচিত্র ধরনের আবোয়াব বা সেসের বোঝা। সুতরাং কষ্ট-ক্লিষ্ট চাষীর নিবিড় চাষে উৎসাহ না থাকাই ছিল স্বাভাবিক। উনিশ শতকের শুরুতে জেলা কালেক্টর লক্ষ্য করেছিলেন খাজনাবদ্ধ

জমির তুলনায় নিষ্কর জমির চাষবাস সম্পন্ন হয় অনেক ভালোভাবে। বাড়তি লাভের আশায় চাষীর উদ্যোগ-উৎসাহ সেখানে নিষ্কণ্টক। কালেক্টরের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ঔপনিবেশিক শাসকের শিক্ষা গ্রহণের কোনও প্রশ্নই ছিল না।

দাদন বা অগ্রিম ছিল রায়তদের আর্থ-সামাজিক ভাবে বেঁধে রাখার এক সনাতন উপায়। চাষীরা এতই দরিদ্র ছিল দাদন না নিয়ে তাদের উপায় ছিল না। একজন ইংরেজ বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, এ দেশে যেকোনও উৎপাদনশীল কাজের জন্য দাদন অপরিহার্য। চাষীদের দাদন দিয়ে বণিক-ব্যবসায়ীরা কৃষিপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন সুযোগই চাষীরা পেত না। ধানচাষীদের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে সত্য ; আর চাষীসমাজের তারাই ছিল বৃহত্তম অংশ। কর্মহীন দিনগুলোতে নিতান্ত বেঁচে থাকা ও চাষের কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে ধানের বেপারিদের কাছ থেকে দাদন নিতে বাধ্য হত তারা। ফসল তুলে সুদে-আসলে শোধ করা ছিল প্রধান শর্ত। কিন্তু হিসাব-নিকাশের পর সামান্য শস্যই তাদের হাতে থাকত। বছরের বেশির ভাগ সময় ক্রেতা হিসাবে তাদের নির্ভরতা খোলা বাজারের ওপর। অথবা মুদির দোকানে— ধারে মাস-কাবারি তাদের সঙ্গে কারবার। ধারে কিনতে গেলেই চড়া দাম ও সুদ। খোলা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো বড় ধানচাষী ও জোতদার (যারা আসলে একই শ্রেণিভুক্ত) এবং পাইকার-মহাজনরা। অর্থকরী ফসলের (তুলো, আখ আর নীল) চাষীদের জন্যও একই ভবিতব্য নির্দিষ্ট ছিল। তার ওপর সাগরপারের অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কাও ভোগ করতে হত তাদের।

কৃষির উদ্বৃত্ত আয় নিয়োজিত হত জমিদারি মহাল ক্রয়ে অথবা মহাজনি কারবারে।

শিল্প : কৃষির সহায়ক হিসাবে গ্রামীণ শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক বীরভূমে। একগুচ্ছ গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ, কৃষির সঙ্গে শিল্পের ছিল পারস্পরিক সহযোগী সম্পর্ক। মুদ্রার প্রচলন না হওয়ায় বিনিময় ব্যবস্থা ছিল পণ্য আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম।

'একমাত্র' বলাটা সম্ভবত সঠিক হল না। কারণ, রাস্তাঘাট ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, প্রাক-ব্রিটিশ আমল থেকেই বিনিময় ব্যবস্থাকে কিছুটা দুর্বল করে গ্রামে গ্রামে মুদ্রা অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তবে তা ঘটেছিল ধীরগতিতে, প্রশাসনিক কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে, সীমিত ভাবে। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ আমলেই তা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। মুদ্রা অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে বৃত্তি-ভিত্তিক গ্রাম সমাজের কাঠামো ক্রমশ ভাঙতে শুরু করে। ভাঙতে থাকে গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতা, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের, গ্রামের সঙ্গে প্রশাসনিক কেন্দ্রের সুপ্রাচীন বিচ্ছিন্নতা। ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে জেলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, জটিল ও কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। বণিক ও শিল্পপুঁজির শক্ত নিগড়ে বাঁধা পড়ল সর্বশ্রেণির মানুষ। এই মৌলিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, কৃষির মত শিল্পকেও গুরুতরভাবে প্রভাবিত করল যা অংশত গঠনমূলক হলেও প্রধানত ধ্বংসাত্মক।

বীরভূমের শিল্পসম্ভার : জেলার শিল্প বলতে মোটা সুতিবস্ত্র বা গড়ার কাপড়, কাঁচা রেশম, গুড়, চিনি, নীল, গালা এবং লোহা। এদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপক ছিল গড়া শিল্প। জেলার ভেতরে ও বাইরে এমনকী বিদেশে সর্বত্র এর চাহিদা। ধুতি, শাড়ি, চাদর, গেঞ্জি, গামছা সাধারণের পরিধেয় বা ব্যবহার্য। মোটা গড়ার কাপড় দিয়ে তৈরি হত নৌকা ও জাহাজের পাল। রপ্তানি বাণিজ্যে মোটা সুতিবস্ত্র ছিল প্রধান উপাদান। পশ্চিম ভারত, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ইংল্যান্ড ও ইউরোপে এর বিপুল চাহিদা ছিল।

জেলার শিল্প বলতে মোটা সুতিবস্ত্র বা গড়ার কাপড়, কাঁচা রেশম, গুড়, চিনি, নীল, গালা এবং লোহা। এদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপক ছিল গড়া শিল্প। জেলার ভেতরে ও বাইরে এমনকী বিদেশে সর্বত্র এর চাহিদা। ধুতি, শাড়ি, চাদর, গেঞ্জি, গামছা সাধারণের পরিধেয় বা ব্যবহার্য। মোটা গড়ার কাপড় দিয়ে তৈরি হত নৌকা ও জাহাজের পাল। রপ্তানি বাণিজ্যে মোটা সুতিবস্ত্র ছিল প্রধান উপাদান। পশ্চিম ভারত, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ইংল্যান্ড ও ইউরোপে এর বিপুল চাহিদা ছিল।

এই চাহিদার টানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই গুজরাতি ও সন্ন্যাসী বণিক, আর্মেনিয়ান, ফরাসি, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ডেনিস বণিকরা একে একে বীরভূমে আসতে শুরু করে। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে এদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এক সময়ে গড়া বাজারে মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ফরাসি ও ইংরেজ বণিকরা। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের গুণে গড়া উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটে আধিপত্য বিস্তার করে জন চিপের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ ইস্ট

রেশম পলুকে তুঁত পাতা খাইয়ে বড় করা হচ্ছে ছবি : মানস দাস

সালে যখন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গড়া শিল্পে তাদের বিনিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পতনের পেছনে স্থানীয় কারণ ছিল বহুবিধ তাদের মধ্যে মুখ্য বলতে কাঁচামাল অর্থাৎ তুলোর সরবরাহে স্বল্পতা ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয়ের অস্বাভাবিক উত্থান, দাদন ব্যবস্থায় সংকট ও নিবন্ধীকৃত তাঁতিদের ওপর কোম্পানির শোষণ ও জুলুম, পণ্যমানের অবনয়ন ইত্যাদি। কিন্তু কঠোরতম আঘাত এল ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষিত ম্যানচেষ্টারের উন্নততর বস্ত্রশিল্পের আগ্রাসি প্রতিযোগিতা থেকে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজার তো হাতছাড়া হলই, দেশিয় বাজারও ছেয়ে গেল শস্তা বিলিতি কাপড়ে। ফলে গড়া শিল্পের ওপর নির্ভরশীল লক্ষ নরনারী কর্মচ্যুত হল, তীব্রতর হল সংশ্লিষ্ট নানা জটিল প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যা।

কাঁচা রেশমশিল্প : গড়া শিল্পের বিলুপ্তির আংশিক ক্ষতিপূরণ এল কাঁচা রেশম শিল্পের ক্রম-পুনরুজ্জীবনে। সুদূর অতীতে বীরভূম ছিল রেশমশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রেশমি বস্ত্রের ভাল বাজার ছিল বাংলার বাইরে। সতেরো শতকে বীরভূম তথা বাংলার রেশমি বস্ত্র ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংল্যান্ডে বাংলার রেশমি কাপড়ের বাজার ধীরে ধীরে নষ্ট হলেও প্রায় একই সঙ্গে বাড়তে থাকে ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তৃত বাজারে কাঁচা রেশমের চাহিদা। এর ফলে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বহু লোক এই শিল্পে সামিল হয়ে পড়ে।

বীরভূমের কাঁচা রেশমশিল্পের অভূতপূর্ব উত্থান ঘটে জন ফ্রসার্ড নামে এক দুঃসাহসী স্কট বণিকের উদ্যোগে। ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর পাড়ে গনুটিয়া এবং আরও কয়েকটি গ্রাম ঘিরে ছিল ফ্রসার্ডের রেশম চাষ ও উৎপাদনের কেন্দ্র। সর্বমোট ২,৫০০ বিঘে জমি। জায়গাটা ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ফ্রসার্ড জঙ্গল সাফ করে তুঁত চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারখানা স্থাপন করে আধুনিক ইতালিয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শুরু করেন কাঁচা রেশমের উৎপাদন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন জেলায় পথিকৃৎ। ফ্রসার্ড তাঁর কারখানায় স্থানীয় মজুর নিয়োগ করেন। বাইরে থেকেও কিছু মজুর এনেছিলেন তিনি। কারখানার কাজ ছাড়া বন পরিষ্কার এবং চাষের কাজেও তিনি তাদের লাগিয়েছিলেন। এমনকী, 'পার্বত্য অঞ্চল থেকে ৪/৫শ লোকও তিনি এনেছিলেন, যারা, তার ভাষায় '...বর্বর থেকে সমাজের হিতকর সদস্যে পরিণত' হয়। ফ্রসার্ড কথিত এই পর্বতবাসী 'বর্বর' লোকদের মধ্যে ছিল সাঁওতাল ও ধাঙড় জনজাতি। বহিরাগতদের স্থায়ী বসবাসের জন্য তিনি নিজের জমি দান করেন। রেশম উৎপাদনের জন্য ফ্রসার্ডের কারখানায় ছিল ১০০টি বিশাল বিশাল লৌহভাণ্ড। সুতরাং কাঁচামালের জন্য বিস্তৃত তুঁতচাষেরও প্রয়োজন ছিল তাঁর। এ জন্য ফ্রসার্ডের উদ্যোগের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিপুল

ইন্ডিয়া কোম্পানি। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে লিপ্ত লোকের সংখ্যা এতই বেশি ছিল যে এক বিশিষ্ট ডেনিস বণিক বীরভূমকে 'প্রায় পুরোপুরি তাঁতি-অধ্যুষিত' জেলা বলে উল্লেখ করেন। কাটুনী, তাঁতি, ধোপা, গোমস্তা, দালাল, মুহুরি, তাগাদাদার ও পাইক-পেয়াদা প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় যুক্ত নরনারীর সংখ্যা ছিল প্রকৃতই বিশাল। উৎপাদনের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণের মত নির্ভরযোগ্য কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। তবে পূর্বোক্ত ডেনিস বণিকের অনুমান বার্ষিক উৎপাদন ৪ লক্ষ থানের কম ছিল না। ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সালে ইংরেজ কোম্পানির বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৪,৪৮০ থান ও ২,৫২,৬৫৩ সিক্কা টাকা এবং ৫৪,৪৮০ থান ও ২,৪৬,৬০২ সিক্কা টাকা। গড়া শিল্পে সমগ্র বিনিয়োগের কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে একমাত্র ইংরেজদের বিনিয়োগের পরিমাণ থেকেই এর বিশালতা অনুমান করা সম্ভব।

কিন্তু জেলার দুর্ভাগ্য, এমন একটা প্রাণবন্ত বর্ধিষ্ণু শিল্প ঘরে-বাইরের নানা উদ্দীপনা-আঘাতের মধ্যে ওঠা-নামা করতে করতে একদিন নিশ্চিত পতনোন্মুখ হল। চরম আঘাত এল ১৮২০

ব্যয়সাধ্য তাঁর এই শিল্পোদ্যোগ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। এর জন্য দায়ী খেয়ালি ময়ূরাক্ষীর ঘন ঘন বন্যা, জমিদারের ধার্য খাজনার উচ্চ হার এবং জেলার কালেক্টরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘাত। শেষ পর্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য ফ্রুসার্ড বিপুল আর্থিক ক্ষতির বোঝা নিয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন (১৮০৭)। জমিসহ ফ্রুসার্ডের কারখানাটি ইংরেজ কোম্পানি কিনে নেয়, পরে কাঁচা রেশম উৎপাদন ও ব্যবসার দায়িত্বটি তুলে দেয় সোনামুখী কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন চিপের হাতে। এক সময় সুরুল উন্নীত হয় চিপের মুখ্য কুঠিতে।

জন চিপের হাতে গনুটিয়া কারখানার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়। ইউরোপে নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডে কাঁচা রেশম আমদানি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাতে বাংলার রেশমশিল্পের কপালে দেখা দেয় বিকাশের এক সুবর্ণ সুযোগ। কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় গনুটিয়ার কারখানায় লগ্নির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৮২৩ সালে বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকায় পৌঁছয়, উৎপাদনের প্রত্যাশিত পরিমাণ ছিল ১,৮০০ মন কাঁচা রেশম। কারখানাটি প্রকৃতই বিশাল আকার নিয়েছিল। চিপের মৃত্যুর আগের বছর কারখানায় রিল বা নাটাইয়ের সংখ্যা ছিল ১,২০০টি। গোটা বাংলায় কোম্পানির অধীনে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারখানা ছিল এটি। মানের বিচারে এখানকার রেশম ছিল 'সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম'। পরবর্তীকালে বর্ধিত চাহিদা মেটাতে গনুটিয়া কারখানা আরও প্রসারিত হয়, আরও দুটি পৃথক কারখানা যুক্ত হয় এর সঙ্গে। ইতিমধ্যে জমিদার, পত্তনীদার ও দেশীয় বণিকরা লাভজনক রেশম উৎপাদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের উদ্যোগে উত্তর বীরভূমে ময়ূরাক্ষীর তীর বরাবর গজিয়ে ওঠে ছোট বড় বহু রেশম কারখানা। সত্বর তারা দামে-গুণে কোম্পানির কারখানার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত বর্ধমান চাহিদা মেটাতে দেশিয় কারখানাজাত রেশম কিনতে বাধ্য হয় গনুটিয়া কারখানার পরিচালন কর্তৃপক্ষ। প্রত্যাসন্ন পতনের এটি ছিল অন্যতম ইঙ্গিত, কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে যা পরিচালনার গুরুতর ত্রুটি হিসাবে ধরা পড়ে। পরে গভীরতর সমস্যাগুলো স্পষ্টতর হয়। চাহিদা অনুপাতে তুঁত ও পলুর চাষ বাড়েনি। বৃদ্ধির পথে জমিদারদের উচ্চহারে খাজনা ছিল অন্যতম অন্তরায়। তাতে একদিকে যেমন রেশম গুটির উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে খাদ্যাভাবের দরুন গুটির মানও নেমে যায় ভয়ংকরভাবে। তাতে অবশ্য পাইকারদের পোয়াবারো। নিকৃষ্ট মানের গনুটিয়ার উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছিল ক্রমশ। নিকৃষ্টমানের গুটির জন্য পণ্যমানেরও অবনতি ঘটছিল। কাঁচামাল সরবরাহের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় দেশিয় কারখানাগুলোকে অবশ্য এই সমস্যায় পড়তে হয়নি। দেশিয় কারখানাগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য কোম্পানি তাদের কাছ থেকে রেশম কেনা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাতেও তাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। অবশেষে ধ্বংসের পরোয়ানা নিয়ে ১৯৩০-৩৩ সালে দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা। ইংরেজ কোম্পানি রেশম উৎপাদন ও ব্যবসা সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেয়। মালিকানা বদল হয় গনুটিয়া কারখানার। চল্লিশের দশকে কারখানাগুলো আগেরই মত অক্ষুণ্ণ রাখে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া। বাস্তবিক ঔপনিবেশিক যুগে বিদেশি কোম্পানির বিরুদ্ধে দেশিয় পুঁজি, কৃৎকৌশল ও সাংগঠনিক সাফল্য নিশ্চিতভাবে বিস্ময়কর।

শর্করা শিল্প : চিনি ও গুড় বীরভূমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। আগেই উল্লেখ হয়েছে, ঔপনিবেশিক যুগে ইংল্যান্ডে চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিনির আমদানি বন্ধ হওয়ার ফলে চাহিদা পূরণের জন্য বীরভূম সহ বাংলায় চিনির উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে কোম্পানি উদ্যোগী হয়। সমসাময়িক এক বিশেষজ্ঞের মতে 'এই জেলার চিনি পৃথিবীর যেকোন অংশের চিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' দামেও সস্তা। সুতরাং কোম্পানি বীরভূমে চিনি উৎপাদনে উৎসাহিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ! ১৮০৯ সালে জেলার চিনির পাইকাররা এক আবেদনপত্রে জানায় ১৭৯২ সাল থেকে কোম্পানিকে তারা চিনি সরবরাহ করে আসছে। ইউরোপ ও বিদেশের অন্যান্য বাজারে বীরভূমের চিনির বিশেষ চাহিদা ছিল। ১৮০৩ সালে কোম্পানি ১,৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে উৎপন্ন করে ২২,৫০০ মন চিনি। ১৮০৬ সালে লগ্নির পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ছোঁয়।

তারপর থেকেই পতনের শুরু। কোম্পানি আখচাষিদের দাদন না দিয়ে দাদন দিত স্বল্প পুঁজির পাইকারদের। তারা অনেক সময় চাষিদের দাদন না দিয়ে নিজেরাই তা আত্মসাৎ করত। দাদন ছাড়া চাষ করার ক্ষমতা ছিল না আখচাষিদের। তাতে আখ চাষ ব্যাহত হত। আখজমির উচ্চ খাজনাও ছিল চাষের অন্যতম প্রতিবন্ধক। তার ওপর ছিল কোম্পানির আর্থিক কৃচ্ছ্রতা এবং ইউরোপিয় বাজারে তেজি মন্দার অনিশ্চয়তা। ওদিকে আর এক বিপদ : বারুদ প্রস্তুতের জন্য ইউরোপে সোরার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি জাহাজের গুরুভার (dead weight) হিসাবেও চিনির তুলনায় ছিল অধিকতর কাংখিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮১০ সালের এক আদেশ বলে কোম্পানি হঠাৎ চিনি কেনা বন্ধ করে। চিনির পাইকার ও আখচাষিদের মাথায় হাত। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের শর্তানুযায়ী ভারতে কোম্পানির একচেটে বাণিজ্যিক অধিকারের অবসান ঘটে। বহু সংখ্যক বিদেশি ও বহিরাগত বণিক-ব্যবসায়ী বাংলায় এসে বাজার গরম করে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশে নিষিদ্ধ হয় ক্রীতদাস প্রথা এবং তারই প্রভাবে দাসশ্রমনির্ভর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আখ

এবং অন্যান্য কৃষি ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অচল অবস্থা দেখা দেয়। বাংলার চিনিশিল্পের ভাগ্যে এ ঘটনা সুবর্ণ সুযোগের বার্তা বহন করে আনে। কিন্তু তার প্রভাব বীরভূমের ওপর কতটা পড়েছিল আমাদের জানা নেই। অন্তত ১৮৩৬ সালের আগে বীরভূমের চিনিশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। ১৮৩০ সালের এক সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সে বছর বীরভূম রপ্তানি করে অল্প পরিমাণ হলদে চিনি যা নিকৃষ্ট মানের আর আমদানি করে উচ্চমানের বিদেশি সাদা চিনি। শিল্পের এটি ম্রিয়মান দশার প্রমাণ। বীরভূমের চিনি শিল্পের আকস্মিক ও অভূতপূর্ব উজ্জীবন শুরু হয় ১৮৩৬ সাল থেকে। সে বছর আমাদের অজ্ঞাত কারণে, জেলায় বহিরাগত চিনির আমদানি নিষিদ্ধ হয় এবং রপ্তানির জন্য কালেক্টরের স্বহস্তে লিখিত 'বীরভূমে প্রস্তুত' এই শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়। সংরক্ষণমূলক এই নীতির ফলে প্রকৃতই জোয়ার লাগে জেলার চিনি উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে। স্থানীয় চিনি উৎপাদক ও বেপারিরা এগিয়ে আসে। ১৮৪০ সাল থেকে অন্তত এক দশক পর্যন্ত ইউরোপীয় ও ইন্দো-ব্রিটিশ বণিকদের রপ্তানিকে বহুলাংশে ছাপিয়ে যায় স্থানীয় বণিকদের রপ্তানির পরিমাণ। সুযোগ পেলে দেশিয় উৎপাদক-বণিকরাও যে কতটা সফল হতে পারত এটি তারই প্রমাণ।

নীল : প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে এই জেলা দেশিয় পদ্ধতিতে খুব সামান্য পরিমাণে এবং অত্যন্ত নিম্নমানের নীল উৎপন্ন করতো। বীরভূমে আধুনিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদনের পথিকৃৎ ছিলেন ইংরেজ কোম্পানির কুঠিয়াল জন চিপ এবং তার সহকারী ডেভিড এরস্কিন নামে স্কটল্যান্ডের এক স্বাধীন বণিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঔপনিবেশিক বণিকরা নীলচাষ অনেকটা কমিয়ে অধিকতর লাভজনক আখ ও কফি চাষে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিপ ও এরস্কিনের সেটাই হল সুযোগ। চীপের কাছ থেকে প্রাথমিক পুঁজি নিয়ে বোলপুর-ইলামবাজারের এক মধ্যবর্তী স্থান দারুন্দায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন এরস্কিন। ক্রমে বিভিন্ন স্থানে নীলচাষ ও নীল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে নিজেকে তিনি জেলার প্রধান নীলকর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ছেলে জন ব্যবসাতে যোগদানের পর এরস্কিন কোম্পানির কর্মতৎপরতা বহুমুখী হয়।

স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি কিনে এরস্কিনরা জেলায় মোট সাতটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। সদর কুঠি ছিল অজয়ের তীরবর্তী ইলামবাজারে। ১৪,৫২৫ বিঘে জমিতে ছিল তাঁদের নীলচাষ। সবই রায়তি জমি, চাষি-রায়তরা তাদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে চুক্তি অনুযায়ী নীলের চাষ করতো এবং যথাসময়ে নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছে দিত। জেলায় নীল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও কয়েকজন ইন্দো-ইউরোপিয় নীলকর। নীলচাষ ও উৎপাদনে বেশ কিছু সংখ্যক দেশিয় জমিদার ও পত্তনীদার যুক্ত ছিল। দেশি-বিদেশি প্রায় সব নীলকরই ছিল প্রচণ্ড অত্যাচারী। এই দুর্নাম অন্তত এরস্কিনদের ছিল না।

নীলকরদের প্রয়াস সত্ত্বেও বীরভূম নীলশিল্প বিস্তার লাভ করেনি। নীলচাষ ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন মোটা পুঁজি। বীরভূমে তার বিশেষ অভাব ছিল। নীলচাষিরা ফসলের উপযুক্ত দর পেত না। আর জমিদার-পত্তনীদাররা নীল উৎপাদক হলে নীলের চাষ তাদের কাছে হত বাধ্যতামূলক। তারই সঙ্গে ফসলের নিম্নতম দর, কঠোর শর্তাবলী এবং পান থেকে চুন খসলেই শাস্তি এবং জুলুম। যশোর-খুলনার নীলচাষিদের মত এদের জীবন এতটা বিষময় না হলেও নীলচাষ তাদের কাছে পরিহারযোগ্য এক অমোঘ অভিশাপ বলেই বিবেচিত হত।

নীলকরদের প্রয়াস সত্ত্বেও বীরভূম নীলশিল্প বিস্তার লাভ করেনি। নীলচাষ ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন মোটা পুঁজি। বীরভূমে তার বিশেষ অভাব ছিল। নীলচাষিরা ফসলের উপযুক্ত দর পেত না। আর জমিদার-পত্তনীদাররা নীল উৎপাদক হলে নীলের চাষ তাদের কাছে হত বাধ্যতামূলক। তারই সঙ্গে ফসলের নিম্নতম দর, কঠোর শর্তাবলী এবং পান থেকে চুন খসলেই শাস্তি এবং জুলুম। যশোর-খুলনার নীলচাষিদের মত এদের জীবন এতটা বিষময় না হলেও নীলচাষ তাদের কাছে পরিহারযোগ্য এক অমোঘ অভিশাপ বলেই বিবেচিত হত। এমন পরিস্থিতিতে শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ক্যাটনি শেরউইল জেলায় মাত্র ২১টি নীলকুঠির কথা তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন। সুতরাং খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষেরই নীলচাষ ছিল জীবিকা। আর উৎপন্ন নীলও ছিল অপকৃষ্ট মানের। পরে ইউরোপের কলে প্রস্তুত কৃত্রিম ও শস্তা নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জেলার নীলশিল্প সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

লৌহশিল্প : গালা ও গালাজাত দ্রব্যসামগ্রী এবং স্বল্প পরিমাণ কয়লাকে বাদ দিলে জেলার কাঁচা লোহার উৎপাদন ছিল জেলার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

বীরভূমে লৌহখনি কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল জানা না গেলেও এর উৎপাদন যে সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। খনিগুলো ছিল প্রধানত ননি, মল্লারপুর, মৌড়েশ্বর পরগনা এবং সারহৃত-দেওঘরে। আগুরিয়া সম্প্রদায় খনি থেকে আকরিক লোহা বা লোহাপাথর উত্তোলন করত। দেশিয় পদ্ধতিতে সেগুলো চুল্লিতে গলিয়ে পাওয়া যেত কাঁচা লোহা। কাঁচা লোহার নিষ্কাশিত রূপ পাকা ধাতু। এই পাকা লোহাই পিন্ডাকারে চালান যেত জেলার বিভিন্ন অংশে, জেলার বাইরে এবং পরে আন্তর্জাতিক বাজারে। কামারদের নেহাইয়ে কৃষি ও গৃহস্থালির যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম এই পাকা লোহা দিয়েই তৈরি। এমনকী মুর্শিদাবাদ নবাবের অস্ত্রাগারের একটা উল্লেখযোগ্য অংশেও সম্ভবত ছিল বীরভূম লোহার অংশ।

পরবর্তীকালে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে বীরভূম লোহার ব্যবহারিক কার্যকারিতার কথা অভিজ্ঞ ইংরেজ লৌহ উৎপাদকরাও স্বীকার করেছিলেন। তার প্রমাণ, ১৭৭৭ সালে কলকাতার মেসার্স মট এ্যান্ড ফার্কুহার নামে এক বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বীরভূমের বিস্তৃত লৌহখনি অঞ্চল (যা 'লোহা মহাল' নামে সরকারি রাজস্ব দপ্তরে চিহ্নিত ছিল) সরকারের কাছে এক দীর্ঘমেয়াদি ইজারার জন্য আবেদন করে। তাদের মতে বীরভূম ও রামগড়ে এমন এক শ্রেণির লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে যা দিয়ে কামানবাহী লোহার ট্রাক, গোলাগুলি ও কামান নির্মাণ করা সম্ভব। তাছাড়া এই লোহা দিয়েই তৈরি হতে পারে ছোটবড় বিভিন্ন তৈজস সামগ্রী, চিনিকলের সিলিন্ডার, চিনিকল, লবণ ও সোরা কারখানার বয়লার ইত্যাদির মত ভারি যন্ত্রপাতি। কোম্পানি শেষ পর্যন্ত ১৯ বছরের জন্য লোহা মহালের ইজারা পেয়ে মহম্মদ বাজার থেকে মাইল কয়েক দূরে ডেঙচায় স্থাপন করে তাদের প্রধান লৌহ উৎপাদন কেন্দ্রে। ডেঙচাকে বেষ্টন করেছিল বহু মাইল বিস্তৃত বীরভূমের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ সমৃদ্ধ অঞ্চল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উৎপাদন শুরু করেও তারা স্বল্পকালের মধ্যেই কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তার কারণ জমিদারি খাজনার ক্রমবর্ধমান চাপ, গণ অভ্যুত্থান এবং জেলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য।

মট এ্যান্ড ফার্কুহারের কারখানা বন্ধ হলেও জেলায় লৌহ উৎপাদন বন্ধ হয়নি। ১৮৪৫ সালেও লোহার উৎপাদন হত ডামরা, গণপুর, ভারকাটা, কানমুড়া এবং আরও কয়েকটি ছোটবড় মৌজায়। লোহার বাজারে তখন তেজিভাব। সেসময় জেলার বিভিন্ন কোটশালে বা দেশিয় উৎপাদন কেন্দ্রে প্রস্তুত হত ৪৫,০০০ মন পাকা লোহা সবই স্বদেশি মালিকানায় দেশিয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত। পঞ্চাশের দশকে দেশিয় লৌহশিল্পে দেখা দেয় গুরুতর ভাঁটার টান। ততদিনে উন্নততর প্রযুক্তিতে উন্নতমানের বিলিতি লোহা আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে ফেলেছে। কলকাতার বাজারে বীরভূমের লোহা শস্তা হলেও চাহিদা ছিল নগণ্য। ফলে জেলার অনেক কোটশাল বন্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধকার বাতাবরণে পুনরুজ্জীবনের কাংখিত বার্তা নিয়ে আসে কলকাতার মেসার্স ম্যাকে এ্যান্ড কোম্পানির অধীন বীরভূম আয়রন ওয়ার্কস। সাত বর্গমাইল বিস্তৃত লৌহখনি অঞ্চল ইজারা নিয়ে একচেটে অধিকার বলে তারা জেলার সমস্ত কোটশাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। তারপর ১৮৫৬/৫৭ সাল নাগাদ মহম্মদ বাজারে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াল তাদের বিশাল কারখানা। মাস মাইনের ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক নিয়ে বীরভূমে এটাই সম্ভবত আধুনিক শিল্প-পুঁজির প্রথম শিল্পোদ্যোগ। ৬ এবং ২০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট দুটি স্টিম ইঞ্জিন বসানো হল কারখানার একাধিক চুল্লি চালাবার জন্য। ডেঙচাতে বৃহৎ চুল্লি বসে। দেশিয় কোটশালের মত জ্বালানি হিসাবে এখানেও ব্যবহৃত হত কাঠকয়লা। ফলে অরণ্য উৎসাদন চলে, পশ্চিম বীরভূম ও ঝাড়খণ্ডের বিস্তৃত অঞ্চলের বন্য পশুপাখি অরণ্যবঞ্চিত রুক্ষ নিরাভরণ ভয়ংকর পাথুরে রূপ তারই পরিণতি। অবাধে অব্যাহত তীব্র গতিতে। মহম্মদবাজার কারখানা থেকে লোহা উৎপাদন হল। মানের বিচারে প্রথম শ্রেণির বিলাতি লোহার সমকক্ষ। কিন্তু লাভের মুখ দেখতে পেল না কোম্পানি। উৎপাদন বাড়লে লাভ হবে আশায় কারখানার প্রসার ঘটল, নতুন চুল্লি বসল। কিন্তু ফল পূর্ববৎ। আরো কয়েক বছর চালাবার পর ক্ষতির চোরাবালিতে ডুবে গেল কোম্পানির উদ্যম। কারখানা বন্ধ, সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার মানুষ জীবিকাহীন, বেকার। দীর্ঘস্থায়ী কঠোর সংকটে পড়ল বীরভূমের অর্থনীতি। পরে অন্য একাধিক সংস্থার ব্যর্থ চেষ্টার পর চিরকালের মত বিলীন হল বীরভূমের লৌহশিল্প পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন।

প্রবল উত্থানের পর বীরভূম লোহার এমন বিপর্যয়কর পতনকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? প্রথমেই স্বীকার করা ভালো, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী উন্নততর বিলাতি লোহার সঙ্গে দেশিয় লোহার অসম প্রতিযোগিতাকে এজন্যে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ, এই দুই জাতের লোহার উৎপাদন প্রক্রিয়া পৃথক, তাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। ভারি নির্মাণ কার্যের জন্য বিলাতি লোহার শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত, অন্যদিকে কৃষি সরঞ্জাম, গৃহস্থালী সামগ্রী ও তৈজসপত্র ইত্যাদি নির্মাণে বীরভূম লোহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সুতরাং দুই ভিন্নধর্মী লোহার মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান কোথায় ? আসলে বীরভূমের আকরিক লোহার ত্রুটিপূর্ণ বিগলন প্রক্রিয়া ও পরিশোধন পদ্ধতির ফলে আদিকাল থেকেই ব্যবহারযোগ্য লোহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ লৌহমলের সঙ্গে বেরিয়ে যেত। এই অব্যাহত অপচয়, কাঠকয়লাজাত শস্তা জ্বালানির অভাব, কাঁচামালের ওপর বিলাতি কোম্পানির একচেটে অধিকার, পরিবহনের সমস্যা এবং লোহা মহালের মালিককে দেয় বর্ধমান উৎপাদন মাশুল যুক্তভাবে পণ্যের গড়পড়তা মূল্য ক্রমশই বাড়িয়ে তুলছিল। ফলে কলকাতার বাজারে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোহার কাছে প্রতিযোগিতায়

তুঁত পাতার (মালবেরি) উপর রেশম পলু ছবি : মানস দাস

কেবলই পিছু হটছিল বীরভূমের লোহা। কিন্তু আসল সমস্যা গভীর ও সমাধানের অতীত—উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই বীরভূমের অধিকাংশ লৌহখনি অপরিকল্পিত খননের ফলে নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র খনিগুলোর সংরক্ষণ ও পরিচালনা অলাভজনক হয়ে পড়ে। প্রধানত এরই পরিণতি বীরভূমের লৌহশিল্পের অনিবার্য পতন।

ব্যবসা-বাণিজ্য : ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক চালচিত্রের এক নির্ভরযোগ্য দর্পণ। আমদানি-রপ্তানি তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জেলার কৃষিপণ্যের মধ্যে চাল মুখ্য। এ ছাড়া ছিল আখ, তুলো, তুঁত, বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও সামান্য পরিমাণ নীল। চাল ও ডালকে বাদ দিলে বাকিগুলো শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। চালের মোট উৎপাদন থেকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও এক বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জেলার বাইরে রপ্তানি হত। উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে চাল ছাড়া রপ্তানি হত চিনি, গুড়, কাঁচা রেশম, তসর, লোহা, কাঠকয়লা, লাক্ষা, নীল, ঘি ও অন্যান্য দ্রব্য। এদের মধ্যে বেশির ভাগ শিল্পদ্রব্য। শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করতো বহির্ভারতের বাণিজ্যচক্রের আচরণের ওপর। আমদানি পণ্য বলতে মুখ্যত লবণ ও তুলো। এছাড়া ছিল আফিম, গাঁজা, তামাক, হলুদ, সুপারি ও পচুই মদ প্রস্তুতের উপাদান বাখর ও মশলাপাতি। পঞ্চাশের দশকে আমদানির তালিকায় যুক্ত হয় গম, যবের মতো কিছু দানা শস্য এবং শাল, গালিচা, কম্বলের মতো অভিজাত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী। জেলায় দুর্মূল্য ও শৌখিন শীত ও শয্যা উপকরণের আমদানি থেকে বোঝা যায় ততদিনে ক্ষুদ্র আকারে হলেও জেলায় একটি অর্থবান শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিঞ্চিৎ উদ্দীপনার প্রমাণ। পাশাপাশি অবশ্য দুর্লক্ষণও ছিল। গড়ার কাপড় অনেক আগে থেকেই ম্যানচেষ্টার বস্ত্রের কাছে আন্তর্জাতিক বাজার হারিয়ে হতমান। এমনকি অভ্যন্তরীণ বাজারের বৃহদংশও দখল করে নিয়েছিল ম্যানচেষ্টারের বিলাতি আর নাদিয়ার দেশি কাপড়। জেলার তাঁতিদের বড় দুর্দিন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চাই ছোটবড় রাস্তা ও সড়ক। চারটি প্রধান বাণিজ্য সরণি দিয়ে জেলার আমদানি-রপ্তানি পণ্য বাহিত হত—সিউড়ি থেকে বহরমপুর, কাটোয়া, বর্ধমান ও দেওঘর পর্যন্ত প্রসারিত সেসব সড়ক। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিউড়ি থেকে রাজনগর হয়ে দেওঘর পর্যন্ত প্রসারিত সড়কটি। মালবাহী বলদ অথবা ভারবাহী মুটে-মজুর ছিল বাহন। পরে এল ভাঙা-চোরা রাস্তা ধরে গরুর গাড়ি। ১৮৫৫ সালে ৮৪ মাইল দীর্ঘ এই দেওঘর সড়ক দিয়ে বাহিত হয় ৫৫,০০০ হাজার টন পণ্যসামগ্রী।

ভারতের পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তুলো আর ডাল ও বৃহদায়তন পণ্যদ্রব্য গঙ্গানদী ধরে নৌকোযোগে পাঠানো হত। মাল খালাস হত জঙ্গিপুর অথবা মুর্শিদাবাদে। জঙ্গিপুরে খালাস-করা মাল আনা হত প্রচণ্ডপুর বা ডেউচা হয়ে, নলাহাটি সড়ক বরাবর। পরিবহণের জন্য বলদই ভরসা। আর মুর্শিদাবাদে মাল নামালে সিউড়ি-কান্দি সড়ক ধরে (একে বহরমপুর বা মুর্শিদাবাদ সড়কও বলা হত) বলদের পিঠে মাল চাপিয়ে দীর্ঘ ৩২ মাইল পদযাত্রা। বহরমপুর সড়কে '৫০ এর দশকে বছরে চলাচল করত আনুমানিক ৫৫,৩৮৩ টন মাল। সড়কপথে এটাই জেলার সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্য চলাচলের রেকর্ড। বস্তুত এটাই ছিল জেলার ব্যস্ততম বাণিজ্য সরণি।

পূর্বাঞ্চল অথবা ইউরোপ থেকে আমদানি-কৃত পণ্য এবং লবণ গঙ্গানদীপথে প্রথমে কাটোয়ায় আসত। সেখান থেকে ৪০ মাইল দীর্ঘ সিউড়ি-কাটোয়ার রাস্তা। বসন্ত ও গ্রীষ্মের চার মাস গরুর গাড়ি চলত। বছরের বাকি মাসগুলো ভাঙা-চোরা জলকাদার রাস্তায় ভারবাহী বলদই একমাত্র পরিবহন। অল্প দূরত্বে মুটে বা মজুর। এই রাস্তায় বছরে চলত ৪৬,৬৬৬ টন মাল। আর ছিল সিউড়ি থেকে বর্ধমান হয়ে কলকাতা যাওয়ার মহাসড়ক। ১৮৩০-এর দশকে বেশ ভাল ছিল এই সড়কের হাল। গোযানে মাল আনা হত, অথবা বলদের পিঠে চাপিয়ে। '৫০-এর দশকে এই পথে বাহিত মালের বার্ষিক পরিমাণ ২৫,৩৩৩ টন। এ সময়ে জেলা কালেক্টর একটি চিঠিতে জানান, উল্লেখিত চারটি সড়ক দিয়ে

রপ্তানি ও আমদানি হত যথাক্রমে ১,২১,২৮২ টন এবং ৬১,০৯৮ টন পণ্য। ওজনের নিরিখে এ হল ৬০,২৮৪ টন পণ্যের অনুকূল বাণিজ্য। তাতে আর্থিকভাবে জেলার লাভবান হবারই কথা। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। আসলে জেলা আমদানি করত প্রধানত শিল্পজাত এবং শৌখিন পণ্য যা, রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর (প্রধানত ধান, চাল এবং অন্যান্য কৃষি ও বনজ সামগ্রীর) চেয়ে ওজনে হালকা হলেও মুদ্রামূল্যে অনেক ভারি। সুতরাং তথাকথিত অনুকূল বাণিজ্য সত্ত্বেও জেলার আর্থিক নির্গমন চলছিল অবাধ এবং বিপুল পরিমাণে।

আমরা নিচে একটি আমদানি এবং একটি রপ্তানি পণ্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

লবণ : নিত্য ব্যবহার্য আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লবণ হল মুখ্য।

বৃহৎ লবণ ব্যবসায়ীরা কলকাতার সরকারি বিক্রয় কেন্দ্র থেকে মাল কিনে নৌকোযোগে পাঠিয়ে দিত মুর্শিদাবাদ ও কাটোয়ায়। সেখানে তা গোলাজাত হত। বীরভূমের পাইকারী ক্রেতারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী ওইসব গোলা থেকে লবণ কিনত বছরে একবার কি দুবার। প্রতি বারে প্রায় ১০০ মন লবণ। শুষ্ক ঋতুতে রাস্তার অবস্থা অনুযায়ী গোযানে বা বলদের পিঠে চাপিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রধান গঞ্জে তা নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে আবার তা গোলাজাত করা হত। বর্ষায় নদীতীরের বিভিন্ন গঞ্জে বস্তায় পুরে লবণ চালান যেত নৌকো সহযোগে। ছোট ব্যবসায়ী ও বেপারিরা পাইকারী দরে কিনত। উপযুক্ত লাভ রেখে মজুত মাল তারা খুচরো বিক্রি করত ক্রেতা-দোকানিদের কাছে। মুর্শিদাবাদ বা কাটোয়া থেকে জেলার বিভিন্ন গঞ্জের দূরত্বের ওপর নির্ভর করত দর-দামের তারতম্য। এই দূরত্বের জন্য সিউড়িতে 'করকচ' লবণের দর মন প্রতি ৪ টাকা ২ আনা হলেও দেওঘরের দর ছিল ৫ টাকা এক আনা। সুযোগ পেলেই পাইকাররা লবণের দাম বাড়িয়ে দিত। সমগ্র জেলার দরিদ্র জনসমষ্টি বটেই জেলার পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র তফসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের কাছে লবণ রীতিমতো একটি মহার্ঘ বিলাসদ্রব্যে পরিণত হয়েছিল।

ধান-চাল : প্রধান কৃষি ফসল ধান অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রায়তরা উদ্বৃত্ত ধান বিক্রি করে জীবনধারণের সর্বপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করে, জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ, পূজা-পার্বণ, অসুখ-বিসুখ এবং অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদি বাবদ যাবতীয় ব্যয়, এই উৎস থেকেই আসে।

কিন্তু সাধারণ চাষি-রায়তের পক্ষে অবাধ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সুযোগ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভবই ছিল বলা চলে। বেপারি-ব্যবসায়ীরা চাষিদের দাদন দিত। ফসল উঠতেই সুদসহ ধানে তাদের পাওনা আদায় করে নিত তারা। পাওনা শোধ করে সামান্য পরিমাণ ধানই উদ্বৃত্ত থাকত রায়তদের হাতে। বাজারে নিয়ে গেলে সেই ধান কিনে নিত বৃহৎ রায়ত, ব্যবসায়ী-বণিক ও কোনো কোনো জমিদার। সস্তা মরসুমের ধান মজুত করে পরে চড়া দামে বিক্রি করত তারা। বস্তুত বাজারের চাবিকাঠি থাকত তাদেরই হাতে। শস্য ব্যবসায়ী ও অন্যান্য দাদন-দাতাদের নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করত হাট-বাজার গঞ্জের দর-দামের ওঠানামা।

প্রকৃতি বিরূপ না হলে ধান উৎপাদনে উদ্বৃত্ত জেলা হিসাবে ছিল বীরভূমের সাধারণ পরিচিতি। তাই ধানকাটার মরসুমে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে কেনাকাটা করতে দলে দলে পাইকারী বেপারিরা আসত। প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে প্রতিবেশী কোনো জেলায় ধানচাষ মার খেলে সেখানকার ক্রেতা-পাইকারদেরও ভিড় বাড়ত এখানকার হাটে-বাজারে। তাতে ধানের দর চড়ত, কখনোবা এখানেও অভাবের সৃষ্টি হত। যেমন হয়েছিল ১৭৮৮ সালে। বহিরাগত পাইকারদের ব্যাপক কেনাকাটার ফলে জেলার হাটে হাটে ধানচালের আমদানি এতোটাই হ্রাস পায় যে, কালেক্টরের আশংকা, তাঁর জেলায় 'একশ মন ধানও সংগ্রহ করা যাবে না। আর ক্ষেতে একটা পাতাও পড়ে নেই।' ১৮৫১ সালে বর্ধমানে গুরুতর শস্যহানি হওয়ায় একমাত্র দুবরাজপুরেই ধান কিনতে প্রতিদিন আসে ৫০টি থেকে ১০০টি গরুর গাড়ি। সে বছর নভেম্বরের শেষাশেষি ধানের খুচরো দর ওঠে টাকা প্রতি ১ মন ১০ সের মাত্র। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় এ প্রায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি। কখনো বাইরের বিশেষত সরকারি চাহিদা আকস্মিক বৃদ্ধি পেলে অতি উৎপাদনের বছরেও ধানের দর বেড়ে যেত অস্বাভাবিকভাবে। কালেক্টরের ভাষায় এ হল 'প্রাচুর্যের মধ্যে অনটনে'র দৃষ্টান্ত। আবার মাঠ ছাপানো ফসল হলে ধানের দরে ধস নামত। পার্শ্ববর্তী জেলাতেও অনুরূপ ভাল ফসল হলে চাহিদা ছাপিয়ে হাটবাজারগঞ্জে আমদানির বন্যা বয়ে যেত যেন। ধান-চালের অস্বাভাবিক নিম্নদর গরিবের শূন্য পেটে খিদে নিরসনের আশ্বাস আনলেও অর্থনৈতিক আকাশে ঝলসে উঠত মন্দার অশনিসম্পাত। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী গুরুতর মন্দার বছরগুলোতে জেলায় ধানের দর অর্ধেক পড়ে যায়। শুরু হয় এক অনিবার্য প্রতিক্রিয়া-শৃংখল—রায়তরা জমিদারের খাজনা মেটাতে পারে না, অনেক জমিদার ব্যর্থ হয় সদর খাজনা মেটাতে ; কোম্পানির লগ্নি হ্রাস পায়, সাধারণভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় তীব্রতর ও দীর্ঘায়িত হয় ব্যবসায়িক মন্দা।

স্পষ্টতই স্তিমিত, কখনো অবরুদ্ধ প্রায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ। এর প্রতিফলন ঘটে আলোচ্য কালসীমার মধ্যে নতুন শহর-গঞ্জের অতি ধীর উন্মেষে ও বিকাশে। ফলত, শতাধিক বৎসরের মধ্যে ৫০০০ ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহর গড়ে উঠেছিল মাত্র চারটি : দেওঘর,

উত্ত শিল্পী, শান্তিনিকেতন ছবি : পাপান ঘোষ
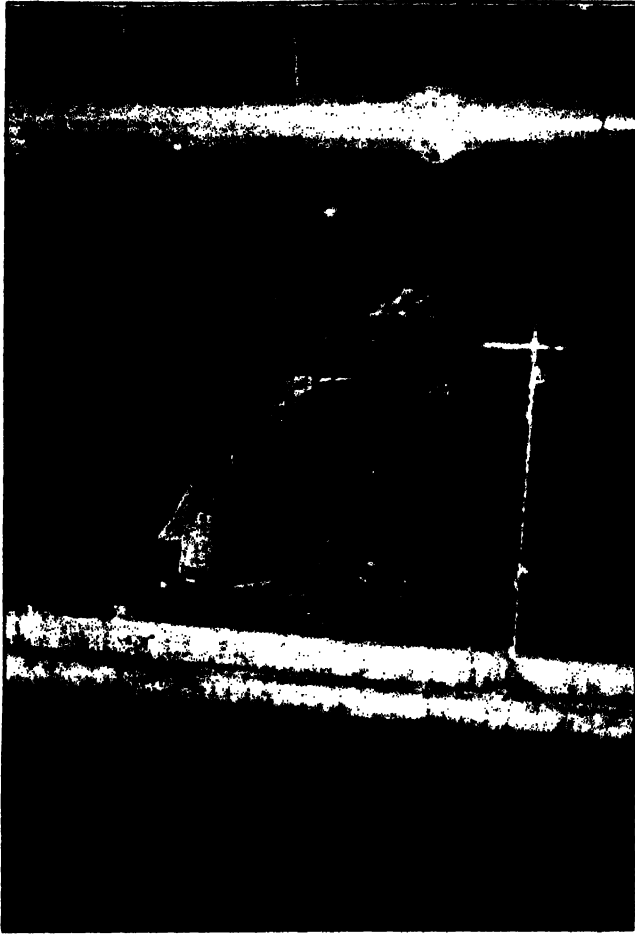
সিউড়ি, মাড়গ্রাম ও দুবরাজপুর। রেলের কল্যাণে হাট রামপুর, পরে রামপুরহাট নামে পরিচিত ও সাঁইথিয়ার অঙ্গে শহরের লক্ষণ ফুটতে সুরু করেছিল শতাব্দীর পঞ্চম দশকে, তদানীন্তন মানদণ্ডেও এদের কপালে শহরের মর্যাদা বহুত দূর অস্ত। একটা কথা মনে রাখতে হবে। মর্যাদাপ্রাপ্ত শহরগুলোও আসলে ছিল বৃহৎ গ্রাম মাত্র—গ্রামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এদের অন্তরে-বাহিরে স্পষ্ট।

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা : উপনিবেশিক শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক এবং তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। প্রতিবন্ধকগুলোর মধ্যে কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পশ্চাৎপদ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কথা। 'প্রাচীনকালে বীরভূম ছিল সৈন্য চলাচলের মহাসড়ক এবং বাঞ্ছিত যুদ্ধক্ষেত্র। (হান্টার)। কিন্তু মারী-মন্বন্তর, দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক ভাঙনের ফলে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয় যে ১৭৮০ সালে পথঘাটহীন অরণ্যসংকুল জেলায় কোম্পানির একটা ছোট সেপাই-দলের পক্ষেও চলাচল ছিল সুকঠিন। বাঘ-ভালুক-ডাকাত সমাকীর্ণ ঘন বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে একটা রাস্তার চিহ্ন অবশ্য খুঁজে পাওয়া যেত। দেওঘরের তীর্থযাত্রীদের এটাই যাতায়াতের পথ। মুর্শিদাবাদ-রাজনগর সড়ক দীর্ঘকাল পড়েছিল মেরামতিহীন এবড়ো-খেবড়ো জীর্ণ। সুরুল থেকে অজয়ের তীর পর্যন্ত হাঁটা পথটির এমনই দুরবস্থা যে ১৭৯৩ সালে একটি বলদের পক্ষে চলা ছিল অসম্ভব। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পণ্য পরিবহনের জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল কুলি বা মুটে-মজুর। পণ্যবাহক হিসাবে ভারবাহী বলদের সঙ্গে মুটে-মজুরের চলত অসম প্রতিযোগিতা। সে প্রতিযোগিতায় মানুষের জয়লাভের প্রশ্নই ওঠে না। বলদ মানুষের চেয়ে বেশি পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। ভাড়াও কম। দূরযাত্রায় বিশেষত বর্ষাকালে—পাইকার-ব্যবসায়ীদের বলদই তাই পছন্দ। বলদে-টানা গাড়ি ভাড়া করা হত শুকনো ঋতুতে ; ভারি ওজনের বেশি মাল অপেক্ষাকৃত কম খরচে পরিবহনের জন্য সেটাই ছিল প্রশস্ত। সুদূর অতীতে অজয় ও ময়ূরাক্ষী প্রায় সারা বছর নাব্য ছিল আগেই বলা হয়েছে। এই নদীপথে দু-পাড়ের গ্রামগঞ্জের অপর্যাপ্ত কৃষিপণ্য ও গ্রামীণ শিল্পসামগ্রী পরিবাহিত হত। পরিবহন ব্যয় যৎসামান্য। বিগত কয়েক শতাব্দীর প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মানুষের অবহেলা-অযত্নে বালি-বাহিত নদীগুলোর বহনক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। ফলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী মাত্র তিন-চার মাস নৌকোযোগে মাল চলাচল হত। বাণিজ্য বিস্তারে এটি ছিল এক গুরুতর প্রতিবন্ধক। ১৮৫৮ সালে অজয় নদ পর্যন্ত সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধমান ও সাঁইথিয়ার মধ্যে রেলগাড়ি চলাচল করতে শুরু করে। বীরভূমের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অর্থনৈতিক সুফল শতাব্দী সমাপ্তির আগে বিশেষ অনুভূত হয়নি।

দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি স্বরূপ পায় অবাধ ছিল চোর-ডাকাত রাহাজান ও অন্যান্য শান্তিভঙ্গকারীদের উৎপাত। পথে-প্রান্তরে ঘরে-বাইরে ধনপ্রাণের নিরাপত্তার অভাব বাণিজ্যিক শ্লথগতির অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নেই। এ সবের ওপর ছিল জমিদার আরোপিত সায়ার নামে পরিচিত বহুবিধ শুল্কের বোঝা। সায়ার অবশ্য বাংলার সব জমিদাররাই আদায় করতেন। সায়ার ছিল দুধরনের। এক, জমিদারির অন্তর্গত ছিল বা নদীবাহিত বাণিজ্য পণ্যের ওপর ধার্য শুল্ক। এবং দুই, হাট ও বাজার-গঞ্জের বিক্রীত জিনিসের ওপর ধার্য শুল্ক। বীরভূমের নগররাজ ২০ প্রকার 'সায়ার' বা শুল্ক আদায় করতেন। সায়ারকে বাণিজ্য-প্রসারের পথে প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে সরকার ধাপে ধাপে তা বিলোপ করে। কিন্তু ৪০-এর দশকে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়া মাত্র সরকারের অর্থলোভে দুর্বার হয়ে ওঠে।

অজয় নদীর দুপারে ফেরিঘাটে আর সদর শহর সিউড়ির চারটি মূল প্রবেশ পথে শুল্ক ঘাঁটি বসে ইলামবাজারের ফেরিঘাটে পায়ে-চলা মানুষ থেকে পণ্যবাহী যেকোন যান, হাতি, ঘোড়া, গাধা, উট কিছুই বাদ গেল না টোলট্যাক্স বা পথশুল্ক থেকে। ইলামবাজারে ফেরি পারাপার করতে গেলেই মাথাকিছু দিতে হত ১ পয়সা টোলট্যাক্স, আর ঝাঁকা মাথায় মুটেকে দেড় পয়সা। ফাঁকা ও মালবোঝাই গরুর গাড়ির শুল্ক যথাক্রমে দু আনা ও চার আনা। যুগের নিরিখে নিঃসন্দেহে উচ্চ হার। সাঁইথিয়া, পুরন্দরপুর আর ইলামবাজারের সড়কপথে সিউড়িতে প্রবেশ করতে গেলে খালি-হাত মানুষ রেহাই পেলেও মাথায় মোট থাকলেই ১ পয়সা প্রবেশকর। তৃণমূলস্তর পর্যন্ত শোষণের এমন বিস্তৃত কঠিন লৌহজালের মধ্যে সাধ্য কী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ প্রসার ঘটে। এছাড়া আরও বহু বাধা-বিঘ্ন। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, জেলায় দীর্ঘকালব্যাপী মুদ্রা সংকট—কখনো স্বর্ণমুদ্রার অত্যধিক প্রাচুর্য এবং পাশাপাশি খুচরো মুদ্রার নিদারুণ অনটন। কখনো বিপরীত চিত্র—খুচরো মুদ্রার ছড়াছড়ি এবং স্বর্ণমুদ্রা আশ্চর্যজনকভাবে অদৃশ্য। খাঁটি মুদ্রার চাহিদা-যোগানে অনিশ্চয়তার ফলে জেলার হাট-বাজার জাল ও কম-ওজন মুদ্রায় ছেয়ে যায়। বাট্টার উচ্চহার কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের মোটা লেনদেনে নয়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনা-কাটা ও জীবনযাত্রাকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পথ খরচ বাবদ একজন সাধারণ মানুষকে মাথায় করে নিয়ে যেতে হত এক বস্তা কড়ি! এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের রুগ্ন বিশীর্ণ চেহারাটি খুবই স্বাভাবিক পরিণতি।

ব্যাপক দারিদ্র আর যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় পুঁজির অভাববশত বীরভূমে বৃহৎ পুঁজির ব্যবসা চলে যায় বহিরাগত, ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশি, বণিকদের হাতে। স্থানীয় বাসিন্দারা বৃহৎ বণিকদের অধীনে গোমস্তা, দালাল বা এজেন্ট হিসাবে মুনাফার খুঁদ-কুঁড়ো পেয়েই সন্তুষ্ট। ব্যবসায়ী হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীদের দৌড়, পাইকারী কারবারে দু-একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বড় জোর মুদিখানা পর্যন্ত। মুদিখানায় চাল-ডাল-নুন-তেলের মতো নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তাদের কাজ কারবার। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবসায়ী-জাত হিসাবে পরিচিত ছিল বীরভূমের সুবর্ণ বণিক ও গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের। ব্রিটিশ আমলে, বিশেষ করে বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে তা পরিণত হয় অতীতের সুখস্মৃতিতে। তারা এখন সোনা-রূপোর কারবারী ও অলংকার বিক্রেতা এবং মুদিখানার মালিকে পরিণত। তবে সদর শহর সিউড়িতে অবশ্য দু-চারজন ধনবান গন্ধবণিকের কথা জানা যায়, আসন্ন দুর্যোগের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র বাজার উজাড় করে চাল-ডাল-গম-নুনের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুত করার মতো যাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তাদের মজুতদারি ও অত্যধিক লাভের লালসা পরাক্রান্ত কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেটকেও রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। পরবর্তীকালে জেলার ব্যবসায়িক উদ্যমে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা বিশেষ শোনা যায়নি। ব্যবসা বলতে তখন অনেকেই বুঝত গ্রাম-শহরের সর্বত্র প্রচলিত ঝুঁকিবিহীন মহাজন। স্বল্প পুঁজির মুদি থেকে জমিদার-পত্তনিদাররাও এই ব্যবসাটি ভালোভাবেই বুঝত এবং তার চর্চা করত। আর ছিল বন্ধকী কারবার—মুদি দোকান থেকে চাষি-গৃহস্থের ঘর পর্যন্ত তা প্রসারিত। মহাজন ছাড়া গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকেরা সাধারণত ঘটিবাটি সোনা-রূপোর অলংকার গচ্ছিত রেখে উচ্চ সুদে ঋণ দিত। বন্ধ্যা, অবরুদ্ধ অর্থনীতির এটিও অন্যতম অনুষঙ্গ।

শতাধিক বছরের (১৭৬৫-১৮৭১) ঔপনিবেশিক শাসনের কী প্রভাব পড়েছিল জেলার অর্থনীতিতে? কৃষিতে ধানচাষের অভূতপূর্ব বিস্তার এক স্বীকৃত সত্য। ১৮৭১ সালে সমগ্র কৃষিজমির ১৬ ভাগের ১৫ ভাগই ছিল ধানচাষে নিয়োজিত। অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচক্রের দুর্জ্ঞেয় আচরণের ফলে আখ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের চাষ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। পরিণামে কৃষিজীবীর প্রায় পুরো চাপ পড়ে ধানচাষের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ ও অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। একইভাবে স্থানীয় প্রতিবন্ধকতা ও বিশ্ব বাজারে পৌনঃপুনিক দুর্যোগ একে একে গড়ার কাপড়, কাঁচা রেশম, তসর, নীল, গালা ও লৌহ উৎপাদন শিল্পে বিপর্যয় ডেকে আনে। দুর্লভ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গুড় ও চিনিশিল্প উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে উন্নততর মানের বিদেশি চিনির প্রতিযোগিতায় তারও নাভিশ্বাস ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বহিরাগত বা বিদেশি বণিকদের হাতে। সব মিলিয়ে একটি পশ্চাদপদ রুগ্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত হয় বীরভূম। সমাজ ছিল বহুবর্ণ ধর্ম ও শ্রেণি বিভক্ত। বৃহৎ গ্রাম-গঞ্জ-শহরে মুষ্টিমেয় আর্থিক সম্পন্ন গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মিললেও জনসংযোগের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই ছিল দরিদ্র। তাই বলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা বিনা প্রতিরোধে চলেনি। প্রমাণ,—১৭৮৫'৯৩ সালের বিস্তৃত গণবিদ্রোহ, ১৮০১-১৪ সালের ঘাটোয়াল বিদ্রোহ ১৮৫৫-৫৬ এবং ১৮৭১ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। তদুপরি চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার অব্যাহত ধারা নিম্নবর্গের মানুষের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ব্রিটিশ প্রশাসনকে সর্বদা ব্যস্ত-বিব্রত রাখত। বস্তুতপক্ষে, অবরুদ্ধ অর্থনীতি ও সামাজিক বিদ্রোহ-বিক্ষোভ পাশাপাশি যুক্ত হয়ে শতাধিক বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করে।

সূত্র : *রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ*—রঞ্জন গুপ্ত

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প, উদ্বোধক—শান্তিদেব ঘোষ, সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

জয়ন্তী চক্রবর্তী

পটভূমি

উপনিবেশ উত্তর ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের (পঞ্চায়েত ও পুরসভা) গুরুত্ব নীতিগতভাবে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী লক্ষ্য থাকলে তা পূরণ করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু বাস্তবটা হল অন্যরকম—শুরু থেকেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই রয়েছে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এগুলি সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ সবই হয়েছে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি অনুযায়ী। সাধারণ মানুষের মনে বপন করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত রকম সরকারি উদ্যোগের উপর এক নির্ভরতার বীজ। একে পাশে রেখে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালিত হয়েছে দেশের

মুষ্টিমেয় অংশের স্বার্থে। ফলত সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে উন্নয়নের চুঁইয়ে পড়া সুফল। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষদের বেশি করে পরিষেবা দিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করে নিলেও এদের জোটেনি সাংবিধানিক স্বীকৃতি। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। আমাদের রাজ্যে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এক দৃষ্টান্তমূলক ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে—নিছক আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো নয়, সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামো তৈরির সপক্ষে রাজ্য পঞ্চায়েত আইনের সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া ও তার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তন এনে প্রকৃত উৎপাদনশীল অংশকে নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টিকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েতে একটি সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হয়েছে। স্থবিরতা কাটিয়ে পঞ্চায়েত পৌঁছতে পেরেছে মর্যাদার আসনে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে শুধু কাগজে কলমে নয়, বাস্তবে শুরু হয়েছে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা পদ্ধতিকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত করার প্রক্রিয়া। এই বহুমাত্রিক প্রয়াস গ্রামোন্নয়নের মূল প্রশ্নে কিভাবে ভূমিকা নিতে পারছে, বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে তারই একটি বাস্তব চিত্রকল্প তুলে ধরার বিষয়টি এ রচনার উপজীব্য।

উন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়ন ভাবনার আঙ্গিকগত পরিবর্তন

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়ন ধারণাটির (অনেক পরে অর্থনীতি চর্চায় স্থান পাওয়া) আঙ্গিকে ও মাত্রাতে পরিবর্তন এসেছে। উন্নয়ন অর্থে দেশে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে যা কিছু নতুন করে তৈরি হচ্ছে তার আঙ্কিক পরিমাপের সীমিত ধারণাটির সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে বন্টনের প্রশ্নটি এবং আরও পরে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত মানোন্নয়নের ধারণাটি। বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্ক নির্দেশিত মানব উন্নয়ন সূচক দিয়ে ক্রমবিন্যস্ত করা হচ্ছে পৃথিবীর দেশগুলিকে। সাম্প্রতিককালে এই ধারণা আরও ব্যাপ্তিলাভ করেছে। উন্নয়ন বা বিকাশকে সমার্থক ভাবা হচ্ছে স্বাধীনতা (সক্ষমতা) অর্জন ও রক্ষার প্রক্রিয়া হিসাবে যা অর্জিত হতে পারে মানুষের জন্য নির্ধারিত সামাজিক সুবিধা যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে। এর কিছুটা অংশের দায়িত্ব নেন জনকল্যাণকর সরকার আর বেশিরভাগটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবিকার জায়গা থেকে লব্ধ সামর্থ্যের উপর। সর্বোপরি প্রয়োজন হয় একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রয়োগের প্রকৃত সুযোগ থাকবে। অনুন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এই সুযোগগুলি স্বল্প মাত্রায় প্রাপ্তি দিয়ে যা এনে দেয় দারিদ্র্য।

মূল বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রামোন্নয়নের ভাবনাতেও এসেছে স্বাভাবিক পরিবর্তন। গ্রামোন্নয়নের চিরাচরিত ধারণাটি সীমাবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট অংশকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা

বিদ্যালয়ে পাঠরত বালক বালিকা

এবং তাদের জন্য কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রশাসনিক স্তরে নিয়ে ফলপ্রসূ করা। এক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এইসব কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কিছুটা সুফল উপর থেকে চুঁইয়ে নীচে যাবে যা কিনা যথেষ্ট এই 'কিছু না পাওয়া' অংশের পক্ষে। এই তত্ত্ব ও প্রয়োগ ভুল প্রমাণিত হয়েছে সর্বতোভাবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ ফল বলেছে এর পিছনে কারণ হিসাবে রয়েছে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে যুক্ত করার গুরুত্ববোধের অভাব। কাজেই উপর থেকে আরোপিত ব্যবস্থা নয়—উন্নীত হওয়ার তাগিদ, উদ্যোগ শুরু হওয়া দরকার জনসাধারণের ভিতর থেকে, তাহলেই উন্নয়নের প্রক্রিয়া ও স্থায়ী উদ্যোগে রূপ নিতে পারে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি এক্ষেত্রে হতে পারে এক মঞ্চ যা প্রতিনিয়ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনসাধারণকে যুক্ত করার লক্ষ্যে স্থির থাকবে। সেভাবেই তার সাফল্যের গ্যারান্টি আসতে পারে।

এ রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সৃষ্ট জনমুখী পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাসমূহ

পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামোন্নয়নের মূল ধারার সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল এক বিকল্প আদর্শগত ভাবনা থেকে যা হল গ্রামীণ অর্থনীতির মূলে থাকা শ্রেণিগত বৈষম্যের জায়গাটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটা সামগ্রিক অংশ গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরি করা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকৃত করা। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করা। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সংগঠিত হওয়া ছটি নির্বাচন—এই সুযোগটি মানুষের কাছে পৌঁছানো সুনিশ্চিত করেছে। কেন্দ্রীয় স্তরে সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির অনেক আগেই এই রাজ্যে সমাজের পিছিয়ে-পড়া অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা গেছে। মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য ও উপায় নিঃসন্দেহে। এই নির্বাচনগুলির মধ্যে দিয়ে একটা বিষয় সুদৃঢ় করা গেছে যা হল প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার মানুষ প্রত্যক্ষ করছে, ফলে ভাল না মন্দ উভয় মূল্যায়ন সহজ হচ্ছে, ব্যাপ্তিলাভ করছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাঠামো সুদৃঢ়তর ও স্বচ্ছ করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয়ভাবে সি এ জি দপ্তর মারফৎ হিসেব-নিকেশ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের কাজকর্মে স্বচ্ছতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

গ্রামোন্নয়নের প্রশাসনিক মূল কাঠামোর সঙ্গে পঞ্চায়েতকে সময়োপযোগীভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন আনা হয়েছে একাধিকবার। ২০০৪ সাল পর্যন্ত ২৪ বার সংশোধিত হয়েছে এই আইন। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী (১৯৯৩)-র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে '৯৪ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে সৃষ্টি করা হয়েছে গ্রামসভা (প্রতিটি গ্রামের মোট ভোটারভিত্তিক) ও গ্রামসংসদ (নির্বাচন ক্ষেত্রের বুথের ভোটারভিত্তিক)-র মত সংবিধান স্বীকৃত প্রশাসনিক স্তর। এ রাজ্যে গ্রামসংসদকে আরও বেশি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে জোর দেওয়া হচ্ছে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার উপর। এ লক্ষ্যে পঞ্চায়েত আইনেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাই নন, এখানে থাকবেন গ্রামের উন্নয়নে আগ্রহী পুরুষ, মহিলা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর দল, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা। সমস্ত উৎসাহী ও অভিজ্ঞ মানুষকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটি সহভাগী গণতান্ত্রিক কাঠামো যেখানে পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের মধ্যে নিয়ে একটি স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

রাজ্যের গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ও বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র নির্বাচন করা যেতে পারে। এগুলি হল : (১) কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের মৌলিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণে পঞ্চায়েতের সংযুক্তি; (২) সামাজিক পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন এবং (৩) উন্নয়নমূলক ও সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের চালিকাশক্তি হিসাবে পঞ্চায়েতের ভূমিকা।

বীরভূম জেলার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সংযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রলব্ধ সাফল্য

১

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে গ্রামোন্নয়নের বিকল্প ভাবনা প্রয়োগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন আনা। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই তা সাধিত হতে পারে। কারণ, নবসৃষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষকে যুক্ত করে গ্রামীণ ক্ষেত্রের সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদাগত অবস্থান পরিবর্তন করার চালিকাশক্তি হতে পারে। এর ফলে গ্রামে কৃষির সঙ্গে যুক্ত অংশের (যা প্রধান অংশ) ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বাজার প্রসারিত হবে। ক্রমশ কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র এবং ছোট শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ গড়ে উঠবে। গ্রামীণ জীবনে গতি সঞ্চারিত হবে। এই কর্মসূচির সঙ্গে শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে এই কর্মসূচির সাফল্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে সামগ্রিকভাবে জনকল্যাণমুখী গ্রামোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পঞ্চায়েতের কাজকর্মের বস্তুগত সাফল্য।

পদ্ধতিগতভাবে দুটি পর্বে বিভক্ত এই কর্মসূচি : (১) বড়ো ভূস্বামীদের মালিকানায় থাকা উদ্‌বৃত্ত জমির পরিমাণ ঠিক করা এবং তা ভূমিহীন অথচ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত অংশের জন্য বণ্টন করা; (২) কৃষকদের চাষের অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা (অপারেশন বর্গা কর্মসূচি)। জেলাগুলিতে পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে এই বিষয়ক স্থায়ী সমিতি রয়েছে যেখান থেকে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হওয়ার সঙ্গে সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে এবং এই নিয়ে উদ্ভূত বিরোধ (কোন কোন ক্ষেত্রে) মীমাংসায় গ্রামপঞ্চায়েত সরাসরি যুক্ত রয়েছে। কিছুটা সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে একাজের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। সারণি ১'ক' ও 'খ'তে এ সম্পর্কিত বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি—১'ক' *বীরভূম জেলার উদ্বৃত্ত ও বণ্টিত কৃষি/অকৃষি জমি এবং বর্গা রেকর্ডভুক্ত জমির পরিমাণ ১৫.১২.০৪-এ প্রদত্ত।*

জমি সংক্রান্ত বিবরণ	জমির পরিমাণ (প্রতি একরে)	
	কৃষি	অকৃষি
উদ্বৃত্ত নীট জমি	৬১০৫০.৯৫	২৭৩৮৮
বণ্টিত জমি	৩৮১৩৬.৮৭	৩৮৪৭.০৫
বর্গারেকর্ডভুক্ত জমি	১১৪১৯৪.৬৬	৮৪০.৭

এখানে দেখা যাচ্ছে যে বীরভূম জেলায় ২০০৪ সালে (১৫.১২.০৪ পর্যন্ত) উদ্বৃত্ত হিসাবে ঘোষিত হয়েছে ৬১,০৫০.৯৫ একর কৃষি জমি—এর মধ্যে বণ্টিত হয়েছে ৩৮,১৩৬.৪৭ একর। অকৃষি ক্ষেত্রে (বাস্তু) উদ্বৃত্ত জমির এবং বণ্টিত জমির পরিমাণ যথাক্রমে ২৭,৩৮৮ একর এবং ৩৮৪৭.০৫ একর। এই মূল কর্মসূচিটির দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বর্গা রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১,১৪,১৯৪.৬৬ একর কৃষি জমি ও ৮৪০.৭ একর অকৃষি (বাস্তু) জমি রেকর্ড করা হয়েছে। ১'খ' সারণিতে এই আলোচিত ক্ষেত্রগুলিতে উপকৃতদের সম্পর্কিত একটি বিবরণ রয়েছে। এখানে একটি চিত্র পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হচ্ছে তা হল, কৃষি/অকৃষিক্ষেত্রে বণ্টিত জমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং বাস্তু (অকৃষি) জমি রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রে তফসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসী মানুষরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। একটি বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হল এই ধরনের ক্ষেত্রগুলি পরবর্তীতে উৎপাদনের কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা গৌণ তথ্য থেকে বোঝা যায় না। জমির ব্যবহার সুনিশ্চিত করার বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বের দাবি রাখে।

এই কর্মসূচিটির প্রয়োগগত সম্ভাব্য বাস্তব সমস্যার সমস্ত দিক নিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবনা চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল প্রথম থেকেই। গ্রামোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন উপভোক্তাভিত্তিক কর্মসূচিতে সহায়তা দেবার যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে ভূমি সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে প্রথম থেকেই। এর সঙ্গে রয়েছে সমস্ত জেলার ক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার অভাবনীয় প্রসার ও সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা। সরকারি সেচ দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিচ্ছে এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। খরাপ্রবণ এলাকাগুলি এবং পিছিয়ে থাকা বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত অংশের কৃষকদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সহায়তা প্রকল্প। অঞ্চলগতভাবে পরিকাঠামো উন্নত করার দিকটিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ফলত সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে চাষের নিবিড়তা। ১৯৮০-৮১ সালে বীরভূম জেলায় এই নিবিড়তার সূচক ছিল ১২৯.৪৮, ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০ *(সূত্র : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ ও জেলা কৃষি দপ্তর, বীরভূম)*। কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের কাঠামোগত অংশের সংস্কার এবং প্রযুক্তি যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে, একই সঙ্গে কৃষকদের বিশেষ করে কৃষি শ্রমিকদের জন্য চালু হওয়া বিভিন্ন ধরনের পেশাগত কল্যাণ কর্মসূচি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দিকটি সুনিশ্চিত করেছে। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ১৯৯৭ সালে নেওয়া হয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্মসূচি (PROFLAL)। বীরভূম জেলা পরিষদ প্রকাশিত সূত্রে দেখা

সারণি—১'খ' বীরভূম জেলার উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ফলে ও বর্গারেকর্ডের ক্ষেত্রে উপকৃতদের সংখ্যা

ক্ষেত্রের নাম	উপকৃতদের সংখ্যা			
	আদিবাসী	তপসিলি সম্প্রদায়	অন্যান্য	মোট
বণ্টিত কৃষিজমি	২৮,৪৪২ (২২.৯৬%)	৬১,১৪৩ (৪৯.৩৭%)	৩৪,২৬২ (২৭.৬৭%)	১,২৩,৮৪৭
বণ্টিত অকৃষিজমি	৬,৪১৪ (২৩.৪২%)	১১,৩৭৩ (৪১.৫২%)	৯,৬০১ (৩৫.০৫%)	২৭,৩৮৮
বর্গারেকর্ডভুক্ত কৃষিজমি	১৭,৩৪১ (১৫.৩৪%)	৪৬,৫০০ (৪১.১৩%)	৪৯,২১৬ (৪৩.৫৩%)	১,১৩,০৫৭
বর্গারেকর্ডভুক্ত অকৃষিজমি	৪,৪৩৯ (১৮.৯৬%)	১১,৫০৯ (৪৯.১৭%)	৭,৪৫৭ (৩১.৮৬%)	২৩,৪০৫

সূত্র : বীরভূম জেলা ভূমি দপ্তর ১৫.১২.০৪-এ প্রদত্ত

বীরভূম জেলা পরিষদ

যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে ১৯,০৩৩ জন রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছেন যা জেলার কৃষি শ্রমিকদের ১৬.৯৪ শতাংশ। সব ব্লকে এখনও শুরু করা যায়নি এই প্রকল্পটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা ধারাবাহিকতার অভাব ঘটেছে। একই সঙ্গে শুরু হওয়া আর একটি প্রকল্প হচ্ছে কৃষি শ্রমিকদের জন্য সমষ্টিগত বীমা প্রকল্প (LALGI), ২০০১-০২ আর্থিক বছরের শেষে প্রকল্পটি কেন্দ্রীয়ভাবে স্থগিত হয়ে যায়।

২

যে সমস্ত সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকে গ্রামোন্নয়নের সমার্থক করে দেখা হয় সেগুলি হল, সকলের জন্য স্বাস্থ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা ও সকল ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়া। মূল বিষয়টি হল, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জনশিক্ষার প্রশ্নটিকে যুক্ত করা, সমন্বিত করা। এই যোগসূত্রের গুরুত্ব তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবনে সময় লেগেছে অনেক দিন। যারা এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ওই সময়টিতে, সচেতনতার অভাবে তাদের মধ্যে অতৃপ্তির যন্ত্রণাও তৈরি হয়নি। বেড়েছে শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার, ব্যাপক নিরক্ষরতা প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় আনা হয়েছে। জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাতে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি ও সর্বশিক্ষা অভিযান সরকারি প্রশাসনিক ক্ষেত্র, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে ও দায়িত্বে গড়ে ওঠা কর্মসূচি। এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বিধানের কাজটি করছে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার মূলত তিনটি দিক রয়েছে : সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ব্যবস্থা (প্রোমোটিভ হেলথ কেয়ার), রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা (প্রিভেনটিভ হেলথ কেয়ার) ও রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা (কিউরেটিভ হেলথ কেয়ার)। প্রথম দুটি অংশের জন্য সার্বজনিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন হয়। পঞ্চায়েতের যে

সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্র রয়েছে তাতে যুক্ত রয়েছে এই বিষয়গুলি। এই কাজে দুভাবে যুক্ত হয়েছে পঞ্চায়েত— প্রথমটি হল সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তর ও সমাজকল্যাণ দপ্তর পরিচালিত প্রকল্পভিত্তিক কাজগুলি তদারকি করা এবং মানুষকে সরকারি পরিষেবা সম্বন্ধে অবহিত করা অর্থাৎ প্রচারের মাধ্যমে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করা, দ্বিতয়টি হল পরিবারভিত্তিক কিছু প্রত্যক্ষ সুবিধা পৌঁছানো যেমন, পরিস্রুত পানীয় জলের উৎস তৈরি ও ব্যবহারের সুবিধা এবং গ্রামে স্যানিটেশন সুবিধা বিযুক্ত প্রতিটি বাড়ির জন্য অত্যন্ত কম খরচে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া ও পরিবারগুলির নিজ চাহিদা তৈরির জন্য তাদের সচেতন করা, উৎসাহিত করা। এজন্য ব্লকগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে স্যানিটারি মার্ট তৈরি করা হচ্ছে—এই সংগঠন চিহ্নিত করা ও পরবর্তীতে তাদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের বড় দায়িত্ব রয়েছে। যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন না পাওয়া গেলে পঞ্চায়েত পুরো দায়িত্বই পালন করবে।বীরভূম জেলা পরিষদ প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০০৫ সালের শুরুতে জেলায় দারিদ্র্যসীমার উপরে থাকা পরিবারগুলির ১৭.৬৭ শতাংশ মাত্র স্বাস্থ্যবিধিসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করেন। জেলা গ্রামোন্নয় সংস্থার (ডি. আর. ডি. সি.) সার্ভে অনুযায়ী জেলায় ৩৮.৪৮ শতাংশ পরিবার এখন দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ২.৯৮ শতাংশ পরিবার স্যানিটেশন সুবিধাযুক্ত। কাজেই যুক্ত না হতে পারা এক বিরাট অংশ রয়েছে। এই পরিবারগুলিকে সুবিধাযুক্ত করার জন্য জেলায় চলছে এক প্রচার কর্মসূচি (টোটাল স্যানিটেশন ক্যাম্পেইন)। সারণি ২'ক'-তে এ বিষয়ে জেলার অগ্রগতির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫,১৭,৪৬৯টি—এর মধ্যে ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১০১৭টি পরিবারকে যুক্ত করা গেছে যা লক্ষ্যমাত্রার ১.৯৬ শতাংশ মাত্র।

এ ধরনের যান্ত্রিক বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার থেকে যে কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এ বিষয়ে মেয়েদের সচেতনতার মান বৃদ্ধি করা—অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এই কাজ অনেকটা এগিয়ে দেয়। কারণ তা ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মূল কাজের সঙ্গে গোষ্ঠীভুক্তদের নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্য বিষয়ে আগ্রহী ও মনোযোগী করার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির এ বিষয়ে আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য সরবরাহকারী সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংযুক্তি বাড়ানোর প্রশ্নে। সীমিত হলেও যেটুকু সম্পদ সৃষ্টি করা গেছে (যেমন প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও পানীয় জলের ব্যবস্থা) সেগুলিকে রক্ষা করার কাজে আরও বেশি অংশগ্রহণ জরুরি।

একইরকমভাবে জনশিক্ষা প্রসার কর্মসূচির মূল ধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পঞ্চায়েত। '৯০-এর দশকে রাজ্য সরকার 'সকলের জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য পূরণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান' ও 'প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা কর্মসূচি'। প্রথাগত যে শিক্ষা পরিকাঠামো রয়েছে বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে তা প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়—একটা বড়ো অংশের ছেলেমেয়েরা রয়েছে যারা নানা কারণে প্রথাগত ব্যবস্থার সুযোগে বঞ্চিত হয়—এদের মূল স্রোতে আনার জন্য প্রয়োজন অসুবিধাগুলি দূরীভূত হতে পারে এমন এক বিকল্প ব্যবস্থা। এই

সারণি ২'ক' : গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্পের চিত্র (ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত)

জেলা	স্যানিটারি মার্টের সংখ্যা	মোট লক্ষ্যমাত্রা	প্রতি মাসের লক্ষ্যমাত্রা	২০০৪-০৫-এ লক্ষ্যপূরণ	এ পর্যন্ত মোট অগ্রগতি
বীরভূম	২০	৫,১৭,৪৬৯	১৭,১৫০	১,৬৩৮	১০,১৭০

সূত্র : বীরভূম জেলা পরিষদ

সারণি ২'খ' : শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এস.এস.কে) ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র (এম.এস.কে) সম্প্রসারণ বর্তমান ছবি। (ফেব্রুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত)

কেন্দ্রের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা					
			তঃ সম্প্রদায়	আদিবাসী	সাধারণ	ছেলে	মেয়ে	মোট
১। শিশুশিক্ষা কেন্দ্র	৬৪৭	৫৮	১৩,১৭০	৮,২৯৩	১৮,১২৭	২১,৯১৫	১৯,৩২৩	৪১,২৩৮
২। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র	৭৭	—	—	—	—	—	—	৬,০৭৩

সূত্র : বীরভূম জেলা পরিষদ

বিদ্যালয়ে পাঠরত বালক-বালিকা

লক্ষ্যে শুরু করা হয় শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং পরে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। শিশুশিক্ষা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ৫—৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের যারা বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা। এই কর্মসূচি পরিচালনায় বড়ো দায়িত্ব বর্তেছে পঞ্চায়েতের উপর। এই কেন্দ্রের শিক্ষিকা (গ্রামেরই চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের যে কোন মহিলা) নির্বাচন থেকে শুরু করে সুষ্ঠু পরিচালনা সবই নজরদারি করে পঞ্চায়েত। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুটি বিষয়, একটি হল এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে একটি আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশ তৈরি করা যাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসার ব্যাপারে আকর্ষণ তৈরি হয় এবং এমনই একটি পরিমণ্ডল তৈরি করা যাতে ছাত্রছাত্রীরা এ জাতীয় ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মনে করতে পারে। তারা ছোটবেলা থেকে বিশেষ সুবিধাভোগী—এ জাতীয় ভাবনা যেন তাদের মনে যেন না তৈরি হয়—এই ভাবনা নতুন এক সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে। অপর বিষয়টি হল পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় মানুষজনের নজরদারি রাখা যাতে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে শেখানোর মান বজায় থাকে। শুধুমাত্র নিয়মরক্ষায় না পর্যবসিত হয় এই উদ্যোগ। সারণি ২'খ'তে বীরভূম জেলায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারণের একটা চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাবে দেখা যাচ্ছে সর্বমোট ৬৪৭টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে যা ২০০০-০১ সালে ছিল ৩৭৮টি। এই কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত বাস্তব অসুবিধা রয়েছে; জেলায় এই সময়ে ৫৮টি বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। প্রথাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ জাতীয় সমস্যা রয়েছে। এখন পরিসংখ্যান থেকে সরকারি সহায়তার অপ্রতুলতার চিত্র উঠে আসছে। জেলার মাত্র ১৮.১৮ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে স্যানিটেশনের সুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাও সব বিদ্যালয়ে নেই—মাত্র ৪৯.৪২ শতাংশ বিদ্যালয় এই সুবিধাযুক্ত। এই সুযোগের সম্প্রসারণ এখনই করা প্রয়োজন। এই অপ্রতুলতার পথ অতিক্রম করার কাজে জনগণের অংশ নেওয়ার দায়িত্ব (অর্থদানের মাধ্যমে, স্বেচ্ছাশ্রমদানে, দেখাশোনা করার কাজে) রয়েছে যা অনেকটাই পূরণ করতে পারে সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতাজনিত বাধা। বিচ্ছিন্ন হলেও জেলায় এ জাতীয় উদাহরণ রয়েছে। জেলার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্থানাভাবজনিত সমস্যা দূর করতে এলাকার অধিবাসীদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'গণউদ্যোগ ভবন'। এ জাতীয় স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে সৃষ্টিধর্মী কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে, গড়ে উঠতে পারে একটি অনুকরণীয় স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেখানে মানুষের স্বতোৎসারিত ভাবাবেগ পাবে যথাযোগ্য সম্মান ও গুরুত্ব—সৃষ্টি হবে দায়বদ্ধতা এবং ব্যক্তি-উদ্যোগ রূপ পাবে সমষ্টিগত উদ্যোগে।

২

উন্নয়নের অর্থ যদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি বোঝায়, তবে তা অর্জন করার উপযোগী প্রেক্ষাপট তৈরি থাকা প্রয়োজন হয়। সামাজিক সুরক্ষা, পরিষেবা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির সঙ্গে পঞ্চায়েতের যোগসূত্রের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার যা হচ্ছে সরকারি পরিষেবা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই যথেষ্ট নয়। কাজেই পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের ব্যক্তি/পরিবারভিত্তিক সামর্থ্য থাকা দরকার হয় যা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সংযুক্তির সুযোগের উপর। বিশেষ করে সেই অংশের সংযুক্তি, যারা অপেক্ষাকৃতভাবে কম সুবিধাভোগী শ্রেণি-দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষজন যাদের বৃহত্তর অংশ সমাজের পিছিয়ে-থাকা জনগোষ্ঠীভুক্ত।

সত্তরের দশকে রাজ্যে নতুনভাবে গড়ে ওঠা পঞ্চায়েতের সামনে লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ও এর মধ্যে দিয়ে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নত করা এবং এসবের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে জীবনযাপনের মানোন্নয়ন করা। প্রাথমিক পর্বে পঞ্চায়েতের কাজের পরিধি গ্রামোন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্মসূচি রাজ্যস্তরে প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়

সারণি ৩'ক' : বীরভূম জেলার বিভিন্ন কর্মসূচি প্রয়োগের চিত্র

বছর	প্রকল্পের নাম	উপভোক্তার সংখ্যা		শতাংশ
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা পূরণ	
১৯৯২-৯৩	আই.আর.ডি.পি.	৮৭৩৪	৯৫১২	১০৮.৯০
	ট্রাইসেম	৬০০	৬২১	১০৩.৫০
	ডোকরা	৩০	২৯	৯৬.৬৬
'৯৩-'৯৪	আই.আর.ডি.পি.	১০,৩২৭	৮৫৩১	৮২.৬১
	ট্রাইসেম	১৪৩০	৭৯০	৫৫.২৪
	ডোকরা	২৫	৩০	১২০.০০
'৯৪-'৯৫	আই.আর.ডি.পি.	৮৩৫৭	১০,১৬১	১২১.৫৮
	ট্রাইসেম	১৫৪১	১৩১৩	৮৫.২০
	ডোকরা	১২	২২	১৮৩.৩৩
'৯৫-'৯৬	আই.আর.ডি.পি.	৮৩৬০	৯২১১	১১০.১৮
	ট্রাইসেম	১৬০০	১৮২৭	১১৪.১৮
	ডোকরা	১০০	৪৪	৪৪.০০
'৯৬-'৯৭	আই.আর.ডি.পি.	৬৭৬০	৬৮২৭	১০১.০০
	ট্রাইসেম	১৫০১	২১৭২	১১৪.১৮
	ডোকরা	৫০	১১৯	২৩৮.০০

সূত্র : জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা

সারণি ৩'খ' : ইন্দিরা আবাস যোজনা (আই.এ.ওয়াই.) প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ সালের চিত্র এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (গ্রামীণ আবাস)-এর ২০০৫ সালের চিত্র

জেলা	প্রকল্পের নাম	সৃষ্ট শ্রমদিবস (লক্ষ শ্রমদিবস)	গৃহের সংখ্যা				
			লক্ষ্যমাত্রা	তঃ সঃ	আদিবাসী	অন্যান্য	মোট
বীরভূম	ই.এ.এস.	৬.১০	১৭৭২	৯৭৮	৩২২	৮৫২	২১৫২
বীরভূম	প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদয় যোজনা (গ্রামীণ আবাস)	—	৪০৬	—	—	—	৪০৬

কাজের বিনিময়ে খাদ্য, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচুর শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়। তবে সেই অর্থে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা ওই সময়ে ছিল না বললেই চলে। শুধুমাত্র এই পর্বে নয়, পরবর্তী ৮০-র দশকেও প্রকল্পগুলিকে সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর কাজে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে এই পর্বে সমস্ত প্রকল্পগুলিকে সুসংহত রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। আই.আর.ডি.পি. ছিল এই সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি। আই.আর.ডি.পি.-র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম হিসাবে গ্রামীণ নারী ও শিশু বিকাশ কর্মসূচি (ডোকরা) ও যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতার জন্য প্রশিক্ষিত করার কর্মসূচি (ট্রাইসেম) শুরু হয় এই সময়ে। প্রথমটির তাৎপর্য হচ্ছে স্বনিযুক্তির মাধ্যমে মেয়েদের (দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারের) স্বনির্ভর করা এবং অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাধীন হতে সহায়তা করা। এর সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিতো সরাসরিভাবে যুক্ত। ডোকরা দলগুলি ছিল মেয়েদের সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরির একটি ধাপ। নিঃসন্দেহে এটি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার তথ্যানুযায়ী '৯৭-'৯৮ সালে তৈরি হওয়া মোট ৩৫১টি দলের মধ্যে ৩৪০টি ছিল অর্থনৈতিকভাবে সচল; সচলতার অর্থ হল এদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা থাকা এবং নিজেদের সঞ্চয় ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা সমন্বয়ে একটি বিনিয়োগযোগ্য আবর্তিত তহবিল গড়ে তোলা। আই. আর. ডি. পি.-র সঙ্গে যুক্ত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের একটা সামগ্রিক চিত্রকল্প দেওয়া হয়েছে সারণি ৩-এ। এতে সাফল্যের চিত্রই পরিস্ফুট; তবে পরিমাণগত লক্ষ্যপূরণভিত্তিক সাফল্য এর ধারাবাহিকতা সর্বদা নিশ্চিত করে না। ব্যক্তি উপভোক্তাভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার অনুৎপাদনশীল ব্যবহার ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। গোষ্ঠীভিত্তিক প্রকল্পগুলিতে বিপণনের ক্ষেত্রে আরও যোগ্য পরিকাঠামোর অভাব ছিল অনেক ক্ষেত্রে। যেগুলি পরবর্তীতে বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রশাসন ভবন

সময়ের সঙ্গে এ জাতীয় কর্মপরিকল্পনাতে এসেছে নানা পরিবর্তন। '৮০-র দশক থেকে '৯০ দশকের প্রায় শেষ পর্যন্ত চলা আই.আর.ডি.পি. / জওহর রোজগার যোজনা পরিবর্তিত হয়েছে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনাতে। পূর্বের প্রকল্পগুলিকে সময়োপযোগী করা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলার প্রয়াস অন্য মাত্রা পেয়েছে। আগেকার ব্যক্তি উপভোক্তাভিত্তিক সহায়তা প্রকল্প পরিবর্তিত হয়েছে গোষ্ঠী ভিত্তিতে—আরও বেশি স্বচ্ছতা, দক্ষতা গড়ে তোলার তাগিদে। প্রকল্পগুলিকে নির্দেশিত করা হচ্ছে স্থায়ী অভাবপূরণের লক্ষ্যে সম্পদ সৃষ্টির কাজে এবং স্ব-উদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার কাজে।

১৯৯৯-তে শুরু হয় স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস.জি.এস.ওয়াই) যাতে মিশে যায় আগেকার স্বনির্ভর কর্মসূচিগুলি। এই প্রকল্পে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নারী, পুরুষ সদস্যদের জীবিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে 'দল' তৈরি হচ্ছে। জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা এদের স্বনির্ভর হওয়ার কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করছে। এই সংস্থাকে বর্তমানে আনা হয়েছে জেলা পরিষদের অধীনে। ফলে সামগ্রিকভাবে পঞ্চায়েত যুক্ত রয়েছে এ জাতীয় প্রকল্পের সঙ্গে। শুধুমাত্র আর্থিক দায়িত্ব বহন করা নয় 'দল' তৈরি থেকে শুরু করে তাদের কাজকর্মের প্রতিটি স্তরে তদারকির কাজ করছে ডি.আর.ডি.সি.। ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংযোগসাধন করছে এই সংস্থা।

বর্তমানে এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক দলগুলিকে (নির্দিষ্ট জীবিকা অনুযায়ী সাজানোর পরে) নিয়ে বড়ো দল (ক্লাস্টার) করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকে চারটি ক্লাস্টার করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই বড়ো দলগুলিকে জেলা পর্যায়ের ফেডারেশনের মধ্যে আনা হবে। সারাবছর বিপণনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য একটি সাধারণের সুবিধাযুক্ত কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে যেখানে স্থায়ী প্রদর্শনীতে পর্যায়ক্রমিকভাবে দলগুলি বিপণনের সুবিধা পাবে। একসঙ্গে বেশি উৎপাদন করার প্রয়োজনে তারা অনেক বেশি উপকরণ একসঙ্গে সংগ্রহ করবেন বলে উৎপাদন ব্যয় কমাতে পারবেন। এই দলগুলির উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির মাধ্যমে এই জেলায় ২০০৩ সাল থেকে একটি তিন বছরের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এর ব্যয় বহন করছে ডি.আর.ডি.সি.। সমস্ত স্বনির্ভর দলগুলির এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে যাতে পরিকাঠামোর দুর্বলতা উদ্যোগ ব্যাহত করতে না পারে। বোলপুরে সূচিশিল্পে (কাঁথা স্টিচ) নিযুক্ত মেয়েদের তৈরি গোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার পরিচালিত ডিজাইন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনস্থ সি ড্যাক (C DAC) সংস্থা এক্ষেত্রে পরামর্শ দিচ্ছেন। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের এই দলগুলি খুব বাজার পেয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও রাজ্যস্তরের জেলাগুলিতে, দিল্লির হাটে বীরভূমে তৈরি পণ্য বিক্রির মাত্রা বাড়ছে। ময়ূরেশ্বর ব্লকের 'নিবেদিতা দল' (ডেয়ারি ও পশুখাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রভিত্তিক) প্রতিদিন ১০০ লিটার দুধ উৎপাদন করছে। আপাতত হিমায়িত করার অসুবিধা থাকাতে এরা স্থানীয় বাজারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বীরভূমের স্বনির্ভর দলগুলির সংখ্যা, সদস্যসংখ্যা এগুলি সারণি ৪'ক' ও 'খ'-এ উপস্থাপিত হয়েছে।

এতো হল জেলার সামগ্রিক অংশের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প রূপায়ণের রূপরেখা। এছাড়া জেলার বিশেষ কিছু অঞ্চলের জন্য রয়েছে খরাপ্রবণ এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি (ডি.পি.এ.পি.) ও জলাভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচি (আই.ডব্লিউ.ডি.পি.) বীরভূমের তিনটি ব্লকে (রাজনগর, মুরারই ১ ও রামপুরহাট ১) চলছে এই কর্মসূচি। '৭০ দশকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে খরাপ্রবণ এলাকার প্রাকৃতিক অসুবিধার জায়গাগুলি চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি করা, জলবিভাজিকা অঞ্চল

সারণি ৪'ক' : স্বনির্ভরগোষ্ঠী সম্পর্কিত ও আবর্তিত তহবিল অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য ৩১ মার্চ ২০০৫

জেলা	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	দলের সংখ্যা					আবর্তিত
		ডোকরা দল থেকে আসা	নতুন স্বনির্ভরগোষ্ঠী	এখনো অনুমোদন না পাওয়া	বাতিল বলে গণ্য	মোট	তহবিল অনুমোদিত হয়েছে
বীরভূম	১৬৭	১৯৫	৩৮৪১	১১১	৫	৩৯১০	২১৩৯

সারণি ৪'খ' : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল সম্পর্কিত তথ্য

জেলা	প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়া ব্লকের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ শুরু না হওয়া ব্লকের সংখ্যা	স্বনির্ভর দলের সংখ্যা	স্বরোজগারির সংখ্যা
বীরভূম	১৫	৪	২৭০৫	২৭০৫০

বীরভূম জেলা স্কুল

গড়ে তুলে স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। অন্যান্য আমলাতন্ত্র নির্ভর প্রকল্পের মতো এটিও ছিল বাইরে থেকে আরোপিত। এলাকার সম্পদ সংগ্রহে ও সেই সম্পদ সংরক্ষণে মানুষকে যুক্ত করতে না পারলে তা স্থায়ী হতে পারে না। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে প্রকল্পটি। বর্তমানে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় এলাকার মানুষজনকে যুক্ত করে সহভাগী পরিকল্পনার আদলে প্রকল্পগুলির জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় দুটি করে জলবিভাজিকা ও হরিয়ালি (সবুজায়ন) প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলাকার অভিজ্ঞ কৃষক, খেতমজুরদের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—এগিয়ে এসেছেন এলাকার উৎসাহী মানুষজন, উল্লেখযোগ্যভাবে মহিলারাও—এরাই হয়েছেন সম্পদকর্মী। এঁদের উৎসাহে জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থার পদ্ধতিগত বিষয়ে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এলাকার মানচিত্র এবং সেগুলি যোগ করে পুরো এলাকার সম্পদের মানচিত্র। সম্পদকর্মীরা, সমস্ত স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা, উৎসাহী ও অভিজ্ঞ গ্রামবাসীরা এবং সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া মূল 'দল' তৈরি করেছে জল বিভাজিকা অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা; এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক বনসৃজন, পশুচারণ ভূমি তৈরি করা, জলাশয় তৈরি ও পুরোনো জলাশয় থাকলে তা সংস্কার করা ও বিভিন্ন রকম কল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া। এ বিষয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। বেশ কিছু কাজ শেষও হয়েছে উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে। ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরের মধ্যে দুটি জলবিভাজিকা প্রকল্পের প্রথমটিতে ১৪ একর ও দ্বিতীয়টিতে ১২ একর এলাকায় বনসৃজনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ জাতীয় প্রয়াসে এলাকার মানুষজনকে আরও বেশি মাত্রায় যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। সেটাই পরিস্থিতির চাহিদা। এরাই তখন রক্ষা করবেন এলাকায় সৃষ্ট সম্পদ বিশেষ করে বন সম্পদ। একাত্মতা তৈরি হবে সামগ্রিক ক্ষেত্রটির সঙ্গে। গ্রামের মানুষের এ জাতীয় একাত্মতা, আন্তরিকতা আমাদের ঐতিহ্যে রয়েছে তাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই জেলার জনসংখ্যার ৯১.৪৩ শতাংশ গ্রামে বসবাসকারী মানুষের ৩০.১৩ শতাংশ তফসিলি

সম্প্রদায় ও ৭.২০ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। পঞ্চায়েত পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির নির্দেশাবলীতেই এই অংশের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ রাখা আছে—তাছাড়াও জেলার ১৯টি ব্লকের ৯টি আই.টি.ডি.পি. ব্লকের (সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত) মানুষের জন্য রয়েছে ব্যক্তি উপভোক্তা ও 'দল'ভিত্তিক কিছু সহায়তা প্রকল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি। স্ব-উদ্যোগ সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ ভরতুকির ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্ষেত্রগুলিতে। তফসিলিভুক্ত মহিলাদের জন্য রয়েছে মহিলাসমৃদ্ধ যোজনা (আমসি) যাতে ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরে জেলার ৬৫৮ জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন। একই সময়ে তফসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট এস.সি.পি., টি.এস.পি. প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন যথাক্রমে ৬৮৮০ জন ও ২৫৬০ জন (*সূত্র : বীরভূম জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর*)। সমস্ত ক্ষেত্রেই সরাসরি যুক্ত রয়েছে পঞ্চায়েত—উপভোক্তা নির্বাচন করছে গ্রাম পঞ্চায়েত। সরকারি দপ্তর, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলেপমেন্ট ফিনান্স কর্পোরেশন ও বহুমুখী সমবায় সংস্থা (ল্যাম্প্‌স)গুলির মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি।

সামগ্রিকভাবে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রের সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির পরিমাপযোগ্য দিকটি আলোচিত হয়েছে। এর বাইরে রয়েছে অপরিমাপযোগ্য একটি বড় প্রেক্ষাপট যেখানে এই রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অবদমিত মনুষ্যত্বকে সম্মান ও মর্যাদা জানানোর একটি গৌরবোজ্জ্বল মঞ্চ। এই মঞ্চ যান্ত্রিকতার আড়ালে থেকে নিরন্তর ভরসা জুগিয়ে চলেছে বিপন্ন, অসহায় মানুষকে। এটি নিঃসন্দেহে অনুধাবন করার বিষয়। দেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘলালিত সামাজিক বৈষম্যের পুরোপুরি অবসান ঘটানো সম্ভব নয়—যা সম্ভব তা হচ্ছে, এই বৈষম্য, অসাম্যের মাত্রা কমানো। সেই প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছে এ আমাদের বিশ্বাস। দুর্বলতার কিছু দিক রয়েছে স্বাভাবিকভাবেই যা উল্লেখের প্রয়োজন আছে। এর অন্যতম হচ্ছে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। এই বিষয়টি উদ্যোগ বিমুখতায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু পঞ্চায়েত নেতৃত্বকে ক্ষমতার অধিকারী (সুবিধা পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে) ভাবারও একটি আশঙ্কা রয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য (প্রিন্সিপাল) যিনি, তিনি যদি বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত না থাকেন, তথ্যসমৃদ্ধ না হন, তবে তো তাঁকে নির্ভর করতে হবে কোনো না কোনো প্রতিনিধি (এজেন্ট)-এর উপর। এজেন্ট এক্ষেত্রে সাধারণভাবে দায়বদ্ধ থাকে তার উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা সমষ্টির উপর—ফলে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিভিন্ন পর্যায়ের এজেন্সি। মুখ্য যিনি তিনি থাকেন প্রক্রিয়ার বাইরে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে। বর্তমানে উন্নয়নের অভিমুখ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে জনগণকে যাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে পঞ্চায়েত প্রশাসন। পঞ্চায়েত নেতৃত্ব এ বিষয়ে সজাগ থাকবেন। আত্মীকরণ করবেন পরিস্থিতির গুরুত্ব। মানুষের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে নতুন এই সামাজিক স্তরবিন্যাসের সম্ভাবনা ব্যর্থ করবেন। শুধুমাত্র যান্ত্রিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন নয়, অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠা। আত্মবিশ্বাসনির্ভরতা এসবের সঙ্গে যুক্ত থাকে ভাবাবেগ। স্বাভাবিকভাবেই প্রগতিশীল মতাদর্শ ও মানবতাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হলে তবেই সেই ভাবাবেগকে সঠিকপথে পরিচালনা করা সম্ভব।

লক্ষণীয় যে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে সমতালে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটেনি। বলা যেতে পারে, বিষয়গত পরিবর্তনের সাথে সাথে বিষয়ীগত পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয়টা, ধীর লয়ে ঘটে থাকে। রাতারাতি পরিবর্তন ঘটে না। এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' নিবন্ধের 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলার' কথা আমাদের অনেকেরই মনে আছে চারপাশে নতুনের মাঝখানে পুরানো তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়।

একথা মনে রেখেও আমাদের ভাবা দরকার যে অর্থনৈতিক জীবনের মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধ ও উন্নত সাংস্কৃতিক মান গড়ে তোলার জন্যও উদ্যোগ অত্যাবশ্যক। আজকে গ্রামীণ জীবনে যে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠছে, তাঁদের মধ্যেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল সমাজ সচেতনতা ও উন্নত সাংস্কৃতিক মান উদ্‌বুদ্ধ করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বলা বাহুল্য, ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো পালটাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে। যার ফলে গ্রামীণ জীবন এখন অনেক বেশি জঙ্গম। তার সামাজিক গতিশীলতা বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বিদ্যুতায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে নাগরিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সুযোগও সর্বত্র সমানভাবে না হলেও আগের তুলনায় অনেকাংশে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য ও দূরত্ব বহুলাংশে কমেছে। শক্তিশালী বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম এই দূরত্ব ঘোচাবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সবকিছু দিক বিচারে একথা বলা যায় যে, সামগ্রিকভাবে যোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাতাবরণে গ্রামীণ মানুষের আচরণগত ও চিন্তাগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হবে। গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মানবিকতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ নতুন মানব সমাজ গড়ার পথ প্রশস্ত হবে। যার মাধ্যমে সামাজিক সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য অনেকাংশে দূর করা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম করার সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যতের প্রত্যাশা সফল হবে।

লেখক : অধ্যাপিকা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

খড়িমাটি শিল্প (মহম্মদ নগর)

উন্নয়নের আলোকে বীরভূম

তপন চৌধুরী

প্রস্তাবনা

দেশের কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের একটি জেলাকে বেছে নিয়ে তার উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা প্রথমেই যে সমস্যাকে সামনে আনে তা হল—এ আলোচনা বিচ্ছিন্নভাবে হতে পারে কিনা। বীরভূম ভারতের একটি নির্দিষ্ট এলাকার একটি জেলা। অবশ্যই তার ভৌগোলিক গঠন, তার অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট, জনবৈচিত্র্য, এসবের কিছু নিজস্বতা থাকবে। আছেও। এটাই স্বাভাবিক। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব বৈচিত্র্যের মূল্যও কম নয়। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে জেলাটি বৃহত্তর ভারতের সমাজ-অর্থনীতির অঙ্গ। ফলত দেশের সামগ্রিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এ জেলার বৈশিষ্ট্যও জড়িত, তার বিকাশের সমস্যাদিও একইভাবে দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। পরিসর বিচারে এর মধ্যেও জেলা বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নিয়ে আলোচনার প্রয়াস থাকবে এ নিবন্ধে।

শান্তিনিকেতনে বেঙ্গল অম্বুজার উপহার—উপবন শিলান্যাসের পর মঞ্চে হর্ষ নেওটিয়া, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। উন্নয়নের জন্য গৃহীত জেলাগত পরিকল্পনাও এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। আপাত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সত্ত্বেও দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসে কেন্দ্রিকতা স্পষ্ট। আর্থিক ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতা আরও প্রকট। কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের সাংবিধানিক বিন্যাস রাজ্যের, ফলত জেলার উন্নয়নে রসদে টান ধরায়।

আলোচ্য জেলা বীরভূমের সমস্যা রাজ্যের অনেক জেলা থেকেই অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। এটি রাজ্যের পশ্চাৎপদ জেলার একটি। প্রাকৃতিক সম্পদ জেলার নেই তা নয়। মাটির নিচের ব্ল্যাকস্টোন, চুনাপাথর, চিনামাটি সুবিদিত। সাম্প্রতিক সমীক্ষা জেলার কয়েকটি ব্লক এলাকা জুড়ে উৎকৃষ্ট কয়লার অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেছে। রয়েছে বনজসম্পদ। পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা নদীগুলির জলস্রোত মূলত বর্ষাকালীন হলেও এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহারযোগ্যতার সম্ভাবনা এনে দেয়। এসব সত্ত্বেও আধুনিক শিল্পের মানচিত্রে এ জেলার নাম চিহ্নিত হয়েছে অতি সম্প্রতি। তবুও সম্ভাবনা রয়েছে সঠিকভাবে বাছাই করা শিল্পের, সম্ভাবনা রয়েছে কৃষির উন্নতির। অনস্বীকার্য, সাতের দশকের শেষ দিক থেকে বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার প্রবর্তন, ফলত গ্রামীণ বিকাশের গণমুখী কর্মসূচিগুলিকে রূপায়ণে গণউদ্যোগ, সমাজের অর্থনৈতিক-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে-থাকা মানুষের, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী কর্মজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন বিকাশের ক্ষেত্র কিছুটা তৈরি করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণের নিরিখ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আলোচনা পূর্বতন ধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। শুধুমাত্র কৃষি, শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণগত পরিবর্তনই আজ একমাত্র বিবেচ্য নয়। প্রচলিত রীতির মাথাপিছু আয় বিচারের ধারাও অপ্রতুল। উন্নতির মানবিক উপাদানগুলি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জীবনবিকাশের একান্ত অপরিহার্য দিকগুলির প্রাপ্যতা, গণতান্ত্রিক বাতাবরণের বিকাশ, মানুষের বিশেষভাবে অবহেলিত অংশ, 'অর্ধেক আকাশ' হয়েও সমস্যা, অবহেলার ধূম্রাচ্ছন্ন আকাশ, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান—এগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পেয়েছে।

বিকাশের শেষোক্ত দিকগুলি বিচারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'মানবোন্নয়ন প্রতিবেদন' উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই প্রতিবেদনকে অবলম্বন করে জেলাগুলির বিভিন্ন দিককে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান, যা হবে ব্লক ও গ্রামপঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ব্যষ্টিগত আলোচনার সহায়ক, প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এ কাজ এখনো বাকি।

বর্তমান আলোচনায় 'প্রতিবেদন' পরিবেশিত তথ্যগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত উল্লেখ ছাড়া (reference) ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও রয়েছে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকাশিত 'ইন সার্চ অফ এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স্' ও 'টুওয়ার্ডস এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট'—রিপোর্ট এ বিষয়ে বিশেষ সহায়ক।

জেলার ভৌগোলিক ও অবস্থানগত দিক : দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম জেলা বীরভূমের বিশ্ব-মানচিত্রে অবস্থান ২৩°৩২′—২৪°৩৫′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°২৫′—৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। প্রশাসনিকভাবে বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের দুমকা জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা। পূর্বে বর্ধমান জেলা ও মুর্শিদাবাদ। দক্ষিণে বর্ধমান। আকৃতি অনেকটা বিপরীতভাবে স্থাপিত দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আকৃতি উত্তরদিকে ক্রমশ সরু হয়ে গিয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় একশত কিলোমিটার হলেও পূর্ব-পশ্চিমে এই দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতি ৮০ কিমি থেকে ৮ কিমি পর্যন্ত।

রাঢ় এলাকাভুক্ত এই জেলার প্রাকৃতিক গঠন-বৈচিত্র্য রাঢ়-ভুক্ত মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়ার সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত। খয়রাশোল, রাজনগর, দুবরাজপুর, সিউড়ি, মহম্মদবাজার ও রামপুরহাট থানা এলাকাকে নিয়ে গঠিত পশ্চিমাংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অভিক্ষিপ্ত (Projected) ছোটনাগপুর মালভূমির ভূমিদেশে অবস্থিত। এই অভিক্ষিপ্ত অংশ পূর্ব দিকে ক্রমশ তরঙ্গায়িত রূপ পেয়েছে। পশ্চিমদিকের উচ্চভূমি কঠিন বস্তুর ঘর্ষণে সৃষ্ট স্ফটিক প্রস্তরে গঠিত

(Archaeans), বাকি অংশগুলি গন্ডোয়ানার পাললিক লালমাটির দ্বারা পূর্ণ। পূর্ব-দক্ষিণাংশে লাভপুর, বোলপুর এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু সমতলভূমি।

বীরভূম মূলত গ্রীষ্মপ্রধান। জলীয় বাষ্পেরও আধিক্য রয়েছে। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সময়গুলিতে বৃষ্টিপাত মূলত সুসমবণ্টিত। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শীতকাল। গ্রীষ্ম মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল, যার রেশ পরবর্তী দুমাসও থাকে। বৃষ্টিপাতের ৭৮ শতাংশই ঘটে জুন-সেপ্টেম্বর সময়কালে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিভিন্ন বছরে বৃষ্টিপাতের তারতম্য খুব বেশি উল্লেখ্য নয়।

জেলার প্রধান নদ-নদী ময়ূরাক্ষী, অজয়, পাগলা, বাঁশলৈ, দ্বারকা, মণিকর্ণিকা, কোপাই, বক্রেশ্বর, হিংলো। এছাড়াও রয়েছে কিছু শাখানদী ও প্রচুর কাঁদর। নদীগুলির গতিধারা সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূগঠন অনুযায়ী বিচিত্র। গতিপথ ফলত ভিন্নমুখী। উত্তরের নদী পাগলা ও বাঁশলৈ উত্তর থেকে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত। অপর নদীগুলি পূর্ব থেকে চলে গেছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। দ্বারকা নদীর রামপুরহাট থানা এলাকা থেকে পঃ-পূর্বগামী গতিপথ পরবর্তী ধাপে ময়ূরেশ্বর থানা এলাকার প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে মহঃবাজার থানার উত্তর থেকে পূর্বমুখী হয়ে গেছে। মালভূমি, নদী ও কাঁদরের অবস্থিতি রুক্ষ মাটিতেও চাষের কিছু অতিরিক্ত সুযোগ চাষীদের যোগায়।

নদ-নদীগুলি সবই ছোটনাগপুরের পার্বত্য এলাকা থেকে উৎপন্ন। ফলত ছোটনাগপুরের মালভূমি এলাকায় বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নদীর জলধারা যুক্ত। বর্ষাকালে খরস্রোতা। বাকি সময়ে প্রায় শুকনো। প্রধান নদী ময়ূরাক্ষী দেওঘরের পূর্বে ত্রিকূট পাহাড়ের নিকট থেকে উৎপন্ন হয়ে ঝাড়খন্ডের আমজোড়া গ্রামের কাছাকাছি জেলার অধুনা খটঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং জেলার ভৌগোলিক এলাকা পরিক্রমা করে রামনগরের কাছে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করেছে। গতিপথে মিলিত হয়েছে কুয়ে ও দ্বারকা নদীর সঙ্গে।

সর্ববৃহৎ নদ অজয় জেলার সমগ্র দক্ষিণাংশে প্রবাহিত। বর্ধমান ও বীরভূমের সীমারেখা চিহ্নিত করেছে এই নদ। হাজারিবাগের উত্তর-পূর্বের চাকাই পর্বত এর উৎপত্তিস্থল। কাটোয়ায় নদটি ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বনজ সম্পদ : পুরনো নথিপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী অতীতে বীরভূম ছিল মূলত জঙ্গলাকীর্ণ। যদিও দুই শতাব্দী পিছিয়ে গেলে সে সময়টায় বনভূমি কতটা এলাকা জুড়ে ছিল তার হিসাব মেলে না। পরবর্তী সময়ে কৃষিকার্যের প্রসার, লাক্ষা ও নীল চাষের প্রবর্তন বনভূমিকে সঙ্কুচিত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশও। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সাল থেকে বনভূমি বৃদ্ধির কিছু একান্তই অপ্রতুল পরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোট ৮০৬৫ একর জমিতে বনসৃজন হলেও আগুন লাগা, বনভূমিতে পশুচারণ ইত্যাদি তার অনেকটাই নষ্ট করে দেয়। ১৯৬৯-এ বনভূমি ছিল ১৫৫ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে। একে এলাকাগতভাবে মূলত ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল বোলপুর, সিউড়ি, রাজনগর, মহঃবাজার ও রামপুরহাট সংলগ্ন অঞ্চল। সাতের দশকের মাঝামাঝিতে বনভূমির পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১৩৭ বর্গকিলোমিটারে। উল্লেখযোগ্য, জাতীয় বননীতি অনুযায়ী ২০ শতাংশ স্থান বনভূমিতে আবৃত থাকা ঘোষিত লক্ষ্য হলেও এই পরিমাণ মোট জমির ৩ শতাংশ মাত্র। ছয় ও সাতের দশকে নতুন সৃষ্ট বনভূমি চরিত্রগত দিক থেকেও ছিল আলাদা। প্রাবল্য ছিল পণ্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দ্রুত বেড়ে ওঠা গাছগাছালির। বাণিজ্যিক দিক থেকে এতে কিছুটা সুবিধা হলেও পরিবেশগত সাযুজ্য কতটা রক্ষিত হয়, তা তর্কাতীত নয়।

বনভূমি প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হয় আটের দশকে বনদপ্তর গৃহীত সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প। পরবর্তী স্তরে নয়ের দশক থেকে এই প্রকল্পের সঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েত ও এলাকার মানুষকে যুক্ত করে বনরক্ষা, বনসৃজনে উৎসাহ সৃষ্টি, বন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবস্থা চালু হয়। এতে অসাধু ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টির ফলে বন নিধন, বনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার—এগুলি রোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

বনভূমি প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হয় আটের দশকে বনদপ্তর গৃহীত সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প। পরবর্তী স্তরে নয়ের দশক থেকে এই প্রকল্পের সঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েত ও এলাকার মানুষকে যুক্ত করে বনরক্ষা, বনসৃজনে উৎসাহ সৃষ্টি, বন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন পরিচালনার ক্ষেত্রে যৌথ ব্যবস্থা চালু হয়।

এইসব উদ্যোগ, বিশেষ করে বনসৃজনে পঞ্চায়েতের ইতিবাচক ভূমিকার ফলে বনভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১-০২ সালে জেলার মোট সংরক্ষিত বনভূমি ও সরকারি সুরক্ষাযুক্ত বনভূমির আওতায় আসে যথাক্রমে ৭৫৮.৮৮ হেক্টর ও ৬৪৪৬.৮৫ হেক্টর জমি। এছাড়াও শ্রেণি-বিভাজনহীন রাজ্যগত বনভূমি হয় ৮৭২০.৮৪ হেক্টর জমিতে। সব মিলিয়ে বনভূমি ওই

সময় ১৫,৯২৬.৫৮ হেক্টর বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিবেশরক্ষা, হঠাৎ 'হড়পা' বান প্রতিরোধ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনের তুলনায় এখনো তা অপ্রতুল।

খনিজ সম্পদ : বীরভূমের বিস্তৃত এলাকার ভূগর্ভে রয়েছে বাণিজ্যিক-অমূল্য কালো পাথরের স্তর, কয়লা, লৌহ আকর, চুনা পাথর, চায়না ক্লে, অল্পবিস্তর আরও অনেক ধরনের সম্পদ। এসবের যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহার উন্নয়নের নতুন নতুন পথ করে দিতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগ হলেও তা বিরাট নয়। কয়লা এখনো সম্ভাবনার তুলনায় বাস্তবে অব্যবহৃত। জেলা এখনো কৃষিনির্ভর হিসাবেই চিহ্নিত।

পাথর ভাঙ্গাই শিল্প (পাঁচামি)

জনবিন্যাস : ২০০১ সালের জনগণনায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জেলার মোট লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত ৪৬ জন। পুরুষ ১,৪৫,৭৫০ জন, মহিলা ১৪,৬৬,৭৮১ জন। লিঙ্গ অনুপাত ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪৯ জন। তফসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসী লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২,১৬, ৯২৫ (মোট জনসংখ্যার ২৯.৫১ শতাংশ) ও ৫৬,৮৫৪ (মোট জনসংখ্যার ৬.৭৪ শতাংশ) জন। তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসংখ্যা রামপুরহাট মহকুমায় এবং আদিবাসী সিউড়ি সদর মহকুমায় তুলনামূলকভাবে বেশি। সদর মহকুমায় আদিবাসী ৯.০৫ শতাংশ। অধিবাসীদের ৯০.৫৭ শতাংশই অর্থাৎ মোট ২৭,২৮,৪৩৮ জন গ্রামে বাস করেন। শহরবাসী ২,৮৪,১০৮ জন (৯.৪৩ শতাংশ)। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জন-ঘনত্ব ৬৬২.৬৮। এই দশকে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১.৭৭ শতাংশ। জন্মের হার (এক দশকে) ১৯৯১-এর জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২২.৮ শতাংশ। সাধারণ পুনরুৎপাদনের হার (জি এফ আর) ৯৪.৫৪। রাজ্যের হার ৭৮.৪০ থেকে শতাংশ হারে বিচ্যুতি (+) ২০.৫৮। তুলনামূলক অবস্থান ৭ম স্থানে। এসময় ১৫—৪৯ বছর বয়ঃক্রমের মোট ৭২৬৮৯৭ জন নারী, জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই হিসাব। ২০০১-র জনগণনায় বয়ঃক্রম অনুযায়ী জনসংখ্যার বিন্যাসের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
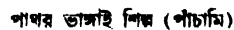
বীরভূমে ২৪৬৭টি মোট গ্রামের মধ্যে জনবসতি রয়েছে ২২৩২টিতে। ১৯টি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত ১৬৭টি। নলহাটি পৌরসভার মর্যাদা পাওয়ার পর ২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ওই পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত। পূর্বতন সংখ্যা ছিল ১৬৯টি। মোট পৌরসভা ৬টি।

১৯৯১-এ গ্রাম ও শহরবাসীর হার ছিল যথাক্রমে ৯১.০২ শতাংশ ও ৮.৯৮ শতাংশ। এ সংখ্যা শতকরা হিসাবে কমে গেছে। ২০০১-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই হার হয়েছে ৮.৫৮। সারা রাজ্যে এই হার এক দশকে ২৭.৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.০৩ হয়েছে। জেলার ক্ষেত্রে রাজ্যগত হারের সঙ্গে শতকরা হারে বিচ্যুতি (—) ৬৯.৩৯। নগরায়নের ক্ষেত্রে কলকাতা ও শিলিগুড়িই এখনও প্রধান গুরুত্বের। জেলায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পানাগড়-মোড়গ্রাম হাইওয়ে সহ অন্যান্য ভাল রাস্তাকে কেন্দ্র করে কিছু গঞ্জ গড়ে উঠলেও শহরে তার প্রতিফলন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। শহরের কর্মজীবীর হার ১৯৯১ থেকে ২০০১-এ জেলায় ৭.৪৭ থেকে ৭.৪৫ হওয়ায় (—) ০.০২ শতাংশ কমে গেছে।

সামগ্রিক জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ-নারীর অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি বর্তমান সময়ে নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বীরভূমে ১৯৯১-এ হাজার পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৯৫০। ২০০১-এ তা ৯৪৯। সামান্য হ্রাস পেলেও তা একান্তই নগন্য। এ ব্যাপারে একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিতে আসে। আদিবাসীর মধ্যে এই অনুপাত প্রায় ১ : ১। কোথাও কোথাও তুলনামূলকভাবে নারীর সংখ্যা বেশি। যেমন নলহাটি ২নং ব্লক (১ : ১.১৬), রামপুরহাট ২নং ব্লক (১ : ১.০৫)। এই অন্যথার কারণ কী তার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কৃষি : জনসংখ্যায় প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ, মোট উৎপাদনের তুলনামূলক অংশ বিচারে কৃষিই উৎপাদনের প্রধানতম ক্ষেত্র। কৃষিদপ্তর প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৯-৫০ সালে মোট কর্ষণযোগ্য জমি ছিল ৯,৬৯,৪০০ একর। স্বাধীনতার পরও দীর্ঘদিন চাষের জমির বেশিরভাগই ছিল এক ফসলী। অপেক্ষাকৃত রুক্ষ মাটির কয়েকটি থানা এলাকায় কৃষি উৎপাদন ছিল খুবই কম। কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত ক্ষেতমজুরের কর্মদিবসের ও মজুরির পরিমাণও ছিল জীবন নির্বাহের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। গরিব কৃষকের আর্থিক অবস্থাও ছিল ভীষণভাবে সংকটাকীর্ণ।

১৯৬১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী জেলায় কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা ছিল ৪,৫১,৩১৪, যা জনসংখ্যার ৩১.২১ শতাংশ। এর মধ্যে চাষে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ১৩.৬৩ শতাংশ। কৃষি মজুর ৯.৫৫ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ হয় কৃষিজীবী, নয়তো কৃষিমজুর—কোনো না কোনোভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। মোট কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ৭৬ শতাংশ। যদিও রাজ্যগত গড় তুলনামূলকভাবে অনেক কম—৫৪ শতাংশ। ১৯৬১-৭১ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে চাষির শতকরা হার ৪৩.৭ থেকে কমে দাঁড়ায় ৩৬.৯০-এ। স্পষ্ট, এ সময়ে অনেকেই জমি হারিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃষি মজুরের হার ৩০.৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪১.৮০ শতাংশ। হ্রাস পায় অপরাপর অংশের শ্রমজীবী মানুষের হারও। ১৯৬১-তে এই হার ২৫.৭, ১৯৭১-এ ২১.৩০।

ছয়ের দশকে কৃষিক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আসে। তবে তা মূলত জৈব প্রযুক্তিগত। এ সময়কালের প্রথম দিকে নিবিড় কৃষি এলাকা প্রকল্প (Intensive Agricultural Area Programme) ও পরবর্তী স্তরে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি কর্মসূচির (High Yielding Varieties Programme) অধীনে আনা হয় মোট এলাকার এক-পঞ্চমাংশ। শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের উচ্চফলনশীল ধান ও গমের চাষ। অধিকতর জমি সেচের আওতায় আনা হয়। রবি ও খারিফ চাষের জন্য ব্যবহৃত হয় নদী থেকে জলোত্তলন, নদী উপত্যকা প্রকল্প, গভীর নলকূপের ব্যবহার, অগভীর ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, শ্যালো টিউবওয়েলের ব্যবহার। ১৯৬৮-৬৯ সালে মোট সেচসেবিত হয় রবি চাষের ক্ষেত্রে ৫৪,৮১৭.৬ এবং খারিফের ক্ষেত্রে ৩,৭১,৫০৪.৪ একর জমি। এই সেচ ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ১৯৫৫-র জুলাই মাস থেকে চালু হওয়া ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের তিলপাড়া জলাধার। তিলপাড়া ব্যারেজের জল সরবরাহের প্রধান খাল, শাখা খাল ও প্রশাখা খাল এবং নালার মোট দৈর্ঘ্য ২১৬.৭১ কিমি, ১৪৭.০৭ কিমি, ১৬৬৪ কিমি ও ৩৯৩১ কিমি। সেচসেবিত জমি ১,৬০,৯৩১ হেক্টর।

এছাড়াও সংযুক্ত হয়েছে ১৯৮৫ সাল থেকে চালু হওয়া বহুমুখী 'ময়ূরাক্ষী জলাধার প্রকল্প', অজয় ও শালনদীর অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে হিংলো সেচ প্রকল্প, গত দুই দশকে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত

গভীর নলকূপ

ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা। ময়ূরাক্ষী কম্যান্ড এরিয়ায় ২০০০-০১ সালে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মোট ২৩,৬২৫ হেক্টর জমিতে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০১-০২ সালে মোট ২৭৬.৩৯ হাজার হেক্টর জমি সেচসেবিত। এস আই পি আর ডি প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০০০-০১ সালে জেলার মোট জমির মধ্যে সেচসেবিত জমির অংশ ৮১.০৬ শতাংশ। রাজ্য গড় থেকে বিচ্যুতির হার + ৭০.২২। অবস্থান ৩-এ।

কৃষি উৎপাদনের মধ্যে জেলায় প্রধান ধান। এর মধ্যে রয়েছে আউস, আমন ও বোরো। এছাড়াও রয়েছে গম, বিভিন্ন ধরনের দানা শস্য, সরষে, অন্যান্য তৈলবীজ। আলু, পাট, এগুলিও রয়েছে। ধানের উৎপাদন ১৯৯৮-৯৯ সালে ১১৮৭.৮ হাজার টনে পৌঁছায়। ২০০১-০২ সালে সামান্য কমে যায়। এই হ্রাস আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে বলে আপাতভাবে মনে করা যেতে পারে। ২০০১-০২ সালে আউস, আমন ও বোরোর উৎপাদন যথাক্রমে ১৫.৬, ৯১২.০৩ ও ২২৯.৮ হাজার টন। গমের উৎপাদন ২০০০-০১ সালে ৭৭.৭ এবং পরবর্তী বছরে ৭১.৮ হাজার টন। দানাশস্য সহ মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২৪৭.৯ হাজার টন। আলুর উৎপাদন জেলায় উল্লেখ্য। ২০০১-০২ সালে মোট ২৭৩.২ হাজার টন আলু উৎপাদিত হয়। ওই বছর আখের উৎপাদন ৪৭.৭ হাজার টন।

২০০০-২০০১-এর পূর্ববর্তী দুবছরের তুলনায় ওই বছর শস্য নিবিড়তা (cropping intensity) জেলায় হ্রাস পায়। পূর্ব বছর ছিল ১৪৩। উল্লিখিত বছরে হয় ১৩৬, যখন রাজ্যে তা ১৬৮। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওই সময়ের খরাজনিত পরিস্থিতির জন্যই এই হ্রাস। অধিকতর নিবিড়তাকে অধিকতর কৃষি উন্নয়নের নিরিখ হিসাবে গণ্য করলে, এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত সময়ে জেলায় শতাংশের বিচারে বিচ্যুতি (—) ১৯.০৫। বীরভূমের অবস্থান ১৪-তম, প্রাপ্ত নম্বর ৮.১০। উৎপাদনশীলতা বিচারে, ধানের উৎপাদন ২০০১-০২ সালে হেক্টর প্রতি ২৯৩৭ কিলোগ্রাম। আউস, আমন ও বোরোর উৎপাদনশীলতার হার যথাক্রমে ২৪১১, ২৯৬১ ও ২৮৮৫ কি গ্রা। গমের উৎপাদনশীলতা ২৬৪৬ কি গ্রা। সর্বপ্রকার খাদ্যশস্যের উৎপাদন হেক্টর প্রতি দাঁড়ায় ২৮৩২ কি গ্রা। আলু, আখ ও আদার উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ২১৬৬৬, ৫৩৪১৯ কি গ্রা, ২১০২ কি গ্রা। ধান, গম, ছোলা, সরষের উৎপাদনশীলতার হার রাজ্যের হারের থেকে বেশি। (গত পাঁচ বছরে চাষের ক্ষেত্র, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতার পরিবর্তনের জেলাগত চিত্র) সারণি-১

উৎপাদন ও সুসম বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন ছিল শস্যের ধরন পরিবর্তনের। জলের সাধারণ অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সেচনির্ভর শস্যের চাষ-কম গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

প্রতি একর জমিতে সারের ব্যবহার জেলায় বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। ১৯৯৫-৯৬ সালে সারের ব্যবহার ছিল ৭০.৪৯ কেজি। ২০০০-০১ সালে তা হয়েছে ৮৭.৯৩। বিচ্যুতির হার + ৯.৫০। জেলার স্থান ৮-এ। প্রাপ্ত নম্বর ১০.৯৫। উল্লেখযোগ্য, ২০০০-০১-এ সারা রাজ্যে ব্যবহারের গড় ৮০.৩০। এ সময়ে জেলায় মোট রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৬৪.৬ হাজার টন।

অনুসঙ্গ : কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য প্রয়োজন গার্হস্থ্য প্রয়োজনের আনুসঙ্গিক দিকে নজর দেওয়া। মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ইত্যাদির চাষ বৃদ্ধি। এক্ষেত্রেও উন্নতি লক্ষ্যণীয়। ১৯৬১ সালে জেলায় মোট প্রাণিসম্পদ ছিল ১১,১৩,৫১৫টি। গবাদিপশু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শূকর ও ঘোড়ার সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭৭০৯৫টি, ৩৩৪৪৯টি, ৭০২৭৬টি, ৩১২৩০১টি, ১৬৫০০টি ও ৩৭৬৫টি এবং অন্যান্য ১২৯টি। এ সময় মুরগি ও হাঁসের সংখ্যা ছিল ৪১৬৭৩৬টি ও ২৮০০৩৭টি। মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে ১৯৬৬-৬৭তে মোট ২০টি মৎস্যচাষী সমবায় কাজ করতো। সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৪৩।

সারণি-১

ভিত্তি বছর ১৯৭১-৭২, বন্ধনীতে ভিত্তি ১৯৮১-৮২ ধরে

বছর	এলাকা		উৎপাদন		উৎপাদনশীলতা	
	খাদ্যশস্য	সব মিলিয়ে	খাদ্যশস্য	সব মিলিয়ে	খাদ্যশস্য	সব মিলিয়ে
১৯৯৭-৯৮	৯৬.৯০ (১০৩.৮৮)	৯৪.৫৫ (১০০.৬৪)	১৬৩.৩৭ (১৮৩.৯৮)	১৬৮.৪০ (১৮০.৭০)	১৬৮.৬০ (১৭৭-১৭)	১৭৮.১১ (১৭৯.৬১)
২০০১-০২	১০৪.৮০ (১১২.৩২)	১০৭.৩০ (১১৪.২৩)	২০১.০০ (২০৭.৬০)	২১৩.৭৮ (২১২.৫০)	১৯১.৮০ (১৮৪.৮৩)	১৯৯.২৪ (১৮৬.০৩)

সূত্র : বি এ ই এস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রজাতিগত মান উন্নয়ন, খাদ্যের যোগান, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচালনা ও বিপনন, প্রশিক্ষণ গুরুত্ব পাচ্ছে। ২০০৪-এর জানুয়ারিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৪৫জন প্রাণিবন্ধু কাজ করছেন। রয়েছে বড়মঙ্গলার বড় প্রশিক্ষণকেন্দ্র। ২০০৩-০৪-এ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২৫০৪ জন। উল্লিখিত সময়ে জেলায় দেশি ও

তিলপাড়া ব্যারেজ

সংকরজাতীয় গবাদিপ্রাণি ছিল ৯৫৩৩৫৩টি ও ১১৯৬০১টি। মহিষ ৬৬৮৯৫টি, ভেড়া ১৮৬২৮১টি, ছাগল ৭২১১০৬টি, মুরগি ২৩০১৬৯টি হাঁস ১২৩৩৬৭৬টি ও শূকর ৫৭৬৮০টি। গবাদি পশুর চাষে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। রাজ্যের গড় মাথাপিছু দুধ ১২০ গ্রাম হলেও জেলার মানুষ দুধ পান প্রয়োজনের মান ২৮০ গ্রামের মধ্যে মাত্র ৬৮ গ্রাম।

শিল্প : প্রকৃতপক্ষে শিল্পের মানচিত্রে বীরভূমের আত্মপ্রকাশ বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর ১৯৮৮ সালে এটি অনুমোদন লাভ করে। ১৯৯৬-র ৩১ মে প্রতিটি ২১০ মেঃ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি ইউনিটের প্রথম ইউনিট উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে চলছে ৪র্থ ও ৫ম ইউনিটের নির্মাণপর্ব। এখানে কর্মরত পাঁচ শতাধিক কর্মচারি ও প্রযুক্তিবিদ। এর আগে আধুনিক শিল্প বলতে যা বোঝাত পূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষয় শুরু হয় ছয়ের দশক থেকে। বর্তমানে গঞ্জের প্রসার, বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে নতুন নতুন ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ ঘটছে। ২০০১ সালে বিভিন্ন ধরনের নথিভুক্ত কারখানা ১৪৬টি। এতে দৈনিক কর্মরত ৪৮১৫ জন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অধিকারে নথিভুক্ত নতুন কারখানার সংখ্যা ১৭৫, যাতে নিয়োজিত ১৫৯২ জন। ১৯৯৭-৯৮ সালে কারখানাগুলিতে ইউনিটপ্রতি কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৭.০৯। রাজ্যে এসময় এই গড় ১১২.২২। বিচ্যুতির হার (—) ৫৮.০৪, প্রাপ্ত নম্বর ৪.২০। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে এই নিয়োগ উল্লিখিত সময়ে ৬.৩২, ২০০০-০১ সালে ৬.৪৬ (রাজ্যে ৫.৯৮)। রাজ্যের তুলনায় অগ্রগতি বেশি। বিচ্যুতির হার ৮.০৮। অবস্থান ৪-এ। প্রাপ্ত নম্বর ১০.৮১।

কারখানাগুলির মূল্য সংযোজনের হিসাব ১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য সংযোজন ১৯৯৬-৯৭-এ ৭৪,১৪,০০০ টাকা হলেও পরবর্তী বছর তা মাত্র ৭০৫ হাজার টাকা। রাজ্যে এ সময় তা ১৭,৬৯,৮০০। ফলে বিচ্যুতির হার (—) ৯৪.৬৩। কর্মীনিয়োগ ও মূল্য সৃষ্টির তুলনামূলক চিত্র কারখানার বিনিয়োগ কতটা লাভজনক, তা তুলে ধরে।

এসব সত্ত্বেও বাস্তব বিচারে জেলায় শিল্প সম্ভাবনা নেই তা নয়। ভূগর্ভের কয়লা, যা যথেষ্ট উৎকৃষ্টমানের উত্তোলন, চায়না

ক্রের ব্যবহারের মাধ্যমে নানা ধরনের সৌখিন জিনিষ তৈরি করা, এসবের সঙ্গে সঙ্গে মূল গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কৃষিজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার এবং এগুলিকে শিল্পের উপকরণ হিসাবে কাজে লাগানো। আলু, চালের আবরণ, আদা এগুলি শিল্প উপকরণ হতে পারে। প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনার। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনগর সিসলফার্মকে কেন্দ্র করে চিরাচরিতভাবে না ভেবে সিসলকে ওষুধের উপকরণ হিসাবে ভাবা যেতে পারে। জেলার তাঁত ও তসরশিল্প বর্তমানে প্রায় নিঃশেষিত হলেও এগুলিকে উন্নত করা, মূলধন সরবরাহ, উৎপাদিত সামগ্রি বাজারজাত করার পরিকল্পনা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রথম থেকেই বর্জ্য পদার্থকে উপজাত সামগ্রি তৈরি করার কাজে লাগালে আহমদপুর চিনিকল অধিকতর বলশালী হতে পারতো। পেস্টবোর্ড অ্যালকোহল ইত্যাদির কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব ছিল।

ইতিমধ্যে শিল্পচিত্রকে পরিবর্তিত করার উদ্যোগও চলছে। গড়ে উঠেছে পাইপ তৈরি, শিল্প তৈরি ইত্যাদির কিছু প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন পর্ষদ ইলামবাজার বোলপুর সড়কের দুপাশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে চলেছে।

শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান : নানাবিধ গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষভাবে ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ গরিব মানুষের অবস্থার যে পরিবর্তন এনেছে, কমিয়েছে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন সমীক্ষাই তা প্রমাণ করেছে। কর্মদিবস বৃদ্ধির প্রভাবও আয়ের ওপর পড়েছে। গ্রামীণ মানুষের নিয়োগ মূলত কৃষিক্ষেত্রে। পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কৃষিতে মজুরি টাকার অঙ্কে, ১৯৯০-৯১ সাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় তা ক্রমবর্ধমান। জেলার ১৯৯০-৯১ সালে এই মজুরি ছিল ২০.২৫। ২০০০-২০০১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৫১.৭৯-এ। রাজ্যগতভাবে এই সময়কালে ২১.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৫.৯৭। জেলায় এই সময়কালে বৃদ্ধির হার ১১.৫০ শতাংশ। জেলার অবস্থান ৫-এ। রাজ্যে এই বৃদ্ধির হার ১০.৫৯ শতাংশ। সংগঠিত কৃষক আন্দোলন কোথাও কোথাও মজুরির লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব হয়।

এছাড়াও ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ১২৩৮৪৭ জন ভূমিহীন ও গরিব কৃষকের মধ্যে ৩৮১৩৬.৮৬ একর জমি এবং ২৭৩৮৮ জনের মধ্যে ৩৮৪৭.০৫ একর অকৃষি জমি বিলি করা হয়েছে। প্রাপকদের মধ্যে চাষের জমির ক্ষেত্রে ২৮৪৪২ জন আদিবাসী মানুষ পেয়েছেন ৯৮০০.২৭ একর জমি। তপসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের ৬১,১৪৩ জন পেয়েছেন মোট ১৭৭৬৯.৯০ একর, ১১৯৩৬ জন মুসলিম কৃষক পেয়েছেন ৩২৮৪.৪০ একর, অন্যান্যদের মধ্যে ২২৩২৬ জন পেয়েছেন ৭৩১৮.৩০ একর কৃষি জমি। অকৃষিজমির মধ্যে ৬৪১৪ জন আদিবাসী মানুষ ১১২১.৬৯ একর, ১১৩৭৩ জন তপসিলি সম্প্রদায়ের কৃষক ১৪৫৫.৩৬ একর, মুসলিম কৃষকদের ৪২৮২ জন ৫৫৫.২২ একর, অন্যান্য ৫৩১৯ জন কৃষক ৭১৪.৯৩ একর জমি পেয়েছেন।

বর্গাদার হিসাবে ২০০৪-এর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছেন ১,১৩,০৫৭ জন। এদের বিভাজন—আদিবাসী বর্গাদার ১৭৩৪১ জন, জমির পরিমাণ ১৯৯৬৬.২৯ একর, তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের বর্গাদার ৪৬৫০০ জন। জমির পরিমাণ ৪৯৯০২.৮৭ একর, মুসলিম বর্গাদার ২৫২৫৪ জন, জমির পরিমাণ ২২৭০৬.৯২ একর, অন্যান্য অংশের বর্গাদার ২৩৯৬২ জন। এদের জমির পরিমাণ ২১৬১৮.৫৮ একর।

বর্গাদার হিসাবে ২০০৪-এর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছেন ১,১৩,০৫৭ জন। এদের বিভাজন—আদিবাসী বর্গাদার ১৭৩৪১ জন, জমির পরিমাণ ১৯৯৬৬.২৯ একর, তফসিলভুক্ত সম্প্রদায়ের বর্গাদার ৪৬৫০০ জন। জমির পরিমাণ ৪৯৯০২.৮৭ একর, মুসলিম বর্গাদার ২৫২৫৪ জন, জমির পরিমাণ ২২৭০৬.৯২ একর, অন্যান্য অংশের বর্গাদার ২৩৯৬২ জন। এদের জমির পরিমাণ ২১৬১৮.৫৮ একর।

বর্গাচাষের ক্ষেত্রে মালিকানা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভূমিহীনদের হাতে জমি পৌঁছানো, চাষের অধিকারে স্থায়িত্ব অবশ্যই কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

পরিকাঠামো : শিল্পোন্নয়নে পরিকাঠামো একটি বড় বিষয়। রাস্তাঘাট তৈরি, বিদ্যুতায়ন, যানবাহনের চলাচল এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে। পানাগড়-মোড়গ্রাম সড়ক দুটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সঙ্গে জেলাকে যুক্ত করেছে। এই রাস্তা জেলায় নানানভাবেই বিরাট পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তবে, জেলায় যাতায়াতের মুখ্য অবলম্বন এখনও সড়কপথ। এছাড়াও অবশ্য রয়েছে জেলার উত্তর ও দক্ষিণকে যুক্ত করা সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের রেলপথ, নলহাটি-আজিমগঞ্জ, অন্ডাল-সাঁইথিয়া রেললাইন আর আহমদপুর কাটোয়া ন্যারোগেজ
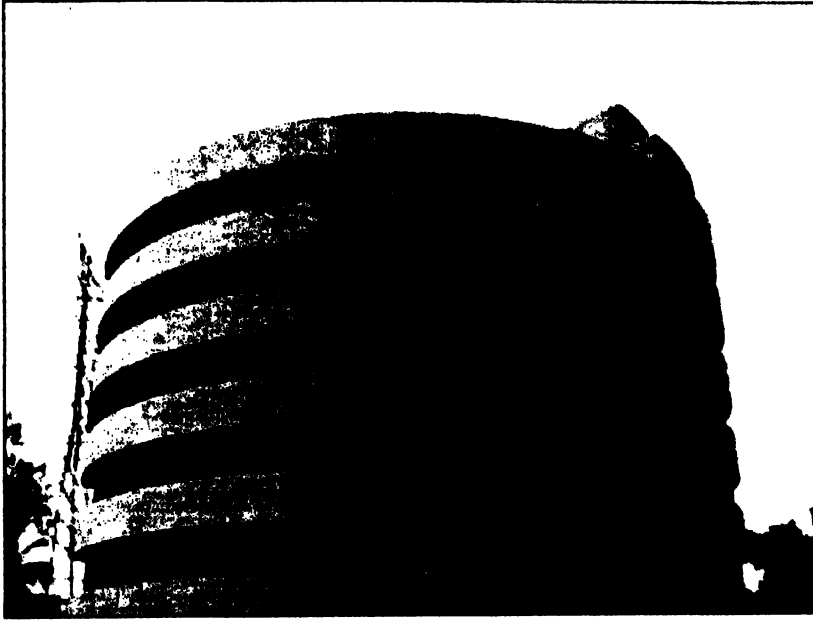
বাণিজ্যিক কেন্দ্র

রেলপথ। বর্তমানে বন্ধ থাকা ভীমগড়-পলাশথলি লাইনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে রামপুরহাট থেকে দুমকা রেললাইন স্থাপনের কাজ চলছে। তা সুসম্পন্ন হলে কিছুটা সংযোজন ঘটবে। অন্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনটি 'ডবল' করার কাজ সবে শুরু হয়েছে। সর্বসাকুল্যে রেলপথের বর্তমান দৈর্ঘ্য (পলাশথলি লাইন বাদ দিয়ে) ২০১ কিমি।

জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বিরাট এলাকায় রেল যোগাযোগ নেই। অবলম্বন অন্যান্য যানবাহন। পাথর শিল্পের বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে পাঁচামির সঙ্গে সাহেবগঞ্জ লুপের সংযোজক রেললাইনের দাবি যুক্তিযুক্তভাবেই উঠেছে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনেরও উন্নতি প্রয়োজন। প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কারণেই সদর শহর সিউড়ির সঙ্গে কোলকাতার রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি। এসব সত্ত্বেও রেলে যাত্রী ও মাল পরিবহণের বৃদ্ধি ঘটেছে।

রাস্তাঘাটেরও সম্প্রসারণ ঘটেছে। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর নিঃসন্দেহে তা অধিকতর। ২০০১-০২ সালে পাকা ও মোরামযুক্ত উভয়বিধ রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩৪৭৮.৮০ কিমি। এগুলি পি ডব্লিউ ডি (১০৪৬ কিমি) ও জেলা পরিষদের অধীনে (১৮০০ কিমি) ও পৌরসভার (৬৩২.৮০ কিমি) তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ২০০২ সালে মাল পরিবাহী মোট যানের সংখ্যা ৩৯১৪টি। এছাড়াও রয়েছে মোটরগাড়ি, জীপ (৪৩৬টি), স্কুটার ও মোটর সাইকেল (২৪৩২৫), ট্যাক্সি ও অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ পরিবাহী (৭০৩টি), অটোরিকশা (১৪টি), মিনিবাস (৭৪টি), স্টেজ ক্যারেজ (৪৩৯টি), ট্রাক্টর ও ট্রেলার (৪১৬৩টি) এবং অন্যান্য ভেহিকল ১৯৬টি। সর্বমোট সংখ্যা ওই সময় ছিল ৩৪,৪৪১টি। ভীমগড়-পাণ্ডবেশ্বর সেতু রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে জেলার যোগাযোগ সহজ করেছে।

জেলায় বর্তমানে পাকা রাস্তার অংশ ৭০.১২ শতাংশ। রাস্তার নিবিড়তা ২০০০-০১ সালে ৭২৩.৮৭, পশ্চিমবঙ্গে যা ১০৮৬.৮১। ফলে শতাংশের বিচারে বিচ্যুতি (—) ৩৩.৩৯। অবস্থান ১২তম। প্রাপ্ত নম্বর ৬.৬৬।

অন্যান্য ধরনের যোগাযোগের মধ্যে উল্লেখ্য ডাক ব্যবস্থা জেলায় চালু হয় ১৯১০ সালে। ১৯৪৬-এ সংখ্যা ছিল ৯৪। ২০০০-২০০১-এ এই সংখ্যা ৪৭৬, অর্থাৎ ১ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু ১৫.৮০। রাজ্যে এই সংখ্যা ১০.৭৯। ফলে বিচ্যুতির শতাংশ (+) ৪৬৪৩। বীরভূমের অবস্থানও ২-এ। ২০০১ সালে ১৭৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা রয়েছে জেলায়। দীর্ঘদিন ধরে এই সংখ্যা অপরিবর্তিত। এক লক্ষ লোকপিছু ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২০০১ সালে ৫.৭৮।

বিদ্যুৎও পরিকাঠামো বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ইতিহাস খুব দীর্ঘদিনের নয়। সিউড়ি শহরে প্রথম আলো জ্বলে ১৯৪৯ সালে। বোলপুর শহরেও এ সময় একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতায়নের কাজ শুরু করে। এসবই জেনারেটরভিত্তিক। ময়ূরাক্ষী হাইড্রেল পাওয়ার স্টেশন স্থাপনের পর সিউড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় ১৯৫৫ সাল থেকে। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জেলায় মোট ২২০৭টি জনবসতিপূর্ণ গ্রামের মধ্যে ৩৪টি বিদ্যুতায়িত হয়। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আরও ২১টি। ১৯৬৬-৬৭-তে সর্বপ্রকার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল ১,.১,৮১,১০০ কিলোওয়াট ঘন্টা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ জনজীবনের অপরিহার্য অংশ হতে শুরু করে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা হয়ে ওঠে একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৯৭৭ সালের পর নানান সমস্যার মধ্যেও প্রয়াস চলে নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের। সংযোজন হয় বক্রেশ্বর প্রকল্প। ২০০০ সাল পর্যন্ত জেলায় ৯৯.১ শতাংশ গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়। রাজ্যে এই অংশ ৭৮.০। ফলত, শতাংশ হিসাবে বিচ্যুতি ২৭.০৫। বীরভূমের অবস্থান ২-এ। মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ২০০০-০১-এ দাঁড়ায় ৭৪.১৬ কিলোওয়াটে। ১৯৯৭-৯৮ থেকে পর পর তিন বছরের তুলনায় অবশ্য এই পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্যুতির শতাংশ (—) ৪৮.৪৯। অবস্থান ৬—এ। প্রাপ্ত নম্বর ৫.১৫।

জেলার পরিকাঠামোগত অবস্থানের সংখ্যাগত অবস্থান (২০01 সালে) এস আই পি আর ডি-র তথ্য অনুযায়ী ২-এ। জেলার সূচক ১৩.৪৯। জেলার ডি ডি পি-র হিসাবে অবস্থান ১৩-তে। ফিজিকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স ও ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের অবস্থান উভয়ের পার্থক্য (—) ১১।

শিক্ষা : ১৯৭৭-এর পূর্ববর্তী স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্যোগ ছিল প্রধানত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। ফলে তা ছিল অপরিকল্পিত। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭০-৭১ সালে জেলায় সাধারণ শিক্ষার ১৮১৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চবিদ্যালয়, উচ্চতর সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় ও কলেজ ছিল যথাক্রমে ১৫৩৩টি, ১০৫, ১০৮, ৬৩ ও ৬টি। ১৯৭৫-৭৬ সালে সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২০২৬টিতে। এদের মধ্যে প্রাথমিক ১৭৭৭টি, মাধ্যমিক, উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয় যথাক্রমে ১১৮, ২০০ ও ৬৯টি। কলেজ দুটি বৃদ্ধি পায়। এদুটি হল মুচলেকা কলেজ, খুজুটিপাড়ার চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয় ও অল্পদিনেই মৃত লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজ।

১৯৭৫-৭৬-এ সাধারণ শিক্ষায় সর্বস্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,০৮,১৬৯, যার মধ্যে বিদ্যালয় স্তরে ১,৯৭,৬২৮ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১,১৭,৯৩৬ জন ছাত্র ও ৭৯,৬৯২ জন ছাত্রী—মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬ শত ২৮ জনের নাম বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হয়। কলেজ স্তরে মিলিত সংখ্যা ছিল ২২৯৩। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্স উল্লেখ করেনি, এই তথ্যে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে কিনা। সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে এসময় শিক্ষকের সংখ্যা ৫,২৩৫ জন। এদের মধ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক ৪,৬৯০ জন।

১৯৭৭-এর পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি পরিকল্পিত হয়। শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ভূমি সংস্কার, বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের ছাপ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর পড়ায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সার্বিক সাক্ষরতা প্রকল্প শিক্ষার গুরুত্বকে প্রসারিত করায় তার প্রভাবও পড়ে। বর্তমান শতকে প্রযুক্তিগত

নবম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কংগ্রেস, বিশ্বভারতী

শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হতে শুরু করে, যদিও তা পুরোপুরি সরকারি উদ্যোগে নয়। ২০০১-০২ সালে সরকার অনুমোদিত সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৫১টিতে। অনুমোদিত মিডল স্কুল, হাইস্কুল ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৩৩৫টি, ১১৬টি, ২৫৫টি ও ৭০টিতে। সাধারণ ডিগ্রি কলেজ হয় বিশ্বভারতী ছাড়া ১১টি। যুক্ত হয় স্নাতক পর্যায়ের দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বৃদ্ধি পায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয় ও শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা। এসময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাধারণ শিক্ষায় ৬,১৬,৬৫৯ জন। এদের মধ্যে প্রাথমিকস্তরে ৩,৫৭,৯৫৭ জন, প্রাথমিক পরবর্তী স্তরে (মাদ্রাসাসহ) ২,৩৫,১৯৩ জন। সাধারণ ডিগ্রি কলেজে সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৫৩৬ জনে। সাধারণ (কারিগরি সহ) বিদ্যালয়স্তরের ছাত্রছাত্রী এ সময় ১৫১৩ জন। নতুন সংযোজন কারিগরি ও ব্যবস্থাপনায় (Management) স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এ সময় ৬৮১ এবং ১৫৯ জন।

এছাড়াও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার জন্য রয়েছে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। শেষোক্তটির তিনটি মহকুমায় ৩টি শাখা আছে।

প্রথাবিমুক্ত শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০১-০২ সালে মোট ৪৭৯টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬,৩৪৬ জন। প্রথাবিমুক্ত অন্যান্য স্তরের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সময় ছাত্র ৭৩,১৮৭ জন ও ছাত্রী ৭৬,৩২৭ জন মোট ১,৪৯,৫১৪ জন।

নয়ের দশকে সাক্ষরতা আন্দোলনের জোয়ার সাক্ষরতার হারকে ৪৮.৫৬ শতাংশ (৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী) থেকে ৬২.১৬ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হয়। সংখ্যাগতভাবে ৪৫ লক্ষ নবসাক্ষরকে নিয়ে সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি শুরু হয়। আসে ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম। ৭০ হাজারের মতো শিক্ষাকেন্দ্র প্রাথমিক পর্যায়ে সাক্ষরতার আন্দোলনে যুক্ত হলেও, নানা কারণেই ১৯৯৫ থেকে গতি কিছুটা স্তিমিত হয়। কমতে শুরু করে সাক্ষরতা কেন্দ্রর সংখ্যা। মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্রসহ সাক্ষরতাকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০২৭-এ। ২০০১-০২-এ সংখ্যা হয় ২০২২। অবশ্য এই আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে এবছরই শুরু হয় ১৫৫টি রবীন্দ্র জনচেতনা কেন্দ্রের। সরকারি হিসাব অনুযায়ি সাম্প্রতিক সময়ে নিরক্ষর মানুষের বৃদ্ধির সংখ্যা ২.৫ লক্ষ, যা ২০০১-এর জনগণনার হিসাবে জেলায় মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্ধাংশ। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিএইস এবং জনগণনায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বীরভূমে ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার ৬.২ শতাংশ। অবস্থান রাজ্যে ১৪তম। পূর্বতন ১০ বছরে এই হারের পরিবর্তন হয়েছে ১৩.৬ শতাংশ। মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫২.২ শতাংশ। পরিবর্তনের হার ১৫.১ শতাংশ। পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়েরই সাক্ষরতার হার রাজ্যের গড় থেকে কম। রাজ্যের মিলিত হার ৬৯.২২। শতাংশে বিচ্যুতি (—) ১০.২০।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ি প্রথাগত শিক্ষার নিবিড়তা জেলায় ২০০০-০১ সালে ৫.৭০। ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ৫.১২। পরবর্তী বছরগুলিতে সামান্য হলেও তা বেড়েছে। রাজ্যগত নিবিড়তা থেকে (৫.৯০) তা সামান্য কম। শতকরা বিচ্যুতি ৩.৩৯। স্থান ৯ম। প্রাপ্ত নম্বর ৯.৬৬। ২০০০-০১ সালে উপযুক্ত বয়ঃক্রমের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নথিকরণের হার ৮৩.৯৬, যা রাজ্যের হারের (৭৭.৫৬) থেকে বেশি। রাজ্য থেকে শতাংশে বিচ্যুতি (+) ৮.২৫। উপযুক্ত বয়সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নথিকরণের হার ৫০.৬৭ (রাজ্যে ৪৭.০৩) শতাংশ। বিচ্যুতি (+) ৭.৭৪ শতাংশ। অবস্থান ৬-এ। উচ্চতর বিদ্যালয়ে নথিকরণের হার ৪৭.৫৩ (রাজ্যে ৪৬.৬২) শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (২০০০-২০০১) যথাক্রমে ৪৭.২১ (রাজ্যে ৫৬.৬৯) ও ৩৯.৬৫ (রাজ্যে ৪৬.৭৩) শতাংশ। বিদ্যালয়ে পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে। ২০০২ সালে ৫৫.১৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৭ সালে এই হার ছিল ৪১.২৪। শৌচাগারযুক্ত গ্রামীণ বিদ্যালয়ের হার ১৭.৬৪ থেকে ৮.২২ শতাংশ হয়েছে। এই হ্রাস ১৯৯৭-এ পরিসংখ্যান সংগ্রহের সূত্রগত ত্রুটির জন্যও হতে পারে।

স্বাস্থ্য : জনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থান বিবেচ্য। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০১ সালে জেলায় মোট হাসপাতাল ১০টি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৭৭টি, ক্লিনিক ২১টি ও ডিসপেনসারি ২৫টি। সর্বমোট ১৩৩। হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ২৩৭০। এতে নিয়োজিত ডাক্তারের সংখ্যা ২৫৪। এছাড়াও রয়েছে ৪২৮টি সরকারি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। এসময়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে ১,১৩,৭৭৬ জনকে। ১৯৭৬-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওই সময় হাসপাতাল ৮টি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৫৯টি, ক্লিনিক ২৭টি, ডিসপেনসারি ১৪টি, সর্বমোট ১০৮। মোট শয্যাসংখ্যা ১৫০২। ওই সময় পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ছিল ৩৪টি।

সংখ্যাগতভাবে চিকিৎসার সুযোগ বেড়েছে। এসব সত্ত্বেও শিশুমৃত্যুর হার এখনো উদ্বেগের কারণ। ২০০১ সালে ২৫০০ গ্রামের কম ওজন নিয়ে জন্মেছে জেলায় ২৬.৮০ শতাংশ শিশু। এ হার রাজ্যের হারের থেকে বেশি (রাজ্যের হার ২৩.৩৮ শতাংশ)। জেলার অবস্থানও ১৩তম। শিশু জন্মের পর বেঁচে থাকার হার ৩৬.২৮। অস্তিত্ব বজায় সূচক (Survival Index—2001) ০.১৫৭। শিশু মৃত্যুর হারের আধিক্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য

পরিষেবার অভাব, পরিবেশের অস্বচ্ছতা, সামাজিক রীতিনীতিগত কাঠিন্য—এগুলির দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত দক্ষতা বিচারে জেলার সদর হাসপাতাল ও মহকুমা / স্টেট জেনারেল হাসপাতালের প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৪৭ ও ৫১। গড় প্রাপ্ত নম্বর ৪৯.০। এই নম্বর রাজ্যগত মান (৫১.০) থেকে কম। জনস্বাস্থ্য বিচারে ২০০১ সালে গ্রামীণ পরিবারের মাত্র ১১.৬৪ শতাংশের শৌচাগার রয়েছে। এই সংখ্যা রাজ্যগত মানের (২৬.৯৩ শতাংশ) বহু নিচে।

গ্রামীণ ক্ষেত্রে জলসরবরাহের অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। মোট ৯৭.৩৪ শতাংশ, যা রাজ্যের অংশের (৭৭.৮৬ শতাংশ) থেকে বেশি, পানীয় জল সরবরাহের আওতায় এসেছে।

পরিবার সুরক্ষা হার বিচারে জেলা রাজ্যের হারের থেকে এগিয়ে থাকলেও হার যথেষ্ট আশাপ্রদ নয়। জেলার হার ৪২.৭৭ শতাংশ, রাজ্যের ৩৫.৩৪ শতাংশ। সুরক্ষিত মাতৃত্বের সূচক বিচারে ২০০০-০১ সালে জেলার সূচক ৪৭.৭৫। ওই সময় শিশুর জন্মের প্রাক্‌কালে মায়ের পরিচর্যার সূচক ৪৪.৮০। উভয় ক্ষেত্রেই জেলার অবস্থান রাজ্যের নিচে।

রক্তাল্পতা-ঘটিত রোগের অবস্থান বিশেষভাবে যা কন্যাসন্তান ও মহিলাদের মধ্যে প্রবল, জেলাগত চিত্র, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রাপ্তি, প্রভৃতি বিষয়ে ব্যষ্টিগত পরিসংখ্যান নির্ধারণ জরুরি। জেলার সামগ্রিক বিচারে সংক্রামক রোগের মধ্যে একুট পলিয়েলাইটিস, নিওনাটাল টিটেনাস-এ দুটির প্রাবল্য রয়েছে। এখনো রয়েছে কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ। এছাড়াও নলহাটি থানার নসিপুর গ্রামে ফ্লুরোসিসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হওয়ার পর অনুসন্ধানে জেলার কয়েকটি স্থানে জলে ফ্লুরাইডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এটি জনস্বাস্থ্য সমস্যার নতুন দিক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

নারীর অবস্থান : বিভিন্ন ধরনের কাজে নারীর অংশগ্রহণের হার নির্ণয় সুকঠিন। জনগণনা সহ অন্যান্য পরিসংখ্যান নারী অংশের কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক গার্হস্থ্য কাজের হিসাব-নিকাশ হিসাবে আসে না। এ সমস্যা বাদ দিয়ে, প্রাপ্ত সরকারি তথ্যানুযায়ী মহিলাদের শহরে মূল কাজে অংশগ্রহণের হার ২০০১ সালে ৯.১ শতাংশ (রাজ্যে ৮.৮ শতাংশ)। পূর্ববর্তী ১০ বছরে পরিবর্তনের হার ৩.৩ শতাংশ, যা রাজ্যের হারের সমান। প্রান্তিক কাজে অংশগ্রহণের হার ২০০১-এ ২.৭ শতাংশ। ১৯৯১ থেকে ২.১ শতাংশ হারে বেড়েছে। পার্শ্ববর্তী জেলা মুর্শিদাবাদে এই হার সবচেয়ে বেশি।

পুরুষের ক্ষেত্রে শহরে ১৯৯১ সাল থেকে ১.৮ হারে মূল কাজে অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০০১ সালে মূল কাজে অংশগ্রহণের হার জেলায় ৪৮.৫ শতাংশ। প্রান্তিক কাজে অংশগ্রহণের হার ৩.৫ শতাংশ। দশ বছরে পরিবর্তনের হার ৩.২ শতাংশ।

সামগ্রিক বিচারে জেলায় নারীর কাজে অংশগ্রহণের হার (১৯৯১—২০০১) ১২.৭৫ শতাংশ থেকে ১৯.৪৬ শতাংশ হয়েছে। এই হার রাজ্যের তুলনায় বেশি। শতকরা বিচ্যুতির হার ৭.৬৩ শতাংশ। জেলার অবস্থান ১০।

অতিরিক্ত জমি বিলিবন্টনে মহিলাদের অবস্থা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিলি হওয়া জমির মোট ১১,৬৫৯৮ জন পাট্টাদারের মধ্যে ৪০০৫ জন নারী পাট্টাদার যা সমগ্র ৩.৪৩ ভাগ। এছাড়াও রয়েছে যৌথ পাট্টার প্রচলন। যৌথ পাট্টা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে।

মজুরির ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প—উভয় উৎপাদনক্ষেত্রেই লিঙ্গগত ব্যবধান এখনও রয়েছে। খেতমজুরদের সংগঠিত আন্দোলন, সমান মজুরির দাবি এই হারকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করছে। অনেক ক্ষেত্রেই এলাকাগতভাবে চাষের সময় সমান মজুরি চালু হয়। তবে বিড়িসহ বিভিন্ন অসংগঠিত শিল্পে এখনো মজুরির পার্থক্য রয়েছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ধীর গতিতে হলেও বাড়ছে। ১৯৯৯ সালে মোট অংশ ১৪.২৩, তবে জেলার অবস্থান ১৩তম।

অভ্যন্তরীণ উৎপাদন : ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস্ অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স কোনো জেলার উন্নয়ন বিচারের ক্ষেত্রে নিট জেলাগত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে (এন ডি ডি পি) বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেছে। ব্যুরো প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্টস্ ২০০১-২০০২ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০০০-০১ সালে ১৯৯৩-৯৪ সালের স্থির দামের হিসাবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২৩১.৫২ কোটি টাকা। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯ এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭৮৮.৯৪ কোটি, ১৮৭৭.৬৬ কোটি, ২০০০.৬৫ কোটি, ২২৪৩.৪১ কোটি ও ২৩১৪.৮৬ কোটি টাকা। ওই সময় এন ডি ডি পি-তে জেলার অংশ হয় ১৯৯৩-৯৪-র দামস্তরের হিসাবে ২.৯৬। বিশেষজ্ঞগণ এই সময়কালের এন ডি ডি পি-র (১৯৯৩-৯৪-র স্থির দামে) হ্রাসবৃদ্ধিকে দুটি সময়কালে ভাগ করেছেন। (ক) ১৯৯৫-৯৬ থেকে ১৯৯৭-৯৮ এবং (খ) ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০০-২০০১ এই দুটি সময়কালে জেলার এন ডি ডি পি-র পার্থক্য নিম্নরূপ :

			বিকাশের হার
(ক)	সময়কাল	—	৩.৮৮
(খ)	সময়কাল	—	১.০৫
	উভয়ের পার্থক্য	—	(—) ২.৬৮

এতে দেখা যাচ্ছে (খ) সময়কালে বিকাশের হার কমেছে।

জেলায় ১৯৯৩-৯৪-এর স্থির দাম স্তরের হিসাবে টাকায় মাথাপিছু আয়ের গত ৬ বছরে বিবর্তন নিম্নরূপ :

বৎসর :	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-০১	রাজ্যগত আয়ের সঙ্গে শতাংশের বিচ্যুতি	নম্বর	অবস্থান
	৬৪৯১.৬২	৬৭০২.৪১	৭০২৪.৯৪	৭৭৪৮.৮৪	৭৮৬৫.২০	৭৭৩৮.০৭	(—) ২০.৮৬	৭.৯১	১৭

আয়ে কৃষির অংশ বীরভূমে ২০০০-০১-এ ৩৩.৮৩ যা পূর্বতন বছরগুলি থেকে কমেছে। কারখানা শিল্পজাত দ্রব্যের অবস্থান ২০০০-০১-এ ৪.৯৪ যা রাজ্যের একের তিন ভাগ।

দারিদ্র্য ও বীরভূম : "আয়গত দারিদ্র্য চিত্রের একটি অংশমাত্র"—ইউ এন ডি পি-র এই বক্তব্যের (মানবোন্নয়ন রিপোর্ট,

(৪৯.২৯ শতাংশ) ও শিশুদের যে অংশ পুরোপুরি প্রতিষেধক গ্রহণ করেনি (৬৫.১০ শতাংশ), তাদের ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত আমরা সংশোধিত জন-দারিদ্র্য সূচকের (Modified Human Poverty Index) সাহায্য নিতে পারি। এতে অভীষ্ট বস্তু বঞ্চনার (provisioning Deprivations) সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

	জন্মকালীন শিশুর কম ওজন (%) মার্চ ২০০০-০১-এর তথ্য	প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম (%)	সাক্ষরতাহীন নারীর হার	সি পি এম	রাজ্যের তুলনায় বিচ্যুতির হার	নম্বর	অবস্থান
বীরভূম	২৪.৭৩	৪৯.২৯	৪৭.৭৯	৪০.৬০	৪.০৫	৯.৬০	৯
রাজ্য	২৪.৮৯	৫২.৪০	৩৯.৭৮	৩৯.০২	—	—	—

কলম-৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য, আর সি এইচ সমীক্ষা

১৯৯৬) পরিপ্রেক্ষিতে মানব উন্নয়ন মন্ত্রক ওই বছরই সামর্থ্য দারিদ্র্য পরিমাপকের সূচনা করে (ক্যাপাবিলিটি পভার্টি মেজার, সংক্ষেপে সি পি এম)। নিম্নে সংশোধিত সি পি এম অনুযায়ী জেলার চিত্র তুলে ধরা হল। এতে তিনটি নির্দেশকেরই সমান গুরুত্ব অনুযায়ী হিসাব (২০০১-এর তথ্য অনুযায়ী) দেওয়া হয়েছে :

স্বাস্থ্য পরিষেবা বঞ্চনা, নিরাপদ পানীয় জল ও বিদ্যুৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার শতকরা হার এতে হিসাবে আনা হয়েছে। জেলার ক্ষেত্রে এইচ পি আই নিম্নরূপ :

এই হিসাব অনুযায়ী এইচ ডি আই ও ডি ডি পি-র নিরিখে (২০০১) জেলার স্থান যথাক্রমে ১২ ও ১৩। দারিদ্র্যের ক্ষেত্র,

সংশোধিত মানব উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী জেলার অবস্থান :

	ডি ডি পি সূচক	শিক্ষার সূচক	অস্তিত্বের (Survival) সূচক	মানব উন্নয়ন সূচক	বিচ্যুতির হার	নম্বর	অবস্থান
বীরভূম	০.১২৩	০.৪০৩	০.১৫৭	০.২২৮	(—) ৪৪.৪৫	(—) ৫.৫৫	১৪
রাজ্য	০.৩৪০	০.৫০৩	০.৩৮৬	০.৪১০	—	—	—

[এইচ পি আই এবং এইচ ডি আই, এস আই পি অ্যান্ড আর ডি-র হিসাব অনুযায়ী। ইউ এন ডি পি-র সব পদ্ধতি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি বলে 'সংশোধিত' বলা হয়েছে।]

বঞ্চনার অন্যান্য ক্ষেত্রকেও যুক্ত করে সি পি এন-কে আরও সম্প্রসারিত করা মানব দারিদ্র্য সূচক (এইচ পি আই) বর্তমানে প্রকৃত অবস্থা বিচারের একটি উল্লেখযোগ্য নিরিখ। এ সংক্রান্ত অবস্থানে পৌঁছানোর প্রয়োজনে 'জ্ঞান বঞ্চনা' সহ বিভিন্ন তথ্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। জেলায় ২০০১-এর জনগণনার তথ্যানুযায়ী সাক্ষরতাবিহীন মানুষের হার ৩৭.৮৪ শতাংশ এবং ০—১৫ বয়ঃক্রমের বিদ্যালয়ে না প্রবেশ করা শিশুকিশোরদের হার ২৯.৫৮ শতাংশ ধরে জ্ঞান বঞ্চনার ৩৫.০৯ শতাংশ। জেলার স্থান ১৩তম। জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বঞ্চনা ৫৭.২০ শতাংশ। জেলার অবস্থান ১২। এজন্য প্রতিষ্ঠানবহির্ভূত ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম

কর্মসংস্থান ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষেত্র, পরিকাঠামো ক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, স্বাস্থ্যক্ষেত্র ও সামাজিকভাবে সুযোগহীন ক্ষেত্রের অবস্থান (সূত্র ওই) তুলে ধরা যেতে পারে। ১ থেকে ৯নং সারণির ক্ষেত্রে মোট নম্বর ২০।

জ্ঞান	অভীষ্ট বস্তু বঞ্চনা	এইচ পি বঞ্চনা	রাজ্যের আই	প্রাপ্ত সঙ্গে বিচ্যুতির হার	অবস্থান নম্বর	(Rank)
বীরভূম	৩৫.০৯	৫০.০১	৫৯.০৯	১২.২০	+ ৮.৭৮	১৩
রাজ্য	৩২.৪০	৪৪.০৩	৫২.৬৭	—	—	—

সারণি—১ : দারিদ্র্যের ক্ষেত্র

কর্মজীবী মানুষের মধ্যে কৃষি শ্রমিকের অংশ	সংশোধিত এইচ পি আই	সংশোধিত এইচ ডি আই	মোট প্রাপ্ত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বরের হার	অবস্থান
৫.১৮	৮.৭৮	৫.৫৫	১৯.৫১	৩২.৫২	১৫

সারণি—২ : কর্মসংস্থান ক্ষেত্র

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার	মোট জনসংখ্যায় শ্রমিকের সংখ্যা	কর্মহীনতার পশ্চাৎপদতা (Incidence)	মোট নম্বর	প্রাপ্ত নম্বরের হার	অবস্থান
৯.৬৩	১০.১৭	১০.২৯	৩০.০৯	৫০.১৫	১১

সারণি—৩ : কৃষিক্ষেত্র

সার ব্যবহারের ধরন	খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা	ফসলের নিবিড়তা	সেচ অধীনতা	মোট নম্বর	শতকরা নম্বর	অবস্থান
১০.৯৫	১০.৯৩	৮.১০	১৭.০২	৪৭.০০	৫৮.৭৫	৬

সারণি—৪ : শিল্পক্ষেত্র

এস এস আই-এ ইউনিটপ্রতি নিয়োগ	কারখানায় ইউনিটপ্রতি নিয়োগ	কারখানায় গড়ে নীট মূল্য সংযোজন	মোট নম্বর	শতকরা নম্বর	অবস্থান
১০.৮১	৪.২০	০.৫৪	১৫.৫৫	২৫.৯২	১৭

সারণি—৫ : অর্থনৈতিক বিকাশ-ক্ষেত্র

মাথাপিছু আয়	ডি ডি পি-তে কৃষির অংশ	ডি ডি পি-তে শিল্পের অংশ	মোট প্রাপ্ত নম্বর	শতকরা নম্বর	অবস্থান
৭.৯১	১৪.৭৯	৩.৩১	২৬.০১	৪৩.৩৫	১৬

সারণি—৬ : পরিকাঠামো ক্ষেত্র

বিদ্যুতায়িত গ্রামের হার	মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার	রাস্তার নিবিড়তা	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা (এক লক্ষ জনসংখ্যায়)	পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস (এক লক্ষ জনসংখ্যায়)	মোট নম্বর	অবস্থান
১২.৭০	৫.১৫	৬.৬৬	১০.৪৯	১৪.৬৪	৪৯.৬৪	৬

সারণি—৭ : শিক্ষাক্ষেত্র

মোট সাক্ষরতার হার	প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি	মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি	প্রথাগত শিক্ষার নিবিড়তা	ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (প্রাঃ) ২০০০-০১	ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (মাঃ)	মোট নং	শতকরা নম্বর	অবস্থান
৮.৯৮	১০.৮২	১০.৭৭	৯.৬৬	১১.৬৭	১১.৫১	৬৩.৪১	৫২.৫৪	৩

সারণি—৮ : স্বাস্থ্যক্ষেত্র

শয্যার লভ্যতা	প্রতিষ্ঠানে প্রসব	দম্পতি সুরক্ষার হার	হাসপাতালের দক্ষতা	গ্রামীণ জল সরবরাহ	গ্রামীণ শৌচাগার	প্রাপ্ত নম্বর	শতকরা নম্বর	অবস্থান
১০.৭৩	১০.৬৫	১২.০১	৯.৬১	১২.৫০	৪.৩২	৫৯.৮২	৪৯.৮৫	৮

সারণি—৯ : সামাজিকভাবে সুযোগহীন ক্ষেত্র

কাজে নারীর অংশগ্রহণের হার	নারীর সাক্ষরতার হার—২০০১	লিঙ্গগত অনুপাত	সাধারণ উৎপাদনশীলতা ২০০১	প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ অনুপাত	সরকারি কাজে নারীর অংশ	কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তফসিলি ও আদিবাসীদের অংশ	পঞ্চায়েতে নারীর সংরক্ষণ (১৯৯৮)	মোট নম্বর	শতকরা নম্বর	অবস্থান
১০.৭৬	৮.৬৭	১০.১৬	৭.৯৪	১০.০৭	৯.৯০	৮.১৭	৯.৭৬	৭৫.৪৩	৪৭.১৪	১২

সারণি—১০ : জেলার প্রাপ্ত মোট নম্বর

অর্থনৈতিক বিকাশ	দারিদ্র্য	কর্মসংস্থান	কৃষি	শিল্প	পরিকাঠামো	নগর উন্নয়ন	শিক্ষা	স্বাস্থ্য	সামাজিকভাবে সুযোগহীন ক্ষেত্র	মোট	শতাংশ	অবস্থান
২৬.০১	১৯.৫১	৩০.০৯	৪৭.০০	১৫.৫৫	৪৯.৬৪	৬৫.৬০	৬৩.৪১	৫৯.৮২	৭৫.৪৩	৪৫২.০৬	৪৮.০৯	৯

- কলকাতার ক্ষেত্রে নির্ধারকের নম্বর ৩০, মোট নম্বর ৬০০
- অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে নির্ধারকের নম্বর ৪৭, মোট নম্বর ৯৪০

উপসংহার : জেলা হিসাবে বীরভূম দীর্ঘদিনের পশ্চাৎপদতার শিকার, গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ রয়েছে। এসব সত্ত্বেও জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ও জেলাগতভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন সম্ভাবনার আলোও যে দৃশ্যমান, একথা অনস্বীকার্য।

সহায়ক পুস্তক :

১। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বীরভূম—দুর্গাদাস মজুমদার (ডিসেম্বর, ১৯৭৫)
২। মানব সম্পদ উন্নয়ন রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০৪
৩। ইন সার্চ অফ এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স—অধ্যাপক বি চ্যাটার্জি ও দিলীপকুমার ঘোষ (স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েতস এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, কল্যাণী)
৪। টুওয়ার্ডস এ ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট—এস আই পি এ্যান্ড আর ডি, সম্পাদনা—ঐ
৫। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, বীরভূম (বিভিন্ন বছরের)
৬। জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের তথ্যাবলী।

লেখক : অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ি

বীরভূমে সামাজিক বনসৃজন

মতিচূড় মসজিদ : রাজনগর — ছবি : অনির্বাণ সেন
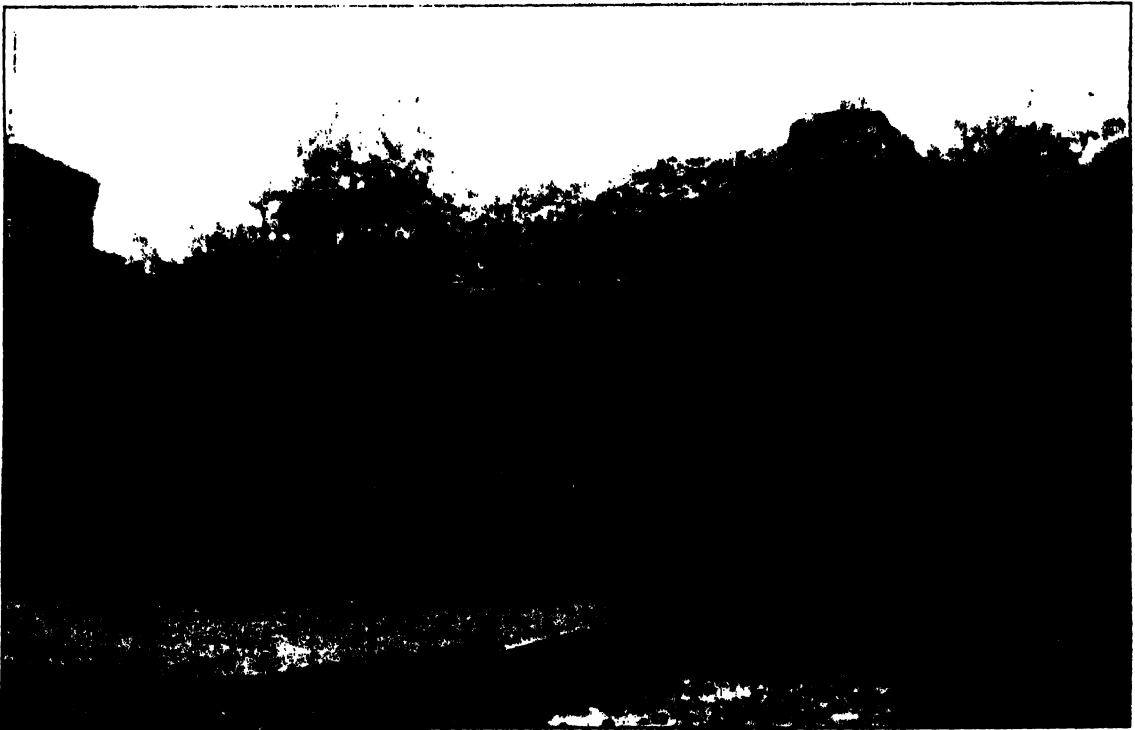
সুরুলের প্রাচীন মন্দির (ছোট বাড়ি) — ছবি : পাপান ঘোষ
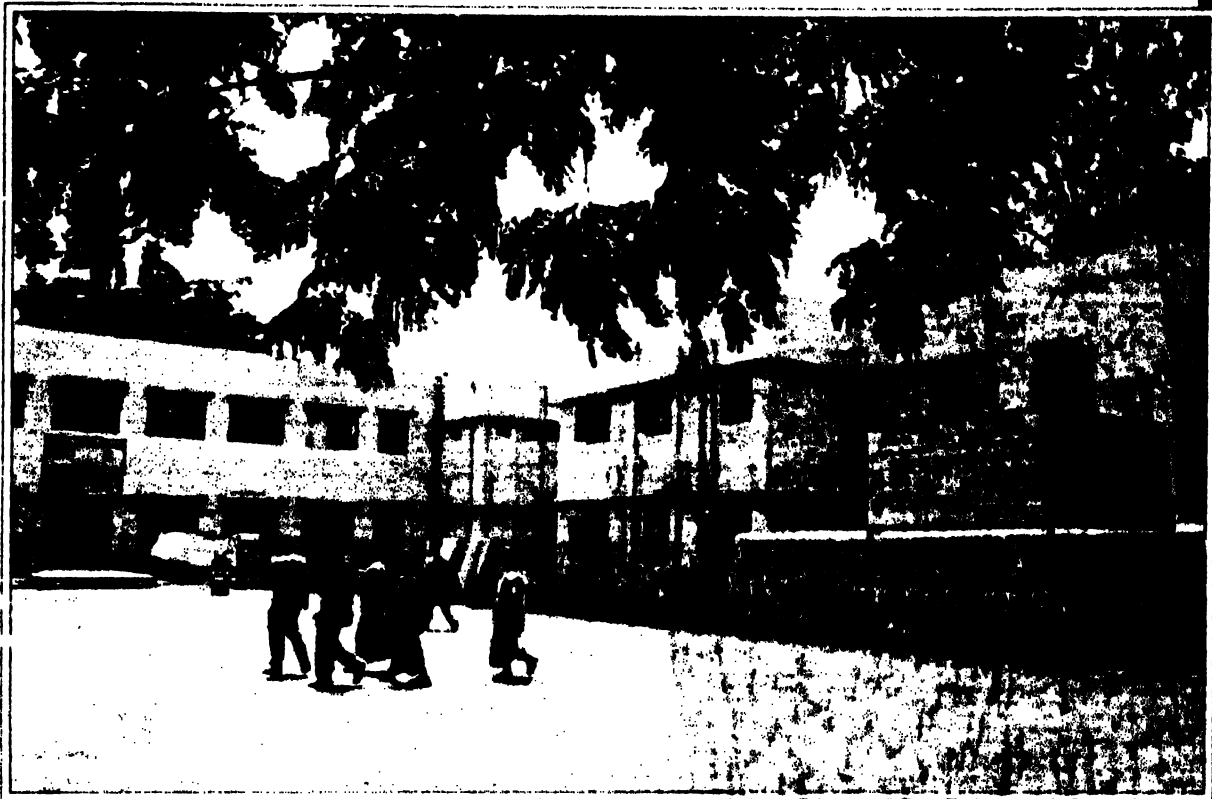
সিউড়ি সদর হাসপাতাল

বীরভূম জেলার স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

দীক্ষিত সিংহ

বীরভূমের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভকাল থেকেই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠতে থাকে। অথচ ভৌগোলিক দিক থেকে দেখলে এর উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির মতন দেখতে, উত্তর-পশ্চিমদিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু, মাঝেমাঝেই তরঙ্গায়িত ভূমি। শাল, মহুয়া পরিবৃত জঙ্গলভূমি ও অপেক্ষাকৃত শুষ্ক আবহাওয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় বীরভূমকে করে তুলতে পারত আদর্শ স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামোর অসাম্যতা, প্রশাসনিক শিথিলতা ও দূরদৃষ্টির অভাব, সর্বোপরি মানুষের চেতনাবোধের ঘাটতি নানাভাবে বীরভূমের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে তুলেছে।

যে জেলা একসময় স্বাস্থ্যকর জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল (এল এল ওম্যালির ১৯১০ সালে উক্তি ছিল : "Birbhum has long been noted for its salubrity" পৃ. ৪৮) তা ক্রমশ হয়ে

উঠতে থাকে সবরকম রোগী ও রোগ বিস্তারের জায়গা। ম্যালেরিয়া এই জেলায় ১৮৭১ সাল থেকেই পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেয়। হাসিম আমির আলি তাঁর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত লেখা "Thirty eight years' of Rice yeilds"-এ দেখিয়েছেন ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত শুধু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত হয়ে ২৪.৯% থেকে ১৯.৬% রোগী মারা গিয়েছিলেন। এর মাত্রা কখনও কখনও ৫০% ছাড়িয়েও গিয়েছিল। শুধু ম্যালেরিয়াই নয় বিভিন্ন রকমের আন্ত্রিক রোগ, ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ, কলেরা, যক্ষ্মা, নিমোনিয়াসহ নানারকমের শ্বাসযন্ত্রের রোগ, যৌনঘটিত রোগ, স্ত্রীরোগ বীরভূমের গ্রামে নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল (টিম্বার Report on the Medical Conditions in Birbhum District, V.B. Quarterly 1930)

বীরভূমের জনবিন্যাস :

বীরভূমের এখনকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে চোখ ফেরানোর আগে বলে নেওয়া দরকার যে জেলার জনবিন্যাস ঐতিহাসিক নানা কারণে বিশেষ রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগোষ্ঠীর তুলনায়, বিশেষ করে তপসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের গড় উপস্থিতি অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার তুলনায় বেশি। এই জেলায় ২০০১ আদমসুমারি অনুযায়ী তফসিলি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০.৬৮ যেখানে সমস্ত রাজ্যে তা ২৩.৬২%। অন্যদিকে আদিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৬.৯৫ (পঃ বঃ ৫.৫৯%)। এছাড়া জনগোষ্ঠীর বেশ বড় একটা অংশ মুসলমান।

জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সম্প্রদায় প্রভেদ অনুযায়ী বীরভূম জেলাকে আমরা দুটি অঞ্চলে ভাগ করতে পারি। একটি অঞ্চল (পশ্চিম অঞ্চল) যেখানে তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন, আর একটি অঞ্চল (মধ্য ও পূর্ব অঞ্চল) যেখানে আদিবাসীরা আছেন কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম। এই অঞ্চলে সাধারণ উচ্চ ও মধ্য বর্ণের এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তফসিলি সম্প্রদায় বীরভূমের সব অঞ্চলেই বেশ ভালো সংখ্যায় বিদ্যমান। এই সব জনগোষ্ঠী যেসব অঞ্চলে বসবাস করেন, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, স্বাস্থ্য বিশেষ করে দৈহিকপুষ্টির অভাব লক্ষ্য করার মতো। এঁদের মধ্যেই ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন মজুর, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষির সংখ্যা বেশি।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও তার যোগান :

বীরভূমের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দিকে তাকালে (District Statistical Hand book 2000) বোঝা যায় যে পরিকাঠামো বেড়েছে কিন্তু তা অত্যন্ত ধীরগতিতে। ১৯৯৫ সালে জেলায় যেখানে সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবার সংখ্যা ছিল ১২৫টি, ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২টিতে। এই সময়ের মধ্যে রোগশয্যা ২০৯৬ থেকে বেড়ে হয়েছে ২২৪৯টিতে। কিন্তু এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারের সংখ্যা ১৯৯৫-তে যেখানে ছিল ২৫৬ জন ২০০০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২২৮ জনে (District Statistical Hand book 2000)। এর থেকেই বোঝা যায় যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারের সংখ্যা পর্যাপ্ত পরিমাণে বীরভূমে নেই। যেখানে শহরের এই অবস্থা, বলা বাহুল্য, ডাক্তারের যোগান ব্যবস্থা গ্রামে কি আকার ধারণ করেছে। এর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা যদি যোগ করা যায় তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করুণ চিত্রটি সহজেই অনুমেয়।

সিউড়িতে একটি জেলা হাসপাতাল ছাড়াও রামপুরহাট ও বোলপুরে একটি করে sub-divisional হাসপাতাল আছে। এছাড়াও চারটি গ্রামীণ হাসপাতাল আছে যার পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা পর্যাপ্ত মানের নয়। জেলায় গড়ে মাথাপিছু ৩৯,১২৪ জন্য ৭৭টি সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে প্রতিটি কেন্দ্র পিছু ৫৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় পরিষেবা দিয়ে থাকে। অন্যদিকে বীরভূমে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ৪১২টি যা গড়ে মাথাপিছু ৭১৯০ জন লোকের জন্য পরিষেবা দিয়ে থাকে (প্রতীচি ট্রাস্ট, 'The Delivery of Basic Health Services in West Bengal and Jharkhand : A study in Birbhum & Dumka District 2004)। ফলে প্রয়োজন থাকলেও খুব কম সংখ্যক লোকই হাসপাতালে ভর্তি হন বা যেতে পারেন।

অন্যদিকে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শুধু যে অপ্রতুল তাই নয় তা সমাজের বিশেষ শ্রেণির জন্যই সীমাবদ্ধ। বীরভূমে কোনো বড় হাসপাতাল বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে গ্রামের লোকদের যৌথ উদ্যোগে শ্রীনিকেতনের তত্ত্বাবধানে ১৯৩২ সাল থেকে জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৪টিরও বেশি স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয় তাও বিভিন্ন কারণে স্থায়ী হয়নি। তখনকার সেই প্রয়াসের লক্ষ্য শুধু স্বাস্থ্যের উন্নতিই ছিল না তা ব্যাপক অর্থেই ছিল কল্যাণমূলক ও সমাজ গঠনমূলক। ইদানীং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এনে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়েছে কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংগঠিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে করেছিলেন তা অধরাই থেকে গেছে।

আমরা এও দেখছি যে জেলা সদরে বা মহকুমা শহরগুলিতে প্রাইভেট ডাক্তার ও নার্সিংহোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তার মানও যে উপযুক্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। এঁরাও সরকারি ডাক্তারের সাহায্য নেন কিন্তু তাতে শুধুমাত্র এক বিশেষ শ্রেণিই উপকৃত হন। প্রতীচি ট্রাস্টের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে সিউড়ি শহরে যে ৪০ জন ডাক্তার সরকারি পরিষেবার বাইরে রোগী

দেখেন তার ৫০ শতাংশই সরকারি ডাক্তার। এটা যে চাহিদা ও যোগানের বিস্তর ফারাকের সূচক তাই নয় বাজারি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অসারত্বও প্রমাণ করে।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও সমাজ :

শুধু হাসপাতাল, ডাক্তার ও অন্যান্য পরিষেবা দেওয়ার লোকের অপ্রতুলতা ছাড়াও বীরভূমের পিছিয়ে পড়ার চিত্রটি পরিষ্কার হয় যখন দেখি বীরভূমে মাত্র ১৩.৯% লোকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে sanitation পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু এ ব্যাপারে যে জন-উদ্যোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন তা এখনও ঈপ্সিত স্তরে পৌঁছায়নি।

শিশুদের টীকাকরণ কর্মসূচিতেও সার্বিকভাবে বীরভূম পিছিয়ে আছে। West Bengal Human Development Report, 2004 অনুযায়ী মাত্র ৩৪.৯% শিশুদের সমস্তরকমের প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে সমস্ত এলাকায় এই চিত্রটি এতটা আশঙ্কাজনক নয়। বিশ্বভারতীর সমাজকর্ম বিভাগ অতি সম্প্রতি (২০০৪-এ) দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় (সাত্তোর ও কসবা) এলাকার স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপরে যে সমীক্ষা করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৯১.৬% শিশুকে এলাকায় সমস্তরকম টিকাকরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এই চিত্রটি এলাকাভিত্তিক, সার্বিক নয়। এলাকার প্রশাসন, পরিষেবার ওপর নজরদারি (monitoring), আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অবস্থান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। টিকাকরণের হার আদিবাসী ও মুসলমান সমাজে অপেক্ষাকৃত কম আবার সুনীল সেনগুপ্ত ও সত্যব্রত দত্তর ১৯৯৫-৯৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মেয়েদের মধ্যে তা আরও কম।

আর একটি সমস্যা জনসাধারণ সম্মুখীন হন তা হল প্রসবজনিত পরিষেবার অপ্রতুলতা। প্রতীচি ট্রাস্টের সমীক্ষায় দেখছি মাত্র ১৪% শিশু জন্মগ্রহণে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। ৫৩% শিশু দাইমার সাহায্যে ২৮% প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সহায়কের হাতে জন্মগ্রহণ করেছে।

বিশ্বভারতীর পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র ২০০৪ সালে দুটি বিভিন্ন ধরনের গ্রামে সমীক্ষা চালিয়েছিল। একটি গ্রাম বোলপুর শহরের কাছে, পাকা রাস্তা দ্বারা যুক্ত কিন্তু গ্রামের ৩৫.৪৫% ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। আর একটি গ্রাম শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। যাতায়াতের ব্যবস্থা ভ্যান ও সাইকেল নির্ভর, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে এঁরা ভালো অবস্থায় আছেন (মাত্র ৫.৫৯% ভূমিহীন ক্ষেতমজুর)। প্রথমোক্ত গ্রামটিতে ৫১.০৭% শিশু চিরাচরিত দাইয়ের সাহায্যে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের মধ্যে এই সংখ্যাটি আশানুরূপভাবেই কম (২৩.৭৬%)। অপরদিকে আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাটি ৭৯% এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪২.৪২%। অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্রামটি, যার অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশ ভাল, সেখানে দেখা যাচ্ছে চিরাচরিত প্রথায় জন্মগ্রহণের হার অপেক্ষাকৃত কম (৪৬.২৭%)। এই গ্রামে হাসপাতালে জন্মগ্রহণের হার ৫০.৪৮%। এখানেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অপেক্ষাকৃতভাবে সামাজিক অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে হাসপাতালের সাহায্য নেওয়ার হার কম। দুটি গ্রামের ক্ষেত্রেই বাড়িতে জন্মগ্রহণের হার কমেছে কিন্তু তা ভীষণভাবে আর্থিক সচ্ছলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও হাতের কাছে প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

বীরভূমে রোগ ও তার বিস্তার :

রোগের বিস্তার শুধু যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না একথা আমরা আগেই বলেছি। স্বাস্থ্য সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের অবস্থার ওপরও নির্ভরশীল। আবার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মানের ওপর অর্থনৈতিক অগ্রসরতা বা অনগ্রসরতাও নির্ভর করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি ঘটলে জনসাধারণের রোগ-ভোগের চেহারাও পাল্টায়। তথাকথিত উন্নত পশ্চিমি দেশগুলিতে ও আমাদের দেশগুলিতে একসময় যক্ষ্মা সহ যে সব মারণ রোগ দেখতে পাওয়া যায় তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

একসময় বীরভূমের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রম অবনতি হওয়ায় জনসংখ্যার ওপর এর দারুণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় যেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৮৭২-১৯৩১ সালে ছিল ৪৭.৩%, কিন্তু বীরভূমে তা মাত্র ১০.৬%-তে দাঁড়ায় (সুধীর সেন Land and its Problem ১৯৪৩)। কিন্তু এর থেকেও বড় কথা রোগে বীরভূমের সমস্ত শ্রেণি সমানভাবে আক্রান্ত হয়নি। ভারত সরকারের আদমসুমারি বিভাগের

সারণি ১ :

১৯৯৯-২০০৩ সালে বীরভূমে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা

রোগের নাম	বছর ভিত্তিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা				
	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
টি.বি	১৮৪৪	৩৪৪৭	২৩৯২	৩৪২২	২৪৩৭
ক্যান্সার	০০	০০	০০	০০	০০
অ্যাকিউট ডাইরিয়া	২২,৬২৮	৯৪৭৬	৩৭,৫১৬	৪২,২৯৫	৫২,৩১৯
ডিপথেরিয়া	২১	১৪	১৯	০৬	০৩
অ্যাকিউট পোলিও মাইলিটিস	০০	০১	০৪	০৫	০০
টিটেনাশ নিয়োনেটাল	২৫	৩০	৮০	৪৫	২২
টিটেনাশ (অন্যান্য)	৩৭	৭৪	১৪৮	১১১	১০০
হুপিং কফ	০৪	০৮	০০	১০	০০
মিজিলস	১২৫	১০১	১৯৩	২২৫	৪১৬
নিমোনিয়া	৬২২	৮৫৩	১৬৩০	১৪৪৩	১০৮০
ভাইরাল হেপাটাইটিস	১৯৭	১৬৫	২০৫	১৯১	১২৩
আন্ত্রিক ফিবার	১০৪০	১১৫৪	২৯৭০	১৫৫৭	২১৮৮
জাপানিজ এনকেফেলাইটিস	০০	০০	০০	০০	০০
মানিংগো কোকাল মেনিনজাইটিস	০০	০০	০০	০০	০০
ম্যালেরিয়া	—	১৫৪	৩৪৪	৪৯৪	২৮০
রেবিস	০২	০০	১৫	১৪	১০
এস.টি.ডি	০০	০০	৩৩২৪	২৬৫৫	২২৪০
কালাজ্বর	০০	০২	০৬	১৬	৪৬
এ.আর.আই (নিমোনিয়া ছাড়া)	৭৭৮৫	১৮৪১১	৩৮৭১০	৪৭২০১	৫৮৮০৪
এডস/এইচ.আই.ভি	০০	০০	০০	০০	০০

মহকুমা হাসপাতাল

তৎকালীন অধিকর্তা শ্রীঅশোক মিত্র দেখিয়েছেন যে ১৯০১-১৯১১, ১৯২১-৩১ এবং ১৯৩১-৪১ জন-গণনা বর্ষে নিম্নবর্গের সম্প্রদায় যথা—বাগদি, বাউরি, বায়েন, মাল প্রভৃতির জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে ১৯৯১-২০০১ সালে আদমসুমারি বর্ষে জেলার মোট জনসংখ্যা আগের জনগণনা বর্ষের থেকে ৪.০৬% কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার কারণ প্রাকস্বাধীনতা যুগের উল্লিখিত বর্ষের কমে যাওয়ার কারণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আগের কারণ যদি মহামারির জন্য হয়ে থাকে তবে এখনকার কারণ তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে যুক্ত ও ভবিষ্যৎ ভাবনারই প্রতিফলন। যে ভাবনার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সংগঠিত জীবন-যাপন ও স্বাস্থ্য সচেতনতা জড়িত।

১ নং সারণিতে বীরভূম জেলার, ১৯৯৯-২০০৩ এই পাঁচ বছরে, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যে সব রোগীর শুধুমাত্র হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে বীরভূমের অধিকাংশ মানুষ পেটের অসুখ, আন্ত্রিক ঘটিত জ্বর বা যক্ষ্মা রোগে ভোগেন। এছাড়াও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ যথা নিমোনিয়া, এ আর আই (acute Respiratory Infection) রোগের সংখ্যাও কম নয়। বীরভূমে এখনও পর্যন্ত (২০০৩) মাত্র ৫৯ জনের মধ্যে মারাত্মক HIV/AIDS রোগের বীজ পাওয়া গেছে। (Health on the March. West Bengal 2002-2003)। এই মারণ রোগের বিষ ক্রমশই বাড়ছে, কমছে না। বীরভূমে, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জেলার মতো, কুষ্ঠ রোগের সংখ্যাও যথেষ্ট। জলবাহিত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের আধিক্য থেকে বোঝা যায় যে বীরভূমে রোগভোগের চিত্রটি পুরোনো দিনের থেকে খুব একটা বদলায়নি। কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের প্রকোপ প্রাকস্বাধীনতা কাল থেকে চলে আসছে। এটা ঠিক যে এইসব রোগের থেকে মৃত্যু কমে গেছে। কিন্তু রোগ নানান জায়গায় ও সময়ে অসময়ে মাথাচাড়া দিচ্ছেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও অপেক্ষাকৃত উন্নত চেতনাবোধ মানুষকে রোগভোগের মোকাবিলা করতে সাহায্য করছে এ কথা ঠিক কিন্তু অসম অবস্থা থেকেই গেছে। আজকে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উন্নয়নের পরিপূরক। বীরভূমের পিছিয়ে পড়া জেলা তকমা পাল্টাতে ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন।

রোগের প্রতিরোধ ও তার প্রতিকারের জন্য যেমন উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নততর চেতনাবোধের প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন জন-উদ্যোগ, প্রথাগত ও অপ্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। রবীন্দ্রনাথ এই বীরভূমের মাটি থেকে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ নির্মূল করার জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সমবায় স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ সমাজের আর্থিক কাঠামোর চোরাবালিতে অকালে পথ হারিয়েছিল। সে সময়ে সমাজের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণিদের সমাজের কাজে অংশীদার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ছিল। আজ এঁদের মধ্যে চাহিদা ও চেতনাবোধ দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু যে জিনিসটির এখনও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হল সংগঠিত জন-উদ্যোগ ও সমস্ত অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

লেখক : অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

কোটাপুরের মদনেশ্বর মন্দিরের চত্বরে রক্ষিত প্রাচীন শিলামূর্তি ছবি : মানস দাস

বারাগ্রামে উদ্ধার প্রাপ্ত পুরাকীর্তি ছবি : মানস দাস

বীরভূমের প্রাচীন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ — সৌজন্যে সুনীল কর্মকার

শিক্ষা প্রসারের বীরভূম জেলা

বিকাশ রায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে বীরভূম জেলা যে অগ্রসর হচ্ছে বিগত একশত বছরের চিত্র পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়। এই অগ্রগতির ধারাকে তিনটি পর্যায়ে আমরা বিভাজিত করতে পারি। প্রাচীন কাল থেকে সারাদেশ ও রাজ্যের সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও দেশজ প্রচেষ্টা ছিল এবং ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর পাশ্চাত্য ধরনের আধুনিক শিক্ষার একটি ধারাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এই পর্যায়ে দেখা যায় যে, পাঠশালা, টোল, মক্তব, মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা প্রসারের যে দেশজ ধারা ছিল ব্রিটিশরা তাকে ধ্বংস করে যে শিক্ষা-ধারার প্রচলন করে তা মূলত তাদের শাসন ও শোষণকে বজায় রাখার স্বার্থে। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা কখনই তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাভাবিকভাবেই দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য স্বাধীন দেশের সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই আশা সকলে করেছিল। কিন্তু শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকার করা হল না, সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে অঙ্গীকার করা হল যে, ১৯৬০ সালের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র উদ্যোগ নেবে। কিন্তু আমরা দেখি যে স্বাধীনতার সাতান্ন বছর পরও সেই অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়নি। শিক্ষা এখনও মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত নয়। অর্থাৎ স্বাধীনতা পাওয়ার পর যে শক্তি দেশ পরিচালনা করেছে তারা চায়নি শিক্ষার প্রসার হোক। সেই শক্তি আইনসভায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিল এলে তার বিরোধিতা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, শিক্ষার প্রসার হলে সমাজের উচ্চকোটি অংশের মানুষ ঝি-চাকর পাবে না। সুতরাং নিজ শ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষা প্রসারের পথে বাধা দিয়েছে সমাজে কায়েমী স্বার্থ রক্ষাকারী জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণী এবং দেশের সরকার তাদের স্বার্থরক্ষা করেছে। দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের কার্পণ্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র ২.৮ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়, শিক্ষার জন্য ব্যয় অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হিসাবে গণ্য করে দেশের সরকার। যদিও জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার দাবি উঠেছে। শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবি উঠেছে। শিক্ষাকে কলুষমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক করার দাবি উঠেছে। কিন্তু সে দাবিকে অদ্যাবধি গ্রাহ্য করা হয়নি জাতীয় স্তরে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ সঙ্গত কারণেই যে, "....সকলকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব ইহা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নহে"। সকলের অন্তরের কথা যে নয় তা প্রমাণিত। সেজন্য যারা চান সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হোক, রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ বিদূরিত হোক, তাঁরা চেষ্টা করছেন বিগত ১৯৭৭ সাল থেকে, পশ্চিমবঙ্গে এবং বীরভূম জেলাতে শিক্ষা প্রসার লাভ করুক। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকে রাজ্যে শিক্ষা প্রসারের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সুফল থেকে বীরভূম জেলার মতো শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা জেলাও বঞ্চিত হয়নি। এই তৃতীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের নানা সদর্থক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য, নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য, সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য আরও নিবিড় উদ্যোগ প্রয়োজন, রাজনৈতিক উদ্যোগকে আরও সংহত করা জরুরি।

গত শতকে বীরভূম জেলার সাক্ষরতার হারের কি অগ্রগতি ঘটেছে তা একনজরে দেখে নেওয়া যেতে পারে—

সাল	মোট সাক্ষরতার হার	পুরুষ সাক্ষরতা	নারী সাক্ষরতা
১৯০১	৭.৭২ শতাংশ	১৫.২৫ শতাংশ	০.৪১ শতাংশ
১৯১১	৮.৭৫ শতাংশ	১৭.০২ শতাংশ	০.৬৩ শতাংশ
১৯২১	১০.২৪ শতাংশ	১৯.৪৬ শতাংশ	১.০৬ শতাংশ
১৯৩১	৬.৯২ শতাংশ	১২.৮০ শতাংশ	১.০৫ শতাংশ
১৯৪১	১২.৭৬ শতাংশ	২১.৪৪ শতাংশ	৪.০৭ শতাংশ
১৯৫১	১৭.৭৪ শতাংশ	২৮.২২ শতাংশ	৬.৪০ শতাংশ
১৯৬১	২২.০৯ শতাংশ	৩২.৪৩ শতাংশ	১১.৪৭ শতাংশ
১৯৭১	২৬.৩৯ শতাংশ	৩৫.৭২ শতাংশ	১৬.৭৭ শতাংশ
১৯৮১	৩৩.৬৯ শতাংশ	৪২.৫৮ শতাংশ	২৪.৪৬ শতাংশ
১৯৯১	৪৮.৫৬ শতাংশ	৫৯.২৬ শতাংশ	৩৭.১৭ শতাংশ
২০০১	৬২.১৬ শতাংশ	৭১.৫৭ শতাংশ	৫২.২১ শতাংশ

● সূত্র—জনগণনার তথ্য থেকে সংকলিত।

আমরা জানি যে ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনা হয়। এর নয় বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮১ সালে বীরভূম জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল পুরুষদের মধ্যে ৯.২ শতাংশ, নারীদের মধ্যে ০.১ শতাংশ এবং মোট সাক্ষরতার হার ৪.৬৫ শতাংশ প্রায়। সাক্ষরতার হারের অগ্রগতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল অর্থাৎ ৫০ বছরে অগ্রগতি ঘটেছে মাত্র দশ শতাংশ এবং ১৮৮১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সাতটি দশকে অগ্রগতির হার মাত্র ১৩.০৯ শতাংশ। সে সময়ে আমাদের দেশ ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজ শাসনাধীনে। অর্থাৎ প্রাকস্বাধীনতা পর্যায়ে দেশের সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও শিক্ষার অগ্রগতির হার খুবই দুর্বল।

এখন দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের এই তিরিশ বছরকে ধরা যায় তাহলে দেখা যায় যে, এই তিন দশকে সাক্ষরতার হারের অগ্রগতি ঘটেছে ১৫.৯৫ ভাগ এবং নারীদের মধ্যে ১৮.০৬ ভাগ, সেখানে ১৯৮১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই দশকেই অগ্রগতি ঘটেছে ২৮.৪৭ ভাগ এবং নারীদের মধ্যে ২৭.৭৫ ভাগ। অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর সময়ের দুটি পর্যায়ের মধ্যে শেষ দুই দশকের জেলায় শিক্ষার অগ্রগতির হার বেশি।

বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ দুই শতকে বীরভূম জেলায় সাক্ষরতার স্তরে যে অগ্রগতি তার পিছনে আছে সদর্থক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারি ও সাংগঠনিক উদ্যোগ। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দশকটিকে সংগঠিত সাক্ষরতা আন্দোলনের দশক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এখানে একথা বলতেই হবে যে, এই অগ্রগতি শুধুমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা তথা শিক্ষার সদর্থক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্রামের গরিব মানুষের হাতে জমি দেওয়া, বর্গাচাষের আইনগত স্বীকৃতি ও তা কার্যকরী করা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা, তপসিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসী বালিকাদের পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এমন এক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে, এর ফলস্বরূপ সামগ্রিক উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবেই মানুষের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গরিব মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমগ্র জীবনধারার মানোন্নয়ন ঘটেছে, সেইসঙ্গে সাক্ষরতার হারেরও বৃদ্ধি ঘটেছে। এতো সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে। এদেশে এবং বিদেশেও। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, বীরভূম জেলাতে কি কোনো ঘাটতি নেই? আছে। ২০০১ সালে জেলার সাক্ষরতার গড় হার ৬২.১৬ শতাংশ হলেও গ্রামীণ সাক্ষরতার হার ৬০.৫০ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে এই হার ৫০.৪০ শতাংশ। আবার পুরুষ ও নারী সাক্ষরতার হারের মধ্যে ফারাকও কম নয় এবং ব্লকভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্লক এলাকায় নারী সাক্ষরতার হার পঞ্চাশ শতাংশেরও নীচে। তাছাড়া এখনও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে আছে, যারা আগামী দিনে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধির সহায়ক হবে এই আশঙ্কা করা যেতে পারে। এই দুর্বলতার দিকগুলি দূর করে ২০১০ সালের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট অবস্থানে যাওয়ার
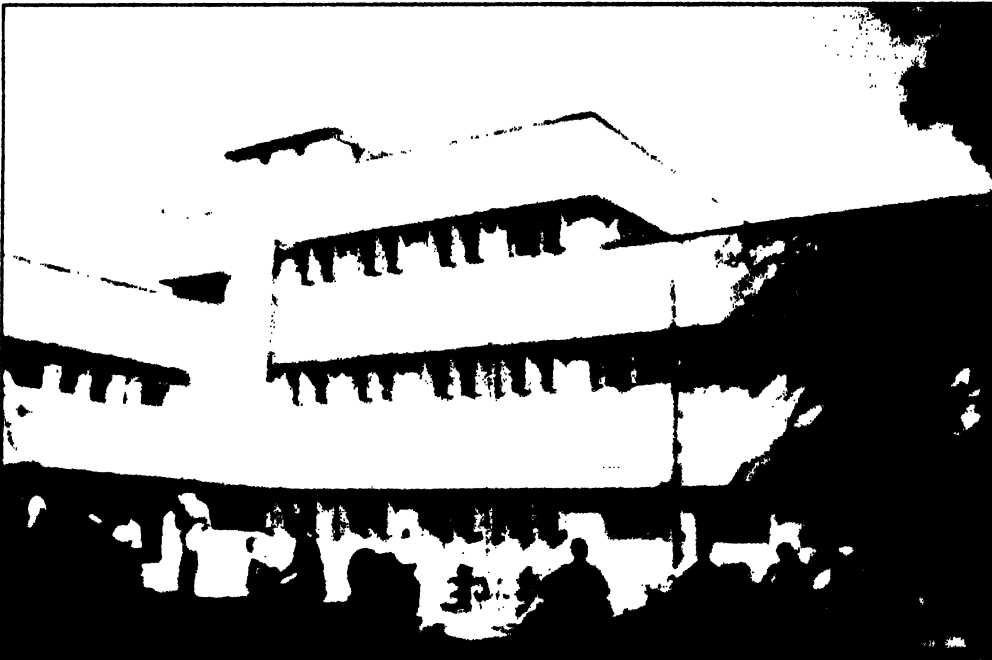
বীরভূম জেলা স্কুল

সৌজন্যে : বিকমাধ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামীণ শিক্ষা কমিটির সভা

প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে আমরা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা আলোচনা করব।

প্রাথমিক শিক্ষা :

প্রাচীন কাল থেকেই বীরভূম জেলায় শিক্ষার একটা ধারার প্রবাহ ছিল। এই শিক্ষাধারার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রাচীন পুঁথিপত্র যা উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে, এ প্রসঙ্গে কবি জয়দেবের লেখা গীতগোবিন্দ বা চণ্ডীদাস ও অন্যান্য পদকর্তাদের লেখা পদ-এর কথা বলা যায়, নিশ্চয় তার কোনো পাঠকও ছিলেন। ফলে অনুমান করা যায় যে, যত কমই হোক না কেন, লেখাপড়া জানা মানুষজন কিছু ছিলেন। অর্থাৎ যদি কোনো প্রতিষ্ঠান নাও থেকে থাকে, ব্যক্তিগত চর্চার রেওয়াজ ছিল একথা বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সময়ের উপরে ই জি ড্রেক-ব্রকম্যানের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত জেলায় কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তৎকালীন জেলাশাসক মিঃ গ্যারেট বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন ১৮২৩ সালে। উইলিয়াম এডাম ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকে বীরভূম জেলায় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে তথ্য সংগ্রহ করেন সেই প্রতিবেদন (তৃতীয় প্রতিবেদন ১৮৩৭) থেকে জানা যায় যে, বীরভূম জেলায় তখন সাধারণের বিদ্যালয় মিলিয়ে প্রায় ৫৪৪টি বিদ্যালয় ছিল। ওই প্রতিবেদনে পড়ুয়ার সংখ্যা তিনি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ওই সময়ে শুঁড়ি, ডোম, কেওট ইত্যাদি তথাকথিত অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে শিক্ষা নেওয়া এবং শিক্ষকতা করার আগ্রহের উন্মেষ ঘটেছে—যা তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা পুষ্ট সমাজের প্রতি একটা আঘাত হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এছাড়া ডব্লুউ ডব্লুউ হান্টার ১৮৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৮৭২-৭৩ সাল পর্যন্ত জেলায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা ও তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন তাঁর রিপোর্টে। ১৯০৯-১০ সালে এল এস এস ওম্যালীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় বীরভূম জেলাতে তখন ৯২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে জন্য তেমন উদ্যোগ নেয়নি। যদিও ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। তথাপি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৯৪৫-৪৬ সালে বীরভূমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৬৩৬টি। ১৯৪৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে গ্রামীণ এলাকায় অবৈতনিক করা হয় এবং সমস্ত বিদ্যালয়কে জেলা স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে গ্রান্ট দেওয়া চালু হয়। ক্রমে ১৯৬৭-৬৮ সালের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই বছর পর্যন্ত জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ১,৫৩১টি, সেখানে

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,২০,৩০৬ জন। বর্তমানে জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২,৩৭০টি এবং এই বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৭৭ সালের পরবর্তী সময়ে। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ৩,৪০,২০১ জন। বর্তমান সময়ে জেলার জনসংখ্যাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা বিচার করলে গড়ে ১,২৭১ জন প্রতি ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি বিদ্যালয়ে গড়ে ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রী আছে। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক অনুপাত ৪১ : ১, শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৮,০৯১ জন। ১৯৭৭ সালের পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম ছিল এবং তাঁদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধাগুলিও অবহেলিত হত। এখন সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তা তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

পূর্বের জেলা স্কুল বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ করা হয়েছে। ধুঁকতে থাকা বোর্ডগুলি তদর্থক কমিটির পরিচালনাধীনে থাকার পর এখন নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে প্রতি চার বছর অন্তর। শিক্ষক-শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধায়ক, শিক্ষাকর্মী সমস্ত স্তরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তৈরি হওয়া সংসদের কাজ গণতান্ত্রিক পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ও পেশাগত দিকগুলিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কাজ করে আসছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। একসময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে। সেইসঙ্গে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদেরও রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যবস্থা এমন এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যা শিশুদের বিশেষ করে গরিব ঘরের শিশুদের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছে, শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সামাজিকতাবোধ গড়ে উঠতে সাহায্য করছে—একথা সমীক্ষায় প্রমাণিত।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করার বিষয়টি আজকের দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রাথমিক স্তরে যে বৈজ্ঞানিক পাঠক্রম চালু করেছে তাকে অনুসরণ করে শিশুদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক মূল্যায়ন, বহির্মূল্যায়ন নিয়মিত হচ্ছে। এই মূল্যায়নের ফলাফলের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা মানের উন্নয়ন ঘটছে। এমনকি সমাজের অনগ্রসর ও গরিব পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরও শিখনমানের উন্নতি ঘটেছে। স্বাস্থ্যচেতনা বৃদ্ধি করা জরুরি —এই ভাবনায় প্রাথমিক স্তরে শিশুদের স্বাস্থ্যচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ইংরেজি ভাষা কী করে শিশুরা সহজে শিখতে পারে তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্মশালাও করা হয়েছে।

কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদির আয়োজন করার পাশাপাশি তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে গৃহীত উদ্যোগের সুফল পাওয়া যায়না। এজন্য জেলার ৩২টি চক্রে যে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ আছেন তাঁরা এবং জেলান্তর থেকে পরিদর্শকগণ নিয়মিত বিদ্যালয়গুলিকে পরিদর্শন করার চেষ্টা করছেন। এই পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার ও যুগোপযোগী করে তোলার জন্য জেলাস্তরে কর্মশালা করা হয়েছে। এই পরিদর্শনের লক্ষ্য খবরদারি করা নয়, বিদ্যালয়স্তর বা শ্রেণিস্তরে সাফল্য-ব্যর্থতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার যে রীতি-নীতি, তা ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠছে।

তপসিলি সম্প্রদায়, আদিবাসী সহ অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় সাত ভাগ মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১ সালে প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১২,৮৮৩ জন, ২০০৪ সালে ওই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৩,৩২১ জন। আদিবাসী শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অলচিকি হরফে শেখানোর জন্য সাঁওতালি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় জেলায় আদিবাসী ও অনগ্রসর অংশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১১টি আশ্রমিক ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি করা হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে আদিবাসী ও তপসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে।

এখন জেলায় কোনো গৃহহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বিদ্যালয়ে পানীয় জল, শৌচাগার নির্মাণের কাজেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। সাংসদ ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা থেকেও বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণে সাহায্য পাওয়া গেছে। ডি পি ই পি, সর্বশিক্ষা অভিযানসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধাকে ব্যবহার করে ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রসারের কাজে অগ্রগতির স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হচ্ছে।

বীরভূম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার যে সুফল পাওয়া যাচ্ছে তার প্রমাণ, স্কুলছুটের হার কমছে, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর চার বছরের মধ্যেই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ সম্পূর্ণ করার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে পঠন-পাঠন পরিবেশেরও উন্নতি ঘটছে এবং অন্যদিকে 'স্কুল চলো কর্মসূচি'র মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, গ্রাম শিক্ষা কমিটি ও মাতা-শিক্ষক সমিতির সক্রিয়তা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এ সবই তো অগ্রগতির দ্যোতক।

এতসব উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও সমাজের একটা অংশের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের আঙিনায় আসতে পারে না নানা কারণে। তাদের শিক্ষার আঙিনায় আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলির নিজস্ব পরিচালন সমিতি আছে এবং সহায়িকারা সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই কেন্দ্রগুলি পরিচালনা করছেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর প্রতীচী শিক্ষা প্রতিবেদনে সেকথা উল্লেখ করেছেন। এই শিশুশিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি সর্বশিক্ষা অভিযানের আয়ত্তাধীনে শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (Education Guarantee Scheme), পরিপূরক ও উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা (Alternative and Inovative Education) ইত্যাদি যে সুযোগগুলি আছে সেগুলি ব্যবহার করার উদ্যোগও চলছে। নির্দিষ্ট বয়সের স্কুলছুট শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য সেতু পাঠক্রম কেন্দ্রও চালু আছে। কোথায় এ ধরনের কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা যাবে তার জন্য অনুস্তরীয় পরিকল্পনা আবশ্যক।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও বীরভূম জেলা যথেষ্ট অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। ১৮৫৪ সালে বীরভূম জেলা বিদ্যালয়ই সারা জেলার একমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে জেলায় মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা ইত্যাদি মিলিয়ে মোট মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০৪টি। নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সংখ্যা বাড়ছে। জেলার কোনো কলেজেই এখন উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা নেই—তার জন্য অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই পরিচালন কমিটি আছে—যাঁরা সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন। সত্তরের দশকে বিদ্যালয়গুলিতে তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তাকে প্রতিহত করে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় এ জেলার ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যস্তরে বিশেষ স্থান দখল করছে। বিশেষ করে

বীরভূম ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, সিউড়ি

একসঙ্গে মিলে লেখাপড়া

একথা উল্লেখ করতেই হবে যে, বিগত দিনের থেকে বর্তমানে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করছে তার মধ্যে গরিব শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েও আছে এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি ও সামগ্রিক উন্নয়ন নীতি গ্রামের গরিব খেতমজুর পরিবারেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছে। সাক্ষরতা কেন্দ্র থেকে পড়াশুনা শুরু করে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার আঙিনায় এসেছে ধর্মেন্দ্র দাস, ইমরান সেখের মতো গরিব ঘরের ছেলেরা—এটা আমাদের গর্বের। বিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে জেলা ও মহকুমা স্তর পর্যন্ত। সেখান থেকে নিয়মিত পরিদর্শন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জেলার কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায় মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়েছে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা কোনো না কোনো কারণে মাধ্যমিক শিক্ষায় আসতে পারেননি বা নানা কাজের মধ্যে থেকেই মাধ্যমিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে চান তাঁদের জন্য রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। বর্তমানে সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো প্রসারের কাজ চলছে ও অন্যান্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের অনুকূলে একটা বাতাবরণ গড়ে তোলা যাচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শেখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে জেলায় উচ্চশিক্ষা লাভের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ঘটছে।

উচ্চশিক্ষা :

ও ম্যালীর রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় যে, সে যুগে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার চাহিদা ক্রমবর্ধমান এবং এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেলায় কলেজ আছে ১১টি। কলেজগুলিতে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের নানা বিষয়ে সাধারণ স্নাতক ও সাম্মানিক স্নাতক পড়ার সুযোগ আছে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার আছে সিউড়ি

বিদ্যাসাগর কলেজে। কলেজগুলিতে প্রতিনিয়ত পঠন-পাঠনের সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সদা তৎপর। কারিগরি শিক্ষার সুযোগও জেলায় ক্রমবর্ধমান। সিউড়ি রামকৃষ্ণ শিল্প বিদ্যাপীঠে এই সুযোগ আছে, সেইসঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগে ২টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃত্তি শিক্ষার জন্য আই টি আই কলেজ আছে। সেই সঙ্গে জেলায় তিনটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে এবং ৩টি বেসরকারিভাবে এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর। এছাড়া আছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত জেলার গর্ব বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এটি শুধুমাত্র জেলা, রাজ্য বা দেশের নয়, এটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়।

সাক্ষরতা আন্দোলন :

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটিকে সংগঠিত সাক্ষরতা আন্দোলনের দশক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বীরভূম জেলা জুড়ে এই আন্দোলন জেলার প্রায় প্রতিটি প্রান্তে সাড়া ফেলেছিল। মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার পর বীরভূম জেলা সাক্ষরতা সমিতির নেতৃত্বে ১৯৯০ সাল থেকে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। জেলা জুড়ে সমীক্ষার মধ্য দিয়ে পাওয়া ৭,৩০,২৬৪ জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা কেন্দ্রে আনার কাজ শুরু হয়। প্রচার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৯১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস থেকে কেন্দ্র খোলে। এই প্রকল্প জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের অনুমোদন পায় ১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর। কিন্তু প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর কাজটি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি করে রেখেছিল ১৯৮৯ সাল থেকেই। যদিও ছোট আকারে ছিল সেই সলতে পাকানোর কাজ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের রূপ পাওয়ার পিছনে এই সাংগঠনিক উদ্যোগের ভূমিকাকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়। বীরভূম জেলা সাক্ষরতা সমিতির কাজে সবাই যুক্ত হল। বিভিন্ন গণসংগঠন, প্রশাসন, ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষক-শ্রমিক-শিক্ষক সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এল, সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রচারকের কাজ করলেন। সমস্ত স্তরের পঞ্চায়েত যোগ্য ভূমিকা নিয়ে নেতৃত্ব দিল। ২৫৪ জন মুখ্য প্রশিক্ষক, ৩৫১৯ জন মাস্টার ট্রেনার, ৭০,৪৯৩ জন স্বেচ্ছা শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অসংখ্য সংগঠক মিলে এক ইতিহাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল জেলার কোণে কোণে। ১৯৯২ সালে মূল্যায়নের পর জেলার ৮০ শতাংশ মানুষ সাক্ষর হয়ে ওঠার ভিত্তিতে ওই বৎসরের ৩০ জুন বীরভূম জেলাকে পূর্ণ সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ওই দিন সিউড়িতে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে উপস্থিত

বীরভূম জেলার টিটিডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছিলেন শ্রদ্ধেয় জননেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরি। এই সভাতেই কয়েকজন নবসাক্ষরের হাতে উপকরণ তুলে দিয়ে সাক্ষরোত্তর পর্বের আনুষ্ঠানিক সূচনাও করেন তিনি।

এই সাক্ষরোত্তর পর্যায়ের কাজে কয়েকটি মাত্রা যোগ হল পরবর্তী সময়ে। যেমন—(ক) নবসাক্ষরদের শিক্ষার চর্চা অব্যাহত রাখতে স্থাপিত হল শিক্ষাচক্র (খ) যে সমস্ত পড়ুয়া ভাল করে শিখতে পারলেন না, তাঁদের জন্য সেতু পাঠক্রম কেন্দ্র, (গ) যাঁরা নিরক্ষর থেকে গেলেন তাঁদের জন্য সাধারণ সাক্ষরতা কেন্দ্র চালু রাখা এবং (ঘ) নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করার লক্ষ্যে স্কুলের বাইরে থাকা বালক-বালিকাদের স্কুলে ভর্তি করা এবং তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বিশেষ বাহিনী তৈরি করা হয়। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই ধরনের কাজ চলার পর ১৯৯৬ সালে ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয় এবং প্রকল্প অনুমোদিত হলে ১৯৯৭ সাল থেকে তার কাজ শুরু হল। জেলায় মোট ১৭৩৭টি ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্র, যা মূলত গ্রাম সংসদ ভিত্তিক এবং ২৯০টি মুখ্য ধারাবাহিক শিক্ষাকেন্দ্র যা মূলত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে স্থাপন করার কাজ শুরু হল।

এই ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যগুলি হল নিম্নরূপ :—

(ক) অর্জিত সাক্ষরতাকে শিক্ষাচর্চায় ব্যবহার করা,
(খ) যুক্তিশীল চিন্তা চেতনার নিরন্তর বিকাশ এবং
(গ) জীবন ও জীবিকার গুণগত মান উন্নয়নে অর্জিত শিক্ষাকে ব্যবহার করা।

সুতরাং বলা যায় নিরন্তর শিক্ষাচর্চার মাধ্যমে জীবনের গুণগত মানোন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত সমাজ গড়ে তোলা। এই কাজের জন্য প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে পাঠকেন্দ্র, উন্নয়ন ও তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি দশটি ধারা আছে। এই কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র পঠন-পাঠনের কেন্দ্র নয়, এগুলি হল বহুমুখী শিক্ষা ও বিকাশ কেন্দ্র। প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রেরক এবং মুখ্য প্রবহমান কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব আছে সঞ্চালকের উপরে।

বীরভূম জেলায় যে ধরনের বহুমাত্রিকতা নিয়ে কেন্দ্রগুলি চলার কথা, তা চলেনি। প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচিকে সঙ্গে করে সমমান কর্মসূচি, জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন কর্মসূচি ব্যক্তিগত আগ্রহ বৃদ্ধি কর্মসূচি, আয় বৃদ্ধির কর্মসূচিকে যুক্ত করা গেছে। কিন্তু তাকে সুষ্ঠু রূপ দিতে আরও অনেক পরিকল্পনা প্রয়োজন। শুধুমাত্র পঠন-পাঠনই সাক্ষরতার উদ্দেশ্য নয়, সচেতনতা, সক্ষমতা সৃষ্টিও তার লক্ষ্য। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ব্লক চিহ্নিত করে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করছে সাংগঠনিক উদ্যোগ, যাতে যে মানুষগুলি এখনও নিরক্ষর আছেন তাঁদের সাক্ষর করে তোলা যায়।

কিন্তু সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি পর্যন্ত অগ্রগতির নানা সূচক আমাদের সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়। তবে সব অগ্রগতি কেবলমাত্র সাক্ষরতার জন্যই, একথা না বলে তাকে সমন্বিত প্রচেষ্টার ফল হিসাবেই দেখতে হবে এবং এই সামগ্রিক উন্নয়নের পিছনে সাক্ষরতা আন্দোলন একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষায় প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। "নবসাক্ষর মায়ের হাত ধরে নতুন প্রজন্ম স্কুলের দরজায় পা রেখেছে"। সেজন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ে নতুন করে সমস্যা তৈরি হল—এ সমস্যা সম্ভাবনাময় সমস্যা।

বীরভূম জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করতে হলে প্রতিটি শিশু-কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে হবে, আর এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে জেলার প্রতিটি নিরক্ষর মাকে সাক্ষর করে তোলা একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কারণ 'সাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর থাকে না' —একথা প্রমাণিত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও সর্বশিক্ষা অভিযান :

এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৯৭ সাল থেকে জেলাতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বা ডি পি ই পি শুরু হয়। ২০০৪ সালে ডি পি ই পি-এর কাজ শেষ হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আসে সর্বশিক্ষা অভিযান। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল—চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি শিশু-কিশোর-কিশোরীকে বিদ্যালয়ে অথবা কোনো না কোনো পরিপূরক শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসা, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের শিক্ষালয়ে ধরে রাখা এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করা। এজন্য বিদ্যালয়গৃহসহ সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনগণকে যুক্ত করে সমগ্র কার্য পরিচালনা করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কথা বলা আছে। বালিকাদের ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। বীরভূম জেলায় সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করতে হলে প্রতিটি শিশু-কিশোর-কিশোরীকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে হবে, আর এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে জেলার প্রতিটি নিরক্ষর মাকে সাক্ষর করে

বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল কর্মসূচি

তোলা একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কারণ 'সাক্ষর মায়ের সন্তান নিরক্ষর থাকে না'— একথা প্রমাণিত। গ্রাম বা ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। মাতা-শিক্ষক সমিতিকে কার্যকরী করে শিক্ষা প্রসারের সুযোগকে ব্যবহার করতে হবে। এই বিষয়টি বিবেচনায় থাকা জরুরি। সেই সঙ্গে জনগণকে যুক্ত করে শিক্ষা ও সাক্ষরতাকে সমন্বিত করে জনআন্দোলন গড়ে তোলাটা আজকের সময়ের দাবি। গ্রাম/ওয়ার্ডে শিক্ষা কমিটি গড়া হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গুচ্ছ-সম্পদ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, চক্র-সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের কার্যধারা চালু আছে। জেলা থেকে গ্রাম পর্যন্ত সমস্ত স্তরেই পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা গেছে। জেলাতে সামগ্রিক অভিযান পরিচালনার নেতৃত্বে আছে জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান কমিটি। জেলা পরিষদের সভাধিপতি এই কমিটির চেয়ারম্যান। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ এবং কোনো না কোনো ধরনের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকা বিভাগসমূহকে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তদারকি ব্যবস্থা আছে—একে আরও গতিশীল করা দরকার। সর্বশিক্ষা অভিযানের কাজে মানুষের আশা বাড়ছে।

বীরভূম জেলার শিক্ষার কথা বলতে গেলে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করে থাকা যাবে না, সে হল জনশিক্ষা প্রসারের মাধ্যম পাঠাগার। নানা কারণে হয়ত এর পাঠক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে, কিন্তু সে পর্যালোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে ১১৪টি, শহর বা মহকুমা গ্রন্থাগার ৯টি, জেলা গ্রন্থাগার ১টি সহ মোট ১২৪টি গ্রন্থাগার আছে জেলা জুড়ে। সেই সঙ্গে ১৯টি জনগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার বিভাগের। এখন পর্যন্ত জেলায় ১১টি জনগ্রন্থাগার চালু করা গেছে। গ্রন্থাগারগুলিতে নানা ধরনের, নানা স্বাদের বই রাখার পাশাপাশি স্কুল পাঠ্যপুস্তক এবং নবসাক্ষরদের জন্য পুস্তক-পুস্তিকাও রাখা হচ্ছে।

মানুষের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনই নানা ধরনের সুযোগও উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু সুযোগকে ব্যবহার করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বীরভূম জেলাকে আরও সক্রিয় হতে হবে। বিভিন্ন উদ্যোগকে সংহত করে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শিক্ষাই উন্নয়ন, শিক্ষাখাতে ব্যয় অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নয়—এই বিষয়টিকে সর্বস্তরে অনুভবের মধ্যে আনার প্রয়োজন আছে। পঞ্চায়েত, প্রশাসন, বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষক সমাজকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ শিক্ষায় অগ্রগতি ছাড়া সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু সবাই শিক্ষা প্রসারে আগ্রহী তা বলা যায় না। যদি একজন সাক্ষর মানুষ একজন নিরক্ষর মানুষকে

সাক্ষর করার দায়িত্ব নিতেন তাহলে শতকরা ৬২ জন সাক্ষর জেলায় শতকরা ৩৮ জন নিরক্ষর থাকতেন না। কিন্তু আছেন। আছেন এ কারণেই যে, সবাই চায়না নিরক্ষর মানুষ সাক্ষর সচেতন সক্ষম হয়ে উঠুক। সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রসার পরিকাঠামোগত সমস্যা আছে, শিশু শ্রমিক সমস্যা আছে, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজনের একটা অংশের মনে নিষ্ক্রিয়তা-অনীহা আছে এটা অস্বীকার করা যাবে না। শিশু শিক্ষা, নারী শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য আরও নিবিড় ও সুসংহত পরিকল্পনা নিতে হবে।

পরিশেষে একথা বলতে হবে যে, বীরভূম জেলা অনেক পিছিয়ে পড়া জেলা। এখানে শিক্ষা প্রসারে বাধা অনেক। কিন্তু নানা ধরনের বাধা কাটিয়ে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা প্রসারের যে কাজ চলছে তার ফলে অগ্রগতির নিরিখে তা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কবি জয়দেব, কবি চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত এবং অমর্ত্য সেনের কাজের অন্যতম ক্ষেত্র এই জেলা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রতি প্রত্যয় ঘোষণা করেছে। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা প্রসারের কর্মকাণ্ড জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সাফল্যের নজির রাখছে তা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে, শিশুমৃত্যুর হার কমাতে, স্বাস্থ্য চেতনা প্রসারে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিসহ জীবনের মানোন্নয়নে তার প্রভাব আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় শ্রদ্ধেয় অমর্ত্য সেন শিক্ষার কাজে আরও গণউদ্যোগ সৃষ্টি করা, জনগণকে যুক্ত করার জন্য আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। এখানেই থামা নয়, আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেবলমাত্র সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে নয়, মানবসম্পদের সুপরিকল্পিত বিকাশসাধনই এই শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্য। শিক্ষা সকলের জন্মগত অধিকার—এই অধিকার অর্জনের লক্ষ্যেই বীরভূম এগিয়ে চলেছে।

বীরভূম জেলার শিক্ষাবিষয়ক কিছু তথ্য একনজরে

১। মহকুমা—৩টি
২। ব্লক—১৯টি
৩। পৌরসভা—৬টি
৪। চক্র—৩২টি (সর্বশিক্ষা অভিযানে চক্রসম্পদকেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত)
৫। গ্রাম পঞ্চায়েত—১৬৭টি
৬। গ্রাম শিক্ষা কমিটি—২১০৮
৭। ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি—১০১
৮। গুচ্ছ সম্পদকেন্দ্র—১৭৯
৯। প্রাথমিক বিদ্যালয়—২৩৭০
   (ক) ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী—৩৪০২০১
   (খ) শিক্ষক-শিক্ষিকা—৮০৯১
১০। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়—১০৬
১১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়—১৯৯
১২। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়—৭১
১৩। মাদ্রাসা (হাই)—১৪
১৪। মাদ্রাসা (নিম্ন মাধ্যমিক)—১০
১৫। সিনিয়র মাদ্রাসা—৪
১৬। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে (৮ম শ্রেণি পর্যন্ত) ছাত্রছাত্রী—২০৪৬৩৯
১৭। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকা—২৫৩৭
১৮। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র—৬৪৬
   (ক) ছাত্রছাত্রী—৪১২০২
   (খ) সহায়িকা—১২৭৬
১৯। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র—৭৭
   (ক) ছাত্রছাত্রী—৬০৩৭
   (খ) শিক্ষা সম্প্রসারক—১৭৬
২০। কলেজ—১১
২১। পলিটেকনিক—১
২২। আই টি আই—১
২৩। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—১ (বেসরকারি)
২৪। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র—৩টি
২৫। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র (বেসরকারি)—৩টি
২৬। বিশ্ববিদ্যালয়—১টি

সূত্র :

১। বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস : বীরভূম এল এস এস ও ম্যালী
২। এ স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব বীরভূম —ডব্লুউ ডব্লুউ হান্টার
৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস : বীরভূম —দুর্গাদাস মজুমদার, ডিসেম্বর, ১৯৭৫
৪। DISE Report . DPEP & S. S. A., Birbhum
৫। ভারতের জনগণনা প্রতিবেদন
৬। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

কৃতজ্ঞতা : আলোচনা করে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় অরুণ চৌধুরি

লেখক : বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
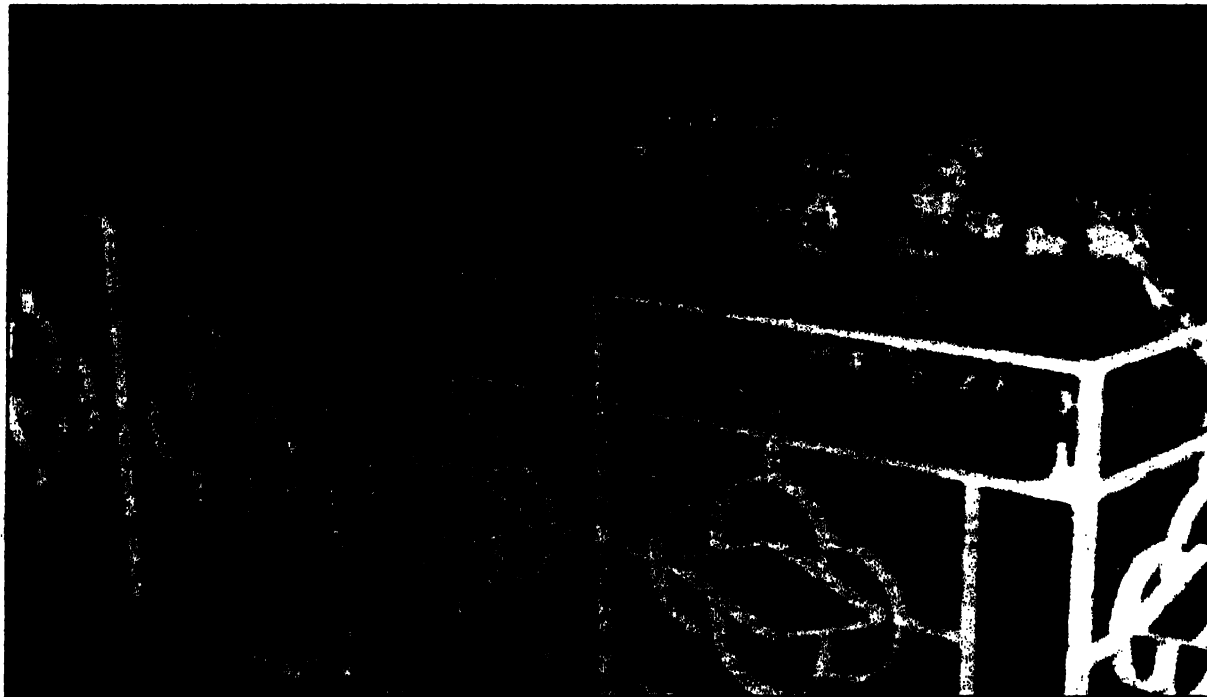
দাতাবাবা মেহবুব শাহ-র মাজার

মেহবুব শাহ-র মাজারের তোরণদ্বার
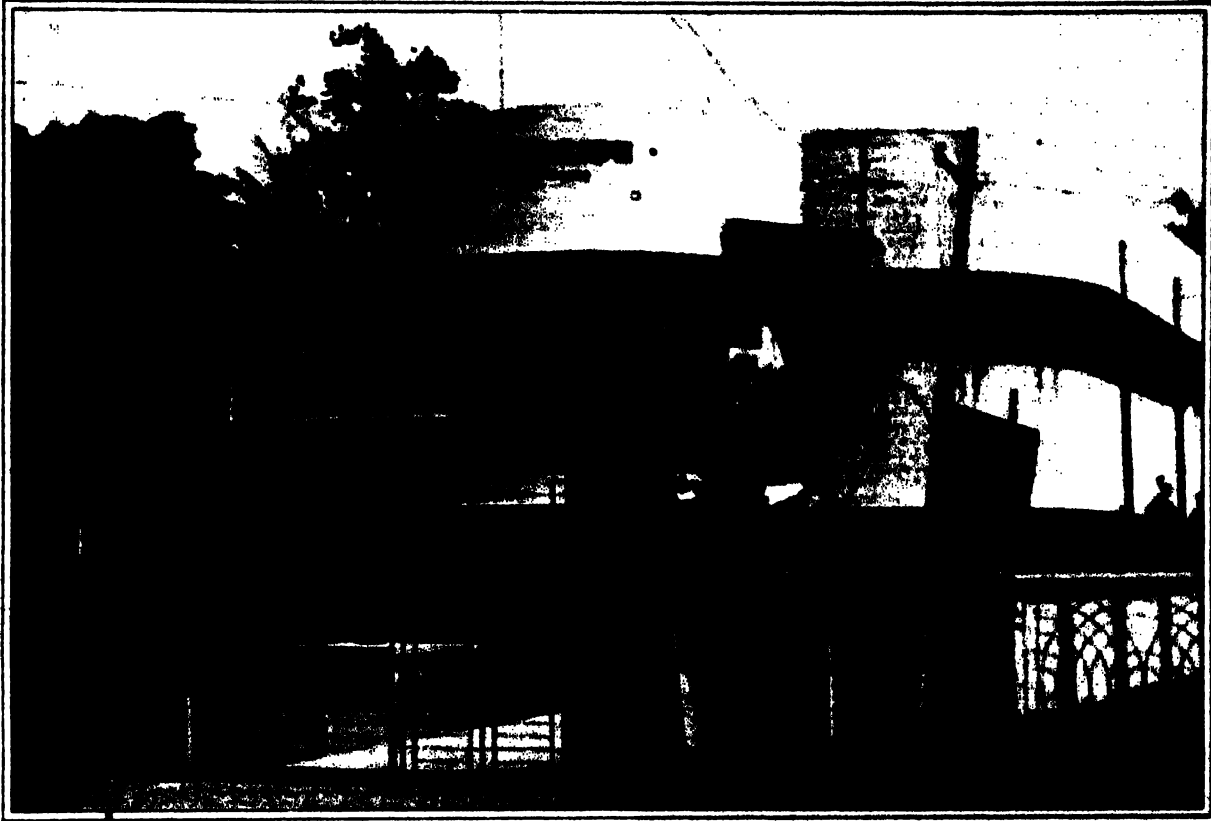
বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার

বীরভূম জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন

সুশান্ত রাহা

১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থাগারে এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার মধ্য দিয়ে বাংলা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়! ১৮৩৫ সালে বাংলায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হয় এবং ১৮৩৬ সালের ২১ মার্চ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের উপর এই গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, বিশেষত ১৯০৫ সালের পর বাংলার মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। যুব সমাজের উৎসাহে ও উদ্যোগে বাংলার গ্রাম ও শহরে শত শত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর (যা গ্রন্থাগার দিবস নামে পরিচিতি লাভ করেছে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপন এক্ষেত্রে এক মাইলস্টোন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গের এই গতিময় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল থেকে সরকারি স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়। বীরভূম এই ধারার ব্যতিক্রম নয়।

জেলার কথা

জেলার ১০৪ বছরের প্রাচীন গ্রন্থাগার বিবেকানন্দ লাইব্রেরী। এর পূর্বতন নাম ছিল রামরঞ্জন টাউন হল অ্যাণ্ড জুবিলী লাইব্রেরী। প্রতিষ্ঠার সময় হেতমপুর রাজ পরিবারের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রসারের অঙ্গ হিসাবে দেশের অন্যান্য জায়গার মতো এই জেলায়ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে অতীতের দিকে তাকালে দেখতে পাই,—হেতমপুর, রাজনগরের রাজপরিবার, লাভপুর, পাঁড়ো, কুণ্ডলা, জাজিগ্রাম, পাইকর, রায়পুর, সুপুর ইত্যাদি স্থানের জমিদাররা আগ্রহ ও সৌজন্য দেখিয়েছিলেন পুঁথি রচনা, সংরক্ষণ ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। রামপুরহাটের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জে এল ব্যানার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর গ্রন্থ ছিল। বর্তমান রামপুরহাট মহকুমা গ্রন্থাগার তাঁর নামে নামাঙ্কিত। তাঁর ছিল দ্বৈত সত্তা, এক সত্তায় তিনি শিক্ষাব্রতী আর এক সত্তায় তিনি দেশব্রতী। জয়দেব, বীরচন্দ্রপুর, ভাণ্ডীরবনের মতো দেবস্থানগুলিতেও পুঁথি ও ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষিত থাকত।

বীরভূম সাহিত্য পরিষদ ভবন, সিউড়ি সৌজন্যে : কিশোরীরঞ্জন দাশ

সিউড়ি শহরের বীরভূম জেলা স্কুলেও (১৮৫১, ৯ই ডিসেম্বর স্থাপিত) একটি লাইব্রেরীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। সিউড়ি শহরের উকিল, মোক্তার ও সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা স্কুল থেকে বই পেতেন, বইয়ের মূল্য জমা রেখে। কিন্তু এই সুযোগ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এমনি করেই ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার। প্রথমে এই জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় ছিল বীরভূম জেলা লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশান, যা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শাখা হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে আরও গ্রন্থাগার সরকারিভাবে এবং বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠে।

বর্তমানে এই জেলায় সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১২৪। এই সমস্ত গ্রন্থাগারই বর্তমানে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কৃত্যক, বীরভূমের নিয়ন্ত্রণাধীন। এলাকার আয়তন ও লোকসংখ্যা সহ জেলার গ্রন্থাগারের তালিকা নিচে দেওয়া হল :

সিউড়ি পৌরসভা

(আয়তন ৯,৪৮ বর্গ কিমি. ১৮টি ওয়ার্ড সমন্বিত, লোকসংখ্যা ৬৪,০৭২)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
১। বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার সিউড়ি	৪৪,৯৯৭	৩৭২৪
২। সিধু-কানু স্মৃতি পাঠাগার ওল্ড সার্কিট হাউস, সিউড়ি	৩৪৭৯	২৪০
৩। সামসুজ্জোহা জাকিয়া পাবলিক লাইব্রেরী	৫০২২	৩৪৩
দুবরাজপুর পৌরসভা, (আয়তন ১৬.৮৩ ব. কিমি। লোকসংখ্যা-৩২,৭৫২)		
৪। দুবরাজপুর টাউন লাইব্রেরী	১০,৩০৮	৫২৫
সাঁইথিয়া পৌরসভা, (আয়তন ৭.৮৮ ব. কিমি। লোকসংখ্যা-৩৫,৪২৮)		
৫। সাঁইথিয়া টাউন লাইব্রেরী	৯,৪৩৪	৫৪৮
বোলপুর পৌরসভা, (আয়তন ১৩.১৩ ব. কিমি। লোকসংখ্যা-৬২,৪৫৮)		
৬। বোলপুর সাধারণ পাঠাগার (শহর গ্রন্থাগার)	৯,৮০০	১,১৮০
৭। প্রফুল্ল সেন কৃষ্টি পরিষদ গভ: স্পনর্সড রুর‍্যাল লাইব্রেরী বোলপুর	৫,৩০৪	৩০৫
রামপুরহাট পৌরসভা, (আয়তন ৫.১০ ব. কিমি। লোকসংখ্যা-৫১,০৫২)		
৮। জিতেন্দ্রলাল মহকুমা গ্রন্থাগার রামপুরহাট	১০,৮৪৫	৯৪০
নলহাটি পৌরসভা, (আয়তন ৬.৬৬ ব. কিমি। লোকসংখ্যা-২৪,৬৭২)		
৯। নলহাটি টাউন লাইব্রেরী, নলহাটি	৬,৭১৪	৬২৫

গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার

সিউড়ি ১ নং উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৫৫.৩৮ ব. কিমি. ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, লোকসংখ্যা-৯১,৩৬৭)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
১০। কড়িধ্যা শহর গ্রন্থাগার, কড়িধ্যা	৯,৬১৯	৮৭৪
১১। নগরী বাণী মন্দির পাবলিক লাইব্রেরী, নগরী	৪,২০৮	২৫৭
১২। ভুরকুনা গ্রামীণ পাঠাগার, ভুরকুনা	২,৬৪০	৩৮
১৩। হুকুমাপুর আঞ্চলিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার, খটঙ্গা	২,৬১৮	২৫৮
১৪। বিদ্যাসাগর স্মৃতি পাঠাগার	২,৪৭৪	৩৪৮

সিউড়ি ২ নং উন্নয়ন অঞ্চল (আয়তন-৬৩.৮৯ ব. কিমি. ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-৭৬,৮৮০)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
১৫। পুরন্দর রুর‍্যাল লাইব্রেরী (গভ: স্পনর্সড) পুরন্দরপুর	৫,২০২	১৫০
১৬। অবিনাশপুর গভ: স্পনর্সড রুর‍্যাল লাইব্রেরী, অবিনাশপুর	৪৩০২	১৩৫
১৭। ধলটিকুরি রুর‍্যাল লাইব্রেরী (দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েত) ইকরা	২,৮১৯	৮৫
১৮। কোমা রুর‍্যাল লাইব্রেরী, জানুরী	১,৯৪৫	৩০৮
১৯। বনশঙ্কা বিদ্যাসাগর গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বনশঙ্কা	৪,০০৪	৮১

রাজনগর উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-২২১.১০ ব. কিমি. ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-৭২.৬১৬)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
২০। রাজনগর সাধারণ পাঠাগার রাজনগর	৫,৮৯৯	৩২[illegible]
২১। মাধাইপুর পল্লিমঙ্গল গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী (চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) মাধাইপুর	৫,৯৮৪	১৮০
২২। আলিনগর ট্রাইবাল এরিয়া লাইব্রেরী (গাংমুড়ি-জয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত) আলিনগর	২,২৮৪	৩২৫
২৩। তাঁতিপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার, তাঁতিপাড়া	৩,০৮৪	১৩৪

খয়রাশোল উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-২৭১.১২ ব. কিমি. ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৪৪,০৫৫)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
২৪। খয়রাশোল মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, খয়রাশোল	৩,২৯৭	২৬৫
২৫। লোকপুর অগ্রণী রুর‍্যাল লাইব্রেরী লোকপুর	৩,৬২৪	৪৫৩
২৬। পাঁড়ো কমলা যুব সংঘ গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী, পাঁড়ো হাট	৬,৬১৯	১২৮
২৭। নৃসিংহ স্মৃতি পাঠাগার (বরমা গ্রাম পঞ্চায়েত), বড়া	২,৭২২	২০৮
২৮। কেন্দ্রগড়িয়া কল্যাণ সংঘ লাইব্রেরী কেন্দ্রগড়িয়া	২,৮৮৮	৩৫০
২৯। রূপুসপুর শৈলজানন্দ স্মৃতি পাঠাগার রূপুসপুর	২,৩৫৬	২৮৪
৩০। নাকড়াকোন্দা ফাল্গুনী পাঠাগার নাকড়াকোন্দা	১,৯১২	৭৫

দুবরাজপুর উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-৩৪২.৭১ ব. কিমি. ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৫৮,৫৭৮)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
৩১। বালিজুড়ি রুর‍্যাল লাইব্রেরী, বালিজুড়ি	৫,৩২৮	১১৫
৩২। হেতমপুর রামরঞ্জন সাধারণ পাঠাগার হেতমপুর	৩,০০২	৩১৫
৩৩। নজরুল সুকান্ত পাঠাগার (চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েত), চিনপাই	২,৫৯৯	৩৮০
৩৪। আনসার স্মৃতি গ্রামীণ পাঠাগার (সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), যাত্রা	২,৪৭১	২৪৫
৩৫। গোয়ালিয়ারা উন্নয়ন রুর‍্যাল লাইব্রেরী গোয়ালিয়ারা	৪,৭৬০	১০০

সাঁইথিয়া উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-৩০১.২০ ব. কিমি. ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৮৩,০২৩)

গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা	পুস্তকসংখ্যা	সদস্যসংখ্যা
৩৬। গড়গড়িয়া হৃষীকেশ স্মৃতি পাঠাগার গড়গড়িয়া	৩,১০৩	২০০
৩৭। আমোদপুর জয়দুর্গা লাইব্রেরী আমোদপুর	৩৬৯৫	২৬০
৩৮। কচুইঘাটা মণীন্দ্র স্মৃতি গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী (ভ্রমর কোল গ্রাম পঞ্চায়েত), কচুইঘাটা	৪৯০১	১৪৫
৩১। দেরিয়াপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার দেরিয়াপুর	২৯৬৪	১৮৫
৪০। নবদিগন্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগার (ফুলুর গ্রাম পঞ্চায়েত), বলাইচণ্ডী	২৪৯১	২৩২
৪১। সিউড়ি পল্লিমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার (শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), পূর্ব সিউড়ি	২৪৪৮	১৭৫

মহম্মদ বাজার উন্নয়ন অঞ্চল (সিউড়ি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-৩১৩.৪০ ব. কিমি. ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৩৭,২৫৬)

৪২।	উদয়ন পাঠাগার (মহম্মদ বাজার গ্রাম পঞ্চায়েত), মহম্মদ বাজার	৩৩৩৬	১৯৫
৪৩।	কুলকুড়ি বঙ্কিম গ্রন্থাগার (রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত), কুলকুড়ি	৫৬৫২	১৮৫
৪৪।	গণপুর সবুজ সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার, গণপুর	২৯৯৩	২৪৫
৪৫।	আলিনগর বান্ধব পাঠাগার (ভাঁড়কাটা গ্রাম পঞ্চায়েত), মকদমনগর	২৩৪১	১৮৫
৪৬।	শান্তিসংঘ গ্রামীণ পাঠাগার (ডেউচা গ্রাম পঞ্চায়েত), ডেউচা	১৯৭২	২২০
৪৭।	আনন্দ সুহৃদ পাঠাগার (ভুতুরা গ্রাম পঞ্চায়েত), সেওড়াকুড়ি	২৫০৬	২২৫

ইলামবাজার উন্নয়ন অঞ্চল (বোলপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-২৫৯.৫০ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৪২,৬৫৬)

৪৮।	ইলামবাজার রুর‍্যাল লাইব্রেরী (ইলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত)	৪০৭৬	৩২০
৪৯।	ঘুরিবা নির্মল মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার	৭০৪৮	২০৫
৫০।	হরিমতি স্মৃতি পাঠাগার (মঙ্গলডিহি গ্রাম পঞ্চায়েত)	২৬৫২	১৭৫
৫১।	খুষ্টিগিরি গ্রামীণ সাধারণ পাঠাগার (বাতিকার গ্রাম পঞ্চায়েত)	২৪৩০	৩১০
৫২।	কবি জয়দেব সাধারণ পাঠাগার (জয়দেব-কেন্দুলি গ্রাম পঞ্চায়েত)	২২৩৮	৩৮৫
৫৩।	গৌরীসুন্দর স্মৃতি পাবলিক রুর‍্যাল লাইব্রেরী (শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েত)	২৫৬০	১৪৫
৫৪।	বাতিকার বঙ্কিম রায় স্মৃতি পাঠাগার বাতিকার	২৪৪২	২৩০

বোলপুর-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন অঞ্চল (বোলপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-৩৩৩.৫২ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৭৯,৪১৫)

৫৫।	বেড়াগ্রাম পল্লিসেবা নিকেতন, গৌরীবালা স্মৃতি পাঠাগার (কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত)	৬৯৯৬	৫৭
৫৬।	মহিদাপুর সাধারণ পাঠাগার (রায়পুর-সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত)	৩১৮১	১৪৫
৫৭।	সিজি আগে চলো সাধারণ পাঠাগার	১৯৫৩	১৯২
৫৮।	বাহিরী সাহিত্য পাঠাগার গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী (বাহিরী-পাঁচশোয়া গ্রাম পঞ্চায়েত)	৫৬৬২	১৪০
৫৯।	দ্বিজপদ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী (সিয়ান মুলুক গ্রাম পঞ্চায়েত)	৪৪৫৮	৪৮০
৬০।	শ্রীনিকেতন এরিয়া লাইব্রেরী	১১৮৭৫	৮২৫
৬১।	সর্পলেহনা আলবাঁধা গ্রাম পঞ্চায়েত আঞ্চলিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার	২১৫৫	৩৮৮

নানুর উন্নয়ন অঞ্চল (বোলপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-৩০৯.২০ ব. কিমি. ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৯৮,৬৬৯)

৬২।	নানুর চণ্ডীদাস স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার	৩০৫৩	২৮৫
৬৩।	উচকরণ গভ: স্পনসর্ড পাবলিক রুর‍্যাল লাইব্রেরী	৩৭৩৮	২২৫
৬৪।	হাটসেরান্দি বাণীভবন রুর‍্যাল লাইব্রেরী (চারকলগ্রাম, গ্রাম পঞ্চায়েত)	৪১২২	২৭০
৬৫।	দীননাথ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার, খুজুটিপাড়া (নবনগর-কড্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত)	৩৬৪৯	৬৯০
৬৬।	কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি টাউন লাইব্রেরী	৯৯১৯	৩৬৫
৬৭।	দাসকলগ্রাম ত্রাণ সমিতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী	১৫৬৩	১২০
৬৮।	আব্দুল হালিম স্মৃতি গ্রন্থাগার, সরডাঙ্গা (কীর্ণাহার ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	১০১১	৮৭
৬৯।	বড়া কিশোর সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার (বরহা-সাওতা গ্রাম পঞ্চায়েত)	৩০৮০	১৩৫

লাভপুর উন্নয়ন অঞ্চল (বোলপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-২৬৪.৮২ ব. কিমি. ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৮১,১৮৪)

৭০।	চৌহাট্টা সতীশ স্মৃতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী (চৌহাট্টা মহোদরী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	৪৪৩৭	৩৫২
৭১।	হাতিয়া আনন্দ সংসদ-ক্লাব-কাম রুর‍্যাল লাইব্রেরী	৪৪১২	১৭৫
৭২।	লাভপুর অতুলশিব ক্লাব রুর‍্যাল লাইব্রেরী (লাভপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	৫৭৪২	৪২০
৭৩।	আব্দুল হালিম স্মৃতি পাঠাগার (থিরা গ্রাম পঞ্চায়েত)	২৪৯০	৪১৫
৭৪।	বিপ্লবী সত্যেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার (লাভপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	২৪৭৪	৩৩০
৭৫।	জামনা ধ্রুববাটী পল্লি উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী	২৫০৭	৩৩৫
৭৬।	বিপ্রটিকুরী মনোরমা কালীপদ স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার	২২৪২	৩২৫
৭৭।	তাঁতিনাপাড়া গ্রামীণ পাঠাগার (চৌহাট্টা পঞ্চায়েত ভবন) (মহোদরী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	১৮০০	১৭৫

রামপুরহাট ১নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৭৭.৬৬ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৫৮,৫০৮)

৭৮। খরুণ শক্তি সংঘ পাবলিক-কাম-গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী ৭৩৬৯ ২৯৫

৭৯। প্রগতি সংস্কৃতি চক্র রুর‍্যাল লাইব্রেরী (নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) ৪৬১৪ ২০৫

৮০। দখলবাটী রুর‍্যাল লাইব্রেরী ২৬৫০ ২৩০

৮১। আয়াস সমাজ কল্যাণ লাইব্রেরী ২১২৫ ১৯৫

৮২। শালবাদরা রুর‍্যাল লাইব্রেরী ২০১৩ ১৪০

৮৩। কাষ্ঠগড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২৩২৬ ২০৫

রামপুরহাট ২নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৮৪.২২ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৬৩,৪১২)

৮৪। চাঁদপাড়া রুর‍্যাল লাইব্রেরী (দুনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত) ৪৭১১ ২৮০

৮৫। কড়কড়িয়া পল্লিমঙ্গল গ্রন্থাগার (সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) ২৩০৫ ১৫০

৮৬। বিনয় স্মৃতি পাঠাগার (বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) ৩১২৩ ২১০

৮৭। বারমল্লিকা তরুণ সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বুধিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত) ২২৭৮ ১৯৫

৮৮। চন্দন স্মৃতি পাঠাগার জয়সিংহপুর (সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) ২২৩০ ২২৩

৮৯। মাড়গ্রাম বান্ধব সমিতি লাইব্রেরী ২১৭২ ২৬০

৯০। কানাইপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ১৯৩৬ ১৪৫

ময়ূরেশ্বর ১নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-২২১.৩১ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৩৭,৫৭৮)

৯১। অগ্রণী সংঘ পাবলিক রুর‍্যাল লাইব্রেরী (মল্লারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) ৪৮৯৯ ২৮৫

৯২। ফতেপুর বাজার মিতালী সংঘ টাউন লাইব্রেরী (মল্লারপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) ৮৫০৮ ৪০৫

৯৩। দক্ষিণগ্রাম তরুণ সংঘ রুর‍্যাল লাইব্রেরী ৫৭৯৯ ৩৪৫

৯৪। রসুলপুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২০২৪ ১৫০

৯৫। নেতাজী গ্রাম্য পাঠাগার (ডাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত) ২৩৬০ ২৬৫

৯৬। কানাচি রুর‍্যাল লাইব্রেরী ২৫০১ [illegible]

ময়ূরেশ্বর ২নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৮৪.২২ ব. কিমি. ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,১৬,৬০৫)

৯৭। কুণ্ডলা পল্লিমঙ্গল গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী ৬১৮৪ ৩৮৫

৯৮। রাধা বিনোদিনী গ্রামীণ পাঠাগার (বাটপলসা গ্রাম পঞ্চায়েত) ২৩১৫ ১৮৫

৯৯। নোয়াপাড়া ডাঃ কালিপতি মেমোরিয়াল পাবলিক রুর‍্যাল লাইব্রেরী (উলুকণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত ৬৩১৫ ১৯৫

১০০। লোকপাড়া গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী (ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েত) ৫৩৭৬ ৫৪৫

১০১। কৃপানাথ স্মৃতি পাঠাগার (ময়ূরেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত) ৩১৪৮ ৪১৫

নলহাটি ১নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৫৩.৭৪ ব. কিমি. ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৮১,৩৮৬)

১০২। পাইকপাড়া তরুণ সংঘ গভ: স্পনসর্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী ৪৭৮৫ ১৭০

১০৩। কুরুমগ্রাম সম্মিলনী পাবলিক কাম গভ: স্পনসর্ড লাইব্রেরী ৫১৫২ ৫৮০

১০৪। সোনার কুণ্ডু কিরিটী ভূষণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বাউটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত) ১৭৯৭ ৯৫

১০৫। কয়থা ইয়ং ম্যানস অ্যাসোসিয়েশন রুর‍্যাল লাইব্রেরী (কয়থা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) ৩৪৬১ ১৩৫

১০৬। উদয়নগর গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২১৩৯ ২৬৩

নলহাটি ২নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১০৭.৫২ ব. কিমি. ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,০৬,০১২)

১০৭। গোপালচক জনকল্যাণ সমিতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী (শীতল গ্রাম পঞ্চায়েত) ৩৭৩৫ ২৯৫

১০৮। ভদ্রপুর মহারাজা নন্দকুমার সাহিত্য সদন (ভদ্রপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) ২৭৯২ ৩৪৫

১০৯। উজিরপুর সবুজ মহল পাঠাগার (নোয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত) ২০৫০ ৩৪৫

১১০। বারা গোরাচাঁদ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (বারা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) ২৮৭৪ ৩৮০

১১১। ভবানীপুর রুর‍্যাল লাইব্রেরী (জ্যোষ্ঠা ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) ২০০৬ ৩২

মুরারই ১নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৬৭ ব. কিমি. ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৪৪,৬০১)

১১২। মহুরাপুর পাবলিক লাইব্রেরী ৫৯৬৪ ৩১৭

১১৩। কল্যাণ সমিতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী (চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত) ৩২০০ ২৪৭

১১৪। রাজগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ২১৪৮ ৪৫৫

১১৫। মুরারই আমাদের আশা গ্রামীণ পাঠাগার ১২৯৬ ৮৭

১১৬। গোর্সা গ্রামীণ পাঠাগার ২০১৯ ১৯৫

১১৭।	কনকপুর মিলন সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার (ডুমুরা গ্রাম পঞ্চায়েত)	১৫১২	১৯৫
১১৮।	পলসা প্রমোদ দাশগুপ্ত পাঠাগার	১৯০২	২৯৫
১১৯।	জোগাই তরুণ সংঘ পাবলিক কাম গভ: স্পনসর্ড লাইব্রেরী	৭০০৩	৪২৫

মুরারই ২নং উন্নয়ন অঞ্চল (রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, আয়তন-১৮৪.২২ ব. কিমি. ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত সমন্বিত, লোকসংখ্যা-১,৭০,৯৯১)

১২০।	পাইকর সত্যেন্দ্র পাবলিক কাম গভঃ স্পনসর্ড টাউন লাইব্রেরী (পাইকর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত)	৩৯১৬	১৯৫
১২১।	মিত্রপুর হাজী সামসুজ্জোহা স্মৃতি পাঠাগার	২০৫০	১৪৫
১২২।	জাজিগ্রাম দিলীপ মুখার্জি স্মৃতি গ্রামীণ পাঠাগার	২১৪২	১৯৫
১২৩।	রুদ্রনগর গ্রামীণ সাধারণ পাঠাগার	২৭৮৩	১৪৫
১২৪।	বিপ্রনন্দী গ্রাম রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি পাঠাগার	১৫১৫	২৬০

পরিশিষ্ট

কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রতন লাইব্রেরী (১৮৯৯)

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, শিবরতন মিত্র নিজ বাসগৃহে এই লাইব্রেরী গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমান রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের সামনেই এই রতন লাইব্রেরী ছিল। এই গ্রন্থাগার অমূল্য পুঁথি ও প্রাচীন আকর গ্রন্থের সমাহার-কেন্দ্র ছিল। বহু গবেষক এখান থেকে উপকৃত হন। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত না থাকলেও গবেষকরা এই গ্রন্থাগারের সাহায্য পেতেন। বীরভূমের অন্যতম ইতিহাস প্রণেতা হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় এখানেই সেই অর্থে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট বিরচিত পুঁথি এখানে ছিল। এর পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ দেখে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমগ্র গ্রন্থাগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় প্রত্যুত্তরে শিবরতন মিত্র বলেছিলেন—I can part with my sons, not with the book. শিবরতন মিত্রের সুযোগ্য সন্তান গৌরীহর মিত্র ছিলেন বীরভূমের ইতিহাসের অন্যতম এক রূপকার। তাঁর গ্রন্থ আজও গবেষক মহলে আদৃত। তাঁর পৌত্র ডঃ অমলেন্দু মিত্রও ছিলেন সুসাহিত্যিক ও রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতি গবেষক। পেশায় ছিলেন বীরভূম রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ "রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর" রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল। এই অমূল্য গ্রন্থরাজি পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পায়।

রামরঞ্জন পৌরভবন ও বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার (১৯০০)

বীরভূমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই প্রতিষ্ঠান। ১০৪ বছরের পুরানো সিউড়ি বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার অমূল্য পুস্তকরাজিতে পূর্ণ। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর হেতমপুর রাজাদের দান করা জমিতে বর্ধমান বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মিঃ জে কেনেডি (সি এস) সিউড়ি টাউন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট তদানীন্তন কমিশনার মিঃ সি জে এস ফোল্ডার সাহেব এই ভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। যিনি এক সময়ে ১৪-৪-১৮৮৮—৬-১১-৮৮ বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এই উদ্যোগ পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীরভূমের তদানীন্তন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে সিউড়ির সুপণ্ডিত লেখক ও ঐতিহাসিক শিবরতন মিত্র সিউড়ি শহরে একটি আদর্শ গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগকে সংহত করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। প্রথমে টাউন হল হিসাবে নির্মিত হলেও পরে এর সঙ্গে পাঠাগার যুক্ত হয় এবং নামকরণ হয় রামরঞ্জন টাউন হল অ্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরী। গ্রন্থাগার স্থাপনের পুরোধা অন্যতম আর এক ব্যক্তিত্ব হলেন বীরভূমের প্রথম ইতিহাস লেখক হেতমপুর রাজপরিবারের কুমার মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়। গ্রন্থাগারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হেতমপুর রাজ এস্টেট থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডেশ্বর তথা ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে পাঠাগারের নাম রাখা হয় "জুবিলী লাইব্রেরী।" স্বাধীনতার পর ১৯৬২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষে এই লাইব্রেরীর নামকরণ করা হয় 'বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার'।

মাত্র ছয়টি কাঠের আলমারী ও ৪৮০০ বই নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে এটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। সব মিলিয়ে ৫০/৫১ হাজার মূল্যবান বই বর্তমানে এখানে রয়েছে। বহু গবেষক এই গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়ে তাদের গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। বিধানচন্দ্র রায়, অন্নদাশংকর রায়, হুমায়ন কবীর, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রবোধচন্দ্র সেন, ফুলরেণু গুহ প্রমুখ এই গ্রন্থাগারের ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু বারবার পড়াশুনো করতে এই গ্রন্থাগারে এসেছেন। সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, আশালতা সিংহ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ সকলেই এই গ্রন্থাগারে পা রেখেছেন।

বীরভূম সাহিত্য পরিষদ (১৯১০)

বীরভূম সাহিত্য পরিষদের জন্ম ১৯১০ সালের আষাঢ় মাসে। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন। এই প্রতিষ্ঠান এক বিশেষ সংগ্রহশালা ও গবেষণার কেন্দ্রভূমি। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃতের মত বিভিন্ন সময়ে লিখিত শ'দেড়েক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এখানে রয়েছে। ২৫০ বছরের পুরানো

শতবর্ষের পুরাতন সিউড়ি বিবেকানন্দ পাঠাগার — সৌজন্যে : রবীন্দ্রনাথ দাস

এমনই এক বিরল দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এখানে রয়েছে, যার নাম 'সঙ্গীত দামোদর'। এছাড়াও 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি'র মতন প্রায় ৪০০'র বেশি পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংগ্রহও এখানে রয়েছে। ৮০০'র মতোন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ এখানে বর্তমান রয়েছে। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব দোতলা ভবন রয়েছে। মাসের প্রথম রবিবার নিয়মিত সাহিত্য সভার অধিবেশন বসে। তাতে অংশ নেন সংগঠনের ১২০ জন আজীবন সদস্য এবং ৭৫ জন সাধারণ সদস্যের অনেকেই। বিকালে সাহিত্যের আড্ডা। বসে প্রায় প্রতিদিনই। ৬৫টির মতোন পুস্তক পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সভাপতি ও সম্পাদকপদে বৃত আছেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক ও অধ্যাপক ড. কিশোরীরঞ্জন দাশ মহাশয়। সংগঠনের মুখপত্র 'বীরভূমি' নিয়মিত প্রকাশ পেয়ে চলেছে। পত্রিকার শতবর্ষ সংখ্যাটি বীরভূমের সন্তান লেখক শৈলজানন্দ ও সজনীকান্ত জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে প্রকাশ করা হয়েছে। যদিও পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯৯ সালে কীর্ণাহারের শিক্ষক নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। ১৯১১ সালে পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন বর্তমান সভাপতির পিতৃদেব কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, ভাগবতরত্ন। মাঝে কিছুদিন পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ ছিল। পরে বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদকের উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় নবপর্যায়ে 'বীরভূমি' প্রকাশিত হয় (১৯৭৩)। এখন বছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশ পায়। জেলার সাহিত্য আন্দোলন ও সাহিত্যচর্চা সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বীরভূম সাহিত্য পরিষদের অবদান অপরিসীম। পরিষদের সভাগৃহে নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা, সভা ও সাহিত্যিক এবং মহাপুরুষদের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করা হয়। নবীন কবি লেখক ও সাধারণ পাঠকরা এতে উপকৃত হন।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার (১৯৫৫)

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন আবর্তিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনাকালে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ৬১২০ বর্গফুটের বিতল গ্রন্থাগারটিতে ৮ খানি কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের দপ্তর (D.L.O. Office) এই ভবনে অবস্থিত। পুস্তকের সংখ্যা—৪৭৯৫৩।

এর মধ্যে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তকসংখ্যা	—	৩৩,১৪৭
ইংরেজি	—	১১,২৩১
হিন্দি	—	৩,৫৬৫
সাঁওতালী	—	১০

২২ ধরনের পত্র-পত্রিকা আসে এই গ্রন্থাগারে। কলকাতার ৯ খানি সংবাদপত্র পাঠককে সরবরাহ করা হয়। সাধারণ পুস্তক ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকের জন্য আলাদা ইস্যু কাউন্টার ও বিভাগ রয়েছে। সমৃদ্ধ শিশু বিভাগের সদস্য সংখ্যা ২৬৯ জন। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য চাঁদা দিতে হয় না। অন্যান্যদের মাসিক দুই টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। পুরুষ সদস্য সংখ্যা—৩৬২৯ জন। মহিলা সদস্যা রয়েছেন ৮২৪ জন। দৈনিক গড়ে দেড়'শখানি পুস্তক ইস্যু বা লেনদেন হয়। পাঠকক্ষে ১৪০/১৫০ জন পাঠক নিয়মিত পড়াশুনো করেন। শতাধিক পুঁথি এখানে রয়েছে।

কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য : বরুণ রায় সম্পাদিত 'বীরভূমি বীরভূম' গ্রন্থে প্রকাশিত সুব্রত রায় রচিত 'জনগ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আয়নাতিতে বীরভূম' প্রবন্ধের নির্বাচিত ও সম্পাদিত অংশ বিশেষ—সম্পাদক)

দেওয়ানজী শিবমন্দির (হেতমপুর) ছবি : সুকুমার সিংহ

ভাণ্ডারবন গোপাল মন্দিরের নহবতখানা ছবি : সুকুমার সিংহ
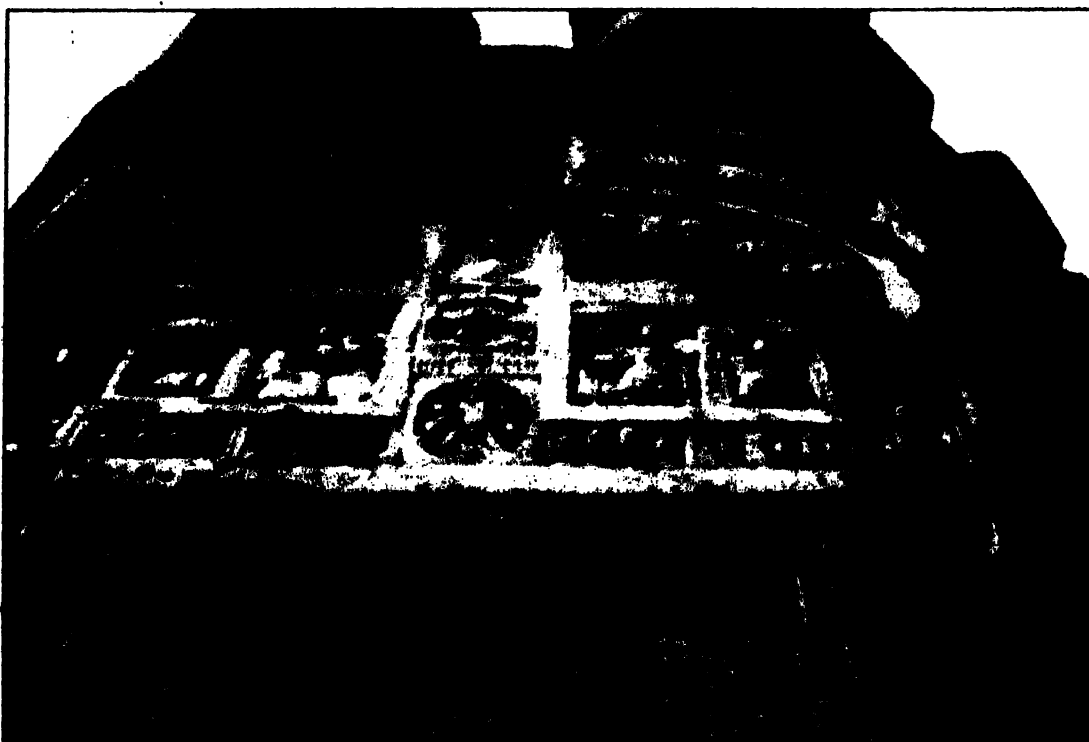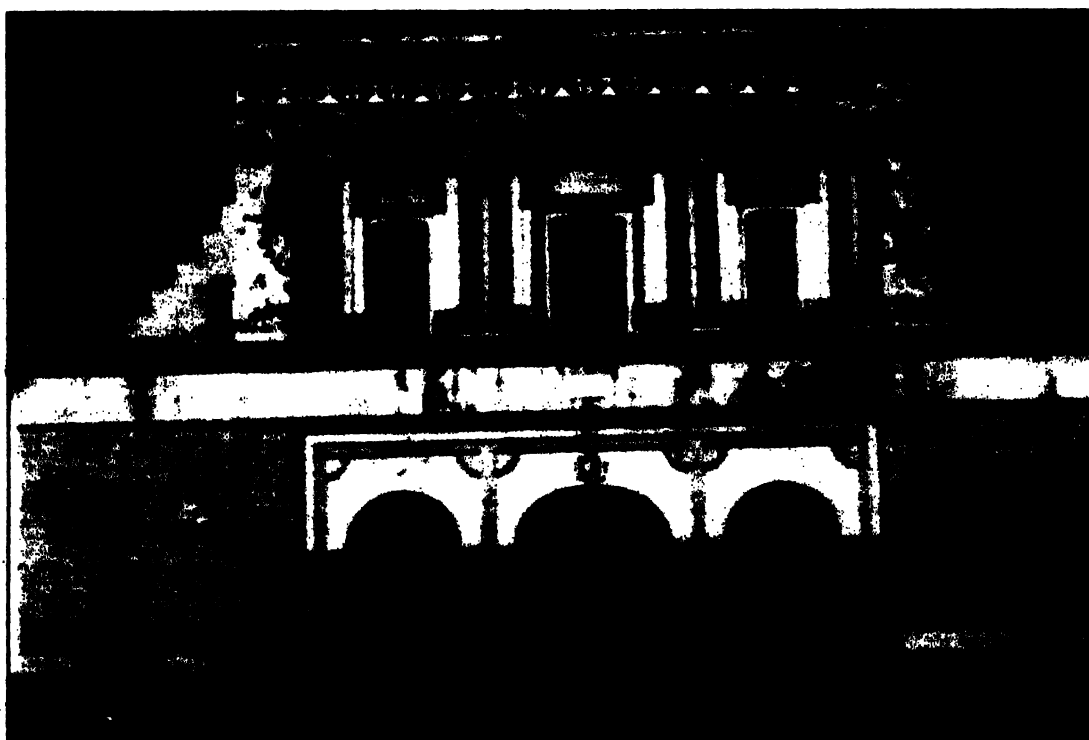
শ্রীনিকেতন কর্মীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বীরভূম জেলার সমবায় আন্দোলন

কালীপ্রসাদ ঘোষ

বীরভূম জেলার সমবায় আন্দোলনের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। মহাকালের বুকে পদচিহ্ন এঁকে আর্থ-সামাজিক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বীরভূমের রাঙা মাটি বরণ করে নেয় বর্ণালী সমবায় আন্দোলনকে। রাঙা মাটির সমবায় আন্দোলনের পথ অনুধাবন করতে গেলে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পর্যালোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

পশ্চিমি দেশগুলির মতো ভারতে সমবায় আন্দোলন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত জন্মলাভ করেনি। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মালিক পক্ষের চিরায়ত শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অর্থনৈতিক সংগ্রামের মঞ্চ হিসাবেই রচডেস ইকুইটেবল পাওনিয়ার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় কাপড় কলের পীঠস্থান ম্যাঞ্চেস্টার শহরে। সে ছিল সমবায় মহীরুহের প্রথম বীজ। ফলত সমবায় আন্দোলনের জন্মই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের ফসল হিসাবে।

ইংরেজ শাসনকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সন্তান জমিদার, পত্তনীদার, মহাজনেরা কৃষকশ্রেণির এই আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে চড়া সুদে ঋণ দাদন করে হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করেন। দিশেহারা এবং সর্বহারা কৃষকশ্রেণির অবদমিত আক্রোশের ক্রমশ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে এবং অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন মুম্বাই প্রদেশের পুণা ও আহমদনগরের চাষীরা। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তারা জমিদার, পত্তনীদার, মহাজনদের ঘরে জোর করে প্রবেশ করে ঋণের নথিপত্র, হ্যান্ডনোট, দলিল দস্তাবেজ ছিনিয়ে নিয়ে এসে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ ছিল এক শ্রেণি বিদ্রোহ। টনক নড়ে ইংরেজ শাসকদের। তার আগে সাঁওতাল বিদ্রোহ পূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি মূল কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে। বিদ্রোহী এবং শোষিত নেটিভদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে ঋণ দান ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন, আই সি এস মহাশয়কে ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন, সে দেশের ঋণ-গ্রস্ততা সমস্যা কেমন করে সমাধান করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে এবং সেই পদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রবর্তন করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করে তার প্রতিবেদন পেশ করতে। ফলত সমবায় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক আইন 'দি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট'-এর জন্ম হল ১৯০৪ সালের ২৫ মার্চ। রাজপত্রে তা প্রকাশিত হল এবং পথ চলা শুরু হল।

অবিভক্ত বাংলায় সমবায় আন্দোলনের দুই প্রাণপুরুষ হলেন—একজন স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন অপরজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনচাষা কবিগুরুর সমবায় আন্দোলনের ধাত্রীভূমি হল পতিসর এবং পরীক্ষাগার হল রাঢ় বাংলার মালভূমিসিক্ত বীরভূম জেলায়, আর হ্যামিলটন সাহেবের কর্মযজ্ঞ ছিল ভয়াল সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে পত্তনীকৃত জনপদ দ্বীপগুলিতে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেবের সমবায় কর্মধারা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। আমরা কবিগুরুর উদ্যোগধন্য বীরভূম জেলা সমবায় আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করছি যার চালচিত্র নিম্নরূপ।

বীরভূমের শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে সমবায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সামসুদ্দিন হুসাইন এবং শান্তিদেব ঘোষের পিতা কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার পল্লীগুলির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৫ সালে কবিগুরু সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন।

এই সময়ে বীরভূমে স্বাস্থ্যসমবায় গড়ে ওঠে। অবিভক্ত বাংলাদেশে কালীমোহন ঘোষ গ্রাম সমীক্ষা করেন। সেই সমীক্ষার প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে, শ্রীনিকেতন পার্শ্ববর্তী কতগুলি গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠে বাঘগোড়া স্বাস্থ্যসমবায় যার প্রাণপুরুষ ছিলেন অবশ্যম্ভাবীভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে এবং রোগ নিরাময়ে সাহায্য করতে এর কার্যক্রম বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। আজ ভাবলে অবাক লাগে যুগের ভাবনায় কতদূর তিনি এগিয়ে ছিলেন এবং এ ধরনের সমবায়সমিতি আজও কত প্রাসঙ্গিক। প্রয়াত একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুবরাজপুরে স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি তৈরি করেছিলেন যা এলাকার মানুষকে আজও সেবা দিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন (অমর্ত্য সেনের মাতামহ), প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ দ্বারা সমবায়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বিশ্বভারতী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক' যা আজও বোলপুর শহরে রবীন্দ্রকর্মের সাক্ষ্য দেয় এবং উপরোক্ত মনীষীদের স্বহস্ত লিখিত কার্য বিবরণী এবং অন্যান্য নথি বীরভূম রেঞ্জ সমবায় সহ নিবন্ধক কার্যালয়ে কিছু আছে। কবিগুরুর বিচিত্রগামী তথা প্রায় সর্বত্রগামী প্রতিভার বিচ্ছুরণ সমবায় আন্দোলনকেও সম্পৃক্ত করেছিল তা বলাই বাহুল্য। তাঁর সমবায় ভাবনা বিষয়ক প্রবন্ধ সমবায় চিন্তার মাইল ফলক স্বরূপ। কবিগুরু সমবায় চিন্তা চেতনাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, তিনি নোবেল প্রাইজ বাবদ প্রাপ্ত সাম্মানিক অর্থ তাঁর জমিদারির এলাকাভুক্ত কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন।

বীরভূম জেলার সমবায় আন্দোলনে কবিগুরু যদি প্রখর তপনতাপে বিকিরণ করেন তবে পাশাপাশি বলতেই হয় অরাবীন্দ্রিক কিছু সমবায় সমিতিও ঐতিহ্য ও কর্মে সমুজ্জ্বল। প্রথমেই মনে আসে 'জল বাবাজীর কথা'। অধুনা ময়ূরেশ্বর ২-ব্লকের ষাটপলসা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৈরি হয় সেচ সমবায়। এর পিছনের ইতিহাস চিত্তাকর্ষক এবং প্রেরণাদায়ক।

ষাটপলসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বারগ্রামের গোপাল পারিবারিক দুর্ঘটনায় সংসার নিস্পৃহ হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। মণিকর্নিকা নদীর যার স্থানীয় নাম 'ডাউকী' ধারাপথ বেয়ে দীক্ষান্তে গোপীনাথ বাবাজী ভিক্ষা করে বেড়াতেন (মাধুকরী) ৩০ / ৩২টি গ্রামে। গ্রামীণ কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে তিনি বৈপ্লবিকভাবে ভাবলেন ডাউকীর বয়ে যাওয়া জলধারা আটকে সেচব্যবস্থা করা যায়। এ নিয়ে গান বাঁধলেন। :

তোরা কে নিবি গো আয়
ডাউকীতে ধানের বন্যা ভেসে যায়।
কোদাল পেছে নেরে সাথে
শ্রীভগবান হবেন সহায়।
জল হবে না দেশে / তোরা ভাবছিস কি বসে
দশে মিলে আয়রে চলে / আছে তার ভালো উপায়।

শ্রীনিকেতন সমবায় সম্মেলন ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ। উপস্থিত আছেন এলমহার্স্ট, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন কর, নেপাল রায় প্রমুখ

তোরা জমির পাশে গেলে / নদী বয়ে যায় চলে
তা দেখরে চোখ মেলে / দাদপুরে তার পুল বাঁধিলে
থাকবে না আর চাষের ভয়।
দশজনের শক্তি তাতে হবে যুক্তি
আছে পুরাণেতে উক্তি
বনের পশু সাগর বাঁধে রামায়ণে শুনা যায়।

অনুরণিত হল নতুন রাগিণী। এই রাগিণী বৈরাগ্যের নয়, এ রাগিণী জীবনের। রাগিণী হলো মানুষের শক্তির ও চেতনার উদ্দীপক। আর জনজাগরণের বৈতালিক বৈষ্ণব ব্যবস্থায় পরিচিত হলেন 'জলবাবাজী' নামে। ১৯২৪ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের 'District Collector' জে আর ব্ল্যাকউডসাহেব দাদপুর ডাউকি জল সরবরাহ সমবায় সমিতির নিবন্ধন করেন। প্রায় ২৫টি গ্রামে সেচের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন বছরে বিঘা প্রতি ১ (এক) টাকা 'জলকর' হিসাবে আদায় করত ওই সমবায় সমিতি। আজও এ সেচ ব্যবস্থা বর্তমান।

রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত সমবায় সমিতি গঠনের আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৯০২ সালে রামপুরহাট মহকুমার কুলমোড় গ্রামে, ফতেপুর গ্রামে (অধুনা মল্লারপুর বাজার), কানাচি গ্রামে সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠে। এদের উদ্যোক্তাদের বিষয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না তবে কানাচি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এখনও কাজ করে চলেছে। কানাচি সমবায় সমিতি পরবর্তী সময়ে প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক আইনে ১৯০৯ সালে নিবন্ধিত হয়।

প্রাকস্বাধীনতা পর্বে গঠিত এ জেলার চারটি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক গ্রাম্য কৃষি ঋণদান সমবায়সমিতিগুলির মাধ্যমে মূলত স্বল্প / অল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ দাদন ও আদায়ের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। এদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ—

সিউড়ি : ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি, বীরভূম সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় জেলার সদর শহর সিউড়িতে। রেজিস্ট্রেশন নং-১। কার্যকরী এলাকা নির্ধারিত হয় 'সিউড়ি সদর মহকুমা।' উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন— বিজয়কুমার মুখার্জি, ভৈরবনাথ ব্যানার্জি, ক্ষিতিশচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র মুখার্জি, শৈলেশচন্দ্র ব্যানার্জি, কালিকানন্দ মুখার্জি প্রমুখ।

রামপুরহাট : সমসাময়িককালে রামপুরহাট শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় রামপুরহাট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড। উদ্যোক্তা হিসাবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কমলাপ্রসন্ন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভোলাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নলহাটি : ১৯২৭ সালের ২৭ নভেম্বর রামপুরহাট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক এলাকা যা সমগ্র রামপুরহাট মহকুমা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, তা থেকে নলহাটি ও মুরারই থানা এলাকা দুটি বিয়োজন করে নলহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নলহাটি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ধরণীধর মুখোপাধ্যায় যিনি নলহাটি হরিপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, যাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে উক্ত বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রাবাসের একটি ছোটো ঘরে এই ব্যাঙ্কের সূচনা হয়। ১৯২৯ সালের মে মাসে তিন হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকায় ইমারতসহ তিন কাঠা জমি ক্রয় করে নিজস্ব বাড়িতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম স্থানান্তরিত হয়।

অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—অঘোরনাথ দাস, খান বাহাদুর মৌলবী মদ্দশ্বর হোসেন, উপেন্দ্রনাথ রায়, নলিনাক্ষ সিংহ, ডাঃ মুণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ আব্দুল আজিজ এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীনিকেতন (বিশ্বভারতী): ১৯২৭ সালের ২২ নভেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। রেজিস্ট্রেশন নং ১২৪। সিউড়িস্থিত সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটিডের কার্যকরী এলাকা থেকে বোলপুর, নানুর ও ইলামবাজার থানা এলাকাগুলি বিয়োজন করে ওই এলাকাগুলি বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের কার্যকরী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিপ্রসাদ বসু, জগদানন্দ রায়, গৌরগোপাল ঘোষ, হেমবালা সেন প্রমুখ।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের পথিকৃত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সপরিবারে বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের অংশীদার সদস্য হয়ে তাঁকে সন্তান স্নেহে পালন ও পোষণ করেছিলেন।

৭ পৌষ, ১৩৩৫ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভায় রবীন্দ্রনাথ যে আশীর্বাণী দিয়েছিলেন তা আজও অমোঘ উচ্চারণে আমাদের আকর্ষণ করে—

"UTTARAYAN
SANTINIKETAN
BIRBHUM.

Dated .. 18.2. ....193?.

To

The Secretary,
Visva-Bharati Central Co-op. Bank Ltd.,.
Sriniketan.

Dear Sir,

I desire to withdraw the sum of Rupees Four Thousand only from my Fixed Deposit Account, by the end of March next.

Though the amount was deposited for one year, I hope the Directors will be good enough to sanction the withdrawal.

Yours faithfully,

Rabindranath Tagore

বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে চার হাজার টাকা তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের আবেদন

"মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই, এইখানেই তার প্রাণের নিকেতন, লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।

...."ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রী বন্ধন দ্বারা বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধরাশির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রদেবতার অভিশাপকে সেই সাধকের দেশ হইতে তিরস্কৃত করুন এই আমি একান্ত মনে কামনা করি।"

স্বাধীনোত্তর পর্ব

'নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা সমিতির (১৯৫৩-১৯৫৪) সুপারিশ অনুযায়ী সমগ্র দেশের সঙ্গে বীরভূম জেলাতেও ছোটো ছোটো সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সংযোজনে আর্থিক শক্তিশালী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠনের প্রয়াস শুরু হয়।

জেলার সমবায়ের এই সন্ধিক্ষণে একীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুতভাবে রূপায়িত করতে জেলার অন্যান্য সমবায়ীদের সঙ্গে এগিয়ে আসেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

প্রথম পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের ২২ অগাস্ট বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড মিশে যায় সিউড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬২ সালের ২৯ ডিসেম্বর রামপুরহাট সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং নলহাটি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং পূর্বোক্ত সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংযুক্তি পরবর্তী নাম হয় 'বীরভূম জেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। কার্যকরী এলাকা হয় সমগ্র বীরভূম জেলা।

বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত বীরভূম জেলায় সমবায় আন্দোলন প্রবাহ এখনও চলছে এবং এগিয়ে চলেছে।

	সমবায় সমিতির রকম	সংখ্যা
১।	সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড (ল্যাম্পস, এক এস সি এস সহ)	৩৫০টি
২।	সমবায় বিপণন সমিতি লিমিটেড	১৯টি
৩।	প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড	৬৩টি
৪।	শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড	৫০টি
৫।	প্রকরণ সমবায় সমিতি লিমিটেড	১টি
৬।	ইঞ্জিনিয়ার্স কোঃ অপাঃ সোসাইটি লিমিটেড	১০৯টি
৭।	লেবার কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (কো অপাঃ সোসাইটি) লিমিটেড	১৮৮টি
৮।	চাকুরিজীবীদের ঋণদান সমবায় সমিতি	৩৬২টি
৯।	মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড	৩টি
১০।	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১টি
১১।	জলসরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড	১১টি

১২।	হোলসেল কনজুমার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি	১টি
১৩।	দুগ্ধ সরবরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড	২৩টি
১৪।	স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি লিমিটেড	৩টি
১৫।	প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	২৪টি
১৬।	ইলেকট্রিক কোঃ অপাঃ সোসাইটি লিমিটেড	১টি
১৭।	সিনেমা কোঃ অপাঃ সোসাসটি লিমিটেড	১টি
১৮।	পোলট্রি সমবায় সমিতি লিমিটেড	২টি
১৯।	সমবায় খামার সমিতি লিমিটেড	৭টি
২০।	পরিবহন সমবায় সমিতি লিমিটেড	১১টি
২১।	আবাসন সমবায় সমিতি লিমিটেড	৫০টি
২২।	প্রাইমারি কনজুমার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	৬৫টি
২৩।	বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড	১টি
২৪।	এগ্রিল রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড	২টি
২৫।	ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড	১টি
২৬।	ডিস্ট্রিক কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন	১টি
২৭।	কোঅপারেটিভ কেন্দ্র স্টোরেজ সোসাইটি লিঃ	৪টি
২৮।	বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৩টি
২৯।	শস্যভাণ্ডার সমবায় সমিতি লিমিটেড	৩১টি

জেলা সমবায় আন্দোলনে প্রতিষ্ঠানগতভাবে যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে সেগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড—আমানত সংগ্রহের পরিমাণ দুইশত কোটি টাকার উর্ধ্বে, দাদনের পরিমাণ ষোল কোটি টাকারও উর্ধ্বে, দাদন দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বর্তমানে এই ব্যাঙ্কের প্রকল্প রূপায়ণী সংস্থা হিসেবে দায়িত্বে বীরভূম জেলা সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প চলছে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের যৌথ প্রকল্প যার রূপায়ণে এই ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতিকে মূলধনী, পরিকাঠামো এবং প্রশিক্ষণগত সাহায্য দিয়ে (১) সদস্য বৃদ্ধি, (২) ব্যবসা বৃদ্ধি, (৩) আয় বৃদ্ধি, (৪) আমানত বৃদ্ধি, (৫) কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি ও (৬) সেচ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রকল্প কাজ করে চলেছে এবং জেলা সমবায় আন্দোলনের নূতন মাত্রা হিসেবে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

রামপুরহাট কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং বীরভূম কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড উভয় ব্যাঙ্ক মিলে সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১৮,৮৪৩। দাদনের, পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

শহরাঞ্চল সমবায় ব্যাঙ্ক (ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড) আমানতের পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। দাদনের পরিমাণ সাড়ে তিন কোটির উর্ধ্বে। এছাড়া রয়েছে সমবায় চালকল সমবায় হিমঘর, হোলসেল কনজুমার্স কোঅপারেটিভ, আদিবাসী সমবায় উন্নয়ন নিগম ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্যতার বিচারে এদের ভূমিকা আরও প্রয়াসের দাবি রাখে।

বেনফেড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন মহাসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় তার সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৭২ সালে বীরভূম শাখা অফিস খোলা হয় মূলত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

(১) সমবায় বিপণন সমিতিগুলিকে কার্যকরী করে তার মাধ্যমে চাষীদের কাছে সরকারি ও ন্যায্যমূল্যে বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ করা।

(২) অভাবী বিক্রয় থেকে চাষীকে রক্ষা করা এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসল ক্রয় করা।

(৩) সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে সমস্ত মানুষকে সমবায়মুখী করার প্রচেষ্টা।

বেনফেড বীরভূম শাখা সেই লক্ষ্যে কাজ করতে নেমে ১৯৭৪ সালে সার ব্যবসায় রাজ্যে ৮ম স্থান থেকে ৪র্থ স্থানে চলে আসে। বিগত ২০ বছরের মধ্যে বেনফেড বীরভূম শাখার সার ব্যবসায় ১৪,০০০ টন থেকে ৬০,০০০ টনে এসে দাঁড়ায় ওই সময়ে সার ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসাও যথা আলু সংগ্রহের কাজ, বীজ, কীটনাশক এবং কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা প্রসারণের পরিবর্তে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ১৯৯৮ সালে নির্ধারিত বোর্ড আসার পর আবার সবরকম ব্যবসা চালু হয় এবং গত ৬।৭ বছরে বেনফেড বীরভূম শাখায় নিম্নলিখিত ব্যবসাগুলি করা হয়—

(১) গড় প্রতি বছর প্রায় ৬০,০০০ টন সার সমবায় বিপণন সমিতি ও সমবায় উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে চাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

(২) গত ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ সালে সরকার নির্ধারিত মূল্যে যথাক্রমে ২৯০০, ১০,০০০, ১৯০০ টন চাষীদের কাছ থেকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

(৩) যেখানে সমবায় সমিতি দুর্বল অথবা অচল সেখানে বেনফেড নিজস্ব সেল-সেন্টার খুলে চাষীদের প্রয়োজনীয় সার বীজ ইত্যাদি জোগান দিচ্ছে।

চাষীদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার লক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে বীরভূম জেলার ধান কেনার ফলে চাষীরা উপকৃত হয়েছেন এবং রাজ্যে ধানের দামের ক্ষেত্রে স্থিতি-স্থাপকতা লক্ষ করা গিয়েছিল।

জেলায় ব্লক স্তরে ১৯টি প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি (PAMS) থাকলেও বর্তমানে বেনফেডের মাধ্যমে মাত্র ১২টি মার্কেটিং সমিতি কাজ করছে তার মধ্যে ৪টি ব্লক মার্কেটিং সমিতি ঠিকমতো কাজ করছে ও চাষীদের সার, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করছে।

জেলায় ৩৩০টি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি থাকলেও এই কাজে বেনফেডের মাধ্যমে মাত্র ৬৫টি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি যুক্ত আছে। ওই ধরনের সমিতির মধ্যে বেশ কয়েকটি সমিতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা বন্ধ হবার মুখে, কয়েকটি কৃষি সমবায় সমিতি শুধু ঋণ দাদনের সঙ্গে যুক্ত আছে।

এর কারণ পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বোর্ড না থাকা, পরিচালক মণ্ডলীর সচেতনতার অভাব বিশেষ করে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অডিট, বিভিন্ন বিষয়ে অজ্ঞতা, কর্মী ও পরিচালক মণ্ডলীর দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া ও স্বজন পোষণ।

সমবায়গুলো মূলত ভূমিওয়ালা মধ্যবিত্ত ধনীশ্রেণির সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে। ভূমিহীন ক্ষেতমজুর গ্রামীণ শ্রমিক গরিব কৃষকের কাছে সমবায়ের বহুমুখী কাজের ধারাকে প্রসারিত না করার ফলে 'সমবায় আমার সংগঠন এই সংগঠন আমার রুটি রুজির সংগ্রামের হাতিয়ার' এই ধারণা গড়ে না ওঠার ফলে সমাজের ভিতকে স্পর্শ করেনি। সমবায় আন্দোলন জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার 'সর্বজনীন সদস্য পদের' ধারণাকে নিয়ে আসেন। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিগুলিতে সমাজের ভিত্তি গরিব কৃষক, ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ শ্রমিক ও কারিগর ও গ্রামীণ মহিলাদের যুক্ত করা যায়। সমাজের এই অংশে জমি না থাকলেও ২ টাকা ভর্তি ফি দিয়ে কৃষি সমবায়ের সদস্য পদের জন্য আবেদন করে সমবায় সমিতির সদস্য হওয়া যায়। রাজ্য সরকার প্রতিটি সর্বজনীন সদস্যদের জন্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিকে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা হিসাবে ৫টি শেয়ারের মূল্য ৫০ টাকা করে দিয়ে দেন।

আমাদের জেলায় সর্বজনীন সদস্য আংশিকভাবে কিছু কিছু কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে কার্যকরী হলেও তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেনি ফলে জেলার কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক অংশ গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রত্যেকটি সংস্থার মূল চালিকা শক্তি হল তার কর্মীরা, পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে কর্মীদের হৃদ্যতা ও বোঝাপড়া জরুরি। এক্ষেত্রে জেলার সমবায় কর্মীরা আর্থিক দিক থেকে দারুণভাবে পিছিয়ে রয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে সমবায় সমিতির আয় বাড়িয়ে কর্মীদের আর্থিক মান উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

১৯৯২ সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD) অপ্রথাগত ঋণদান ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর স্কিম চালু করেছে। এই গোষ্ঠী গ্রাম ও শহরের সমসাময়িক ভাবনা সমঐতিহ্য, সমআয় পাশাপাশি অবস্থান ও সমপ্রকৃতির গরিব মানুষেরা নিজেদের সঞ্চয় থেকে নিজেদের ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা, তারা ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি থেকে যাতে ঋণ নিতে পায় তার ব্যবস্থা আছে। এটি একটি স্বেচ্ছা প্রকল্প। ৫ থেকে ২০ জন মহিলা নিয়ে একটি দল বা (Group) হবে।

আমাদের জেলায় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি/গ্রাম পঞ্চায়েত/এন জি ও-র মাধ্যমে বেশ কিছু স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হলেও বিভিন্ন স্তরে যথোপযুক্ত উদ্যোগ নিয়ে আরও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের সম্ভাবনা আছে। তবে মহিলাদের দ্বারা গঠিত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি ভালো কাজ করছে।

সমৃদ্ধি ও জাতি গঠনে চালিকা শক্তি হিসাবে সমবায় আন্দোলনের সমস্ত কর্মীদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। সমবায় সেবা থেকে যদি আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা বঞ্চিত হয় তবে তাদের আবার ফিরে যেতে হবে সুদখোর মহাজনদের কাছে। অথবা বাধ্য হয়ে চুক্তি চাষ মেনে নিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলির জোগানদারে পরিণত হবে। বিগত দিনের নীল চাষীদের মতো প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে বীরভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে সমবায়ের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে হলে কৃষি প্রধান মানুষ এই বিশ্বায়নের যুগে আরও অন্যান্য পেশায় যুক্ত মানুষের মধ্যে সমবায় সচেতনতা বাড়িয়ে তাদের সমবায়মুখী করে সমবায় গঠন করতে হবে।

সমবায় শতবর্ষে সমস্ত সমবায়কে পুনরুজ্জীবিত করে বীরভূম জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এই হোক আমাদের শপথ।

রবীন্দ্রভাবনায় বলি 'সমবায় নীতি মনুষ্যত্বের মূল নীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। সভ্যতা শব্দের অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র সমাবেশ।'

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবি হউক।

ঋণ স্বীকার/তথ্যসূত্র

(১) শ্রীঅরুণ চৌধুরি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
(২) ধূসর মাটি (সাপ্তাহিক পত্রিকা, বীরভূম)
(৩) বীরভূমি ও বীরভূম।
(৪) সমবায় কর্মী
(ক) নইমুর রহমান।
(খ) স্বপন চৌধুরি।
(গ) আবুল কালাম।
(৫) এ আর সি এস অফিস বীরভূম।

লেখক : ডাইরেক্টর, বেনফেড, বীরভূম

বীরভূমের পল্লীপ্রকৃতি

বীরভূমের অতীত ও বর্তমান সমাজ চিত্র : সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

শুচিব্রত সেন

ইতিহাস রচনার পরিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে সামাজিক ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্বের স্বীকৃতির প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সামাজিক ইতিহাসের সংজ্ঞা নিরূপণকে কেন্দ্র করে বিতর্ক অনিবার্য ওঠে। জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ানের সামাজিক ইতিহাসের প্রাথমিক সংজ্ঞা 'কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রাচীনকালের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা' বর্তমানে আর গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক ইতিহাসের পরিধি বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে। একদিকে যেমন মার্কসবাদী বীক্ষা অনুসারে উৎপাদন সম্পর্ক ভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে ইতিহাসের মূল নির্দেশিকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে ব্রদেল, লাব্রুস, লাঁদুরির মতো এ্যানাল গোষ্ঠীর প্রখ্যাত পণ্ডিতরা ইতিহাসের প্রায় সমস্ত শাখাকেই সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে এক সামগ্রিক ইতিহাস বা Total History-তে রূপ দিতে চেয়েছেন। ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে একদা প্রাচ্যবাদীরা (The Orientalists) ধর্মকেই সমাজ সংগঠনের মূল ভিত্তি বলে মনে করেছিলেন।

পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্ব ভারতীয় সমাজকে হিন্দু ও মুসলমান দু-ভাবে বিভক্ত করে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত বিভেদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। ম্যাক্স ওয়েবার থেকে শুরু করে স্ট্রাকচারালপন্থী লুই ডুমো পর্যন্ত সবারই মোটামুটি এই ধারণা যে ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় প্রাধান্য সবসময় ধর্ম-নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রটিকে অবদমিত করে রেখেছিল।

পশ্চিমি পণ্ডিতদের এই ধরনের বক্তব্য একদিকে যেমন ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন জটিলতাগুলি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যদিকে অঞ্চল-ভেদে ভারতের গ্রাম-জীবনের মূল সুরটির উপলব্ধি তাঁদের কাছে থেকে গিয়েছে অজ্ঞাত। উত্তর ভারতের গ্রামীণ কাঠামোর বর্ণ-বৈষম্যের চরিত্রকে মাপকাঠি ধরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলা বীরভূম, বাঁকুড়ার সমাজ-জীবনকে বিচার করা সঙ্গত হবে না। এই সব অঞ্চলে বর্ণ-সমন্বয় না থাকলেও অবশ্যই ছিল এক ধরনের বর্ণ সমঝোতা, সেই সঙ্গে ধর্মাচরণের পশ্চাৎপটে উৎসব বা সামাজিক মিলনের তাৎপর্যটুকুও লক্ষ্যণীয়। এর ঐতিহাসিক কারণ নির্দেশ করে বহু পূর্বেই নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন, 'বস্তুত সমাজ বিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। .....মধ্যগাঙ্গেয় ভারতে যে ভাবে আর্য, বিশেষভাবে আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাংলাদেশ সে ভাবে তাহা করে নাই। ....বস্তুত, বাংলাদেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। বাংলাদেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্ত মিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ ভারতের মত এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই। বস্তুত, বাংলার সমাজ বন্ধনে তথাকথিত শূদ্র জাতির লোকদের প্রাধান্য।'[১]

বীরভূমের জনগোষ্ঠীর নিরিখে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য সমধিক সত্য। ১৯০১-এর জনগণনাকে উদাহরণ হিসাবে ধরলে দেখা যাবে ব্রাহ্মণের তুলনায় সদগোপরা সংখ্যায় বেশি এবং মিলিতভাবে তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও সদগোপদের মিলিত সংখ্যার অপেক্ষা অনেক বেশি।[২] এই অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে আছেন বাগদি, মুচি, ডোম, মাল, বাউড়ি, হাড়ি, লেট, জোলা প্রভৃতি। ১৮৭২, ৮১-র জনগণনায় সদগোপরা সংখ্যাধিক্য থাকলেও ১৯০১-র জনগণনায় বাগদিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে পরিগণিত হয়।[৩] এ ছাড়াও বীরভূমে জনগোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাঁওতালরা। ১৮৭২-এ তাদের সংখ্যা ছিল ৬,৯৫৪, ১৯০১-এ সেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ৪৭,২২১-এ।[৪] ধর্মভিত্তিক বিভাজনে স্বাভাবিকভাবে হিন্দুদের পরেই স্থান মুসলমানদের। ১৮৭২-র এঁরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬.৬ ভাগ, ১৯০১-এ ২২.৩৪ এবং ১৯৫১-তে ২৬.৮৬ ভাগ।[৫] সমাজ-অর্থনীতির নিরিখে একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অন্যান্য জায়গার মতো বীরভূমেও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলির মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি।[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বীরভূমের মুসলমান-দের মধ্যে পাঠান, শেখ, সৈয়দ এবং জোলারাই প্রধান। এখানকার পাঠান রাজাদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক ধারাবাহিকতা। শেখ এবং সৈয়দরাও সুফি মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বীরভূমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যতিক্রমী অনুপস্থিতির জন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীর এই চরিত্রটি অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। এমনকি ১৯৪৭ সালে দেশব্যাপী ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও একজন মুসলমানও বীরভূম পরিত্যাগ করেছেন এমন তথ্য নেই।'[৭] ও-ম্যালীর বিবরণে আমরা যে জনগোষ্ঠীর বিবরণ পাই তার চেয়ে আরও কিছু বেশি জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন অশোক মিত্র। যেমন কোঁড়া, লোহার, শুঁড়ি, রাজবংশী জালিয়া কৈবর্ত, কোনাই প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই তফসিলি সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে যদুপতিয়ারা যার উল্লেখ ও-ম্যালী এবং অশোক মিত্র উভয়েই করেছেন, এরা প্রধানত আমোদপুর, সিউড়ির পানুরিয়া, ময়ূরেশ্বরের দাদপুর এবং রামপুরহাটের বেলে অঞ্চলে বাস করেন। বৃত্তিগত ভাবে এরা পিতলের কারিগর এবং পটুয়ার কাজ করে থাকেন। যমপাটা বা নরকচিত্রাঙ্কনে এদের প্রসিদ্ধি আছে। ধর্মীয় জীবনে যদুপতিয়ারা একাধারে আল্লা এবং অন্যদিকে কালী, মনসা প্রভৃতির উপাসনা করে থাকেন। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই এই বৃত্তি ত্যাগ করেছেন।

বস্তুত, বাংলাদেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও, ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দুই একটি সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। বাংলাদেশে নানা নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে, প্রচুর রক্ত মিশ্রণের ফলে এবং নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতভেদ-বর্ণভেদের বৈষম্য আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ ভারতের মত এত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই। বস্তুত, বাংলার সমাজ বন্ধনে তথাকথিত শূদ্র জাতির লোকদের প্রাধান্য।

বীরভূমের পল্লীপ্রকৃতি

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে তো বটেই ষাটের দশকের প্রথম ভাগেও বীরভূমের সামাজিক জীবন ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিস্তরঙ্গ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গের অভিঘাত উঠত বৃহত্তর সামাজিক জীবনে তা মিলিয়ে যেত অচিরেই। রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে যদি বা কিছু সামাজিক চলমানতা দেখা দিয়েছিল, তার থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে তা আদৌ দৃশ্যমান ছিল না। তারাশঙ্করের গণদেবতার অনিরুদ্ধ কামাররা সংখ্যায় ছিলেন খুবই কম। বিপরীতে যা ঘটছিল তা হল 'একটা প্রকাণ্ড আবর্তনের আলোড়নের টানে নিচের জলকে উপরে টানিয়া তুলিতে চাহিতেছিল সমুদ্রের অন্তঃস্রোত-ধারার আকর্ষণেই সে উচ্ছ্বাস ভাঙিয়া পড়িল। নিরুৎসাহ নিস্তেজ জীবনযাত্রায় আবার দিনরাত্রিগুলি কোনরকমে কাটিয়া চলিল।'[৮] আসলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমাজ থেকে উত্থিত না হওয়ার ফলে শুধু বীরভূম নয় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রামাঞ্চলেরই সামাজিক অবস্থা ছিল পরিবর্তনবিমুখ। উপরন্তু সেই মান্ধাতার আমলের কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই বয়ে যেত গ্রামীণ জীবন। রাস্তাঘাটের অবর্ণনীয় দুরবস্থায় বিশেষত বর্ষাকালে শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র গরুর গাড়ি। বর্ধমানের মতো বীরভূমে কোনো শিল্প বা খনি অঞ্চল না থাকায় বীরভূমের শহরগুলিকেও উন্নত গ্রামের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া সম্ভব ছিল না। শিল্প বলতে ধানকল, আর সাঁইথিয়ায় নারকেল তেলের মিল। তাঁতিপাড়ায় যে উন্নত ধরনের তসর ও তাঁত বস্ত্র তৈরি হত তাও মূলত ছিল কুটির শিল্প-ভিত্তিক।

বীরভূমে নগরায়নের সময়কে কোনো সন তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তবে একটি গবেষণাপত্রের ভূমিকায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত উল্লেখ করেছেন যে ১৮৫৯ সালে বোলপুরের মধ্যে দিয়ে যে রেলওয়ে লাইন (লুপ) পাতা হয় সেই সময় থেকেই এখানে নগরায়নের সূচনা।[৭] এই গবেষণাপত্রে দেখান হয়েছে যে ১৯৫০-এ বোলপুর পৌর শাসনাধীনে আসে এবং ১৯৫১-৬১-র মধ্যে এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এর অন্যতম কারণ অবশ্যই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমন এবং বিশ্বভারতী। বাণিজ্যিক দিক থেকে অবশ্য বোলপুরের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ ছিল চালকলগুলির মধ্যে। শহর হিসাবে বোলপুরের শ্রীবৃদ্ধির আরও একটি কারণ হল বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বোলপুরে স্থায়িভাবে বসবাসের প্রবণতা। উপরন্তু চারপাশের বহু গ্রামের মধ্যে বোলপুরই ছিল একমাত্র বাজার।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে শহরের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা মোটামুটি এই রকম— যে কোনো পৌরসভা সংপৃক্ত জায়গা যেখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম

নয়। উপরন্তু এও বলা হয়েছে 'As far as possible to treat as towns in places which are of a more or less urban character.' সেই হিসাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বীরভূমে সিউড়ি, রামপুরহাট, দুবরাজপুর, বোলপুরে শহর গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্তগুলি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। ১৯৫৫-র মধ্যেই রামপুরহাট, দুবরাজপুর এবং বোলপুরে ইউনিয়ান কমিটি তৈরি হয়। সিউড়িতে পৌরসভা এর আগেই স্থাপিত হয়েছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে সিউড়ি জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য হেতমপুর এবং কান্দলার জমিদাররা দান করেন যথাক্রমে পঁচিশ হাজার ও দশ হাজার টাকা। বিশের দশকেই সিউড়ি শহরে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও কোলকাতার নাট্যদলের নাটক মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হত। 'ভূমিলক্ষ্মী' এবং 'বীরভূমবাণী' ও 'বীরভূমবার্তা' পথ সংবাদপত্রের আবির্ভাব তখনই হয়েছে ১৯২১-এ। সাঁইথিয়াও শহর হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। কোলকাতা ও অণ্ডালের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ ও ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রের জন্য সাঁইথিয়ার গুরুত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই ছিল। তবে তারও আগে তীর্থস্থান ও তাকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন মেলা ও গরুর হাট হত তার ফলে গ্রাম থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের গঞ্জে রূপায়ণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। মাড়োয়ারি জৈন সম্প্রদায়, গন্ধ বণিক, আদিবাসী শ্রমিক, বাঙালি, রাজস্থান থেকে কিছু ঠাকুর সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, বিহারের সিং ব্রাহ্মণ এবং বাউড়ি, হাড়ি, মুচি মিলে সাঁইথিয়ায় তৈরি হয়েছিল এক মিশ্র জনসম্প্রদায়।*

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষভাগেও বীরভূমের গ্রামীণ জীবনে নগদ অর্থের প্রচলন যে খুব বেশি ছিল সে কথা বলা যাবে না। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্রের সমীক্ষা ও বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একই সিদ্ধান্ত বহন করে। বোলপুর শহর থেকে পাঁচ থেকে দশ মাইল (তখন মাইল প্রচলিত ছিল) দূরবর্তী সমস্ত গ্রামে পুরোহিত, নাপিত, কামার, কুমোর প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিজীবীরাই মাসিক মূলত বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানের বিনিময়ে তাদের কাজ সমাধা করতেন। চাষের কাজে নিযুক্ত মুনিস বা মাহিন্দাররাও তাদের বেতন হিসাবে পেতেন ধান, খড় ও গুড়। বাগাল বা যারা গরু চরাত তাদেরও নগদে বেতন দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেন না। গ্রামের যে কোনো সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের আগে মোড়ল বা গ্রামপ্রধান সভা ডাকতেন। বীরভূমে মোড়ল সাধারণত ছিলেন সদগোপরা (ঘোষ, মণ্ডল, গঁড়াই উপাধিধারীরা ছিলেন সদগোপ)। এই সভায় ঠিক হত কে কত ধান চাঁদা হিসাবে দিতে পারবেন। বাজনদাররা বাজনা বাজাবার বিনিময়ে পেতেন গৃহস্থ বাড়িতে খাওয়া ও কয়েক গোলা মদ। যে কোনও পূজার বিসর্জনের সময় লাঠি খেলার চল ছিল খুব এবং বাগদিরা লাঠি খেলার জন্য কয়েক গোলা মদেই সন্তুষ্ট

সাঁওতালী কিশোর

থাকতেন। যে কোনো পূজার বিসর্জনে একটি গানই গাওয়া হত, আর তা হল:

ও মা দিগম্বরী নাচ গো
যেমনি নাচ শিবের কাছে তেমনি নাচ আমার কাছে
ও মা দিগম্বরী নাচ গো

জানি না তথাকথিত নিম্নবর্গের কালী সাধনার প্রাধান্যই এর পেছনে কাজ করত কিনা।

সমাজ জীবনে ছোট-খাট বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা গ্রামেই সমাধা হত। গ্রামের মোড়ল জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সবার সামনে বয়স্ক ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে বিচার সমাধা করতেন। মুসলমান সমাজে বিচারের জন্য ছিল মসজিদের সভা আর সাঁওতালদের বিচার পদ্ধতি সমাধা হত তাদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে। "সিরমারে সিঙ্গ বোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ" অর্থাৎ আকাশে সূর্য দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়েত। ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত আদিবাসীদেরই সৃষ্টি। বর্ণ হিন্দু সমাজে মোড়ল ছিলেন যেমন গ্রাম প্রধান সাঁওতাল সমাজে তেমনি গ্রামের দায়িত্ব ছিল মাঝির উপর। সাঁওতাল গ্রাম বা পাড়া গড়ে উঠত মূল গ্রামের একপাশে কোনো উঁচু জায়গায়। মুসলমান গ্রাম অবশ্য হিন্দু গ্রামের থেকে স্বতন্ত্র ছিল— কিন্তু উভয় গ্রামের প্রান্তে বাগদি, হাড়ি বা মুচিদের বসবাসে কোনো অসুবিধা ছিল না। মনে রাখতে হবে হিন্দু, মুসলমান বা সাঁওতাল কেউ কারো নিজস্ব সমাজ স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করত না।

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বার্নাড কোন (Bernard S. Cohn) মন্তব্য করেছেন যে অত্যাচারিত হয়েও উঁচু জাতের বিরুদ্ধে যে হাত তোলা সম্ভব ছিল না এর মূলেও রয়েছে বর্ণাশ্রম-প্রথাজনিত যুগ সঞ্চিত সংস্কার।[১০] বীরভূম গ্রাম বা শহর কোথাও এই সাধারণ নিয়মের খুব একটা ব্যতিক্রম ছিল না। তবে বীরভূমে উঁচু জাতের আধিপত্য তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় অত্যাচারের মাত্রাও ছিল কম। কিন্তু সুযোগ পেলে ক্ষমতার আধিপত্য প্রদর্শনে উঁচু জাতের লোকেরা যে পিছপা ছিলেন তা নয়। মোড়ল বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নীচু জাতের লোকেদের জুতো খুলে যেতে হত। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সে সময় অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের শেষে নীচু জাতের লোকের কাছে জুতো পরাটাও ছিল বিলাসিতা। পঙক্তিভোজনে ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র স্থান নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন বা প্রতিবাদ দেখা দেয়নি। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার নিম্নবর্গরা স্বাভাবিক ভাবেই মেনে চলতেন। নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভোজনান্তে ব্রাহ্মণরা পেতেন দক্ষিণা। ব্রাহ্মণের পা ধোওয়া জল পান করতেও তথাকথিত নিম্নবর্গের কোনও দ্বিধা ছিল না। আসলে এসবই তারা সমাজজীবনের স্বাভাবিক নিয়ম বলে মনে করতেন। মুসলমানদের কথা বাদ দিলেও সাঁওতালদের মধ্যে এ ধরনের কোনো ব্রাহ্মণ্য ভক্তি দেখা যেত না, কেননা এরা ছিলেন চতুর্বর্ণাশ্রমের বাইরে।

বীরভূমের গ্রামীণ সমাজজীবনে এমনকি তথাকথিত শহরগুলিতেও পোশাক-আশাকের বাহুল্য পরিলক্ষিত হত না। তথাকথিত উচ্চ জাতি বা ভদ্রলোকেরা ধুতি পাঞ্জাবী বা ধুতি সার্টেই সন্তুষ্ট ছিল। সাধারণ মানুষ হাঁটু সমান কোরা ধুতি এবং গেঞ্জি পরতেন। এদের মধ্যে গামছার ব্যবহার ছিল প্রচুর। ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক ছিল ইজের ও ফ্রক। শীতকালে গরিব ছেলেমেয়ে-দের গায়ে চড়ত দোলাই। পাঠক স্মরণ করতে পারেন পথের পাঁচালির অপুর পোশাকটিকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে জুতো পরাটা ছিল বিলাসিতা। অর্থবান ব্যক্তিরা বাইরে জুতো ব্যবহার করলেও ঘরের মধ্যে চটি পরার চল ছিল না। অন্তত পোশাকের দিক থেকে নিম্নবর্গীয় ব্যক্তিদের বীরভূমের গ্রামীণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবর্ণের কাছ থেকে আত্মকরণের কিছু ছিল না।

মাঝেমাঝেই দেখা দিত কলেরা ও বসন্ত। পানীয় জলের দূষণই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। পুকুরের জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিছু কিছু গ্রামে পানীয় জলের পুকুর সংরক্ষিত থাকলেও অধিকাংশ অঞ্চলে এর অভাব ছিল। বর্ষার সময় বিভিন্ন সার গাদার বর্জ্য ও মল-মূত্র পুকুরের জলে মিশত। এই বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও এখানকার গ্রামগুলিতে মাঠে-ঘাটে মল-মূত্র পরিত্যাগের অভ্যাস এখনও অব্যাহত।

সমাজজীবনে মারী বা মন্বন্তরের একটি বড় ভূমিকা থাকে। সাধারণভাবে বীরভূম স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেই একসময় বিবেচিত হত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে 'বর্ধমান জ্বর' বা কিনা এক ধরনের ম্যালেরিয়া বীরভূমে দেখা দেয়। এর পর থেকে এই জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়তেই থাকে। একটি ছোট পরিসংখ্যান থেকে ম্যালেরিয়ার তীব্রতার পরিণাম বোঝা যায়। ১৮৮৬ সালে ইসলামপুর ও মনোহরপুরের (বোলপুর থানার দুটি গ্রাম) জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৮৫ ও ৮৩৫। ড. টিম্রেস ১৯৩৩-এর একটি সমীক্ষায় দেখান যে ওই দুটি গ্রামে জনসংখ্যা

বীরভূমের প্রকৃতি-বৈচিত্র্য

হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮৩ ও ৩২৪। এর সঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা দিত কলেরা ও বসন্ত। পানীয় জলের দূষণই ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। পুকুরের জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিছু কিছু গ্রামে পানীয় জলের পুকুর সংরক্ষিত থাকলেও অধিকাংশ অঞ্চলে এর অভাব ছিল। বর্ষার সময় বিভিন্ন সার গাদার বর্জ ও মল-মূত্র পুকুরের জলে মিশত। এই বিশ্বায়নের যুগে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও এখানকার গ্রামগুলিতে মাঠে-ঘাটে মল-মূত্র পরিত্যাগের অভ্যাস এখনও অব্যাহত।

চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতাও বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী ছিল। জলপড়া, পাতাপোড়ায় বিশ্বাস তাদের রাখতে হত। শীতলা, মনসা পূজাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। চুরি যাওয়া জিনিসের হদিস জানতে এবং ভাগ্য গণনার জন্য ভর, খুব জনপ্রিয় ছিল। ১৯১০ সালে ও-ম্যালি লিখছেন যে সিউড়ি ও রামপুরহাটে স্বল্প শয্যার হাসপাতাল ছিল। সিউড়িতে লেডি কার্জন জেনানা হাসপাতাল ছাড়া বোলপুর, চেন্না, নলহাটিতে শুধু বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। হেতমপুর, কীর্ণাহার, লাভপুরের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি চলত সেখানকার জমিদারদের বদান্যতায়। কবিরাজি চিকিৎসা এই জেলায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। নলহাটির নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেতমপুরের কানাই কবিরাজ, রামপুরহাটের গয়ানাথ সেন ছিলেন স্বনামধন্য কবিরাজ। সাঁওতাল ভেষজ চিকিৎসা ছিল অত্যন্ত উন্নত। সেই সময় জঙ্গলাকীর্ণ ওষধি গাছপালারও অভাব ছিল না। অনেক সময়ই সাঁওতালরা জঙ্গল থেকে ওষধি গুল্ম ও লতা সংগ্রহ করে কবিরাজদের দিতেন।

বর্তমান সময়ে বীরভূমে আধুনিক চিকিৎসা অনেকটাই সহজলভ্য, কিন্তু সেই একই সঙ্গে জোরের সঙ্গে বজায় আছে, বেলের মাটির বাতের ওষুধ, সিজেকর ডাংএর ধর্মরাজের হাঁপানির ওষুধ, লখিন্দরপুরের দেশজ হাড়ভাঙার চিকিৎসা। সচেতন পাঠক একে কি বলবেন ? ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ? খুন জখম রাহাজানি এবং বেশ্যাবৃত্তিও আজকাল সমাজ ইতিহাস রচনার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এতদ্অঞ্চলে খুনের খতিয়ান খুব একটা বেশি ছিল না। ডাকাতি অবশ্যই হত এবং এগুলি সাধারণত সংগঠিত হত পেশাদারি ডাকাতদের দ্বারা। এই ডাকাতদলের মদতকারী হিসাবে কেউ কেউ ছিলেন উচ্চবর্ণের ব্যক্তি বা সম্পন্ন ভূমধ্যকারী। ইলামবাজারের চৌপাটির জঙ্গল অঞ্চল ডাকাতির জন্য কুখ্যাত ছিল। আমোদপুর বা সিউড়ি অঞ্চলেও ডাকাতি সংঘটিত হত। গ্রামগুলিতে পতিতাপল্লী বলে কোনো নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। শহরের রেল স্টেশন সংলগ্ন কিছু অঞ্চলে পতিতাপল্লী গড়ে উঠেছিল। তবে গ্রামে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা অনেক সময় যে নিম্নবর্গের নারীদের প্রতি আসক্ত ছিলেন সে কথা তো তারাশঙ্করের গণদেবতাতেই পরিস্ফুট। গ্রামে বা শহরে সিঁধ কেটে চুরি বেশ ভালরকমই ছিল এবং এই সিঁধেল চোরদের দক্ষতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ডাকাতির ক্ষেত্রে ডাকাতরা মাঝে মাঝে একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করত আর তা হল দূর থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে মারত। বীরভূমের ভাষায় একে বলা হত 'ফাব্‌ড়া'। পথচারী পড়ে গেলে তার সর্বস্ব অপহরণ করে তারা পালাত। এক্ষেত্রে খুন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকত না। তিরিশ চল্লিশের দশকে এই জেলায় রণপায়ে ডাকাতি করার কথাও জানা যায়। সেই সময়কার Village Crime Note Book ঘাঁটলে এরকম অনেক তথ্যই পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে (১৯ শতাব্দী) সিউড়ি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যে ব্যাপক চুরি, ডাকাতি হত তাতে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন মূলত দরিদ্র মুসলমান ও বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ। ধান বিক্রি করে ১ টাকা পাওয়া গেলেও তা চুরি করা হত। বড় ডাকাতির মাল সামলাতেন পুরন্দরপুর ও কড়িধ্যার বিত্তশালী মানুষরা। সামাজিক ও আর্থিক সমৃদ্ধির পশ্চাতে অপরাধ জগতের যোগাযোগের ইতিহাসটি অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা খুঁজে দেখতে পারেন।

সামাজিক জীবনে বিবাহ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সাধারণের মানুষের কাছে বিবাহের আড়ম্বর খুব বেশি ছিল না। পাল্কি বা গোরুর গাড়ীতে বর ও বরযাত্রীরা আসতেন। শহরাঞ্চলেও পাল্কিই ছিল বরের প্রধান বাহন। উচ্চ ও নিম্নবিত্ত উভয় শ্রেণির মধ্যে বাল্যবিবাহের ব্যাপক চল ছিল। উঁচু জাতের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন না থাকলেও নিম্নবর্গের মানুষরা বিধবাবিবাহকে আদৌ অচ্ছুত মনে করতেন না। একে বলা হত 'সাঙ্গা'। পণপ্রথা অবশ্যই ছিল এবং দান বা কাঁসার তৈজসপত্র প্রদান ছিল আবশ্যিক। অনেক সময় নগদ অর্থের বদলে কন্যার নামে জমি লিখে দেওয়া হত। মুসলমান সমাজে বিবাহের সময় যে গান গাওয়া হত, তাতে খুঁজে পাওয়া যাবে সামাজিক ইতিহাসের অনেক আকর। বধূ নির্যাতন ছিল ব্যতিক্রম, যা এখন দাঁড়িয়েছে প্রায় প্রাত্যহিক নিয়মে।

আমাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় জমিদার শ্রেণিকে অত্যাচারী হিসাবে চিহ্নিত করা স্বাভাবিক নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু বীরভূমের সমাজ জীবনে অনেক জমিদারদের ভূমিকা ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। রুক্ষ মাটির দেশ বীরভূমের জলকষ্ট সর্বজনবিদিত। সেজন্য অনেক জমিদারই পুষ্করিণী খনন করে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ করতেন। এর সঙ্গে ছিল পুণ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা। সুফি মতাদর্শ প্রভাবিত বীরভূমের পাঠান রাজারা যে আদৌ ধর্মান্ধ ছিলেন না সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁরা অর্জন করেছিলেন প্রজাদের শ্রদ্ধা। এর অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের জনকল্যাণমুখী কার্যাবলী। পণ্ডিতের বিবরণ উল্লেখ করে হান্টার লিখেছেন : "Asadullaha added to the number of troops and caused numerous tanks to be jug in the capital, by which means the miseries resulting from the Scarcity of water were in great measure avided."[11] পরবর্তীকালে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনাধীন সময়েও বহু জমিদার বিভিন্ন জনহিতকর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। পুষ্করিণী খনন থেকে শুরু করে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সূচনা এদের হাত দিয়েই হয়। হেতমপুর রাজ, লাভপুরের জমিদার ও সুলতানপুরের জমিদারা ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। এঁরা কেউই অনাবাসী জমিদার ছিলেন না এবং গ্রামে থেকেই এঁরা গ্রামের উন্নতি বিধান করার চেষ্টা করতেন। গ্রামোন্নয়নে জমিদার অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও লাভপুরের যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে বীরভূমের ইতিহাস রচনার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য হেতমপুর রাজ রামরঞ্জন চক্রবর্তী ও মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অন্য অনেক ব্যক্তির ওপরই

ঘরে ফেরা

আলোকপাত করতে পারে। শিক্ষা ও জাতীয়তাবাদী তাগিদ হয়ত অনেকটাই দায়ী ছিল এই আলোকিত জমিদারতন্ত্রের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষের কবিতা উপন্যাসে বলেছিলেন 'কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার'।[১২] কিন্তু বীরভূমের সংস্কৃতি আলোচনায় রাবীন্দ্রিক এই অভিধাটি প্রযোজ্য নয়, কেননা যাকে বলে বিদ্যা যা আহৃত হয় পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে এই জেলায় তার চর্চা ছিল খুবই কম। স্কুল কলেজ যে ছিল না তা নয়। কিন্তু জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশই তার থেকে ছিল বঞ্চিত। এর একটা কারণ অবশ্যই জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা এবং শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনীহা। কাজেই বীরভূমের সংস্কৃতি আলোচনায় আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের ব্যাখ্যায়। "ইহলোক নিয়ে সাধনা হল সংস্কৃতি, অনন্তলোক নিয়ে সাধনা হল ধর্ম।"[১৩] আর এই ইহলোক সাধনা নিয়েই অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে বীরভূমের সংস্কৃতি যুগের কষ্টিপাথরে সসম্মানে উত্তীর্ণ। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বিচার্য কিনা সে বিষয়ে তর্ক থাকতে পারে কিন্তু ধর্মকে উপলক্ষ করেও বীরভূমের সংস্কৃতি যে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে ভাস্বর তার দৃষ্টান্ত বহু। অনন্তলোক নিয়ে সাধনা করতে গিয়েও বীরভূমের মানুষ ইহলোকের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেনি। আর এটি সম্ভব হয়েছে লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাধান্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথকে ধার করেই বলি যে ধর্মের ভার স্বত্বেও বীরভূমের সংস্কৃতি আলোর দিশারী হয়ে উঠতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই 'কালচার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা কিনা প্রযোজ্য এলিট সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

পূজা, পার্বণ, মেলা ইত্যাদি মিলে বীরভূমের জনজীবনে ছিল এক আনন্দের জোয়ার, তাই দারিদ্রকে নিত্যসঙ্গী করেও এর ভিতর থেকে তারা খুঁজে পেত বেঁচে থাকার রসদ। বস্তুতপক্ষে এগুলিই ছিল তাদের আত্ম-পরিচয়ের শর্ত। পুণ্য মাস বৈশাখের শুরুতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নগর সংকীর্তন, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে চব্বিশপ্রহর—শেষ দিনে যার সমাপ্তি ঘটত ধূলোট উৎসবে। শ্রাবণে মনসা পুজো, ভাদ্র মাসে ভাদু, আশ্বিনে দুর্গা ও কালি পুজো। কার্তিকে প্রভাতী বা গ্রামের ভাষায় টহল, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে পিঠে পরব পৌষলক্ষ্মী পুজো ও পৌষ আগলান, মাঘে ব্রহ্মাদত্যি ও অন্যান্য মেলা, ফাল্গুনে দোল, বছর শেষ চৈত্রে চড়ক বা গাজন। এছাড়াও বৈশাখে বুদ্ধপূর্ণিমায় বীরভূমের অতি প্রিয় ধর্মরাজ পুজো। মুসলমান সমাজে অন্যান্য স্থানের মত এখানেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিপালিত হত মহরম, সবেবরাত, ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, মিলাদ-উদ্-নবী প্রভৃতি উৎসব। সাঁওতালরা পালন করতেন বা এখনও করেন সেহরাই, বাঁদনা, মাঘসিম প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

বীরভূম বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয়পীঠ সমৃদ্ধ জেলা। এখানে একদিকে ময়নাডাল, মুলুকশ্রীপাট, নানুর, জয়দেব কেন্দুবিল্ব বৈষ্ণবধর্মের প্রাণকেন্দ্র, অন্যদিকে রয়েছে তারাপীঠ, নলহাটি, বক্রেশ্বর, কংকালিতলা প্রভৃতি শাক্তপীঠ কেন্দ্র। উভয় ধর্মেই অন্ত্যজ শ্রেণির অংশগ্রহণে কোন কঠোর বাধা-নিষেধ নেই। চব্বিশ প্রহরে কীর্তন গানে মাতোয়ারা সমস্ত গ্রাম। ভাদু গানে খুঁজে পাওয়া যায় সমসাময়িক অনেক সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন।

কাশীপুরের মহারাজা গো
সেই করে ভাদুর পূজা
সন্ধে হলে শীতল দেয় মা
কড়কড়ে কলাই ভাজা

অথবা

ভাদুর গয়না মনে লাগে না
ভাদু শ্বশুর-ঘর যায় না।

নারীবাদীরা এসব গানে খুঁজে পেতে পারেন অন্ত্যজশ্রেণির নারীস্বাতন্ত্র্য।

কিংবা

ক্যানেল কেটে কাল হল
টাকায় দু সের চাল হল।

কার্তিক মাসের হিমেল প্রভাতে মোটা কাঁথার নিচে শুয়ে আধো ঘুম, আধো জাগরণে যখন কানে আসত শংকর মেটের টহলের সুর তখন মন ভরে উঠত এক অনির্বচনীয় আনন্দে, কিংবা নবান্নের দিনে সারাদিনের ভুরি ভোজনের পর বিকাল থেকে জমে উঠত ডাংগুলির প্রতিযোগিতা, আর সন্ধ্যাবেলায় 'মেড়া' পোড়ান। কাশ ফুল জমিয়ে সেগুলি শুকিয়ে পোড়ান হোত। বীরভূমে ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধূম-ধাম করে কালিপুজার চল ছিল। এক সময় তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই পুজো করতেন, এখন বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণরাও পুজো করে থাকেন। ধর্মরাজ পুজোর উৎপত্তি বৌদ্ধ-ধর্ম থেকে এসেছে কিনা এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় এ পুজোয় অন্ত্যজ শ্রেণিরই প্রাধান্য। গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, 'বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের রাজারা সেকালে হাড়ি, ডোম, বাগদি, মল্ল, ভল্ল, লোয়ার, বয়রা প্রভৃতি জাতিকেই সৈন্য দলে গ্রহণ করিতেন। ইহারাই অন্তঃপুরের রক্ষক ছিল, ইহারাই রাজার দেহরক্ষীর কার্য করিত। ধর্মের দেবাংশী বা দেয়াশীদের মধ্যে আজিও এই সমস্ত জাতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাই।'[১৪]

কবিগান, ঝুমুর, লেটো, কেষ্টযাত্রা, বাউল, রায়বেঁশে প্রভৃতি বীরভূমের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হবে কীর্তন গান। সম্পন্ন গৃহস্থের শ্রাদ্ধবাড়িতে এটির ব্যবহার এখনও অনেকটাই বজায় আছে। পিছু হটে গেছে ঝুমুর, লেটো, কেষ্টযাত্রা, কবিগান। রায়বেঁশে তো প্রায়

আদিবাসী নৃত্যগীত

ছোলা ভিজিয়ে পরদিন সেই অংকুরিত ছোলা সরায় রেখে বালিকা ও কিশোরী মেয়েরা গৃহস্থের দরজায় গিয়ে নাচত। একমাত্র বাজনদার ছাড়া এখানে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। নানারকম ছড়া কেটে মেয়েরা এই উৎসব পালন করত। অংকুরিত ছোলা সম্ভবত শষ্য উৎগমের প্রতীক। অগ্রহায়ণে মাঠে ধান পাকলে অত্যন্ত পবিত্র হয়ে স্নান করে চাষীরা নতুন কাপড়ে ধানের গুচ্ছ জড়িয়ে এনে বাড়ীর চালের দক্ষিণ দিকে রেখে দিত। একে বলা হয় 'মুঠ' আনা। নবান্নের দিন এই ধান থেকে চাল করে পুজো দেওয়া হয়। এ ছাড়াও আছে 'দাওন' খাওয়ান। সমস্ত ধান উঠে গেলে চাষী এই কাজে নিযুক্ত সমস্ত মুনিষ, মাহিন্দার, মজুর, বাগাল সবাইকে পাত পেড়ে খাওয়াত। খাদ্য তালিকায় অবশ্যই থাকত পায়েস। অগ্রহায়ণের শেষে হয় ইতু (লক্ষ্মী) পূজা। স্বভাবত এখানে নারীরাই প্রধান। আলপনায় সেজে ওঠে গৃহাঙ্গন। ঘটের ওপর আম্রপল্লবের সঙ্গে থাকে ধানের শীষ। ভোগের অন্যতম উপাদান আখকে পিঠে। পৌষ সংক্রান্তির দিনে পিঠে পরবের সঙ্গে হয় পৌষ আগলান। চাষীবৌরা সেই শীতের ভোরে স্নান সেরে শাঁখ বাজিয়ে ছড়া কাটে :

'এসো পৌষ যেও না
জনম জনম ছেড়ো না
যদি বা ছাড়িবে তুমি,
পরাণে মরিব আমি।'

বীরভূমের গ্রামজীবনে খেলাধূলা বলতে ছিল ডাং-গুলি, হা-ডু-ডু বা কপাটি, নূন ধাপসা অনেক জায়গায় যার নাম ছিল ছিজে মারামারি। মেয়েরা খেলতো পুতুল আর বুড়ি বসন্ত। গ্রামে গ্রামে হা-ডু-ডু নিয়ে শিল্ড ছাড়া হোত। অনেকেই ভাল খেলোয়াড় পয়সা দিয়ে নিয়ে আসতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে 'হায়ার' শব্দটি গ্রাম জীবনে ঢুকে গেছে। শহরে ফুটবল খেলা হোত, কিন্তু ক্রিকেট তখনও অবাধ প্রবেশাধিকার পায় নি।

বাংলাদেশের মত বীরভূমেও ত্রিশের দশকের মহামন্দা থেকে দেখা দিয়েছিল আর্থিক সংকট। জমি হস্তান্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা।[১৮] যেহেতু এ জেলায় বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, সেহেতু বিকল্প অর্থনৈতিক অনুসন্ধানও সম্ভব ছিল না। এর সঙ্গে

অবলুপ্ত। কে ভুলতে পারে হাঁসুলি বাঁকের উপন্যাসের সেই অনবদ্য গান :

"আমার বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রায়বেঁশে
আয় ঢকাঢক মদ খেসে।"

কবিগানের জনপ্রিয়তা একদা বীরভূমকে রাখত মাতিয়ে। বলহরি রায় রাজপুত বংশজাত হয়েও কবি খ্যাতিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। নিবাস ছিল বরুল গ্রামে, বলা হত—

কবির গুরু সেই বলহরি
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি।'[১৭]

এ ছাড়াও ছিলেন কৈলাস ঘটক, সৃষ্টিধর ঠাকুর, বনওয়ারি চক্রবর্তী প্রভৃতি এবং অবশ্যই অতি খ্যাত লম্বোদর ও গোমানী। সহজ কবিত্ব প্রতিভার অধিকারী এঁরা মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন এবং সমসাময়িক সামাজিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাও তাদের গানের বিষয় ছিল। সেগুলি সংরক্ষণের কোনও চেষ্টা সম্ভবত করেনি কেউ, কাজেই সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান আকর গেছে হারিয়ে। কবিগানের মত কৃষ্ণযাত্রারও খ্যাতি বীরভূমে কোন অংশে কম ছিল না। শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। যিনি 'কণ্ঠ' নামে পরিচিত ছিলেন কৃষ্ণযাত্রাকে একটি শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন।

কৃষি প্রধান বীরভূমে কৃষি ভিত্তিক কিছু উৎসব ছিল বেশ প্রচলিত। এর মধ্যে অধুনালুপ্ত একটি উৎসব হল 'ভাজো'। ভাদ্র মাসের শেষে বা আশ্বিন মাসের প্রথমে এটি পালিত হোত। রাত্রে

ছিল খরা, বন্যা ও মারী। ১৯৪০-এর ২রা ডিসেম্বর সংখ্যার 'বীরভূম বার্তা'য় লেখা হয় 'বর্তমান বৎসরে বীরভূম জেলার সর্বত্র অনাবৃষ্টির জন্য সমস্ত শষ্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীরভূমে প্রায় ১১ লক্ষ জনগণের অধিকাংশই কৃষিজীবী। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ বীরভূম খরায় পরিণত হইয়া বসিয়াছে। মানুষের গৃহে শষ্য নাই, গৃহপালিত পশুর আহার্য নাই, পুষ্করিণী সমূহ জলশূন্য। ইতিমধ্যে মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুর পানীয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার ওপর সমগ্র বীরভূমে ভীষণ আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। কৃষকসভার নেতৃত্বে কিছু কিছু ধান লুঠও করা হয়।'[১৭] কিন্তু এই সব ঘটনা সম্পন্ন চাষী বা জোতদারদের ওপর সাধারণ মানুষের নির্ভরশীলতা আরও বাড়িয়ে দেয়। স্বভাবতই অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্বে রূপায়িত হতে পারে নি। ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদত্ত হয় নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সেখানেই সূচনা। অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও ঘটতে থাকে কিছু কিছু উন্নয়ন। বৃদ্ধি পেতে থাকে সামাজিক চলমানতা। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ থেকে যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা দখল, নকশাল আন্দোলন, অপারেশন বর্গা এবং পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলেই নিচের মহলের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা বোধে সচেতন হতে থাকে তারা। বৃদ্ধি পায় শহরের সঙ্গে যোগাযোগ, দেখা দেয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের ফলে মাঠে ফলে তিনটে ফসল। সমবৎসর কাজ পায় দিনমজুর।

আপাত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অনিবার্য পরিণতিতে কিন্তু দেখা দিয়েছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার চিরন্তন দ্বন্দ্বে ঐতিহ্য তার মূল্যবোধ নিয়ে পিছু হটছে। আর আধুনিকতা বিশ্বায়নকে সঙ্গে করে আকণ্ঠ ভোগের আসরে মোহময়ী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়ত দিয়ে চলেছে হাতছানি। আনন্দ নয়, উত্তেজনার খোরাক যোগায় টি ভি আর ভিডিও। বাজারি সংস্কৃতির প্রবল উপস্থিতিতে পিছু হটে যায় নিজস্ব গ্রামীণ সংস্কৃতির লেটো, ভাদু আর কবিগান। মাঠের তিনটে ফসলের সঙ্গে খেতমজুরের বাড়তি পাওনা টেনে নিচ্ছে আইনী, বেআইনী ভাটিখানা। মেলাপ্রধান বীরভূমের সব মেলাতেই প্রায় আয়োজন করা হয় লোকসংগীতের। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গত বিনা যেমন সঙ্গীতের ঘটে তালভঙ্গ, মেলাগুলির পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তেমনি ঐতিহ্যানুসারি লোকগানে আসে না সে মেজাজ। পাথরচাপড়ির মত দু-একটি মেলায় অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা হলেও বিশ্বায়নের হাওয়াকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে ভরসা কম। বীরভূমের নিজস্ব সম্পদ দিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ প্রান্তরে নিদাঘের তপ্ত নিঃশ্বাসের উদাসীনতা উন্নয়নের অনিবার্যতায় ঢাকছে সবুজায়ন আর ইমারতে, তাই উদাসি বাউলের একতারাতে কেটে যাচ্ছে ছন্দের সুর। পবিত্র আল্লার নামে মসজিদের সুমিষ্ট গম্ভীর আজানে লাগছে মাইকের কর্কশতা। আদিবাসী নতুন প্রজন্ম নিজস্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য ভুলে বর্ণ-হিন্দু আধিপত্যকারী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে মেতে উঠছে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পুজোর চমকে।

ইতিহাস যেহেতু এগিয়ে চলে পরিবর্তনের পথে, তাই বীরভূমের সমাজ ও সংস্কৃতিতে অতীত ঐতিহ্যের পুনরাভিষেক আর সম্ভব নয়। নবতর সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাকে খুঁজে নিতে হবে নতুন পথের দিশা।

তথ্য সূত্র

১। নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস ; আদি পর্ব, পুনর্মুদ্রণ, কোলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১০

২। ও' ম্যালি : বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : ১৯৯৬, পৃ. ৩৮

৩। সেনসাস অব্ ইন্ডিয়া, ১৯০১, ভল্যুম-সিক্স এ, পার্ট-২ পৃ. ২৬-২৭

৪। ও' ম্যালি : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪০

৫। সেনসাস ১৯৫১, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ড বুক, ১৯৫৪, পৃ. IXX

৬। মনোরঞ্জন ব্যানার্জী : এ স্টাডি অন্ গ্রোথ অব পপুলেসন : এ রিসার্চ মনোগ্রাফ, পৃ. ৬১

৭ক। এ. মিত্র, সেনসাস, ১৯৫১, পৃ. XVII

৭খ। চিত্তপ্রিয় মুখার্জী : আরবন গ্রোথ ইন রুরাল এরিয়া, বিশ্বভারতী, ১৯৭২

৮। সেনসাস অব্ ইন্ডিয়া : ১৯০১, ভল্যুম-১, পার্ট ১, পৃ. ৬৩

৯। সুপর্ণা গুই : নগরায়ন ও সাঁইথিয়া একটি সমীক্ষা : ইতিহাস অনুসন্ধান, ১৬, ২০০২ পৃ. ৩৯৭

১০। বার্ণাড কোন : অ্যান অ্যানথ্রোপলজিস্ট এ্যামঙ্গ দি হিস্টোরিয়ানস এন্ড আদার এসেস : ও, ইউ, পি, ১৯৮৮, প্যা ৫৬৫

১১। ডবলু, ডবলু, হান্টার : এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পুনর্মুদ্রণ ; ১৯৯৬, পৃ. ৩১৫

১২। রবীন্দ্র রচনাবলী : শতবার্ষিক সংস্করণ ; নবম খণ্ড, পৃ. ৭১৮

১৩। ক্ষিতীমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি ; বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ; ১৩৮৪, পৃ. ৬

১৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি, সম্পাদনা ; বিশ্বনাথ রায় ১৯৯৯, পৃ. ৯৩

১৫। ঐ পৃ. ২০৪

১৬। আজিজুল হক ; দি ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাউ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২৮৬

১৭। অমিয় ঘোষ ; জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম ; বোলপুর, ২০০১

এ ছাড়াও দেখুন

১। সুমিত ভট্টাচার্য ; সোস্যাল হিস্ট্রী অব বীরভূম, অপ্রকাশিত পি, এইচ, ডি গবেষণাপত্র, বিশ্বভারতী, ১৯৯৯

২। পঞ্চানন মণ্ডল ; চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র ; ১৯৫৩, বিশ্বভারতী

৩। মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত : বীরভূম বিবরণ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

৪। শুচিব্রত সেন ও সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী সম্পাদিত : বিশ্বভারতী এ্যানালস, নিউ সিরিজ ষষ্ঠ খণ্ড

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক
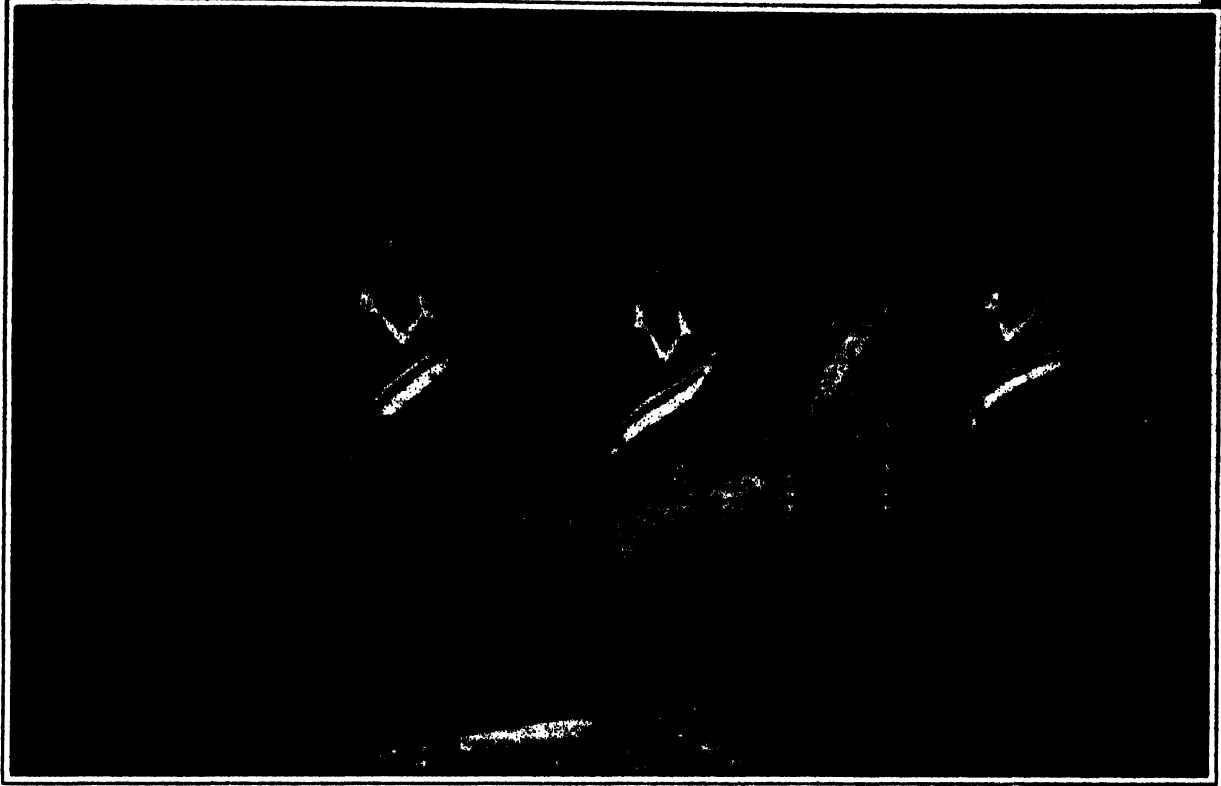
বীরভূমের আদিবাসী সমাজ ও জনগোষ্ঠী

অরুণ চৌধুরী

কথামুখ :

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আটভাগ নরনারী বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবাংলাতেও মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা সাতভাগ আদিবাসী নরনারীর বাস। এই সব আদিবাসী নরনারীরা অল্পবিস্তর সব জেলাতেই রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা মোট আটত্রিশ। বীরভূম জেলার জনসংখ্যারও প্রায় সাতভাগ নরনারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মোট এগারোটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এ জেলার অধিবাসী। তবে, তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল, কোড়া, মাহালি, ওঁরাও— জনসংখ্যার হিসাবে এঁরাই বেশি। তাছাড়া যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এ জেলার বাসিন্দা তাঁদের জনসংখ্যা খুবই কম। যেমন, মুণ্ডা, মালপাহাড়িয়া মগ, হো, খেরিয়া (লোধা), চাকমা, ভূমিজ।

আদিবাসীদের সংখ্যাগত চালচিত্র

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী এ জেলার আদিবাসী নরনারীর সংখ্যা ২,০৩,১২৭ জন। ব্লকওয়ারি হিসাব এরকম : মুরারই ১নং-৭৫৮৬, মুরারই ২নং-৬৬৩, নলহাটি ১নং-৯০৯৩, নলহাটি ২নং-৩৪১, রামপুরহাট ১নং পৌর এলাকাসহ-২২,০২৯, রামপুরহাট ২নং-৬৬৫, ময়ূরেশ্বর ১নং-৯০৬৫, ময়ূরেশ্বর ২নং-৭৫৫৩, মহম্মদবাজার-২৬,৮০০, সাঁইথিয়া পৌরসভাসহ-২১,৭৪৭, দুবরাজপুর পৌর এলাকা সহ-৯,১৪৯, রাজনগর-১০,৫২৪, সিউড়ি ১নং পৌর এলাকা সহ-৯,০৫৮, সিউড়ি ২নং-৯,৭৫৩, খয়রাশোল-২,২২২, বোলপুর-শ্রীনিকেতন পৌর এলাকা সহ-৩২,৯৯৭, লাভপুর-৭,৩১৬, নানুর-৩,৮৩৪, ইলামবাজার-১২,৭০৭।

এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে বোলপুর থানা এলাকাতেই এ জেলার সর্বাধিক সংখ্যক আদিবাসী মানুষ বাস করেন। দ্বিতীয় স্থানে মহম্মদবাজার ব্লক। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে পৌর এলাকা সহ রামপুরহাট ১নং ব্লক এবং পৌরএলাকা সহ সাঁইথিয়া ব্লক।

সাঁওতাল আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ

এইসব আদিবাসী বাসিন্দাদের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসীর সংখ্যাই সর্বাধিক। যদিও বর্তমান আদমসুমারিতে আদিবাসীওয়ারি জনসংখ্যার কোনো বিভাজন পাওয়া সম্ভবপর নয়। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আদিবাসীওয়ারি বিভাজন আমরা পেয়েছি। তখনকার হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সাঁওতাল আদিবাসী জনসংখ্যার সঙ্গে এই জেলার বাসিন্দা অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির সংখ্যাগত পার্থক্য বিস্তর। যেমন, ১৯৬১ সালে এ জেলায় আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল মোট ১,০৬,৮৬০ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭.৩৯ ভাগ। তাঁদের মধ্যে সাঁওতাল আদিবাসী নরনারীর সংখ্যা ছিল ৯৩,৪২৬ জন। দ্বিতীয় স্থানে কোড়া আদিবাসী সংখ্যা। তা হল ৫,৫১৪ জন এবং আর সকলেরই জনসংখ্যা হাজারের নীচে। মাহালি ৮৭৩ জন। ওঁরাও ২৬৯ জন, মালপাহাড়িয়া ৩৫৭ জন, মগ ৯৩ জন, মুণ্ডা ১৫ জন, হো ৪২ জন, চাকমা ২ জন, ভূমিজ ১ জন। এ হিসাবে আরো দেখা যায় যে কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা খুবই নগণ্য।

এবার অতীতের হিসাবের দিকে তাকিয়ে দেখা যেতে পারে। সাঁওতাল আদিবাসী মানুষদের দিয়েই শুরু করা যাক। ১৮৭২ সালে দেশের প্রথম জনগণনা হয়েছিল। সেখান থেকেই শুরু করছি। ১৮৭২—৬,৯৫৪, ১৮৮১—৭২৬, ১৮৯১—২১,৭৭০, ১৯০১—৪৭,২২১, ১৯১১—৫৬,০৮৭, ১৯২১—৫৭,১৮০, ১৯৩১—৬৪,০৭৯, ১৯৪১—৬০,৯২০, ১৯৫১—৭৮,৪৪০। ১৯৬১-এর হিসাবে আগেই উল্লেখ করেছি।

কোড়া আদিবাসী

এবার কোড়া আদিবাসীর হিসাব দেওয়া যাক। ১৮৭২—৩,৭৭৬, ১৮৮১—হিসাব পাওয়া যায়নি, ১৮৯১—১০,২৬৭, ১৯০১—১১,৯০২, ১৯১১—৯৬৮০, ১৯২১—৬১০০, ১৯৩১—৮৯৯৩, ১৯৪১—৪৬৮৫, ১৯৫১—৪৬৮৫। এ ক্ষেত্রেও ১৯৬১-এর হিসাব আগে দিয়েছি।

অন্যান্যরা

মাহালিদের জনসংখ্যার কোনো হিসাব ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১ এই তিনটি জনগণনায় পাওয়া যায়নি। ১৯০১—৭৯২, ১৯১১—৬০৬, ১৯২১-হিসাব পাওয়া যায়নি, ১৯৩১—৬৪১, ১৯৪১—৯৫৫, ১৯৫১—৭৯০।

মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার হিসাব ১৯০১ থেকে পাওয়া যায়। ১৯০১—২১৭, ১৯১১—১৫৭, ১৯২১—১০১৮, ১৯৩১—৭০৭, ১৯৪১—১০৫, ১৯৫১—১৭৫।

ওঁরাওদের ক্ষেত্রেও ১৯০১-এর আগেকার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। ১৯০১—৯৪, ১৯১১—৪৩৩, ১৯২১—১৮৭, ১৯৩১—৭৫, ১৯৪১—৪৭, ১৯৫১—৮০২।

মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৯০১-এর আগে পাওয়া যায়নি। ১৯০১—৫৯৭, ১৯১১—১৭৯, ১৯২১ ও ১৯৩১-এর হিসাব পাওয়া যায়নি। ১৯৪১—২৭৯, ১৯৫১—২০৯।

আগমনের কালপঞ্জি

বর্তমান বীরভূম জেলায় এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের আগমন মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশেষত, সাঁওতাল আদিবাসী মানুষরা বর্তমান বীরভূম জেলায় এসেছেন ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে। তবে কোড়া বা ওঁরাও আদিবাসী কিছু মানুষ হয়ত তার আগেই কাজের সন্ধানে এ জেলায় এসেছিলেন। সম্ভবত নীলচাষের জন্য তাঁদের ছোটনাগপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নীলকররা নিয়ে এসেছিল।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওইসব মানুষরা এই জেলায় মূলত এসেছেন জমি ও খাটুনির সন্ধানে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে নবসৃষ্ট জমিদাররা, বলা যেতে পারে ছোটনাগপুর সিংহভূম থেকে আরম্ভ করে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী বৃহত্তর বীরভূম (সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ১৮৫৬ সালে তৎকালীন বীরভূম জেলার একটি অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগনা নামক নন্‌রেগুলেটেড নতুন জেলা গঠিত হয়) প্রভৃতি জেলা থেকে ব্যাপকভাবে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে। তারই পরিণতিতে উচ্ছিন্ন কৃষকরা জমি ও খাটুনির সন্ধানে বাংলার সমতলভূমির দিকে আসতে শুরু করেন। ওইসব আগন্তুক ভূমিহারা কৃষকদের কাজে লাগিয়ে এই অংশের জমিদাররা পতিত ও অনাবাদী জমি আবাদ করে জমিদারদের আয় বাড়াবার পথ প্রশস্ত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের দেয় রাজস্ব সুনির্দিষ্ট

আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান

ছিল। পতিত বা অনাবাদী জমি আবাদ করে সেখানে প্রজা বসিয়ে নিজেদের আয় বাড়াবার যে-সুযোগ জমিদারদের ছিল, তা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগাল।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে ওইসব জমিদাররা যে সব কৃষকদের শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই ভাবে জমি আবাদ করালো সেই সব কৃষকরা কিন্তু আবার ভূমিহীনে পরিণত হলেন। জমিদাররা ওই সব আবাদী জমি থেকে আবাদকারী কৃষকদের (যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আদিবাসী কৃষক) জমি ছলেবলে কৌশলে কেড়ে নিলো যার পরিণতিতে সাঁওতাল আদিবাসী কৃষকদের ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) ঘটেছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি যে বর্তমান বীরভূম জেলায় নতুন তৈরি সাঁওতাল পরগনা জেলা বা ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন এলাকা থেকে আদিবাসী কৃষকরা বর্তমান বীরভূম জেলায় দলে দলে আসার সূচনা সাঁওতাল বিদ্রোহের পর থেকে।

বর্তমান বীরভূম জেলার পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত নতুন তৈরি সাঁওতাল পরগনার লাগোয়া। কাজেই, সাঁওতাল পরগনা থেকে আসা ওইসব আদিবাসী মানুষরা প্রথম এসেছিলেন বীরভূমের মুরারই, নলহাটি, রামপুরহাট, তৎকালীন মৌড়েশ্বর, বর্তমান মহম্মদবাজার, তৎকালীন সিউড়ি থানার অন্তর্গত বর্তমান রাজনগর থানা এলাকায়, পরবর্তীকালে ওই সব আগন্তুকরা জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকেন। বর্তমান বোলপুর থানা (তখনকার কসবা থানা), সাঁইথিয়া থানা, লাভপুর থানা ও ইলামবাজার থানাতেও ওসব আগন্তুকরা বসতি স্থাপন করেন।

সর্বত্রই কিন্তু জমিদাররা ওই সব আগন্তুক আদিবাসী কৃষকদের—যাঁদের অধিকাংশই ছিল সাঁওতাল আদিবাসী মানুষ, পতিত বা অনাবাদী জমি আবাদ করার কাজে লাগিয়েছিল। জঙ্গল সাফ করে নতুন জমি তৈরির কাজেও ওই সব আগন্তুকদেরই মূল ভূমিকা ছিল।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও উত্তর বালাসোর জেলার (বর্তমানে ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত) সাঁওতাল আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এম সি ম্যাকআলপিনকে নিযুক্ত করে। ম্যাকআলপিন যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে দেখা যায় যে ১৮৭২ সালের আদমসুমারির পরবর্তীকালে ১৯০১ সালের আদমসুমারি পর্যন্ত বর্তমান বীরভূম জেলার সাঁওতাল আদিবাসীর জনসংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। ১৮৭২ সালে এ জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীর জনসংখ্যা ছিল যেখানে ৬,৯৫৪ জন তা বেড়ে হয়েছে ৪৭,২২১ জন।

ওই প্রতিবেদনে এঁদের এই জেলায় আসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে সাঁওতাল পরগনার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ওঁরা ঐ এলাকা ত্যাগ করে নতুন এলাকার দিকে পা বাড়িয়েছেন কিংবা জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা জমিচ্যুত হওয়ার ফলে তাঁরা নতুন জমির সন্ধানে পূর্বাভিমুখী হয়েছেন। একটা অংশ উত্তরাভিমুখী হয়ে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি জেলায় চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ গেলেন চা-বাগানের শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য।

ওঁদের সাঁওতাল পরগনা ত্যাগের পিছনে শেষোক্ত কারণটাই আসল হিসাবে গণ্য বলে মনে হয়।

পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ১৯০১ সাল এ জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীর জনসংখ্যা দুটি মহকুমার মধ্যে এভাবে বিন্যস্ত ছিল। রামপুরহাট মহকুমার বিন্যাস—

থানা	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতাল আদিবাসী সংখ্যা	শতকরা হার
মুরারই	৮৬,১৮২	৩,১০৮	৩.৬%
নলহাটি	৮৩,৫২১	৪,১১০	৪.৯%
রামপুরহাট	১,০২,৮১০	৮,২২০	৮.০%
মৌড়েশ্বর	৯৩,৮৩৯	৬,৭৯১	৭.২%

সদর মহকুমার বিন্যাস—

সিউড়ি	১,৪০,০৩৩	১২,১৯৫	৮.৭%
বোলপুর	১,১৫,৮৪৯	৮,৭৮১	৭.৬%

সদর মহকুমার তৎকালীন অন্য থানাগুলিতে সাঁওতাল আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল এরকম—

থানা	মোট জনসংখ্যা	সাঁওতাল আদিবাসীর সংখ্যা
লাভপুর	৬৪,২৮১	১,২৫৪
দুবরাজপুর	১,৩৮,০২৬	২,৩০৪
সাকুলিপুর (বর্তমান নানুর)	৭৭,৭৪০	৪৫৮

ওই সময়কালে (১৯০১) রামপুরহাট মহকুমার চারটি থানায় সাঁওতাল আদিবাসীর গ্রাম সংখ্যা ছিল এরকম—

থানা	মোট গ্রাম	সাঁওতাল আদিবাসী গ্রাম
মুরারই	২৬০	৩৫
নলহাটি	২৬৫	৪৪
রামপুরহাট	৩০৭	৮০
মৌড়েশ্বর	৪২৬	৪৪

সদর মহকুমার চিত্রটা ছিল এরকম—

মহম্মদবাজার ফাঁড়ি	১৮২	২৮
সিউড়ি ও রাজনগর (ফাঁড়ি)	১৬৮	৬৮
খয়রাশোল ফাঁড়ি ও দুবরাজপুর	৩২৫	৬
ইলামবাজার ফাঁড়ি	৯৭	৩
বোলপুর	৩০৩	৩৭

ম্যাকআলপিন তাঁর প্রতিবেদনে বোলপুরের সাঁওতাল জনবসতি সম্পর্কে লিখেছেন যে এই থানা সরাসরি সাঁওতাল পরগনার সংলগ্ন নয়। এখানকার সাঁওতাল জনবসতির প্রতিষ্ঠাকাল বছর চল্লিশের বেশি নয়। অধিকাংশ জনবসতি বছর কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো জনবসতি মাত্র বছর দশেক আগে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে।

ম্যাকআলপিন তাঁর প্রতিবেদনে তৎকালীন সময়ে বীরভূমের আর একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোড়াদের সম্পর্কেও যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ওই জনগোষ্ঠীর মানুষরাও এ জেলার অনাবাদী ও পতিত জমি, জঙ্গল প্রভৃতি সাফ করে নতুন জমি বা আবাদী জমি করার কাজ করেছিলেন। ১৯০১ সালে এ জেলায় কোড়া আদিবাসী জনসংখ্যার হিসাব ছিল এরকম—

মুরারই-৭২৭, নলহাটি-৭২৩, রামপুরহাট-৪৪৮, মৌড়েশ্বর-২,৮৪১, সিউড়ি-২,৮২৭, বোলপুর-৬২৫, দুবরাজপুর-১,২৫৭।

অর্থনৈতিক জীবন

সামগ্রিকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা অধিকাংশ ভূমিহীন। কৃষি মজুর, খনি ও কলকারখানার মজুর, ইটভাটার মজুর, ঘরবাড়ি তৈরির মজুর প্রভৃতি দৈহিক শ্রমের কাজই আদিবাসীদের উপজীবিকার মূল অবলম্বন। পশ্চিমবাংলার সংগঠিত কৃষক আন্দোলন, ১ম ও ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কারের ফলশ্রুতিতে এই রাজ্যে ভূমিহীন কৃষক, বর্গাদার ও গরিব কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষক সমাজের অন্যতম অংশ আদিবাসী অংশও বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। তার ছাপ ওই অংশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে লক্ষণীয়।

এ জেলায় ওই ভূমি সংস্কারের চিত্রে যাবার আগে এখানকার আদিবাসীদের পেশাগত ক্ষেত্রে অতীতের অবস্থাটা কী ছিল, সে বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

অবশ্য, যে চালচিত্র আমি তুলে ধরতে চাইছি তা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কার প্রথম যে আদমসুমারি অর্থাৎ ১৯৫১-এর আদমসুমারি থেকে প্রাপ্ত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরবর্তীকালে জনগণনায় আলাদা করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির পেশাগত জীবনের কোনো পৃথক চালচিত্র সংগৃহীত হয়নি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে আদিবাসী মানুষরা জমির সঙ্গে সবথেকে বেশি জড়িত। তাঁদের উপজীবিকার মূল উৎস জমি। অন্যান্য কিছু পেশা তাঁদের থাকলেও তা খুবই গৌণ। জমিই তাঁদের জীবনে মুখ্য স্থানাধিকারী।

১৯৫১-এর চালচিত্রটা এরকম—বীরভূমে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা—৭৯,৪১৭। পুরুষ—৩৯,০৪৬, নারী—৪০,৩৭১।

নিজস্ব জমিতে চাষবাসকারী ও তাঁদের পোষ্যবর্গ মোট ২০,০৭৯ জন। পুরুষ ১০,০৬৮ জন। নারী ১০,০১১ জন। পরের জমিতে চাষবাসকারী ও তাদের পোষ্যবর্গ মোট ২৫,৩৩৬ জন। পুরুষ ১২,৩৩৬ জন, নারী ১৩,০০০ জন। কৃষি শ্রমিক ও তাদের পোষ্যবর্গ ৩৯,৬৯৬ জন। পুরুষ ২০,০১৭, নারী ১৯,৬৭৯ জন। মধ্যস্বত্বভোগী মোট ২২ জন। পুরুষ ৮ জন, নারী ১৪ জন।

সিউড়ি কেন্দ্রীয় আদিবাসী ছাত্রীনিবাস

আদিবাসী কৃষককে সেই জমি বিনামূল্যে মোট ৯৮০০.২৭ একর তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা হল চাষযোগ্য জমির হিসাব। একই ভাবে ৬,৪১৪ জন মোট ১,১২,১৬৯ একর অকৃষি জমি পেয়েছেন।

যে-সব আদিবাসী কৃষকরা পরের জমি বর্গা প্রথায় চাষ করেন গত বছর পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ১৭,৩৪১ জনের ওই চাষের জন্য, যার পরিমাণ ১৯,৯৬৬.২৯ একর তা বর্গাদার হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ৪,৪৩৯ জন আদিবাসীর বাস্তুভিটা রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে। রেকর্ডভুক্ত বাস্তুজমির পরিমাণ ১৬৮.৩৭ একর।

ভূমি-সংস্কারের ফলশ্রুতিতে ব্যাপক অংশের আদিবাসী কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রভাব আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যথেষ্ট পড়েছে।

পঞ্চাশ বছরে এই চালচিত্রের পরিবর্তন যে ঘটেছে, সেটা আগেই উল্লেখ করেছি। এই পরিবর্তন ঘটার পিছনে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং এই সরকারের জনমুখী কার্যক্রম। বিশেষত, ভূমি সংস্কার। বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের মধ্যে সরকার ন্যস্ত খাস জমি বিনামূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গ্রামোন্নয়নের কাজ।

তার সঙ্গে আদিবাসী সমাজের সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, সমাজের ওই অংশের মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, যা আমাদের লোকসংস্কৃতির অন্যতম মূল্যবান সম্পদ, তার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল আদিবাসী নিজস্ব ভাষা সাঁওতালির নিজস্ব লিপি 'অলচিকি'র স্বীকৃতি, এই লিপিতে সাঁওতালি ভাষার বিদ্যালয়-পাঠ্য বই তৈরি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রভৃতিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণের ফলশ্রুতিতে উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সমাজের ওই অংশের মানুষদের মধ্যে নতুন প্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়েছে। আজ রাজ্যের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এ জেলাতেও তার স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে।

আদিবাসী সমাজের জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে জমি, দেখা যাচ্ছে বিগত বছর পর্যন্ত এ জেলার ২৮,৪৪২ জন

শিক্ষাগত চালচিত্র

সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার অন্যতম উপাদান হল শিক্ষা। অশিক্ষার অন্ধকার আদিবাসীদের সমাজের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রবল বাধাস্বরূপ থেকে গিয়েছে। কাজেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটানো সামাজিক বিকাশ ঘটাবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক।

এ জেলার আদিবাসীদের শিক্ষার হার কতটা বাড়ল, তার কোনো সঠিক চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। সমাজের ওই অংশের বর্তমান প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে বিদ্যালয়মুখিনতা ও শিক্ষালাভের আগ্রহ আগেকার যে-কোনো সময়ের তুলনায় বহু গুণে যে বেড়েছে—এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

দেখা যাচ্ছে যে ২০০৪ সালে এ জেলার প্রাথমিক স্তরের মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩,৪০,২০১ জনের মধ্যে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ২৭,৯২২ জন। ছাত্র ও ছাত্রী হিসাবে বিভাজন এরকম—ছাত্র ১৪,৬০১ জন। ছাত্রী ১৩,৩২১ জন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আদিবাসী কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানদের যারা বিদ্যালয় পড়ুয়া তাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এটা নিঃসন্দেহে অগ্রগতির লক্ষণ। বিশেষত আদিবাসী নারীদের মধ্যে শিক্ষাহীন মাত্রা যথেষ্ট। সেক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ২০০৪-০৫ সালে মোট ৬,২৮২ জন। এদের মধ্যে ৮১০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করছে।

সিধো কানহু ভবন

ওই তথ্যের আলোকে, এ কথা বলা যায় যে আদিবাসীদের শিক্ষাহীনতার যে বরফ যুগযুগান্ত ধরে জমাট ছিল, তা গলতে শুরু করেছে।

সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু দিক

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠন মূলত গোষ্ঠীভিত্তিক এবং সমাজের বিকশিত অংশ থেকে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিটি গোষ্ঠীরই সামাজিক সংগঠন আবার পৃথক পৃথক ধরনের। তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিগত পার্থক্যও রয়েছে। প্রত্যেকেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এরা সবাই তো প্রাক্-আর্য ভারতের বাসিন্দা। এদের মধ্যে কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত প্রায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা পরিবর্তনের ধাক্কায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে এবং এখনও হারাচ্ছে।

আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাঁওতাল আদিবাসী মানুষরা এখনও নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি ধরে রাখতে পেরেছেন। তবে, সমাজ বিকাশের নিয়মে সেখানেও যে তাঁদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অটুট ও অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে, তা বলা যাবে না। বিশেষত ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী বৈদ্যুতিন প্রচারযন্ত্রের আক্রমণে সংস্কৃতি জগতের সমস্ত লৌকিক উপাদানগুলির বিপর্যয় ঘটছে। তাদের অস্তিত্বের সমস্যা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। বিশ্বায়নের অক্টোপাস বাঁধনে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক অস্তিত্বই আজ বিপন্ন।

সংস্কৃতি তো উপরিকাঠামো। লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক যে জনসমাজ সামগ্রিকভাবেই তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আজ বিপন্ন। কাজেই, তাদের সংস্কৃতির উপরেও আঘাত অবশ্যম্ভাবী। তারই দুর্লক্ষণ ক্রমশ পরিস্ফুট হচ্ছে।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ধনতন্ত্র তার বিকাশের নিয়মে প্রাক্ধনতান্ত্রিক সমাজের অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটায়। এর কতকগুলি ইতিবাচক দিকও আছে। তবে, আজকে যেভাবে তা ঘটছে—তার সবদিকটা আশঙ্কামুক্ত নয়।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে আদিবাসী সমাজের পরিধেয়, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবহার্য আসবাব-পত্রসহ জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। চল্লিশ বছর আগেও আদিবাসী সমাজের নারীদের যে পরিধেয় ছিল, তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। আদিবাসী সমাজের যেসব কন্যা সন্তানরা স্কুল কলেজে পড়ছে। তারা বিদ্যালয়ের পোশাক ব্যবহার করছে, ছাত্ররা প্যান্ট-শার্ট পরছে।

আদিবাসীদের বিয়েসংক্রান্ত রীতিরও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা এখন আর আগেকার মত গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মেশা বা কোনো প্রকাশ্য স্থানে বিয়ে ঠিক করার (চলতি ভাষায় মনামনি) যে রীতি, তাতে আপত্তি জানাচ্ছে। আদিবাসী সমাজের চাকুরীজীবী অংশের মধ্যে অগ্রসর সমাজের জীবনধারা অনুসরণের আগ্রহ স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিচ্ছে। সেখানে মধ্যবিত্ত মানসিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হচ্ছে। এই অংশের মধ্যে নগরবাসী হবার ঝোঁকও লক্ষ করা যাচ্ছে। বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট শহর সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক চাকুরীজীবী আদিবাসী পরিবার বাসিন্দা হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সংখ্যক সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা রয়েছেন। সংখ্যাগতভাবে খুব বেশি না হলেও ধনতন্ত্রের বিকাশধারায় নগরায়নের যে ঝোঁক তার প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মে আদিবাসী সমাজের উপরেও যে পড়ছে, তা অনস্বীকার্য।

শেষ কথা

আর একটি দিক উল্লেখ করে এ নিবন্ধে ইতি টানতে চাই। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালের অনেক কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই জেলার আদিবাসী কৃষকসমাজ সামগ্রিকভাবেই বামপন্থী রাজনৈতিক চেতনার অধিকারী। পঞ্চায়েত-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে তারই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বীরভূমের আদিবাসী সমাজও আজ নবজীবনের অভিযাত্রী। নতুনকালের ভেরীনিনাদ তাঁদের কানেও পৌঁছেছে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

অলস মন্থর ফাল্গুন সিউড়ির পথে

ছবি : পাপান ঘোষ

বীরভূমের লোকভাষা, প্রবাদ-প্রবচন ও কথকতা

অসিত দত্ত

প্রসঙ্গকথা :

ভাষার উন্মেষের মৌলিক বিষয়টি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখে নিলে আমাদের পর্যবেক্ষণের জায়গাটি পরিস্ফুট হবে।

'Language is the product of a whole number of epochs, in the course of which it takes shape, is enriched, develops and is smoothened. A language, therefore, lives immeasurably longer than any base or any superstructure, but of several bases and their corresponding superstructures have not led in history to the elimination of a given language, to the elimination of its structure and the rise of a new language with a new stock of words and a new grammatical system.'[১]

কিংবা এভাবে বলা যায় 'Language exists, language has been created precisely in order to serve society as a whole, as a means of intercourse between people, in order to be common to the members of society and constitute the single language of society. Serving members of society equally irrespective of their class status.'[২]

ভাষার উদ্ভব, বিন্যাস, ইতিহাস সম্পর্কে এটি একটি সার্বিক রূপরেখা হিসেবে চিহ্নিত। সমাজের উত্থান-পতনে, অভ্যুদয়ে কিংবা উন্মেষে ভাষার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় না। নব নব সমাজ সম্পর্ক বিন্যাসের ব্যাপক রূপান্তরের সঙ্গে ভাষার পরিবর্তন সামগ্রিক অর্থে অত্যন্ত ক্ষীণ। সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের আমূল ও অনুপুঙ্খ রূপান্তর বিন্যাসে কিছু শব্দ ও শব্দাংশে অর্থের পরিবর্তিত রূপ অনুপ্রবিষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু ভাষার মৌল কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে যায়। চর্যাপদের ভাষা শব্দ, তার আনুষঙ্গিক রূপসন্নিধি বাংলা ভাষার মৌল চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেই আজকের অব্যাহত ধারার সঙ্গে অন্বিত, একাত্ম। পরিবর্তন ঘটে না এমন নয়, কিন্তু তার মাত্রা কিছু শব্দকে কেন্দ্র করে তাতে মৌল কাঠামো অটুট থাকে। যেমন—
নিতি সিআলা বিহে সম জুঝই।

ঢেণ্ঢন-পা এর গীত বিরলে বুঝই॥

—*চর্যাপদ*

অষ্টাদশ শতাব্দীর রূপাঙ্কনে আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি :

নিতি নিতি শৃগালা সিংহ সনে জুঝে।

কহে কবির বিরল জনে বুঝে।।

কিংবা দেখা যাবে যে, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যে ভিন্নমাত্রিক ছবি বিবৃত থাকলেও তা বাংলা ভাষার অব্যাহত রূপকেই দ্যোতিত করে। যেমন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট
তহি অতি দূরতর বাদল দোল
বারি কি ধারই নীল নিচোল

(গোবিন্দদাস)

এ বিষয়টিকে আমরা অবতারণা করছি এ কারণে যে ভাষার মৌল চরিত্রটি সমাজের সম্পর্কের তার বিশেষত্বের কাঠামোর কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর উপরিকাঠামোর সমতুল[৩] নয়। ভাষার বিন্যাস, চরিত্র ও চলিষ্ণুতা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় যে ভাষার উন্মেষ ঘটে, কিংবা বলা যায় নানা খাত-উপখাত পেরিয়ে একটি ভাষার রূপ স্পষ্ট হয়, তার সামগ্রিক রূপ একক নয়, তার ব্যাপকতা সমস্ত অংশ বিষয়ের বিভিন্নতাকে বিধৃত করে[৪] বাংলা ভাষার কথা ধরলে বলা যায়, চট্টগ্রামের বাংলা ভাষা, বীরভূমের বাংলা ভাষা একটি ভাষার প্রাণের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত। চট্টগ্রামের ভাষার রীতি, মৌলিকত্বে এক হলেও বীরভূমের ভাষা এবং চট্টগ্রামের ভাষাকে একমাত্রায় অভিহিত করা যায় না। এখানেই উপভাষা কিংবা 'ডায়েলেক্ট'-এর প্রকটতা বা প্রকাশ।

বীরভূমের লোকভাষা ও তার মৌলিকত্ব :

আমাদের প্রবন্ধ এ ক্ষেত্রকেই তার পরিচায়ক সংজ্ঞা প্রকৃতি, বিশিষ্টতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, উপভাষা একটি ভাষার ফসল বা ফলশ্রুতি জলবায়ু, শিক্ষার মান, আঞ্চলিকতার প্রাধান্য উপভাষার উদ্ভবের উৎসস্থল। এখানে আকার প্রকার, কিংবা নতুন অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ উপভাষাটিকে একটি বিশিষ্ট মাত্রায় অভিষিক্ত করতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এ কখনই নয় যে, উপভাষা একটি ভাষা ও তার মাতৃস্বরূপা ভাষাবংশ থেকে উদ্ভূত ও উদ্ভাসিত হয়নি। এখানে উপভাষার বিষয় প্রধান আকারে দেখা গেল, কারণ, বীরভূমের লোকভাষা এবং তার উপভাষা সমার্থক ও সমাশ্রিত বলে মনে হবে। এ বিষয়ের উপরেই এ আলোচনার বিস্তৃতি। সাধারণভাবে লোকভাষা ও উপভাষার মধ্যে একটা ফারাক থাকে, একটা ব্যবধায়ক রেখার অস্তিত্ব স্বীকৃত।

মার্জিত বা শিষ্ট ভাষার বিপ্রতীপে আপামর সাধারণের মধ্যে যে ভাষা বহমান থাকে, তাকেই তো লোকভাষা নামে অভিহিত করা যায়। কখনও কখনও একে গ্রাম্য জনভাষা হিসেবে দেখা হয়। এভাবে দেখবার চেষ্টা হয় যে অশিক্ষিত, অমার্জিত জনমানুষের মুখের ভাষাই লোকভাষা। কথাটা সার্বিকভাবে সত্য নয়। কারণ, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত নানা উপাসনা-উপকরণের উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন যন্ত্র-যন্ত্রাংশের ব্যবহারিক অভিধার সঙ্গে অন্বিত জীবনধারণ, শহরের মানুষের কিংবা মার্জিত রুচি মানুষের থেকে আলাদা, পৃথক। সুতরাং তাদের চলিষ্ণুতার ধরন আলাদা, তাদের জীবন থেকে শব্দ সংগ্রহ করা, তাদের জীবনের পথ থেকে কুড়িয়ে আনা নানা মাত্রার শব্দসৃষ্টি লক্ষণীয়ভাবে মৌলিক। অনেক সময় মনে হবে যে, উচ্চারণের ত্রুটির কারণেই এ বিকৃতি ঘটছে। এ তত্ত্ব সর্বাংশে সত্য নয়। যেমন 'খাত' শব্দটি অভিধানে আছে, খনি অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু 'খাদান' শব্দকোষে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার বড়পাহাড়ির পাথরখাত বা খনির নাম 'খাদান'। এ অঞ্চলের বাসযাত্রীর 'বাসস্টপ' খাদান নামে প্রচারিত। পাথরখাত বা 'স্টোন কোয়্যারি' নামে সাধারণ মানুষ জানে না। 'খাদান' নামে সমধিক উচ্চারিত, উদ্ভাসিতও বলা যায়। একে লোকভাষার অন্তর্ভুক্ত করে মার্জিত ও শিষ্ট শব্দভাণ্ডার থেকে পৃথকীকরণ সূত্রে বিভাজন করলেও এ নাম সর্বজনীন বিশেষত্বে বিভূষিত। শিষ্ট ভাষীরাও 'খাদান'কে 'খাত' বা 'খনি' বলে অভিহিত করেন। আমাদের বক্তব্য এই যে,

গোধূলি বেলায় আমার কুটিরের পথে

ছবি : পাপান ঘোষ

গ্রামীণতার ছাপ্প নিয়েও শব্দটি শিষ্টভাষীদের কথ্যভাষার অভিধানে স্থান করে নিতে পারে। ব্যবধানের সূত্রটা কি?
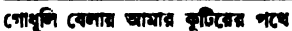
'ভাষায় সাধারণভাবে গ্রামীণতার যে লক্ষণগুলিকে শহরের লোক আলাদা করে চিহ্নিত করে সেগুলিই লোকভাষা বা গ্রাম্য ভাষার নির্ণায়ক। এই কারণে আমরা folk language-এর বাংলা হিসেবে গ্রাম্য ভাষা কথাটি সুপারিশ করি, লোকভাষা নয়।'[৫] আমাদের বক্তব্য, গ্রামের মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত গ্রাম্যভাষা লোকভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও শিষ্ট মার্জিত ভাষার সঙ্গে মৌলিকত্বে কোনও পার্থক্য সূচিত হয় না। বরং তাদের সৃষ্ট ভাষা ও শব্দসম্ভার বাংলা সাহিত্যে কিংবা বৃহদর্থে যে কোনও ভাষার অভিধানের সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। গ্রাম বাংলার মানুষের ভাষা ও শহরের মানুষের মার্জিত ভাষার মধ্যে, আমরা মনে করি, কোনও বিশেষ মাপের ফারাক নেই, কোনও চীনের প্রাচীর দাঁড়িয়ে নেই। সিউড়ি শহর বা এতদঞ্চলের বিশেষ করে রাজনগর খয়রাশোলের মানুষ একটি শব্দ ব্যবহার করেন, যার অর্থ তঞ্চকতা, কিংবা গোলমেলে কোনও বিষয়কেন্দ্রিক, শব্দটির নাম "ম্যাকোকেরী" এটি গ্রামের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জটিলতা বা প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার বিষয়কে বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

'আরে ভাই বোলো না এমন ম্যাকোকেরীর পাল্লায় পড়লাম, জানটো হয়রান হুং গেল।' জটিল এক সমস্যা বোঝাতে এ শব্দটির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ লোকভাষার সংজ্ঞায় একটি নতুন তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। লোকভাষা মানে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মুখের ভাষা, যার উৎপত্তি বা উন্মেষ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ থেকে হয়নি। ভারতবর্ষের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর জীবন ভাবনা থেকে, কিংবা তাদের সমাজ সম্পর্কের মধ্যে এবং শ্রমশক্তি প্রয়োগের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র থেকে উন্মেষিত হয়েছে। সমাজের সার্বিক রূপের সঙ্গে ভাষা সাঙ্গীকৃত। তাই সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের হাত ধরে সমাজ সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটলে ভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটে না ঘটে শব্দের অর্থের আগম কিংবা অর্থের সঙ্কোচন। মধ্যযুগীয় সমাজ সম্পর্কের প্রভাবজাত শব্দ 'মহাজন'-এর অর্থ মহাজন, বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও দর্শনে নিষ্ণাত। কিন্তু আজকের 'মহাজন' মানে সুদখোর, অর্থলগ্নিকারী ব্যক্তি। সামন্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ সম্পর্কের ছবি এতে বিধৃত আছে। বাংলা সাধু বা চলিত ভাষার সারা বাংলায় (এমনকি অখণ্ড) একটি সংস্কৃত সর্বজনীন রূপ আছে লিখিত অবস্থায় তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এক। কিন্তু লোকভাষা বা উপভাষায় তার রূপ চেহারা পাল্টে গেছে। প্রত্যয় নতুন আকার ধারণ করেছে। বীরভূমের 'রাধা'

উপভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে চিহ্নগুলি অন্যান্য উপভাষা থেকে পৃথক করে, তার স্বরূপ নিম্নরূপ :

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য :

১। রন্ধন > রাঁধুন—বাড়ুন
লোক > লুক > নুক
বোতল > বুতল
কোন > কুন
মন > মুন
ভোজ > ভুজ

২। পেট > প্যাট
ফুটবল > ফুটব্যাল
দেশ > দ্যাশ

আবার উল্টোটাও দেখা যায়।

প্যান্ট > পেন্ট
বেহায় > বেয়
বেহান > বেন

৩। অপিনিহিতের প্রভাব
চুল > চুইল
দেখব > দেইখব
করব > কইরব

৪। ন, ল-এর স্থান পরিবর্তন
লেখাপড়া > ন্যাখাপড়া
লেবু > নেবু
নেবে এসো > লেবে এসো
নিয়ে এসো > লিয়ে এসো
লোকাল > নোকাল

৫। অকারণ অনুনাসিকত্ব—
ঘোড়া > ঘোঁড়া
হাসপাতাল > হাঁসপাতাল
হাসি > হাঁসি

৬। পদগত বৈশিষ্ট্য :
রস > অস 'অসের মিষ্টি দিও বাছা।'
আমি > আমু

উদাহরণ—তুমি যাবে, আমুও যাব।

৭। অধিকরণ বোঝাতে 'কে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ :
ঘরকে, জলকে

বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও—'রামের 'লক্ষ্মীকে' বিয়্যা হছে।'

৮। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন :
হবে না > হবেক নাই
আমি যাব না> আমি যাবক নাই
শুনল না > শুনলেক নাই

বীরভূমি উপভাষার ভাষা-শৈলী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করছে। এমন বহু শব্দ আছে এবং বাক্য প্রয়োগ আছে যা অন্য কোনও জেলায় নেই বললেই চলে। পুরো বাক্যটার শব্দার্থ ভিন্ন অর্থকে দ্যোতিত করে এবং নতুন একটি লক্ষণকে হাজির করে।

'ছোঁট টানাটানি আমাবস্যা"।

বীরভূমি উপভাষায় বা লোকভাষায় ছোঁট মানে কাছা, তাকে টানাটানি করার অর্থ কখনই শিষ্ট অভ্যাস নয় এবং আমাবস্যা অর্থাৎ অমাবস্যার অভিধা অন্ধকার বা বিশেষ তিথিকে বোঝায় না। এর অর্থ নদী পেরোনোর সময় জলের প্রবাহের মাত্রার সঙ্গে যুক্ত। নৌকা চলার পক্ষে অনুপযুক্ত হেঁটে পেরোতে হবে। জলের গভীরতার মাপ করতে এ বাক্যটির প্রয়োগ। একজনের অভিজ্ঞতা অন্য একজনের কাছে রাখা হচ্ছে। কাছা পর্যন্ত জলের প্রবাহ আছে। কাছা সিক্ত হতেও পারে কিংবা পারে না এ সমস্যাকে বোঝাতে এ রকম বাক্যের প্রয়োগ হয়। আমাবস্যা মানে সমস্যা। সহজগম্যতার অভাব। এ রকম বাক্যপ্রয়োগের পদ্ধতি বীরভূমি লোকভাষাকে শুধু সমৃদ্ধই করেনি, বাংলা ভাষাশৈলীকে একটি নতুন মাত্রায় যুক্ত করেছে। আবার ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও দেখি ভিন্নতর প্রয়োগে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। যেমন—

হয়েছে > হল্ছে
লুকিয়েছো > লুকল্ছো
এসেছে > আলছে

বিস্ময়সূচক প্রয়োগে দেখা যায়—

'বাবু আল্ছেন'—বাবুর অপ্রত্যাশিত আগমনকে সূচিত করে।

দেখিয়ে দেব > দেখিন্ দুব।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতটা মৌলিক উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। ঝড়ে একটি কলাগাছ শিকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়েছে বীরভূমি উপভাষায় কিভাবে তার প্রকাশ হবে। 'কলাগাছটো হাত পা ছড়িন্ ছিটিন্ পড়ে গেল্ছে'।

মনে হবে অকারণ র-এর প্রয়োগ

ওজন > রোজন
(রোজন দেখে লিস্)
উই > রুই
উপবাস > রোপবাস
অনুমতি > রনুমতি।

আবার উল্টোটিও সমানভাবে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল :

রম্ভা > অম্ভা
রাস্তা > আস্তা
রক্ত > অক্ত
রস > অস
রাত > আত

ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগ :

চমকানো > ফলপানো

পরিত্যাগ > ছাড়বিড়

অশ্লীল অর্থকে কিরকম শিষ্ট প্রয়োগে যুক্ত করা যায় তার উদাহরণ নিম্নরূপ : 'কেল্যার পাঁরিটো পালায়েছে নাকি ঠসাকাকা'! কালী নামক ব্যক্তির ছাগী পালানোর বা হারিয়ে যাওয়ার খবর নিচ্ছে কোনও ব্যক্তি ঠসা মানে কালা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে এরকম প্রতীয়মান হচ্ছে শব্দ সমষ্টির অর্থ করলে। কিন্তু এ ভিন্নতর ব্যবহৃত হয়েছে। কালী নামক ব্যক্তির ভ্রষ্টা চরিত্রের মেয়ের পালানোর খবর নিচ্ছে কোনও ব্যক্তি ঠসা নামক ব্যক্তির কাছে। এখানে অশ্লীল অর্থের প্রাধান্য থাকলেও পশুকে সামনে রেখে অশ্লীলতাকে আড়াল করা হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচন :

প্রবাদ-প্রবচন সর্বজনীনতার স্বীকৃতি পেয়েও উদ্ভবের ইতিহাসের পরিচিতিহীনতার কারণে তা অনেক সময় একটি বৃত্তের সংকীর্ণতার সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয়। শুধু খণ্ডিত বাক্যের পরিসরের মধ্যে সীমায়িত হয়, অর্থপূর্ণ রূপও বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ এককের মাত্রায় অভিহিত হয়। প্রখ্যাত সমীক্ষার কিয়দংশ আমাদের পর্যবেক্ষণের জন্য উদ্ধার করে আনতে পারি।

লালমাটির জেলায় কৃষক রমণী ছবি : পাপান ঘোষ

'নিরর্থক না হইলেও এই যদৃচ্ছাকৃত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি কবিতা নয়, তত্ত্বকথা নয়, নীতি প্রচারও নয়, অথচ লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রবাদের আদি কথা যাহাই হউক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। গ্রন্থাদি রচনার বহু পূর্বেও প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চলতি কথার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়; কারণ, এগুলিকে রচনা করিবার জন্য রচিত হয় নাই, মানুষের মনে আপনি জন্মিয়াছে, তাই মানুষের মুখে আপনি প্রচলিত হইয়াছে'।" একটি সচেতন মানুষের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার ফসল কালক্রমে সর্বজনের এবং পরবর্তীকালের বিশ্লেষণে তত্ত্বরূপে গ্রহণযোগ্যর জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আপাতদৃষ্টিতে নিঃসঙ্গ একক বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে হলেও তা যে সর্বজনীনত্বকে স্পর্শ করেছে, তার প্রতীকরূপে আবির্ভূত হয়েছে, তা এক কথায় অনস্বীকার্য। সুতরাং প্রবাদ-প্রবচন বা প্রবাদবাক্যের উদ্ভবের ইতিবৃত্ত সাল তারিখ দিয়ে সীমার মাপে নির্দিষ্ট করতে না পারলেও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা বা অবদান যেমন স্বীকার্য, ঠিক তেমনি সমকালীন সমাজ-সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অভিমুখিনতার স্পষ্টোজ্জ্বল রূপ বিদ্যমান এ প্রবাদ বা প্রবচনে।

'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'—(চর্যাপদ) এ বাক্যে একটি সরল বিষয়ের অবতারণা আছে। হরিণের মাংসের জন্য তাকে নিহত করা হয়। সুতরাং তার নিজের মাংসই তার শত্রু। এ বিষয়কে স্মরণীয় করার জন্য বা ভবিষ্যতে এ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করার জন্য এ বাক্যের মধ্যে যে সীমায়িত বিষয় যে তাৎক্ষণিক একক প্রত্যয় আছে তাকে প্রয়োগ করার জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক মাধ্যম ব্যবহার করতে হয় না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার এ ক্ষুদ্র নিরীক্ষা একটি অসাধারণ তত্ত্ববাক্যে পরিণতি লাভ করে। বাক্যের মধ্যে সর্বজনীনত্ব সুপ্ত ছিল, তা কালক্রমে ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে একটি মৌলিক সর্বজনগ্রাহ্য প্রত্যয় এবং দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে। নিজের মধ্যেই শত্রুতার উৎস বিরাজমান বহির্জগত থেকে আসে না। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'। একটি অসাধারণ তত্ত্ব, সত্যও বটে। বেদের মধ্যেও প্রবাদবাক্যের উল্লেখ আছে। যেমন—

'ন বৈস্ত্রৈনানি সখ্যানি সন্তি।
সালাবৃকনাং হৃদয়ান্যেতা।'

অর্থাৎ নারীর মধ্যে সখ্য নাই, নারীর হৃদয় সালাবৃকের মতো।

বীরভূমের ভাবাভঙ্গি ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে যেমন গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি তার ধারাও প্রবাহিত হয়েছে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। যেমন (নারী) 'বারো হাত কাপড়েও ন্যাংটো'। নারীর পোশাক পরার ধরনকে কেন্দ্র করে এ

প্রবাদ গড়ে উঠলেও মূল লক্ষ্য তাদের অসম্পূর্ণতা, অনগ্রসরতা ও অসহায়ত্ব। নারী যে একমাত্র ভোগের সামগ্রী এবং তাকে কেন্দ্র করে বিশাল মাপের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম এবং মৃত্যুবরণ তার অসাধারণ প্রবাদবাক্য বীরভূমের অনগ্রসর মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত। যদিও তা প্রকাশ্যে উচ্চারিত নয়। পুরোটাই অশ্লীল। কারণ নারীর যৌনক্রিয়াকে লক্ষ্য করেই প্রবাদবাক্যটির উদ্ভব।

' — — করো না ভাই
— বড় ধন
— এর লেগে মরে গেলছে লঙ্কার রাবণ।"

বীরভূম-বিহার (এখন ঝাড়খণ্ড) সীমান্তের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করার মতো। বীরভূমে যে শব্দ প্রয়োগে নারীর যোনীকে বোঝায় তা দিয়েই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে হবে।

'ভাতারের ভাত খায় নাঙ্গের গুণ গায়।'

বিশেষভাবে বীরভূমে শব্দসম্ভারে 'নাঙ্গ' বলতে উপপতির উল্লেখ আছে।

'ওরে আমার কেরে।
সাত পুরুষের খাপড়া।'

আপনজন নয়, আত্মীয়ও নয় এমন মানুষ আত্মীয় সাজলে বীরভূমে এ প্রবচনের প্রয়োগ হয়।

'যে আমার বিয়া তার আবার দুপায়ে আলতা।'

নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বিষয় বোঝাতে, অপ্রতুল বস্তুর প্রতি লক্ষ নিয়ে এ প্রবন্ধের উদ্ভব।

'পোদে মাছি সাঁইধ্যা যেছি।'

এত বেশি পিছুনটান যে কোনও কিছু করার বা কোথাও যাওয়ার উপায়হীন অবস্থার প্রতি লক্ষ্যবদ্ধ এ প্রবাদবাক্যটি।

'ধনীনে ধনীনে কথা কয়
মধুরস বাণী
ধনীনে গরিবে কথা কয়
যেন কাঁকুর খেয়ে পানি'

কী অসাধারণ শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা এর মধ্য দিয়ে বিবৃত করা হয়েছে। সমাজ সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ছবিটি কী অসামান্য কুশলতায় অভিব্যক্ত করেছেন প্রবাদ রচয়িতা

'জোস্‌তা রেতে কিও ফোটে।
চোরের মায়ের বুক ফাটে ॥'

একটি সামাজিক অবস্থানের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সমাজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

'সাপের মুখে চুমু ব্যাঙের মুখে চুমু।'

এ প্রবাদটি শুধু বীরভূমে নয় সারা বাংলায় প্রচলিত। সমাজের জটিল চরিত্রের মানুষকে বোঝাতে এ প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়।

বুনের বিয়া যেমুন তেমুন
ভায়ের বিয়া রাঁইখেস্যা
খাই চকাচক মদ খেস্যা

সমাজে পুত্রকন্যার মধ্যে অসম ফারাক বোঝাতে প্রবচনটি ব্যবহৃত। এর মধ্য দিয়ে সমাজের যে ছবিটি ফুটে ওঠে, তা দিয়ে সমাজের ঐতিহাসিক অবস্থানের প্রকাশকে ব্যাখ্যা করা যায়।

'প্রেমেতে মজিল মন
কিবা হাড়ি কিবা ডুম।'

প্রেমের জগতে জাতি বিচারের কোনও স্থান নেই। যদিও শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিচারে এর প্রকাশ নিতান্তই সামান্য।

'গুঁড়ের গরু সয় না
যদি সয় হাল বয় না'।

গুঁড় বীরভূমি লোকভাষায় জেলে বা বাগদি। তারা কখনও চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যদি কখনও কেউ এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাতে তার কোনও উপকার হয় না, বরং অপকারই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যার যা করণীয়, তা না করে যদি ভিন্ন কাজে প্রবৃত্তি দেখায় তাহলে এ প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়।

'বেশ ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হল তাঁতির
এঁড়ে গরু কিনে।'

এখানেও এ প্রবাদ বাক্যটি পূর্বোক্ত প্রবাদ বাক্যকেই অনুসরণ করে ভিন্ন অর্থে। এক এক স্তরের মানুষের শ্রমবিভাজন নির্ধারিত থাকে, তাই নিজের বৃত্তের বাইরের কোনও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। এঁড়ে গরু কিনে তাঁতির মতো বিষম ফললাভের সমান দশা প্রাপ্ত হবে।

খেচে দেছে রাজভোগে
নিয়ে যেছে চিম্‌সে রোগে।

সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারে সন্তানের রুগ্‌ণতা দেখা গেলে এ প্রবচন ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির কর্মক্ষমতার অভাব দেখা গেলে এ প্রবচন নঞর্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যক্তিকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

'কালো বামুন কটা শুদ্র বেঁটে মুসলমান
ঘর জামাইয়া পুষ্যপুত্র সব শালাই সমান।'

এ প্রবচনের ব্যাপকতা থাকলেও বীরভূমে এর প্রচলন কম নয়। সরলীকরণের একমুখীনতা থাকলেও এর মৌলিকত্বে কোনও খাদ নেই। প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রবচন মানে প্রজ্ঞাপুষ্ট একটি জাতি বা গোষ্ঠীর অসাধারণত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। বীরভূম এ অর্থে একটি প্রাচীন ভূমির উপর অধিষ্ঠিত জ্ঞানবিজ্ঞানাদর্শের পথ প্রদর্শনের সঙ্গে অন্বিত ভাবাবংশ ও তার সামাজিক প্রত্যয় ও বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকার প্রতীক।

কথকতা-পাঠকতা :

'কথকতা' বা 'পাঠকতা' একটি অর্বাচীন যুগের বা কালের কিছু মানুষের আসর বন্দনায় অনুষ্ঠিত সীমিত আবেগ-উচ্ছ্বাসের

গীতিময়তার বৃত্তে সীমায়িত নয়। কথকতার ঐতিহ্য ভারতবর্ষের সারস্বত সাধনার সঙ্গে অন্বিত। ঋকবেদের বেদগানের পর্যায় থেকেই কথকতার উন্মেষ ঘটেছে। সামবেদের সামগানের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে কথকতার যাত্রাপথের শুরু। দিনক্ষণ সাল তারিখ দিয়ে নয়। সমাজজীবনের একটি সমৃদ্ধ সম্পর্কের উপর কথকতার উন্মেষ ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের প্রকাশ ঘটে এবং তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। কনৌজের ব্রাহ্মণরা ছিলেন পাঠক। বেদপাঠের অসামান্য আবেদনে বেদকে তাঁরা সাধারণ মানুষের মাঝখানে আনতে পেরেছিলেন। বেদকে শ্রুতি হিসেবে যে চিহ্নিত করা হয়, তার মূল কারণ এ কথকতা বা পাঠকতার মধ্যে নিহিত। স্মৃতিতে ধারণ এবং লোকসমক্ষে আবেগমিশ্রিত ভঙ্গি ও আবেদনে প্রকাশই বেদকে শ্রুতির সর্বজনগ্রাহ্য পর্যায়ে হাজির করে। পুরাণকে সাধারণ স্তরে আপামর জনগণের সম্মুখে হাজির করেন পুরাণ পাঠকগণ, যাঁদের বলা হত পৌরাণিক। পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এ অভিধায় ভূষিত হতেন পুরাণ পাঠকগণ। মূলত বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহই পঠিত হত।

ধনীগৃহের শুদ্ধান্তপুরে পুরাণ পাঠের আসর বসত। রামায়ণগানের মধ্যে কথকতার বীজ যে ছিল না এমন নয়। কিন্তু প্রধানত পুরাণপাঠ ছিল কথকতার প্রধান ও মূল ভিত্তিভূমি। বেদপাঠও হত কিন্তু তাতে আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা থাকত না। পুরাণ পাঠে মূলের আবৃত্তিসহ সহজ ভাষ্যের অবতারণা থাকত। ভাষ্যকে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য সঙ্গীত ও নাট্যরস পরিবেশন করা হত।

গুপ্ত সম্রাটদের আমলে লাট, কর্নাটক ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ব্রাহ্মণরাই বাংলাদেশে কথকতা বা পাঠকতার সূত্রপাত করেন। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলেখতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ উল্লিখিত আছে। পৌরাণিক কথকতার বা পাঠকতার বিশিষ্ট ধারায় ভাগবত পুরাণ পাঠ নিবদ্ধ ছিল। ভাগবত পাঠকে কেন্দ্র করে কথকতার একটি বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছিল। ভাগবতের বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রাবল্য এবং প্রেমাকুল আবেশের উচ্ছ্বাস, অত্যাচারী নিষ্ঠুর দৈত্যদানবদের নিহত করার ঘটনা কথকতার মৌল আলম্বনরূপে বিকশিত হয়েছিল। কৃষ্ণভজনে ভক্তির যে উচ্ছ্বাস আছে তা কথকতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। লক্ষ্মণ সেনের আমল থেকে ভাগবত পুরাণ খুব সম্ভব

'দই চাই দই...' পৌষমেলার মাঠে

ছবি : পাপান ঘোষ

বাংলাদেশে পরিচিতিলাভ করেছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতা, ব্রাহ্মধর্মশাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজকাঠামো, যৌনতাগ্রস্ত কৃষ্ণভক্তি, আধা-সামন্ত সমাজ সম্পর্ক সব মিলে অনিশ্চিত জীবনপ্রবাহকে পরিপুষ্ট করেছিল। ফলে রাঢ় বাস্তবতাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিস্মৃত হওয়ার জন্য কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য এবং তার আশ্রয় দেহসর্বস্বতা প্রাধান্যলাভ করেছিল। এর সামগ্রিকতা নিয়ে কথকতা বা পাঠকতার আসর জমে উঠেছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রব্যবস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থার কালে আবির্ভূত হলেন 'পদ্মাবতী-চারণ চক্রবর্তী জয়দেব। তাঁর অসাধারণ কাব্য 'গীতগোবিন্দ' শুধু কাব্য নয়, গেয় কাব্য এবং নাট্যরস সমাশ্রিত। বৈষ্ণবীয় কথকতায় শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে আখরের প্রয়োগ, গীতধ্বনির আবেদন, আবেগের প্রসার তার অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন বীরভূমের জয়দেব। যদিও জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে ১০৯০-১১১০ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সিদ্ধলগ্রামে বঙ্গরাজ হরিবর্মদেবের ব্রাহ্মণমন্ত্রী 'বালবলভীভূজঙ্গ' ভট্টদেবের নির্মিত মন্দিরে সঙ্গীতকেলি বিশেষজ্ঞ একশত বিদ্যাধরী অথবা দেবদাসী নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। জয়দেব লৌকিক কৃষ্ণকথার প্রসারে এবং দেবদাসীদের সৃষ্ট সঙ্গীতনাট্যরসে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মিথিলায় কথকতা পাঠকতার সমৃদ্ধ ধারার কথা মৈথিল সঙ্গীতজ্ঞ লোচনের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁর সময়কাল ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দ। মিথিলায় রাগাশ্রিত সঙ্গীতের সঙ্গে কথকতার একটা নিবিড় যোগ ছিল। কথক 'জয়ত' বিদ্যাপতির কাছে সঙ্গীত শিখে বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সঙ্গীত নাট্যরসকে কথকতায় সঞ্চারিত করেন। কথকতার আদর্শ ও তার মূল বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচিত হয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে। জ্যোতিরীশ্বর বিরচিত 'বর্ণরত্নাকর' কথকতার আদর্শগ্রন্থ। নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে মৈথিল কথকতার ঐতিহ্য বাংলাদেশে আসে চতুর্দশ শতকে। বৈষ্ণবীয় কথকতার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

'রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রুকম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাঢ় দেশে জাতিভেদ বিরোধী সুপণ্ডিত এক বৈষ্ণবগুরু জয়গোপাল দাস।

কথকতার মধ্যে যে কতটা সৃষ্টিধর্মিতা ছিল এবং এর রাগাশ্রিত অঙ্গের মধ্যে কতটা গ্রহণযোগ্য ছিল, তার প্রমাণ পাই পরবর্তী যুগের রাগাশ্রিত গানের মধ্যে কথকতার প্রভাব সঞ্চারিত বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গীতের মধ্যে।

'সংকীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
ভবানীভবের গান মকসসী মাথুর
গড়াহাটী রাণীহাটী বিরহ মাথুর
কবি পশতো তাল ফেরা শুনিতে মধুর
কথকতা তরজাতে শাড়ি (সারিতে) প্রচুর
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর
বাঙ্গালার নবগান নতুন ঝুমুর।'

সুতরাং কথকতার ঐতিহাসিক অবস্থান সার্বিকভাবে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সঙ্গীতবিস্তারে বিরাজমান। বীরভূমে রামায়ণী গানে, মনসার বিভিন্নস্তরের গানের বিস্তারে কথকতার প্রকাশ দেখা যায়। কথকের আবেগস্ফূরিত রামায়ণের বিভিন্ন অঙ্গের গান, রামের বিরহ, সীতার জন্য বিলাপ আবেগের উষ্ণতার সঞ্চার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বীরভূমের গ্রামে গ্রামান্তরের পরিবেশ আবেশঘন হয়ে ওঠে। বাংলা সঙ্গীতের নিজস্ব সম্পদ টপ্পায় কথকতার বিস্তৃতি লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের কবিতায় সঙ্গীতে কথকতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। আবার কথকতার মধ্যে ভারতচন্দ্রের কবিতার প্রভাব সঞ্চারিত লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে কথকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রামীণ জমিদার, নগরের জমিদার, ব্যবসায়ী। কথকতা কবিগানে, আখড়াই, হাফ আখড়াই পর্যায়ে নেমে আসেনি।

আজকের সংস্কৃতির বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বীরভূম আজও সুস্থ সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। গ্রামাঞ্চলে ভক্তিরসের প্রাবল্যকে এখনও মানুষ হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করে বিপর্যয়ের আক্রমণকে রুখে দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের সান্ধ্যকালীন কথকতার রস প্রাবল্য প্রভাবিত আসর অটুট আছে। সমাজ সম্পর্কের পরিবর্তমানতাকে স্বীকার করেও অতীত ইতিহাসের ধারাকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে বুঝতে চায়, অনুভব করতে চায়। 'আজু কে গো বাঁশরী বাজায়' এ রসধ্বনি কথকতার মৌল আসরকে, তার পরিবেশকে তার পরিমণ্ডলকে সার্বিকভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলেও আকর্ষণের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি।

সূত্র :

১। Marxism and Problems of Linguistics—J. V. STALIN. (Foreign Language Press, Peking 1976)
২। ঐ
৩। লোকভাষা লোকসংস্কৃতি—পবিত্র সরকার (চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৭)
৪। বাংলা প্রবাদ—সুশীলকুমার দে (এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা)
৫। বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি—রমাকান্ত চক্রবর্তী, সুবর্ণরেখা, কলকাতা।
৬। রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ সংস্কৃতি—ভব রায়

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

দুবরাজপুর পাহাড়েশ্বর শহীদমঞ্চ — সৌজন্যে : বিষ্ণুপ্রসাদ দাস
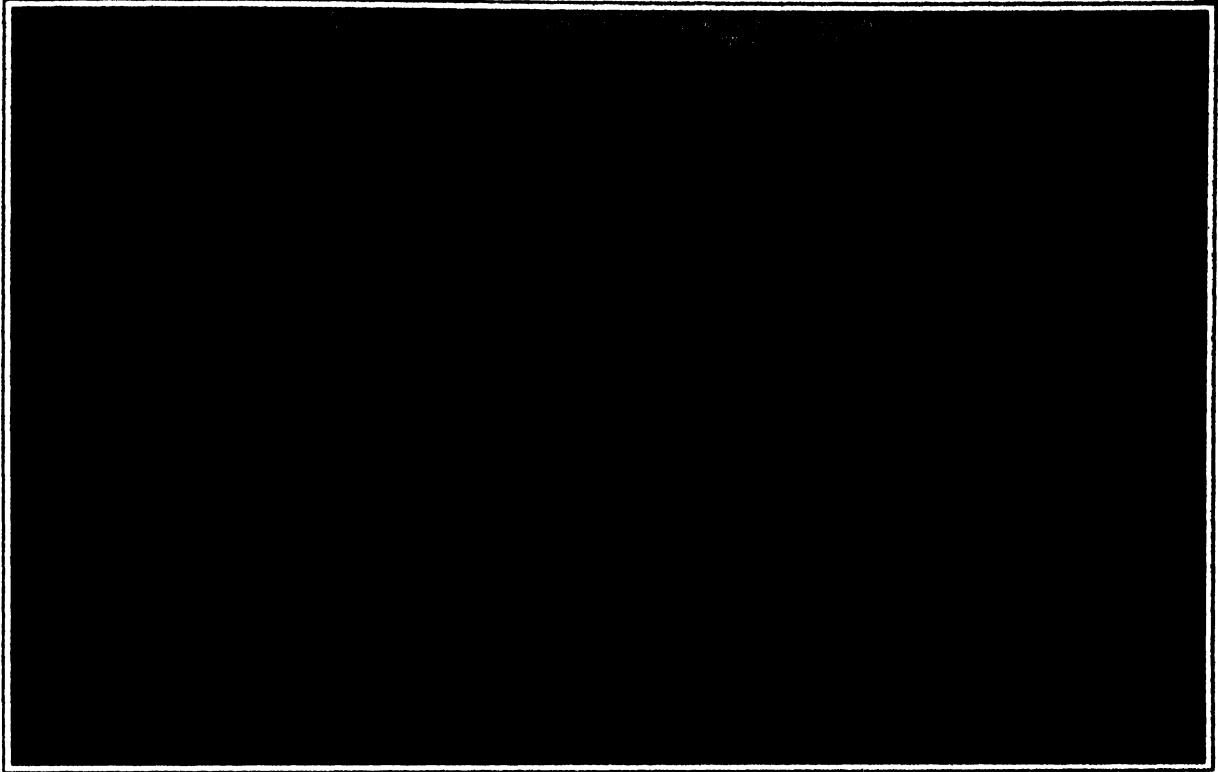
বীরভূম জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন

অমিয় ঘোষ

জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণার সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি প্রশ্নের বারবার মুখোমুখি হই—'এই জেলার লোকেরা কি মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেছিল ?' এই প্রশ্ন করার সঙ্গত কারণ হল, জাতীয় আন্দোলন নিয়ে সর্বভারতীয় নিরিখে যতখানি লেখালেখি হয়েছে এবং তার থেকে আমাদের যে ধারণা জন্মেছে সেই আলোকে জেলার ইতিহাসকে দেখা, অন্যদিকে কিছু স্মৃতিকথা বা টুকরো লেখা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত না হওয়া। অবশ্য ২০০০ সালের শেষে 'জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম' (১৯১৫-১৯৪৭) নামক পুস্তকটি প্রকাশ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কিছুটা চেষ্টা করেছি। আসলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলত ভারতবাসীর স্বার্থ ও ব্রিটিশ উপনিবেশ স্বার্থের মধ্যে সংঘাতের ফসল। অবশ্যই এই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্যায় ছিল ; কিন্তু বর্তমানে জেলা পর্যায়ের গবেষণা (তৃণমূল স্তর) প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই সংগ্রামের রূপও ছিল

নন্দলাল বসু (১৯৪২) অঙ্কিত ভারত ছাড়ো আন্দোলন-উত্তর চিত্র, উৎস : ডি আই বি ও, সিউড়ি

বৈচিত্র্যময়। সর্বভারতীয় পর্যায়ের আন্দোলনগুলিতে জেলার নেতৃত্ব জনগণকে আন্দোলনের নির্দিষ্ট ছকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্থানীয় সমস্যা এবং প্রতিকারের উপায় খোঁজার প্রচেষ্টা। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা এই আন্দোলনে সব মানুষের যোগদান যেমন সম্ভব নয়, জেলার সংগ্রামের ইতিহাসে সে-দৃশ্য প্রতিফলিত, এইরূপ অনেক জেলাতেই দেখা গেছে। তবে জেলায় গঠনমূলক নানা জাতীয়তাবাদী রণনীতি জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা।

এই বিষয়ে অবশ্য অধিকাংশ লেখকই একমত যে, বিংশ শতকের সূচনায় 'স্বদেশী আন্দোলন' আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে গতিময় করে তোলে। বাংলা ভাগের ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের বিরোধিতার জঠর থেকে জন্ম হয় স্বদেশি আন্দোলনের। তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর জেলায় ব্যাপক গণ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে স্বদেশি আন্দোলনের হাত ধরে।

স্বদেশি আন্দোলন ও বীরভূম জেলা :

এই প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমে বলে রাখা ভালো, এই ধরনের আলোচনায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলিকে ছাড়িয়েও জাতীয়তাবাদ সে সময় (স্বদেশি যুগে) অন্য রূপ গ্রহণ করেছিল। 'বয়কট' ও 'স্বদেশি' ছাড়াও 'গঠনমূলক স্বদেশি' যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আত্মশক্তি' তার বিকাশ যেমন শুরু হয় তেমনই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের ছাপ ধরা পড়তে থাকে। বীরভূম জেলায় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সভার পরিমাণ খুব কম ছিল না। সুমিত সরকার তাঁর 'Swadeshi' Movement in Bengal, 1903-1908 গবেষণা গ্রন্থে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে বীরভূমে জনসভারও উল্লেখ করেছেন।[১] স্থানীয় সমকালীন সংবাদপত্র থেকেও জানা যাচ্ছে যে, জেলায় স্বদেশি আন্দোলনকে প্রসারিত করার জন্য ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৬) জেলায় কংগ্রেস দলের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২] সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে এবং প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিয়ে[৩] বীরভূমবাসীর মনে স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে 'বয়কট' ও 'স্বদেশি'র পক্ষে প্রচার চালিয়ে আসছিলেন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ মিশ্র, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র চৌধুরী, ও দামোদর ব্রজবাসী প্রমুখ।[৪] কংগ্রেসের নতুন যে জেলা কমিটি তৈরি হয় সেখানে আন্দোলনে তীব্রতা আনার জন্য ঠাঁই দেওয়া হয় দামোদর ব্রজবাসী ও মৌলবি আব্দুল আজিজকে। সিউড়ি, রামপুরহাট বোলপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে তোলা হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সমাবেশ। উক্ত সভাগুলিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও মৌলবি দীন মহম্মদের উপস্থিতির কথা পুলিশের গোপন নথিপত্রে উল্লেখ রয়েছে।[৫] তবে জেলার অন্যতম ধর্মক্ষেত্র জয়দেব-কেন্দুলির মহান্ত দামোদর ব্রজবাসীর আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বর্ধমানের মহারাজের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য আখড়া বা আশ্রমের সপ্তম মহান্ত দামোদর ব্রজবাসীর প্রচেষ্টায় বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। 'স্বদেশি' আন্দোলনের সময় তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন। আখড়ার দুটি হাতিকে ব্যবহার করা হত প্রচারের কাজে (গ্রামে গ্রামে ঘোরার জন্য)। মহান্তের বক্তৃতার প্রধান অংশ জুড়ে থাকত ধর্মীয় চেতনাকে আঘাত করা (হিন্দু ও মুসলমান)। বয়কটের কথা বলতে গিয়ে বিদেশি কাপড়ে গরু ও শূকরের চর্বি ব্যবহার (কলা হিসাবে) ও বিলিতি চিনিতে গরু ও শূকরের রক্ত ব্যবহার করে পরিষ্কার এবং লবণে জন্তুর হাড়ের মিশ্রণ উল্লেখ করে তিনি মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে আঘাত করতেন। হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মনাশের কথা তুলে তিনি বিদেশি দ্রব্য বয়কটের আহ্বান জানাতেন। দামোদর ব্রজবাসীর বয়কটের প্রচার কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে (নিমতলা ঘাট, বলরাম বসু ঘাট) উপস্থিত হয়ে তিনি মহালয়ার সময় তর্পণরত ব্যক্তিদের 'স্বদেশিদ্রব্য' ব্যবহারের অঙ্গীকার বা শপথ করিয়ে নিতেন।[৬] সমকালীন স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, জেলার বিভিন্ন এলাকায় পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণরা উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করেন : যে ব্যক্তি বিলিতি দ্রব্য গ্রহণ করবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে।[৭] সিউড়িসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় মিষ্টির দোকানে বিদেশি চিনি ব্যবহারে ক্ষুব্ধ স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন দোকানের উপর চাপ সৃষ্টি করে মিষ্টিগুলি নষ্ট করে ফেলার জন্য।[৮] আপাতদৃষ্টিতে দামোদর ব্রজবাসীর প্রচার উৎসাহব্যঞ্জক হলেও এই প্রচারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে তোলার ইন্ধনটি পুরো মাত্রায় বর্তমান ছিল। আধুনিক কিছু গবেষক এই দিকটিকে নজর দিয়েছেন।[৯] তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জেলার বোলপুর এলাকায়) গঠনমূলক কর্মসূচি।

'স্বদেশি যুগে' (১৯০৩-১৯১১) বাংলার রাজনৈতিক জীবনের নানা ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'গঠনমূলক স্বদেশি'। নিষ্কাম ও 'ভিক্ষাবৃত্তি'র রাজনীতি বর্জন করে স্বদেশি শিল্প, জাতীয় শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার উপরে। 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে (১৯০৪) তিনি গ্রামের গঠনমূলক কাজের নকশা ইতিমধ্যেই পেশ করেছিলেন।

স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' প্রতিষ্ঠার গতি ধীর ও অনাড়ম্বর হওয়ায় 'স্বদেশীর আগুনে উত্তেজিত' যুবকদের কাছে তখন সেটি সাড়া জাগায়নি। অনুন্নত বীরভূমকে বেছে নিয়ে 'গঠনমূলক স্বদেশী'র এক কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় ছিল ইংরেজদের বিদ্যালয়ের এক পালটা প্রতিষ্ঠান গঠন। 'স্বদেশি যুগে' রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় জেলার ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা ও শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে গঠনমূলক যে কর্মসূচি শুরু করে তার খ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে।

অসহযোগ আন্দোলন ও বীরভূম :

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যোগদানের আগে আক্ষরিক অর্থে রাজনীতি একটি 'নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থে' আবর্তিত হচ্ছিল।[১০] রবীন্দ্রকুমার স্পষ্টভাবেই বলেছেন, এক নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থেকে জনতার ভাবনাকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্ব তখন জেলা বোর্ড ও সংসদীয় সভার সদস্য রূপে স্বায়ত্ত শাসনের স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত।[১১] অন্যদিকে 'সুরাট সংঘাতের' পর চরমপন্থী গোষ্ঠী বিপ্লববাদের পথকে বেছে নিয়ে গুপ্তভাবে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি চালাতে গিয়ে জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তৎকালীন ভারতীয় যুবসমাজ নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব থেকে রাজনীতি মুক্ত হয়ে নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানাবার জন্য ছিল উন্মুখ। এই মানসিক শূন্যতা ও রাজনৈতিক দৈন্যতার দিনে গান্ধীর আহ্বান ভারতে বিপুল সাড়া জাগায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফত আন্দোলন এবং ইংরেজ অত্যাচারের চূড়ান্ত নিদর্শন জালিয়ানাওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড গান্ধীজিকে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগ করে দেয়। ইংরেজ অত্যাচার দেশব্যাপী যে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, সেই ভয় তাড়াতে তিনি দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের ডাক দেন।[১২]

ভারতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ নীতি প্রয়োগ করার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দাবি আদায়ের জন্য গণসংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সত্যাগ্রহ ভাবনা প্রচারের জন্য এবং আত্মনির্ভরশীল কর্মী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৈরি করেন ফিনিক্স বিদ্যালয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন শেষ হলে গান্ধীজি ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে সমস্যার মুখে পড়লে শান্তিনিকেতনের একনিষ্ঠ কর্মী এন্ড্রুজ এগিয়ে আসেন সাহায্যের মনোভাব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে এন্ড্রুজের আহ্বানে ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদল এসে পৌঁছায় বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে (১৯১৫)।[১৩] কিছুদিনের মধ্যে গান্ধীজি স্ত্রী-সহ এসে পৌঁছন শান্তিনিকেতনে ; এটি ছিল জেলায় গান্ধীজির প্রথম আগমন (১৭-২-১৯১৫)।[১৪] শান্তিনিকেতন আশ্রমে আত্মনির্ভরশীল ভাবনার প্রয়োগ শুরু করেন গান্ধীজি। দিনটি 'গান্ধীপুণ্যাহ দিবস' নামে আজও পালন হয় শান্তিনিকেতনে (১০-৩-১৯১৫)। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, গান্ধীজির শান্তিনিকেতনে আগমন এবং তাঁর স্বরাজ ভাবনার ইতিবাচক দিকের ভারতে প্রয়োগের সূচনা হয়েছিল বীরভূম জেলাতেই।

দেশ জুড়ে গান্ধীজি যে অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন বীরভূম জেলায় তার সূচনা হয় ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের সকল ছাত্র একযোগে মহাবিদ্যালয় ত্যাগ করে।[১৫] বেণীমাধব ইস্কুলের (সিউড়ি) ছাত্ররাও গান্ধীজির আহ্বানে পথে নামে।[১৬] কলেজ ও বিদ্যালয়-ত্যাগী ছাত্রদের নিয়ে ভবিষ্যত কর্মসূচি নির্ধারণে কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক সভার আহ্বান করেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জেলায় সকল প্রকার সরকারি অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান বর্জন করা হবে।[১৭] জেলাশাসক ছাত্রদের বিদ্যালয় ও কলেজে ফিরে যাবার আহ্বান জানালেও তারা অনড় থাকে। ইতিমধ্যে নবনির্বাচিত জেলা কংগ্রেস সম্পাদক গোপিকাবিলাস সেনের উদ্যোগে জেলাব্যাপী

কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তিলক তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও চরকার প্রবর্তনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, মারগ্রাম, বসোয়া, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে তোলা হয় 'স্বরাজ আশ্রম'।[১৮] এই আশ্রমগুলি থেকে চরকার প্রচার, সালিশি সভার আহ্বান এবং বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সত্যাগ্রহীদের প্রচেষ্টায় সাঁইথিয়া ও বোলপুরে গড়ে ওঠে 'শিক্ষাগার' ও সিউড়িতে জাতীয় বিদ্যালয়।[১৯] সমকালীন পত্র-পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, অসহযোগের প্রচারে জেলায় আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি সিউড়ি, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে জনসভা করেন,[২০] সেগুলিতে ব্যাপক জনসমাগম হয়।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বীরভূম জেলায় অসহযোগ আন্দোলন নির্দিষ্ট ধারায় চলেছিল। কিন্তু জেলায় অসহযোগ ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় এক নূতন ধারা 'ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলন।' বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় করবন্ধ (বয়কট) যেমন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল তেমনি জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জির নেতৃত্বে সমগ্র বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে তীব্র ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন। গান্ধীজি স্বায়ত্ত শাসনে ট্যাক্স প্রদানের পক্ষে ছিলেন, জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব তাই ট্যাক্সদানের পক্ষেই প্রচার করতে থাকে। অন্যদিকে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের ট্যাক্স প্রদানের (ইউনিয়ন বোর্ডের). আর্থিক অক্ষমতা উপলব্ধি করে জীতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাদের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে জেলার অসহযোগ আন্দোলন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়।

অনগ্রসর বীরভূম জেলায় অনাবৃষ্টি ও ম্যালেরিয়া ছিল নিত্যসঙ্গী। ১৯১৮-১৯২১ সালের মধ্যবর্তী সময় অনাবৃষ্টিজনিত কারণে দুর্ভিক্ষে জেলায় প্রায় এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।[২১] বিশ্বযুদ্ধজনিত আর্থিক মন্দা, অনাহার, দারিদ্র্য ও মৃত্যু জেলার নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী শ্রেণিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এই বিক্ষুব্ধদের নিয়ে জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি অসহযোগ আন্দোলনে জেলায় নূতন মাত্রা দেন ; রামপুরহাট মহকুমায় জীতেন্দ্রলালের অনুগামী মৌলবি আহমদ আলি এলাকায় গড়ে তোলেন জঙ্গী প্রতিরোধ। ১৯২১ সালের ৩ মে ১৬টি গ্রামের প্রায় ২০০০ কৃষক জেলা সদর সিউড়িতে সমবেত হয়ে কর বন্ধের দাবিতে জেলা শাসককে পাঁচ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে।[২২] রামপুরহাট মহকুমার থানার পুরাতন নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, 'এলাকার কৃষকরা জমি জরিপের কাজে বাধা সৃষ্টি করেন। সাঁইথিয়া থানার কয়েকটি গ্রামে কর আদায়কারীদের সঙ্গে কৃষকদের হাতাহাতি হয়।[২৩] তিলপাড়া, বালিজুড়ি, মাঠপলসা প্রভৃতি স্থানের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা সরকারের করনীতি ও দমননীতির বিরুদ্ধে সদস্যপদ ত্যাগ করে প্রতিবাদ জানায়।[২৪] সাঁইথিয়া শহরে ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট পালন করে (২৫-৪-১৯২১)।[২৫] রাজদ্রোহিতার অপরাধে জেলার দুই অন্যতম নেতা জীতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি এবং গোপিকাবিলাস সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[২৬] দেশব্যাপী আন্দোলন বন্ধের ডাক দিলেও (১৯২২) গান্ধীজির এই আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে জেলায় করবন্ধ আন্দোলন দীর্ঘদিন চলেছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে আত্মনির্ভরশীল ভাবনার প্রয়োগ শুরু করেন গান্ধীজি। দিনটি 'গান্ধী পুণ্যাহ দিবস' নামে আজও পালন হয় শান্তিনিকেতনে (১০-৩-১৯১৫)। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, গান্ধীজির শান্তিনিকেতনে আগমন এবং তাঁর স্বরাজ ভাবনার ইতিবাচক দিকের ভারতে প্রয়োগের সূচনা হয়েছিল বীরভূম জেলাতেই।

অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে শান্তিনিকেতনে আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়। শান্তিনিকেতনের কর্মী নেপালচন্দ্র রায় কংগ্রেস দলের রাজ্যকমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[২৭] শ্রীনিকেতনে গ্রামের কাজে যুক্ত কর্মীরা অসহযোগের পক্ষে গোপনে প্রচার চালাতে থাকেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যখন গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা উপবাস পালন করে।[২৮] শান্তিনিকেতন অসহযোগের কেন্দ্র হয়েছে একথা বিদেশে বসে গুরুদেব বন্ধুর চিঠিতে জানার পর কিভাবে চঞ্চল হয়ে পড়েন সেটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে অনুমান করা যায়।[২৯]

জেলায় আইন অমান্য আন্দোলন :

গান্ধীজি পরিচালিত সর্বভারতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল আইনঅমান্য। আইনঅমান্য আন্দোলন চলার সময় রাজ্যের মতো জেলার রাজনীতিও ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ।[৩০] ১৯৩০ সালের মে মাসে হরতাল ও পিকেটিং-এর মধ্য দিয়ে জেলায় আইনঅমান্য শুরু হয়। একটা গোষ্ঠী আন্দোলনকে (সুভাষগোষ্ঠী) জঙ্গী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। ট্যাক্স বন্ধকে কেন্দ্র করে দুবরাজপুরে চাষিদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে।[৩১] মদের দোকানের সামনে পিকেটিং কেন্দ্র করে নানাস্থানে

সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩৮ সালে বোলপুর স্টেশনে

১৯৩৯ সালে বীরভূমে রূপপুরে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে আমার কুটির আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

উত্তেজনা দেখা দেয়।[৭১] রামপুরহাট শহরে বিক্ষোভকারীরা পথ অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলে।[৭২] অতঃপর আন্দোলন দমন করার জন্য জেলা শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে জেলাব্যাপী ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। জেলায় আন্দোলনের জঙ্গী চরিত্র নিয়ে পুলিশপ্রশাসন কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিল সে চিত্র ধরা পড়ে রাজ্যে মুখ্যসচিবকে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের লেখা এক চিঠিতে : "I have honour to say that the District Magistrate of Birbhum now reports that Congress agitation in that district has intensified and taken a definite turn towards violence...Reports of violence on the part of picketters have been received from several other places. The D M (Birbhum) thinks that the introduction of the Ordinances (V & VI of 1930) in other districts of the Division has caused the volunteers to flock into Birbhum as being and area more favourable to their activities।[৭৩]

জেলাশাসক অতঃপর দমননীতির নির্দেশ পেলে[৭৪] জেলাব্যাপী ব্যাপক পুলিশী অত্যাচার শুরু হয়। বাহিরী, বোলপুর, ইলামবাজার, নানুর ও দুবরাজপুরে কংগ্রেস অফিসগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের গ্রেপ্তার করে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রচারপত্র পুড়িয়ে ফেলে। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় দাবি জানানো হয় যে, অত্যাচার বন্ধ করতে হবে এবং একটি তদন্ত কমিটি (নয় সদস্যের) গঠন করতে হবে।[৭৫]

গান্ধীজির নেতৃত্বে আরউইন চুক্তির পর বাংলার অন্যতম নেতা সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীর নীতির প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতে থাকেন। আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে জেলাকংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। জেলার চরমপন্থী কংগ্রেসকর্মীরা নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে আহমদপুরে একটি পৃথক জেলা কমিটির দপ্তর খোলে 'জেলা যুব সমিতি' নামে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থন লাভ করে।[৭৬] আইনঅমান্য আন্দোলনের অন্তরালে এই বিক্ষুব্ধ সংগঠন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করে। অন্যদিকে গান্ধীপন্থীরা অহিংস পথে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। লাভপুর, বোলপুর, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর থানার নথিপত্র থেকে জানা যায়, জঙ্গী আন্দোলনের জন্য কয়েক শত স্বেচ্ছসেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলার আন্দোলনে অতঃপর গান্ধীবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নলহাটি এলাকায় লালবিহারী সিংহের নেতৃত্বে জাজিগ্রামে 'সর্বোদয় আশ্রম', মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁতীপাড়ায় 'নিখিল ভারত পল্লী শিল্পকেন্দ্র' এবং হংসেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে বোলপুরে 'শিক্ষাগার' জেলায় গঠনমূলক আন্দোলনে এক জোয়ার আনে। ১৯৩৩ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় (গান্ধীজি সম্পাদিত) জেলার গঠনমূলক কর্মসূচির প্রশংসা করা হয়।[৭৭] এইসময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বক্রেশ্বর মন্দিরে হরিজনদের নিয়ে প্রবেশাধিকার[৭৮] কর্মসূচি।

বীরভূমে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রসার :

বঙ্গভঙ্গের সূচনায় বাংলার রাজনৈতিক লড়াইয়ের নূতন হাতিয়ার হয়েছিল বিপ্লববাদ। রাজনীতিতে এই পালাবদল ছিল 'ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা।' স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে গ্রাম-শহরের বিভাজন সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও শহরে নেতাদের সঙ্গে গ্রামের মানুষের যোগাযোগ বাড়ে। রাজনৈতিক বৃত্তের পরিধি ক্রমশ বাড়তে থাকে।[৭৯] স্বদেশি জোয়ারে ভাটা এলেও বিপ্লবীদের কর্মযজ্ঞ থামার কোনো লক্ষণই ছিল না। দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র, হত্যাকান্ড, অর্থের জন্য ডাকাতি বিপ্লবীদের কর্মসূচির তালিকায় ছিল প্রথম দিকে। তবে বাংলার বিপ্লবীদের বড় সাফল্য ছিল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুন্ঠন (১৯১৪, আগস্ট)। এই মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীরা যে বড় আঘাত হানতে পারে সে আশঙ্কায় গোয়েন্দা দল যখন হন্যে হয়ে অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন তারা খবর পায় মউজার পিস্তল ও কার্তুজের কিছু অংশ লুকিয়ে রাখা হয়েছে

দুকড়িবালা ছিলেন বাংলায় প্রথম অস্ত্র আইনে ধৃত মহিলা। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তের সূত্রে জানতে পারে যে বীরভূমের নানা স্থানে জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি প্রমুখের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের গোপনে যাতায়াত রয়েছে। জেলায় এই ধরনের (গোপনে) বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্বদের আগমন পুলিশকে চিন্তায় ফেলে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মে নিযুক্ত প্রাক্তন বিপ্লবীদের উপর যেমন নজরদারি বাড়তে থাকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা যাতায়াত করছেন তাদের গতিবিধি নোট করা হতে থাকে।

শহীদ বেদী, সিধো কানহু ভবন

বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে।[৪১] দুকড়িবালা চক্রবর্তীকে অস্ত্র রাখার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ভাইপো নিবারণ ঘটকসহ উভয়ের কারাদণ্ড হয় যথাক্রমে ২ ও ৫ বছর।[৪২] দুকড়িবালা ছিলেন বাংলায় প্রথম অস্ত্র আইনে ধৃত মহিলা। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তের সূত্রে জানতে পারে যে বীরভূমের নানা স্থানে জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি প্রমুখের মতো বিখ্যাত বিপ্লবীদের গোপনে যাতায়াত রয়েছে। জেলায় এই ধরনের (গোপনে) বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্বদের আগমন পুলিশকে চিন্তায় ফেলে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মে নিযুক্ত প্রাক্তন বিপ্লবীদের উপর যেমন নজরদারি বাড়তে থাকে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রতিষ্ঠানে যাঁরা যাতায়াত করছেন তাদের গতিবিধি নোট করা হতে থাকে।[৪৩] জেলা গোয়েন্দা দপ্তরের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগদানকারী মণীন্দ্র রায়, কেদারেশ্বর গুহ, কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ প্রাক্তন বিপ্লবীরা বোলপুর-শান্তিনিকেতনকে বিপ্লবীদের গোপন মিলনক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করতেন।[৪৪] মূলত কালীমোহন ঘোষ ও কেদারেশ্বর গুহের গোপন সহযোগিতায় ধীরে ধীরে বোলপুরে গড়ে ওঠে 'অনুশীলন' দলের সংগঠন।[৪৫] ধীরে ধীরে এই সংগঠনের শাখা গড়ে ওঠে নানুর থানা, নলহাটি থানা, রামপুর থানা ও ইলামবাজার থানা এলাকায়। রুশ বিপ্লবের পর এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠায় (জেলায়) এদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ধারা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। গোয়েন্দা দপ্তর বোলপুর-শান্তিনিকেতন এলাকায় বিপ্লবীদের কার্যাবলী চলতে পারে এই চিন্তা প্রথমে মাথায় আনেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠানের সুনামকে গোয়েন্দাচোখে ফাঁকিদানের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে বিপ্লবীরা নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। অন্যদিকে বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবীকে (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অংশুপ্রকাশ ব্যানার্জি প্রমুখ) জেলার বিভিন্ন থানায় নজরবন্দী রাখা হয়েছিল। তাঁরাও স্থানীয় যুবককদের সহযোগিতায় গোপনে গড়ে তোলেন 'যুগান্তর' দলের শাখা সংগঠন। লাভপুর থানার ভালাসগ্রাম ছিল 'যুগান্তর' দলের শক্ত ঘাঁটি। আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস গোষ্ঠী গান্ধীজির অহিংস নীতির সমালোচনা করে জেলায় আহমদপুরে যে 'বীরভূম জেলা যুব সমিতি'র অফিস খোলে সেই অফিস থেকে গোপনে নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও জগদীশ ঘোষের নেতৃত্বে জেলাব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[৪৬] অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি, অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য ছিনতাই বা লুঠ, বোমা ও ডিনামাইট সংগ্রহ করার জন্য যোগাযোগ গড়ে তোলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করা।

১৯৩১-৩২ সালের মধ্যে জেলায় বিপ্লবীরা ১২টি ডাকাতির (সফল) মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, ছিনতাইয়ের মাধ্যমে কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে গড়ে তোলে বিপ্লবীরা আন্তঃজেলা ষড়যন্ত্র। জেলায় এতকাল জগদীশ ঘোষ বিপ্লবীদের (যুগান্তর) নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রাণগোপাল মুখার্জি নেতৃত্বপদ পূরণ করেন। প্রাণগোপাল জেলার বিপ্লবীদের চিন্তা ও কর্মধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে বৈপ্লবিক ভাবনার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল সমাজতান্ত্রিক ভাবনার। ভগৎ সিং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের যে 'হিন্দুস্থান সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী সেনা' গঠিত হয়েছিল প্রাণগোপালের সঙ্গে ছিল তাদের যোগাযোগ।[৪৭] মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় জেলার 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' উভয় দলের সদস্যগণ দুবরাজপুর থানার হালসোত গ্রামে এক গোপনসভায় মিলিত হয়ে গঠন করে New Socialist Republican Association (NSRA)।[৪৮] এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলে দেশকে স্বাধীন করা এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলা।[৪৯] জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছিল এই নূতন বৈপ্লবিক কর্মধারা সকলকে অবগত করার জন্য। নানা বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত করা হয় জেলার

নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকজনদের।[৩১] জেলা গোয়েন্দা দপ্তর সুবলপুর ডাকাতির সূত্রে ভালাস গ্রাম থেকে বিপ্লবী জয়গোপাল চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে তাঁর কাছে নানা তথ্যসূত্র জেনে বিভিন্ন স্থানে তল্লাসি চালিয়ে বিভিন্ন প্রমাণসহ ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিশেষ আদালত গঠন করে শুরু হয় 'বীরভূম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা' ৩০৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে (৪০ দিন ধরে) রায় দান করে ১৯৩৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। আসামী ২১ জনের মধ্যে ১৭ জন বিপ্লবীর (৪½ বছর থেকে যাবৎজীবন) সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[৩২] জেলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপর শেষ আঘাতটি হানা হয় 'অতিরিক্ত বীরভূম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা'র মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে পুলিশের ধারণা ছিল শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে নিম্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উপস্থিতি ও যোগাযোগ রয়েছে তার তথ্য প্রকাশ পায় এবং শুরু করে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ অভিযুক্তের মধ্যে ৬ ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৩৩]

১৯৩৮ সাল থেকে সরকারি আইন শিথিল হওয়ায় বিপ্লবীরা মুক্তি পেয়ে একে একে আসতে থাকেন আমার কুটিরে। ধীরে ধীরে দেশকর্মীদের প্রচেষ্টায় 'আমার কুটির' জেলার গঠনমূলক কর্মসূচির যেমন প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় তেমনি জেলায় বাম আন্দোলনের সূচনা হয় এখান থেকেই।

'আমার কুটির' ও জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন :

বীরভূমের জাতীয় আন্দোলনে 'আমার কুটির' প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে জেলার রাজনৈতিক ধারায় পরিবর্তন আসে। প্রতিষ্ঠানের মূল সংগঠক সুষেণ মুখার্জি যিনি দীর্ঘকাল বৈপ্লবিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, তাঁরই প্রচেষ্টায় বোলপুরের অদূরে গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে (সূতীবস্ত্র ছাপার প্রতিষ্ঠান) গড়ে ওঠে ১৯২৬ সালে। কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মগোপনের কেন্দ্র হওয়ায় পুলিশ সুষেণ মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করলে[৩৪] এই গঠনমূলক সংগঠনটির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩২-১৯৩৭ সালের মধ্যবর্তী সময় বিভিন্ন কারাগারে বন্দী-জীবনযাপনকালে পারস্পরিক পরিচয় হয় নানা বিপ্লবীদের সঙ্গে। কারাগারগুলি তখন হয়ে উঠেছিল মার্কসবাদী চর্চার কেন্দ্র। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা নূতন পথের সন্ধানে যেমন চিন্তিত ছিলেন তেমনই মুক্তির পর তাদের আশ্রয়স্থল ও কর্মসূচি কি হবে সে বিষয়টি নিয়ে ছিলেন ভাবিত। সুষেণ মুখার্জি মুক্তির পর বিপ্লবীদের আহ্বান জানান আমার কুটিরে আসার জন্য। ১৯৩৮ সাল থেকে সরকারি আইন শিথিল হওয়ায় বিপ্লবীরা মুক্তি পেয়ে একে একে আসতে থাকেন আমার কুটিরে। ধীরে ধীরে দেশকর্মীদের প্রচেষ্টায় 'আমার কুটির' জেলার গঠনমূলক কর্মসূচির যেমন প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় তেমনি জেলায় বাম আন্দোলনের সূচনা হয় এখান থেকেই। বিভিন্ন গ্রামে কুটির সদস্যরা গড়ে তোলে নৈশবিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যচর্চাকেন্দ্র। বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য চর্মশিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে প্রচার চলতে থাকে কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে। সর্বোপরি পান্নালাল দাশগুপ্ত, কালিপদ বশিষ্ঠ, সুরেন ব্যানার্জি ও কেশব দাসের মতো ব্যক্তিত্ব আমার কুটিরে যোগদানের পর[৩৫] কুটিরের কর্মে রাজনৈতিক ছোঁয়া লাগে। ক্রমে আমার কুটিরের কর্মীদের প্রচেষ্টায় জেলা জুড়ে গড়ে ওঠে কৃষক সংগঠন, জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম। কিছুকাল কমিউনিস্ট লীগ ও কমিউনিস্ট দল আমার কুটিরের কর্মীদের সহায়তায় জেলাব্যাপী যৌথভাবে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করেছিল। এই যৌথ আন্দোলনের ছিল দুটি ধারা—(১) জমিদারদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং (২) কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করে আগামীদিনে বৃহত্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের জন্য তাদের প্রস্তুত করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে (১৯৩৯) আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমার কুটিরের সদস্যরা মতাদর্শ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং অনেকেই কুটির ত্যাগ করে পৃথকভাবে বাম আন্দোলন চালাতে থাকেন। দর্পশীলা, শ্রীচন্দ্রপুর, রূপপুর ইত্যাদি স্থানে কৃষকদের নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে কুটির সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত বড় ধরনের জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন।[৩৬] আমার কুটিরের সদস্যগণ যে কতখানি কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়।

জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব : 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন

জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতার পরিচয় মেলে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ভারতীয়দের সাহায্যলাভের আশায় ইংরেজ সরকার ক্রীপসকে প্রস্তাব নিয়ে পাঠালে অধিকাংশ দলই সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের গতি ছিল তখনও অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী দেখা দেয় রাজনৈতিক হতাশা। ক্রুদ্ধ গান্ধীজি জাপানী আক্রমণ

আমার কুটির, শান্তিনিকেতন

ঠেকাতে ইংরেজদের 'ভারত ছাড়ো' শ্লোগান তোলেন। ১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধীজির প্রস্তাব পাশ হলে দেশব্যাপী শুরু হয় আন্দোলন। বীরভূমে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয় তৎকালীন কংগ্রেস কমিটির জেলা সম্পাদক লালবিহারী সিং-এর নেতৃত্বে। ১৫ আগস্ট জেলার কংগ্রেস দলের আহ্বানে দুবরাজপুরে সরযুপ্রসাদ ভগতের বাড়িতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে এক গোপন সভা বসায়।[৫৭] উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে 'জেলাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। যতদিন না দেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি জাতীয় সরকার হিসাবে কাজ করে যাবে।'[৫৮] পরদিন মধ্যাহ্নের এক জনসভায় 'বীরভূম জেলা স্বাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পরই জেলাব্যাপী শুরু হয় ব্যাপক গণপ্রতিরোধ। ছাত্র-ছাত্রী, নিম্নবর্গের মানুষজন, কমিউনিস্ট লীগ দল, বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি নানা ধরনের জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

'৪২-এর গণ-বিদ্রোহে জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের ছিল বিশেষ ভূমিকা। ১৮ আগস্ট সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দেবীপ্রসাদ নিয়োগীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে জেলাশাসকের দপ্তর অবরোধ করে।[৫৯] কয়েক দিনের মধ্যে হেতমপুর কলেজ ও বিদ্যালয়, রামপুরহাটের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং বেণীমাধব ইস্কুলের সকল ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগদান করে। ২৬ আগস্ট নৃসিংহ সেনগুপ্তের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র জেলা আদালতের চূড়ায় ত্রিবর্ণ পতাকা তোলে এবং ইংরেজদের পতাকায় অগ্নি-সংযোগ করে।[৬০] সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্ররা সিউড়ি রেল স্টেশনে খাদ্য বোঝাইয়ের কাজে (বলপ্রয়োগ করে) বাধা দিলে পুলিশ ছাত্রনেতা রুদ্রপ্রসাদ গিরিকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন নেপালচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে হেতম-পুর কলেজের ছাত্ররা চিনপাই রেল স্টেশনের কাছে টেলিফোন তার কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রায় ৪০০ জনের একটি মিছিল (অধিকাংশ হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ছাত্র) দুবরাজপুরের ডাকঘর ও আদালত আক্রমণ করে এবং আসবাবপত্র ও কাগজপত্র ধ্বংস করে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ বাহিনী ৫৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ও শুরু করে 'দুবরাজপুর হাঙ্গামা মামলা,'[৬১] দুবরাজপুর এলাকাবাসীদের ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য ১০,০০০ টাকা 'পিটুনি কর' আদায় করার নির্দেশ দেন জেলাশাসক। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরাও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। মায়া ঘোষ ও সন্ধ্যারানি সিং রানি চন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানালে (২২-৮-১৯৪২) পরদিন সকালে এলা দত্ত, রানীচন্দ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েকজন ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শ্রীভবন ও কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে যোগদানের

অপরাধে গ্রেপ্তার করলে শান্তিনিকেতনে ছাত্রের দল বোলপুর শহরে মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়। বীরভূম বার্তা পত্রিকায় লেখা হয় : অনেক আশ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আন্দোলনে যোগদানের জন্য ৮ জন কর্মীর উপর ধার্য করা হয়েছে পিটুনি ট্যাক্স।'[১২] কলা ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা নন্দলাল বসুর আঁকা ছবির (ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উপর) কয়েক শত কপি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। ২৫ আগস্ট থেকে আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শান্তিনিকেতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৩]

শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরাও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। মায়া ঘোষ ও সন্ধ্যারানি সিং রানি চন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানালে (২২-৮-১৯৪২) পরদিন সকালে এলা দত্ত, রানীচন্দ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েকজন ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে। শ্রীভবন ও কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে গ্রেপ্তার করলে শান্তিনিকেতনে ছাত্রের দল বোলপুর শহরে মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাস থেকে 'আগস্ট আন্দোলন' শহর থেকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে এবং গণ-বিদ্রোহের রূপ নেয়। এই সময় আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করা। কমিউনিস্ট লীগ দলের সদস্যরা গড়ে তোলে 'স্বরাজ পঞ্চায়েত' ও 'শান্তিসেনা।'[১৪] বোলপুর স্টেশনে সৈন্যদের জন্য খাদ্য পাঠানো বন্ধ করতে গিয়ে সেনাদের সঙ্গে জনতার প্রত্যক্ষ লড়াই শুরু হয়। গুলিতে নয় ব্যক্তি আহত এবং এক জন নিহত হন। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে মানুষ বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ও মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে। কোপাই ও বোলপুর স্টেশনের মাঝে রেললাইন তুলে ফেলা, অজয় নদের রেলসেতু ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি নাশকতামূলক কাজে বিচলিত হয়ে রেল কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাহেবগঞ্জ থেকে খানা জংশনের মধ্যে) রেল চলাচল বন্ধ করে দেয়।[১৫] পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সেনাদের জন্য গড়ে ওঠা ক্যাম্পগুলি ধ্বংস করা। ইতিমধ্যে জেলা বামপন্থী সংগঠন মজবুত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন গণ সংগঠনের মাধ্যমে। কমিউনিস্ট লীগ, লেবার পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বাম সংগঠনগুলি সাঁওতাল সম্প্রদায়কে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। বোলপুরে 'গাড়োয়ান সমিতি' ও 'বিড়ি শ্রমিক সমিতি' মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। দুর্ভিক্ষ শুরু হলে ক্ষুধার্ত জনগণ মজুত খাদ্য লুট করতে থাকে। সব মিলিয়ে সমগ্র বীরভূম জেলা জুড়ে শুরু হয় গণ বিক্ষোভ। অবশেষে প্রশাসন সৈনাদের সাহায্য নিয়ে কঠোর হাতে আন্দোলনকারীদের দমন করে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়; জেলার সামগ্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে সেটি প্রতিফলিত। আন্দোলনের রণনীতি জেলায় প্রতিফলিত তার নিজস্বতা নিয়ে। গান্ধীবাদী আন্দোলন, বৈপ্লবিক ধারা যেমন জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি গঠনমূলক রণনীতি ও বামপন্থীদের গণ সংগঠনগুলি নীচুতলার লোককে একত্রিত করেছে এবং লড়াই করার মানসিকতা জুগিয়েছে। মুক্তি আন্দোলনের সর্বোচ্চ শেষ সংগ্রামে জেলাব্যাপী যে লড়াই আমরা ইতিহাস খুঁজে পাই, সেটি অবশ্যই আমাদের কাছে গর্বের।

উৎস নির্দেশ ও টীকা :

১। Sumit Sarkar—Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908, New Delhi, 1973, pp.-

২। বীরভূম-বার্তা, সিউড়ি (সাপ্তাহিকী), ২৮-২-১৯০৮, পৃ.৪

৩। তদেব, পৃ. ৩

৪। অমিয় ঘোষ—জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম (১৯১৫-৪৭), বোলপুর, ২০০০, পৃ. ক

৫। District Intelligence Branch Office, (Con) File no. 5/1908

৬। বরুণ রায় (সম্পাঃ)—বীরভূমি বীরভূম, কলিকাতা, ২০০৪, পৃ. ২৬৭

৭। অমিয় ঘোষ—জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম, পৃ. খ

৮। বীরভূম-বার্তা, ১০ বৈশাখ, ১৩১৫ সন, পৃ. ৩-৪

৯। দেখুন—(ক) Pradip Kr. Dutta-Carving Blocs : Communal Ideology in Early Twentieth Centrury Bengal, Delhi, 1999
(খ) সুমিত সরকার—জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে : স্বদেশী যুগোত্তর বাংলার কয়েকটি দিক (অমীন দাসগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা-৩), কলিকাতা, ২০০১

১০। Judith M Brown---Gandhi's Rise to Power : Indian Politics 1915-1922, Cambridge, 1972 p.28

১১। Sekhar Bandyopadhyay—From Plassey to Partition (A History of Modern India), New Delhi, 2004, p.p. 284-285

১২। দেশ (কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা), পত্রিকা, (প্রবন্ধ—জড়ভরতের হরিণ অমীন দাসগুপ্ত) পৃ. ৫৫

১৩। Gandhi Century Volume, Visva-Bharati, 1969, p. 195

১৪। তদেব, পৃ। ১৯৬

১৫। বীরভূমবাণী, সাপ্তাহিক, সিউড়ি ২৬-১-১৯২১, পৃ.২

১৬। বীরভূমবাণী, ৩১-১-১৯২১, পৃ. ৫

১৭। বীরভূমবাণী, ১৬-২-১৯২১, পৃ.২

১৮। বীরভূমবাণী, ১২.৪.১৯২১, পৃ. ৩

১৯। বীরভূমবাণী, ১০-৮-১৯২১, পৃ. ৩

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলার গঠনমূলক কর্মসূচী :

	কর্মসূচি	পরিমাণ
১।	মোট চরকার প্রচলন	২,০৭০ টি
২।	মাসিক গড় উৎপাদিত সুতা	৭.৫ মণ
৩।	জাতীয়/সহযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮ টি
৪।	সালিশি সভায় নিষ্পত্তি বিবাদ	৩৪৯ টি
৫।	নথিভূ বিবাহ (অসমাপ্ত)	৪২ টি

(সূত্র-বীরভূমবাণী, ২৬-৪-১৯২২, পৃ. ৩)

২০। বীরভূমবাণী, ৭-৯-১৯২১, পৃ. ২

(চিত্তরঞ্জন দাশের প্রথম সভা হয় রামপুরহাটে, দ্বিতীয় সভা সাঁইথিয়া এবং তৃতীয় সভা সিউড়ি শহরে গঙ্গাকান্তবাবুর হাতায়)

২১। বীরভূমবার্তা, ৭-১১-১৯২১, পৃ. ৩

২২। Village Crime Note Book, P.S.-Suri Town, part-III, p.21 (c)

২৩। D. I. B. O. File No-5/1921

২৪। বীরভূমবাণী, ২৭-৪-১৯২১, পৃ. ২

২৫। তদেব, পৃ. ১—২

২৬। বীরভূমবাণী, ২১-১২-১৯২১, পৃ. ২

২৭। বীরভূমবাণী, ৮-৬-১৯২১, পৃ. ৫

২৮। শান্তিনিকেতন (মাসিক), চৈত্র, ১৩২৯, পৃ. ৩৪

২৯। প্রবাসী (মাসিক), আষাঢ়, ১৩২৮, পৃ. ৪৩২

৩০। সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সর্বজনবিদিত।

৩১। সাক্ষাতকার—সুরেন্দ্রনাথ সরকার, খয়রাসোল, বীরভূম, তাং-১৩-৪-১৯৮৫

৩২। Govt of India, Home (Pol) Dept., File no con/14/20/1931

৩৩। তদেব

৩৪। Govt. of Bengal, Home (Pol) Dept., File no. con/540/1930

৩৫। তদেব

৩৬। বীরভূমবার্তা, ১৩-৭-১৯৩১, পৃ. ১

৩৭। অমির ঘোষ—জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম, পৃ. ৭৭-৭৮

৩৮। Harijan (Journal), 15th July, 1933, p. 4

৩৯। সুরেন্দ্রনাথ সরকার—আমার কথা, খয়রাসোল (বীরভূম), ১৯৭৫, পৃ. ৭১

৪০। বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়—বাংলায় বিপ্লববাদের পালাবদল, কলিকাতা-২০০২, পৃ. ২০

৪১। Village Crime Note Book, P.s.-Nalhati, Vol.III, Part-II, p. 105

৪২। তদেব

৪৩। Visna Bharati Quarterly, Vol-50, p.110

৪৪। তদেব পৃঃ-১১১

৪৫। D.I.B.O. File no-33/1985

৪৬। D.I.B.O File no-33(1)/1925

৪৭। D.I.B.O File no-80A/1933

৪৮।

৪৯। ধূসরমাটি, স্মারক সংখ্যা, সিউড়ি, পৃ. ১০০

৫০। D.I.B.O File No-80A/1933

৫১। তদেব

৫২। Govt of India, Home (Pol) Dept. File no-45/46/1934, p.2

৫৩। অতিরিক্ত বীরভূম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ব্যক্তিরা ছিলেন :

	নাম	বাড়ি	দণ্ড
(১)	ছুকু বাউড়ি	লাভপুর	২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
(২)	ভৈরব মাল	লাভপুর	২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
(৩)	দেবী মাল,	বামনা	২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
(৪)	হরিপদ মণ্ডল	বামনা	৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
(৫)	উমাপদ মণ্ডল	বিক্রমপুর	৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড
(৬)	গোবিন্দ বাগদি	বিক্রমপুর	৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

সূত্র : I.B. Secret Book, C.I.D Bengal, 1939

৫৪। D.I.B.O File no-91/1941

৫৫। সাক্ষাতকার—রমনীমোহন গাঙ্গুলী (আমার কুটিরের প্রাক্তন সদস্য), স্থান—পাইকপাড়া, কলিকাতা, তাং ১৭-১১-১৯৮৪

৫৬। D.I.B.O File no-91/1941

৫৭। V.C.N.B, P.S-Dubrajpur, Vol-III, part-III, p. 254 (T)

৫৮। লালবিহারী সিংহ দেশ সেবার পথে, প্রথম খণ্ড, জাজিগ্রাম, ১৯৬৪, পৃ. ১৭৪

৫৯। D.I.B.O, File No-W.C.R, Part-II, 1/1942

৬০। তদেব

৬১। Govt. of Bengal, Home Dept. (Pol), File No-25/1943 (XIII)

৬২। বীরভূম বার্তা, ৫-১০-১৯৪২, পৃ. ৪

৬৩। D.I.B.O, File No-W.C.R, Part-II, 1/1943

৬৪। তদেব

৬৫। লালবিহারী সিং-দেশসেবার পথে, প্রথম খণ্ড, পৃ-১৯৫

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সাঁওতাল বিদ্রোহের ভূমিকা : বীরভূম জেলা

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 'History of Freedom Movement in India' গ্রন্থখানি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের ২৬ জানুয়ারি, ভারত সরকারের Ministry of Education থেকে। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন হুমায়ুন কবীর। যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের নিয়ে কমিটি হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ তারাচাঁদ। কিন্তু প্রথমে এই মূল্যবান ইতিহাস লেখার জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারকেই চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। তিন বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ হয়, বিভিন্ন রাজ্যের Archive News papers, লাইব্রেরি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ ঘেঁটে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা কোথা থেকে শুরু হবে, তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে তৎকালীন রাষ্ট্রনেতাদের মতের অমিল দেখা দেয়—১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ থেকে, না ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে? রমেশচন্দ্র মজুমদারের চিন্তা-ভাবনায় ব্রিটিশ রাজত্বকালে কোম্পানির

কুশাসনে যে সমস্ত আঞ্চলিক বিদ্রোহ ঘটেছিল সেগুলোও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর্যায় পড়ে; তাই তিনি সেগুলোকেও এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হিসাবে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা না হওয়ায় তিনি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। British Paramountcy and Indian Renaissance গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে—

> *'১৮৫৭ সালে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তাকে যদি স্বাধীনতার উন্মেষ বলে মনে করা হয়, তাহলে সাঁওতালরা বা সুরেন্দ্র সাঁই এবং সম্ভবত আরও অনেকে যে কঠিন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তাদেরও সেই একই রকম মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা যায় না।'*

তাঁকে বাদ দিয়েই ভারত সরকার ওই ইতিহাস রচনা করে। যে সমস্ত আঞ্চলিক বিদ্রোহ ঘটেছিল সেগুলো হল—চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৭০ ও ১৭৭৯), খাসি বিদ্রোহ (১৭৮৩), গঞ্জাম বিদ্রোহ (১৭৯৮), নায়ার বিদ্রোহ (১৮০৪), ফরাজি আন্দোলন (১৮০৪-১৮৩৮), খান্দেশের আদিবাসী বিদ্রোহ (১৮০৮), জাঠ বিদ্রোহ (১৮০৯), সাহারনপুরের গুজার বিদ্রোহ (১৮১৩), খান্দেশের ভীল বিদ্রোহ (১৮১৮), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), মানভূমের ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২), নাগা বিদ্রোহ (১৮৩৯), ওড়িশার খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৪৬), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৫৭) ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে এ সমস্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং ব্রিটিশরাজের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন ব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল। শাসক গোষ্ঠী শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারেনি। আদিবাসী জনতা বারবার বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে সেই অগ্নিতে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছেন, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে বারবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইংরেজরাজের আধুনিক রণসাজে সজ্জিত সেনাবাহিনীর ওপর। সমূলে উৎখাত করতে চেয়েছে শাসক গোষ্ঠীর চিরসহচর ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল জমিদার-মহাজনদের। ভারতীয় কৃষকের সুপ্ত সংগ্রামী শক্তিকে তারাই তো জাগিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে, পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো ব্যাপক, আরো তীব্র, আরো মহীয়ানরূপে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের জ্বালানো আগুনেই তো স্বাধীনতার কষ্টিপাথর যাচাই হয়েছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলন। সেটা জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রথমদিকে একটা জাগরণ মাত্র ছিল। পরে সেটাই হয়ে ওঠে উৎপীড়ক বিদেশিদের হাত থেকে দেশকে তথা জাতিকে মুক্ত করে নিজেদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিবাহী স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে শ্রেণিহীন, শোষণহীন সমাজ স্থাপন করা। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে সরকারি রিপোর্টেও আমরা দেখতে পাই—'সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতা স্পৃহা, যার ফলে তাঁরা ধ্বনি তুলেছিল তাঁদের নিজ দলপতির অধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।' [*Bengal District Gazetteer for Santal Parganas*]

সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণই ছিল ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি-ব্যবস্থার বঞ্চনার বিরুদ্ধে। সেই ভূমি-ব্যবস্থা জমির ওপর তাদের সমষ্টিগত অধিকারমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তন করে কৃষকের ওপর জমিদার গোষ্ঠীর শোষণকে চাপিয়ে দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে খাজনার ক্ষেত্রে দেয় ফসলের অংশের পরিবর্তে সরকারি মুদ্রার প্রবর্তন করে গ্রামাঞ্চলে ডেকে এনেছিল মহাজনী শোষণকে। সুতরাং এককথায় বলা যায়—বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছে সেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সর্বাত্মক উপাদান ও তার প্রতিক্রিয়া। সেটা অগ্ন্যুৎপাতের মতো ফেটে পড়ে সাঁওতাল মহিলাদের ওপর অত্যাচার হওয়ায়।

বিরসা মুন্ডা

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে সাঁওতাল তথা অন্যান্য আদিবাসীদের জীবনধারা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন দেশের অভ্যন্তরে ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারও ধাক্কা এসে লাগে শত শত বছরের নিস্তরঙ্গ আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী জীবনে। ইংরেজ প্রবর্তিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি ও তার অনুসঙ্গী জমিদার-মহাজনী শোষণের চাপে আদিবাসীদের পণ্য

ভাগনাডিহির মাঠ

বিনিময়সূচক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ-জীবন চূড়ান্ত ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়। শত শত বছরের মূল সমাজ জীবনধারা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র এই সমাজ-জীবনের ধারা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা পথ খোঁজে মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে। জমির অধিকার, জঙ্গলের অধিকার, ফসলের অধিকার ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন যেন এই প্রথম ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে তারা দেখতে পায়। অস্বীকার করা যায় না, সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনায় এ সমস্তই ছিল তাদের মূল দাবি।

স্বভাবতই এবার জানতে ইচ্ছা করে—ইংরেজ শাসন ও শোষণে তাদের মনের অবস্থা কিরকম হয়ে উঠেছিল ? পারিবারিক এবং সমাজ-জীবনেইবা তার প্রতিফলন কীরকম পড়েছিল ? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে লোকসংগীতগুলি রচিত হয়েছিল সর্বাগ্রে সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিদেশিরাজের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের দুঃখ-বেদনার কথা যেমন এ সমস্ত গানে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি স্বাধীন মানুষের চিত্তের পরিচয়ও এ সমস্ত গানে পাওয়া যায়। স্মরণ রাখা দরকার—বাংলাদেশের সংগীত, সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় তখনো সেভাবে ঘটেনি। স্বাধীনতা সংগ্রাম, গণসংগ্রাম, গণজাগরণ প্রভৃতির প্রসঙ্গ সেদিন তেমনভাবে ওঠেনি। কাজেই স্বদেশি গানও রচিত হয়নি। কার্যত রাজসেবাই ছিল সেদিনের শিক্ষিত নগরবাসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্রত ও ধর্ম। আদিবাসী প্রগতিশীল মানুষই বরং সেদিন সাহস করে তাদের সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কথা গানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে কোম্পানির কুশাসনের স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। যেমন—

'নেরা নিয়া নুরু নিয়া
ডিভা নিয়া ভিটা নিয়া
হায়রে হায়রে ! মাপাঃ গপচ্ দ,
নুরিচ্ নাড়াড় গাই কাডা নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিৎ
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এাম রুওয়াড় লাগিৎ
তবে দ বোন জলগেয়া হো।'

অর্থাৎ—

'স্ত্রী-পুত্রের জন্য
জমি-জায়গা বাস্তু ভিটার জন্য
হায় হায় ! এ মারামারি এ কাটাকাটি
গো-মহিষ-লাঙল ধন-সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।'
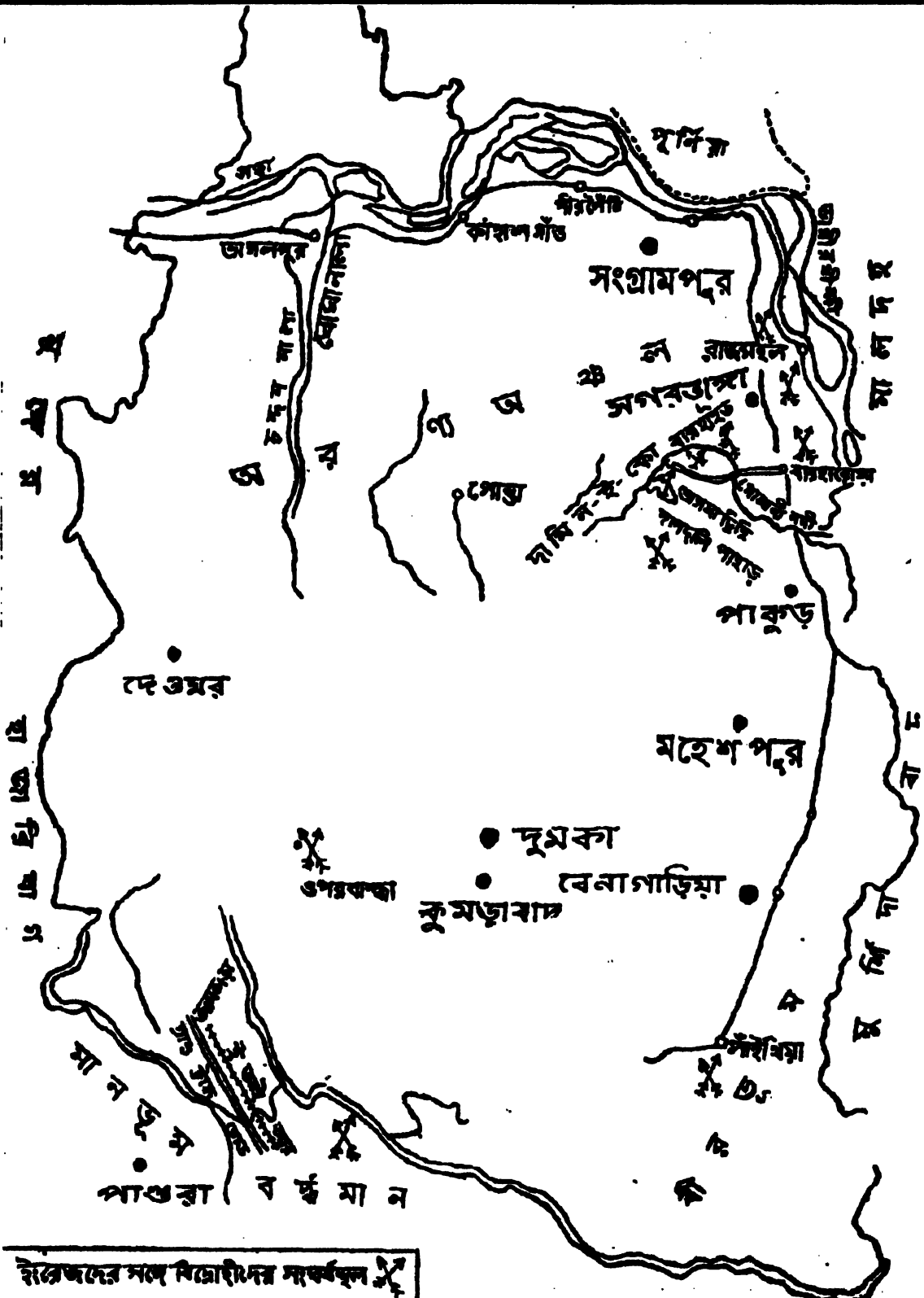
পূর্ণিয়া
গঙ্গা
পীরপৈতি
কাহলগাঁও
সংগ্রামপুর
রাজমহল
সগরভাঙ্গা
গোড্ডা
পাকুড়
দেওঘর
মহেশপুর
দুমকা
বেনাগাড়িয়া
কুমড়াবাদ
সাঁইথিয়া
পাণ্ডরা
ব র্দ্ধ মা ন
ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষস্থল

শোষণ-উৎপীড়নে গুমরে ওঠা সাঁওতালদের মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে এ গানের প্রতিটি লাইনে। এ এক মর্মান্তিক চিত্র। এরকম শত শত গান সেদিন তাদের মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সংগ্রাম মানুষের জন্মগত অধিকার। সংগ্রাম করেই তারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তাই তাদের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল—

'আদ বাংবন পীচঃ সিধু আদ বাংবন থিরঃ,
বাইরি এেঞ্জলতে লাঁড়হাই খন বাংবন ঞিরঃ।
বহঃক্ এঞ্রকঃ রেহঁ সিধু মায়াম লিঙ্গি রেহঁ,
বাংবন পীচঃ লাঁড়হাই আবন দেবন সহরঃ॥'

অর্থাৎ—

'আর আমরা পিছু হটব না সিধু আর চুপ থাকব না,
শত্রু দেখে লড়াই থেকে পালাব না।
মাথা উড়ে গেলেও সিধু রক্ত বইতে থাকলেও,
আমরা আর পিছু হঠব না, লড়াইমুখো হব॥'

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুগ যুগ ধরে আদিবাসী সমাজ শোষণ-অত্যাচারের শিকার হলেও কোম্পানি শাসনের আগে পর্যন্ত তারা কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ কখনো করেনি। অত্যাচার-উৎপীড়নের মানসিক যন্ত্রণাকে তাঁরা বরং নানাভাবে গল্পে, উপকথায় প্রকাশ করে গেছে। সেসব উপকথার আড়ালেই আমরা পাই শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অসন্তোষ, ক্ষোভ ও ঘৃণা। যেমন নেকড়ে ও ভালুকের পরিশ্রমের ফসল কীভাবে শিয়াল তার শয়তানি বুদ্ধিতে ভোগ করেছে। সিংহ ও খরগোশের গল্পে সামন্তপ্রভুর উৎপীড়নকে সিংহের অত্যাচারের রূপকে দেখা যায়। অত্যাচারী সিংহ বনের অন্যান্য পশুদের ওপর অত্যাচার চালায়। ফলে বনের পশুরা নিয়মিত খাজনা অর্থাৎ পশু-ভেট পাঠাতে বাধ্য হয় সিংহের খাবারের জন্য। সামন্তপ্রভুদের পদমর্যাদা নিয়ে একজনের সঙ্গে অন্যজনের বিরোধ ছিল। সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য এক সামন্তপ্রভুকে তুলে ধরে অত্যাচারী সামন্তপ্রভু বা সিংহের প্রাণনাশ করে খরগোশ। শক্তিশালী সামন্তপ্রভুদের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় এভাবেই উপকথা, গল্পের রূপকে সামন্তপ্রভুদের মৃত্যু ঘটিয়ে তারা আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে বিদেশিরাজের শাসন-ব্যবস্থায় তাদের জমি-জায়গা বেহাত হচ্ছে, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে, তখন তারা আর স্থির থাকতে পারেনি। তারা বিদ্রোহ করেছে এবং সক্ষমভাবেই। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকারকে বাঙ্গলাদেশের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত সামরিক আইন (Martial Law) জারি করতে হয় এবং সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহে আমরা দেখতে পাই, বীরভূম জেলার সিউড়ির মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক হাজার সাঁওতালকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এরকম গণফাঁসির নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ ঘটনা তাদের মানসিকতার উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষে এরকম বিদ্রোহ যেন আর না ঘটে সেজন্য সাঁওতাল বিদ্রোহীদের গণফাঁসি দিয়ে ইংরেজরাজ এক সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ই সাঁওতালরা সর্বপ্রথম নিজেদের এলাকায় অর্থাৎ বীরভূমে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের ঐক্য গড়ে তুলেছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। গরিব চাষী, খেতমজুর, জমি-হারা কৃষক এবং সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষই ছিল তাঁদের মূল শক্তি। শক্তিশালী ব্রিটিশরাজের তুলনায় তাদের শক্তি অতি সামান্য; কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা চলে, সাঁওতালদের এ সংগ্রাম ভারতের শোষিত মানুষদের প্রতি বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বিরোধী যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা, তারই প্রথম পদক্ষেপ রূপে পরিগণিত করা যায় এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে।

বাবা তিলকা মাঝি
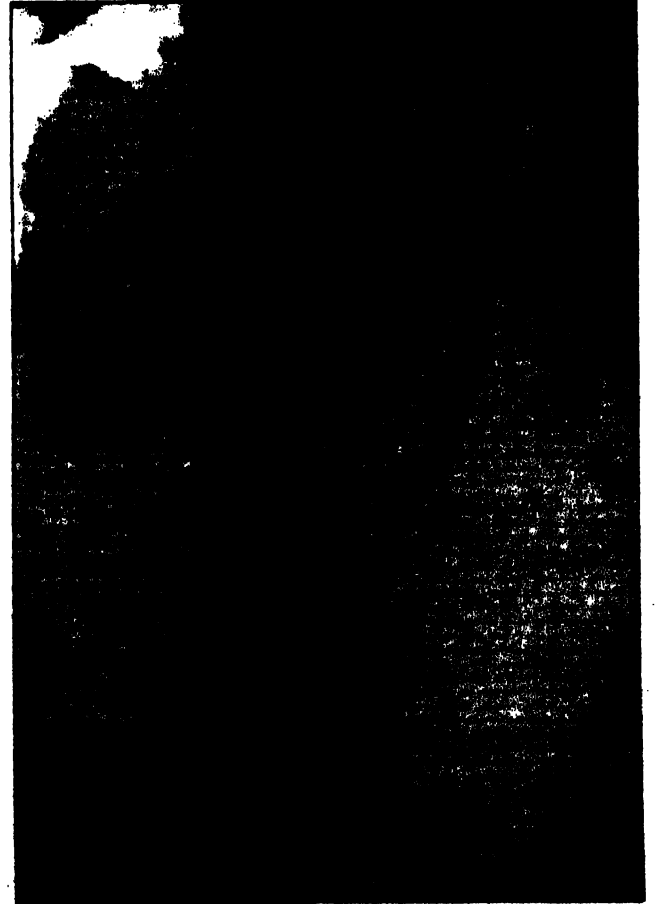
সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম সেনানী সিধু

সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জি

১৭ জানুয়ারি, ১৭৮৪ ভাগলপুর ও রাজমহলের কালেক্টর ক্লিভল্যান্ড হত্যা। তিলকা মুর্মুর নেতৃত্বে প্রথম সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৭৮৫	তিলকা মুর্মুর ফাঁসি।
১৮৩২-১৮৩৩	জন পেটি ওয়ার্ড এবং সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন ট্যানার কর্তৃক দামিন-ই-কোহর সীমানা নির্ধারণ। কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম থেকে দলে দলে সাঁওতালদের দামিন-ই-কোহতে প্রবেশ।
৩০ জুন, ১৮৫৫	ভগনাডিহি গ্রামে বিশাল জনসমাবেশে সিধু-কানুর ভাষণ এবং শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দশ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ। কলিকাতা অভিমুখে প্রথম গণ-পদযাত্রা।
৭ জুলাই, ১৮৫৫	সাঁওতাল জনতার হাতে কুখ্যাত মহাজন কেনারাম ভগত ও দিঘি থানার অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত খুন। সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত।
১১ জুলাই, ১৮৫৫	বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীসহ মেজর বারোজের কলগাঁ আগমন।
১২ জুলাই, ১৮৫৫	সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের পাকুড়ে প্রবেশ এবং রাজবাড়ি আক্রমণ।
১৩ জুলাই, ১৮৫৫	কদমসায়েরে সেভেন্‌থ রেজিমেন্ট বাহিনীর আগমন, বৃহত্তর সামগ্রিক সংগ্রামের সূত্রপাত।
১৫ জুলাই, ১৮৫৫	পাকুড়ের কাছে তরাই নদীতীরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেভেন্‌থ রেজিমেন্টের সম্মুখযুদ্ধ। যুদ্ধে সাঁওতালবাহিনীর পরাজয়।
১৬ জুলাই, ১৮৫৫	পিয়ালাপুরের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে ইংরাজ বাহিনীর পরাজয়।
২০ জুলাই, ১৮৫৫	বীরভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে তালডাঙ্গা থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে ভাগলপুর ও রাজমহল থেকে ভাগলপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ভাগ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আধিপত্য বিস্তার।
২১ জুলাই, ১৮৫৫	কাতনা গ্রামে ইংরাজবাহিনীর পরাজয় স্বীকার।
২৩ জুলাই, ১৮৫৫	বীরভূমের বিখ্যাত ব্যবসাকেন্দ্র গণপুর বাজার ধ্বংস।
২৪ জুলাই, ১৮৫৫	বারহারোয়া-বারহাইত রাস্তায় রঘুনাথপুরে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড় পরিচালিত ইংরাজ সেনাবাহিনীর হাতে চাঁদ ও কানুর পরাজয়।
২৯ জুলাই, ১৮৫৫	ক্যাপ্টেন শেরউইল কর্তৃক বারোখানি সাঁওতাল গ্রাম ও লেফটেন্যান্ট গর্ডন কর্তৃক মুনহান ও মুনকাতরো গ্রাম ধ্বংস।
৩০ জুলাই, ১৮৫৫	লেফটেন্যান্ট রুবি কর্তৃক আরও সাতখানি সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস।
১৭ আগস্ট, ১৮৫৫	ইংরাজ সরকার কর্তৃক আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্র প্রচার ও সাঁওতালদের ঘোষণাপত্র প্রত্যাখ্যান।
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫	মোচিয়া, কাঁসজোলা, রাম পারগানা ও সুন্দ্রা মাঝির নেতৃত্বে ওপরবাঁধ থানা ও গ্রাম লুঠ।
অক্টোবর ২ সপ্তাহ	সিধু-কানু কর্তৃক অম্বা হানা মৌজা লুঠ।
১০ নভেম্বর, ১৮৫৫	ইংরাজ সরকার কর্তৃক সামরিক আইন জারি।
৩ জানুয়ারি, ১৮৫৬	সামরিক আইন প্রত্যাহার।
২৩ জানুয়ারি, ১৮৫৬	সুজারামপুরের গ্রান্ট সাহেবের কুঠি লুঠ।
২৭ জানুয়ারি, ১৮৫৬	লেফটেন্যান্ট ফেগান সাহেব পরিচালিত ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে সাঁওতালদের পরাজয়।
ফেব্রুয়ারি ২য় ও ৩য় সপ্তাহ, ১৮৫৬	সিধু-কানুর মৃত্যু।

লেখক : বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, গ্রন্থকার ও পণ্ডিত গবেষক

ব্রাহ্মণী নদীর উপর বৈধড়া ব্যারেজ — ছবি : মানস দাস

বীরভূমের সেচব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে

আবদুল হালিম

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক আব্দুল হালিম, পরাধীন ভারতবর্ষে যাঁর জন্ম, কঠোর দারিদ্র্যের জীবনযাপন ও অনটনের মধ্যেও দেশকে দেশের শ্রমজীবী মানুষকে গভীর ভালবেসেছিলেন। কৃষকের সন্তান হয়েও দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে শিল্প, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রশাসনিক দুর্বলতা সবদিকেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষত সেচ ও সমাজ উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক ভাবনা মাথায় রেখে শ্রদ্ধেয় হালিম সাহেব বর্তমান প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের হেতু একটাই—একালের পাশাপাশি সেকালের বীরভূম জেলার চিত্র তুলে ধরা। — সম্পাদক

ধূসর মাটির দেশ বীরভূম। বীরভূমের কঙ্করময়, ধূসরগৈরিক, রাঙামাটি, উষর অসমতল ভূমি, উঁচুনিচু, ঢালু পথ, জঙ্গলাকীর্ণ অরণ্যানি, নদীনালা, সবুজ ধানের খেত, উত্তরাঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, সীমান্তের অদূরে শুভ্রধূসর গিরিশ্রেণি; জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে অতীব মনোরম।

বীরভূম জেলার অতীত ঐতিহ্যও অত্যন্ত গৌরবময়। অজয় নদের তীরে 'গীত গোবিন্দের' কবি জয়দেবের পুণ্য জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব, বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান নানুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনার লীলাভূমি শান্তিনিকেতন এই জেলাকে বিশ্বের নিকট প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রাজা বীরচন্দ্র, লর্ড সিংহ প্রমুখ বহু স্বনামধন্য মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি বীরভূমের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। বীরভূমের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনিতে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জেলার সীমা বারবার অদল-বদল হইয়াছে। বীরভূমে জেলার সীমা একদা বিহারের দেওঘর ও মানভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জায়গাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাঁওতাল পরগনার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কিয়দংশ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় চলিয়া যায়।

বীরভূম জেলার আয়তন ১,৭৪২.৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ। বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ি ময়ূরাক্ষী তীরে অবস্থিত। বীরভূম জেলায় ১৪টি থানা আছে। মহকুমা দুইটি সিউড়ি সদর ও রামপুরহাট। বীরভূম জেলার গ্রামের সংখ্যা ২,২০৭টি আর পাঁচটি বড় সহর। বীরভূম জেলার বিভিন্ন উপজাতীয় লোকের সংখ্যা ১,০৬,৮০৬। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি। বীরভূম জেলার মধ্যে স্বত্বাধিকারীদের অধীনেই সবচেয়ে বেশী জমি রহিয়াছে। জমিদারি মালিকদের পরেই এই মধ্যস্বত্বাধিকারীদের স্থান। ছোট ও মাঝারি কৃষকদের হাতে খুব অল্প জমি আছে। তাহাছাড়া সমাজের বিরাট একটি অংশ নিঃস্ব, জমিহীন দিনমজুর। দৈহিক শ্রম ও অন্যান্য কঠোর শ্রমের দ্বারা তাহারা জীবিকার্জ্জন করে এবং বছরের অধিকাংশ সময় তাহারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে জমিদারি দখল আইন ও ভূমিসংস্কার আইন পাশ হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ধনিক চাষিদের স্বার্থকে রক্ষা করিতেছে। কৃষকদের হাতে জমি প্রদানের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমানে দেশের খাদ্যাভাব যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পৌছিয়াছে; দরিদ্র কৃষকের হাতে জমি প্রদান করলে আজ এই বিপর্যয় ঘটত না। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের জীবন আজ দুর্বিবহ হইয়া উঠিয়াছে।

আব্দুল হালিম

জন্ম : ৬ ডিসেম্বর ১৯০১ মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল ১৯৬৬

এই জেলার প্রধান নদী ময়ূরাক্ষী পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত। অজয় নদ এই জেলার দক্ষিণে প্রবাহিত। তাহাছাড়া বক্রেশ্বর, কোপাই, দ্বারকা, কুঁয়ে, চন্দ্রভাগা, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদী রহিয়াছে। বক্রেশ্বরে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ রহিয়াছে এবং স্থানটিকে উন্নত করিয়া একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

সেচের সমস্যা ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা বৃহৎ পরিকল্পনা হইতেছে 'ময়ূরাক্ষী' জলাধার বাঁধ। এটাও বীরভূম জেলায় অবস্থিত।

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচের সুব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বীরভূম জেলায় মাত্র একটা ছোট এবং পরে একটা বড় সেচব্যবস্থা ছিল। ছোট সেচব্যবস্থাটির নাম কাশিয়ানালা, আর বৃহৎ সেচব্যবস্থাটির নাম বক্রেশ্বর ক্যানেল। বক্রেশ্বর খালটির কাজ শেষ হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে; খরচ হয়েছিল ৩,৮৮,০০০ টাকা। বক্রেশ্বর নদীর জল এই খালে প্রবাহিত হয়। এই খালের দৈর্ঘ্যের ২৩ মাইল ১,৯১৫ ফুট। এই খালের জলে মাত্র ১০,০০০ দশ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল, ক্যানেল কর ছিল অত্যন্ত বেশি। বর্দ্ধমান জেলায় ইডেন ক্যানেল বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে দামোদর ভ্যালি ক্যানেল নির্মিত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে অতিরিক্ত ক্যানেল করের বিরুদ্ধে বীরভূম ও বর্দ্ধমানে কৃষকরা বিরাট গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিল। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ছোটখাটো অনেকগুলি সেচ পরিকল্পনার কাজ সরকার হাতে লইয়াছেন। ১৯৫১-৫২ সালে ৪০টি, ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৫টি, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪০টি ছোটখাটো পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সমস্ত ছোটখাট সেচ পরিকল্পনা সবই স্বাধীনতা লাভের পরই হইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বড় সেচ পরিকল্পনাটি বীরভূম জেলার রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তাহার নাম 'ময়ূরাক্ষী জলাধার' পরিকল্পনা। বলা হইয়াছিল যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজ শেষ হইলে শুধু যে বীরভূম জেলার শ্রী ফিরিবে, শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা নহে; বীরভূমের ধূসর মাটি শ্যামল হইয়া উঠিবে, বীরভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে। জেলা সম্পদশালী হইয়া উঠিবে, ৬ লক্ষ একর খারিফ ফসলের জমিতে জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার একর রবিখন্দের জমিতে নভেম্বর হইতে মে মাস পর্যন্ত সেচের কাজ চলিবে। তাহা ছাড়া বিহারের ৩২,৫০০ একর জমিতে সেচের কাজ চলিবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় যে পরিমাণ জল দরকার হইবে তাহার বেশিরভাগ পাওয়া যাইবে ময়ূরাক্ষী নদী হইতে। এই নদীটি বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগনার পাহাড় হইতে উদ্‌গত

হইয়া বীরভূম জেলার সমতল ভূভাগ অতিক্রম করিয়া দত্তবাড়ির নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সাঁওতাল পরগনা জেলায় মশানজোড় নামে জায়গায় এক সংকীর্ণ প্রবেশপথে ময়ূরাক্ষী নদীর খরস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। বীরভূমের কৃষির উন্নতির জন্য নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছিল। এই পার্বত্য নদীটির উৎসমুখ হইল সাঁওতাল পরগনার মাল-ভূমিতে। তাহার পর বক্রগতিতে নানা অসমতল জনপদ, প্রান্তর ও প্রস্তর সমাকীর্ণ অঞ্চলের বুক বিদীর্ণ করিয়া ময়ূরাক্ষী সমতলভূমিতে পৌঁছিয়াছে এবং ১৫৪ মাইল জনপদ অতিক্রম করিয়া ভাগীরথীতে বিলীন হইয়াছে। সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মশানজোড়ের নিকটে ময়ূরাক্ষী নদীর বুকে একটি বাঁধ দিয়া নির্মিত হইয়াছে এই সুবৃহৎ জলাধার। তার সঙ্গে নির্মিত হইয়াছে চারটি বারাজ এবং একটি পাশজলনালি (অ্যাকুইডাক্ট)। জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি এই পরিকল্পনায় সম্ভবপর হইবে। এই জলাধার নির্মাণ করিতে ষোলো কোটি দশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কানাডার কাছ হইতে পাওয়া অর্থসাহায্যকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য 'মশানজোড়' বাঁধের নামকরণ হইয়াছে 'কানাডা বাঁধ'। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি হইতে উত্তর-পশ্চিমে বিহার পশ্চিম বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চল—মশানজোড়ের দূরত্ব ২০ মাইল। 'মশানজোড়ের' বাঁধের উচ্চতা হল ১২৩ ফুট এবং মূল ভিত্তি হইতে ১৫৫ ফুট। ইহার দৈর্ঘ্য ২,১৭০ ফুট। বাঁধটির দ্বারা খাদের দুই পার্শ্বস্থ পাহাড় সংযুক্ত হইয়াছে এবং প্রায় ২৭ মাইল সুদূরপ্রসারী স্থান এক বিরাট জলভাগে পরিণত হইয়াছে। বাঁধের উপরিভাগে নির্মিত হইয়াছে একটি কংক্রিটের সেতু। জলাধারটির গভীরতা বা ঘনত্ব হইল ৩,৯৮,০০০ ফুট; সংরক্ষণ গভীরতা বা ঘনত্ব ৩,৪৯,০০০ ফুট। জল পরিপূর্ণ থাকাকালে ইহার পরিমাণ হইল ১৬,৬৫০ একর এবং সংরক্ষণ মাত্রা ৫,০০,০০০ একর ফুট।

ময়ূরাক্ষী জলাধার

প্রবহমান নদীর ২০ মাইল নিম্নভাগে তিলপাড়া নামে জায়গায় ময়ূরাক্ষীর উপরে যে সেতুবাঁধ দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম 'তিলপাড়া বারাজ' বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি থেকে দুই মাইল দূরে এই সেতুবাঁধটি তৈরি হইয়াছে। এই সেতুবাঁধটি ১,০১৩ ফুট দীর্ঘ। তৈরি করিতে খরচ হইয়াছে এক কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

এ ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাটো সেতুবাঁধ এবং বারাজ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বক্রেশ্বর বারাজ, কোপাই বারাজ, দ্বারকা বারাজ, ব্রাহ্মণী বারাজ, চন্দ্রভাগার পাকা জলনালি ইত্যাদি। 'বক্রেশ্বর' নদীটি সাঁওতাল পরগনার পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া ময়ূরাক্ষীর দক্ষিণ দিয়া প্রায় ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া ময়ূরাক্ষীতে গিয়া পড়িয়াছে। বক্রেশ্বর ক্যানেলকে নূতন পরি-কল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া নূতনভাবে সেচ ব্যবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে—খরচ ৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। মূল খাল ও তাহার শাখা খালগুলির মোট দৈর্ঘ্য হইল ২৪৪ মাইল এবং প্রশাখাগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৯০ মাইল।

বাঁধের নিকট নির্মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র হইলে ২,০০০ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে। কেন্দ্রটির মোট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৪০০০ হাজার কিলোওয়াট। গ্রাম ও নগরের বৈদ্যুতিকীকরণের এবং সেচকার্য ও শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইবে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর উপত্যকা ব্যবস্থা সংযুক্ত হইলে আরো বেশি মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে।

এগুলিই হইতেছে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সমূহ তাৎপর্য। কিন্তু এই সবের আর একটি দিকও রহিয়াছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে হাজার হাজার মানুষের দুর্বিসহ দুঃখ, দুর্ভোগ ও শোকাবহ ঘটনা। বলা হইয়াছিল যে 'মশানজোড় ড্যাম' নির্মিত হইলে বীরভূম জেলায় বন্যানিয়ন্ত্রিত হইবে; বন্যার করালগ্রাস হইতে মানুষ রক্ষা পাইবে কিন্তু ১৯৫৬ সালের শরৎকালের ভয়াবহ বন্যা সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে মশানজোড় জলাধার স্ফীত হওয়ায় জল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। উত্তাল জলরাশি গ্রাম, ঘরবাড়ী, পল্লিজনপদ প্লাবিত করিয়া যে বিপুল ধ্বংস সাধন করিয়াছিল তাহা আজও বীরভূমবাসীদের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল বীরভূমের ক্যানেল অধ্যুষিত অঞ্চলে কৃষকদের ছয় লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হইবে। ময়ূরাক্ষী সেচব্যবস্থা বর্দ্ধমান মুর্শিদাবাদ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত—এই তিন জেলার ৭ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা পরিকল্পনায় থাকিলেও সেচের জল বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায় না। বীরভূম জেলাতেও আজ পর্যন্ত চার লক্ষ একরের বেশি জমিতে সেচের জল সরবরাহ সম্ভব হয় নাই। তদুপরি প্রত্যেক বৎসর বর্ষারম্ভে চাষের সময় নিয়মিত জল সরবরাহ হয় না, ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় না—শস্যহানি হয় এবং খাদ্যাভাব ঘটিয়া থাকে। বীরভূম জেলার খয়রাশোল, ইলামবাজার ও রাজনগর থানা অঞ্চলে কোন বিশেষ সেচব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেক বৎসর শস্যহানি হয়। অনাবৃষ্টির দরুন এই অঞ্চলে ভালো শস্য উৎপাদন হয় না, ফলে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই থাকে। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া, খালবিল সংস্কার করিয়া দুর্গত কৃষকদের সাহায্য না করলে এই অঞ্চল বরাবরই উন্নতির দিক হইতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সালনদীকে বাঁধিয়া একটি সেচ পরিকল্পনা করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। ছোট ছোট খাল খনন করিয়াও সেচব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায়। ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের সেচের জল ব্যবহারে উচ্চহারে সেচকর সরকার ধার্য করিয়াছেন—একর প্রতি দশ টাকা বাধ্যতামূলক সেচকর কৃষককে দিতে হইবেই—কৃষক জল ব্যবহার করুক বা না করুক; তাহার চাষের জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হউক বা না হউক। বীরভূমের কৃষকরা ক্যানেল খননের শুরু থেকে অতিরিক্ত ও উচ্চহারে সেচকর আদায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম বাংলা সরকার তাদের আর্তনাদে কর্ণপাত করেন নাই। কৃষকদের ভারী সেচকর ও ট্যাক্সের বোঝা হইতে রেহাই দেন নাই। কৃষকদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার বিধানমণ্ডলীতে আইন পাশ করিয়া সেচকরকে নিয়মানুগ ও বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষককে সেচের জল সরবরাহ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদনে সাহায্য করার যে বিঘোষিত সরকারি নীতি তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা সত্ত্বেও আজ দেশে দারুণ খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। সরকার যদি অল্পহারে সেচকর ধার্য করিতেন; তাহা হইলে কৃষকগণও খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিত, দেশে প্রচুর শস্য উৎপাদন হইত এবং খাদ্যসংকট অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। ষোলো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ময়ূরাক্ষী জলাধার নির্মাণ, বীরভূমের কৃষি সেচব্যবস্থা ও শস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ সহায়ক হয় নাই এবং দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোনও প্রত্যক্ষ সমাধানও করিতে পারে নাই। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কল্যাণে এবং ময়ূরাক্ষী সেচব্যবস্থার সুযোগে সাধারণ মানুষ ও কৃষকের মানসে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। গ্রামীণ সমাজের উপরতলার কিছুসংখ্যক মানুষ আজ সমস্ত সুযোগ উপভোগ করিতেছে। পল্লিগ্রামে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে; যাহারা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিত্তবান হইয়াছেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি দিক

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বীরভূমেও সমাজ উন্নয়নের (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) কাজ শুরু হইয়াছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল গ্রামবাসীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করা; —কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, কর্মসংস্থান, বাসগৃহ এবং সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বীরভূম জেলার সদর মহকুমার মহম্মদবাজার, আহমদপুর এবং রামপুরহাট মহকুমার নলহাটিতে তিনটি ব্লক নির্মিত হইয়াছে। ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনার ফলে, সেচ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি হইবে এবং তার প্রধান সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে এই ব্লকগুলি। ইহার ফলে এই অঞ্চলের কৃষি, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হইবে। এই ব্লকগুলি নির্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে; বিশেষ করিয়া মহম্মদবাজার প্যাটেলনগর নির্মিত করিতে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু প্যাটেলনগর বীরভূমের জনজীবনে কোনও বৈচিত্র্য আনিতে পারে নাই। বীরভূমে রাস্তাঘাটের কিছু উন্নতি যে না হইয়াছে তাহা নহে, প্রায় দুই হাজার মাইল রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ আজও দুরূহ ব্যাপার। কয়েকটি দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা পাকা করা হইয়াছে এবং যাতায়াতের কিছু সুবিধা হইয়াছে; বাস চলাচলের ব্যবস্থাও হইয়াছে, কিন্তু বীরভূমের বাস ট্রান্সপোর্ট একজনের মনোপলি। বোর্ডও তাদেরই কুক্ষিগত। বাসগুলি খুব পুরাতন এবং বাসের সংখ্যাও খুব কম। ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা নাই। বাসের শ্রেণিভেদও উঠাইয়া একটি শ্রেণি চালু করা যে অত্যাবশ্যক তা এখনও কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন না। ব্লকগুলির অধীনে চাষের উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় হইয়াছে, টিউবওয়েল খনন হইয়াছে কিন্তু কিছুকাল ব্যবহারের পরই নলকূপগুলি অকেজো হইয়া যায়। গ্রামের কৃষকদের যে কৃষিঋণ দেওয়া হয় তা অপর্যাপ্ত এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত কৃষকরা ইহা হইতে বঞ্চিত হয়। বীরভূম জেলায় কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কাজে রূপায়িত করিবার জন্য সরকারি তহবিল হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয় সত্ত্বেও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামের দরিদ্র অধিবাসী ও কৃষক

সেকালে বিশ্বভারতী শিল্পভবনে গালার কাজ

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ব্লকের অফিসারদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবও কৃষককুলকে এই সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে।

আহমদপুর ব্লকে 'জাতীয় সুগারমিল' বা চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি টাউনশিপও গড়িয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু তা শ্রমজীবীদের জীবনে কোনও আশার সঞ্চার করেনা। চিনি কলের শ্রমিকগণও কর্তৃপক্ষের নিকট সুব্যবহার পায় না। ইতিমধ্যেই কয়েকটি শ্রমবিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে। বর্তমানে অযোগ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থার জন্য চিনির কলটি বন্ধ আছে এবং অচিরেই মিলটি উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

সমাজ উন্নয়ন প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য নির্বাচন প্রথা, ভোট সংগ্রহ, পঞ্চায়েত এবং সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং আমলাতান্ত্রিক আশীর্বাদ লাভ করিয়া গ্রামের ওপরতলার একদল মানুষ আজ এক নতুন বিত্তবান শ্রেণিতে উন্নত হইয়াছে। পূর্বের গ্রামীণ সমাজ জীবন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে এবং তার স্থানে আজ এক নতুন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সমাজের পুরোধারা ব্লক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব করিতেছেন। সুতরাং সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থার কাজও বীরভূমে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। কৃষিঋণ, গো-ঋণ, সমবায় ঋণ, শস্যবীজ সরবরাহ প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দুঃস্থদের কাছে পৌঁছায় না। এইসব অব্যবস্থা আশু দূরীভূত হওয়া চাই। পরিকল্পনার দিক হইতে অত্যন্ত চমকপ্রদ হলেও সমাজকল্যাণের কাজ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে নাই। গ্রামের সাধারণ অভাবগ্রস্ত মানুষের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া যে এই ধরনের বিরাট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভ করিতে পারে না তা অনস্বীকার্য। ইহাও অনস্বীকার্য যে একটি ধনবাদী সরকার কর্তৃক পরিচালিত এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না এবং রূপায়ণের পথেও বহু বাধা রহিয়াছে। আগামী দিনগুলিতে সমাজের নিপীড়িত, অবহেলিত, শোষিত মানুষকেই ইহার গুরুদায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমাজ উন্নয়নকে সার্থক করিতে হইবে।

বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা

বৃহদাকার শিল্প বলতে বীরভূম জেলায় বিশেষ কিছু নাই। তবে কুটিরশিল্প প্রায় ধ্বংস হইয়াও জেলার কয়েকটি স্থানে কিছু

কিছু চালু আছে। অতীতে রেশম শিল্পের জন্য বীরভূম প্রসিদ্ধ ছিল। বীরভূমে প্রভূত পরিমাণে তুঁতেও চাষ হইত এবং গুটিপোকা বা রেশমকীটকে খাওয়ানোর জন্য ইহার ব্যবহার হইত। গুটিপোকা হইতেই রেশম উৎপন্ন হইত। বীরভূমে তুঁতের চাষ একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। রাজনগর থানার তাঁতিপাড়া, বোলপুরে

বীরভূমের তাঁত শাড়ি

শ্রীনিকেতনে এবং সিউড়ি থানার কড়িধ্যায় এখনও রেশম শিল্প টিকিয়া আছে। রামপুরহাট মহকুমায় বসোয়া-বিষ্ণুপুরেও রেশম শিল্প টিকিয়া আছে। কিন্তু এই রেশম শিল্প বানারসী কোম্পানির দখলে চলিয়া গিয়াছে। ফলে সাধারণ তাঁতিরা ব্যবসার লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। রেশম শিল্প ছাড়াও বীরভূমে তাঁতশিল্প, কাঁসাশিল্পের প্রাধান্য ছিল। আজ সেগুলি প্রায় ধ্বংসের মুখে। আজও কয়েকটি স্থানে তাঁতশিল্প টিকিয়া আছে। রাজনগর, শ্রীনিকেতন, দুবরাজপুর ও ইলামবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে এবং নলহাটিতে কাঁসাশিল্প এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লাক্ষাশিল্প বীরভূমের একটি বড় সম্পদ ছিল। বিদেশেও কয়েক লক্ষ টাকার লাক্ষা রপ্তানি হইত। কিন্তু বর্তমানে লাক্ষা শিল্পও প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিয়াছে। বীরভূমের ইলামবাজারে ইহার কিছু অস্তিত্ব রহিয়াছে। কুটিরশিল্পে শ্রীনিকেতনের 'বিশ্বভারতী শিল্পভবনের' একটি বিশেষ স্থান আছে। রুচি ও কারুশিল্পের দিক হইতে শ্রীনিকেতন শিল্পকেন্দ্রের জিনিষ সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছে।

বীরভূম জেলায় অনেকগুলি চালের কল রহিয়াছে। আহমদপুর, বোলপুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়ায় এই ধান বা চালকলগুলি রহিয়াছে এবং এইসব কলে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে।

ভারী শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রি বলতে বীরভূমে কিছুই নাই। আহমদপুরে সুগার মিলটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। রাজনগর থানায় শিশল বা কোস্তা চাষের প্রবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু রশি তৈরির প্ল্যান্ট বসানো হয় নাই। ফলে শিশল চাষের উপকারিতা সম্বন্ধে সকলে সচেতন নয়। শিশল হইতে ঔষধ ইত্যাদি দ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে। শুধু সেচব্যবস্থা ও কুটিরশিল্প ও সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থায় বীরভূমের অর্থনীতিক উন্নতিও সাধিত হইবে না—বীরভূমের অর্থনীতিকে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কিছু যন্ত্রশিল্পের কারখানা গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বীরভূম জেলার একটি সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণ চিত্র দেওয়া সম্ভবপর নহে—তাই আমি এই প্রবন্ধে বীরভূমের জনজীবনে কৃষি এবং সমাজ উন্নয়নের স্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আরেকটি দিক

আমি ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ভালোর দিক এবং সম্ভাব্য প্রগতির দিক সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহার আর একটি ক্ষতিকর দিকও রহিয়াছে যাহার আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিক হইতে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে সে বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করিব।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৫৬-এ এবং ১৯৫৯ সাল উপর্যুপরি দুইবার ভীষণ ও প্রলয়ঙ্কর বন্যা হইয়া গিয়াছে। বন্যার প্রবল তরঙ্গে গ্রাম, মাঠ, জনপদ, গৃহ, বসতবাড়ি, সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে; মাঠের শস্য ও ফসল নষ্ট হইয়াছে, অনেক লোক মারা গিয়াছে। গবাদি পশু বন্যার খরস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই বিধ্বংসীকর বন্যা শুধু বীরভূম জেলাকে ধ্বংসলীলায় পরিণত

রেশম গুটি তৈরির কারখানা
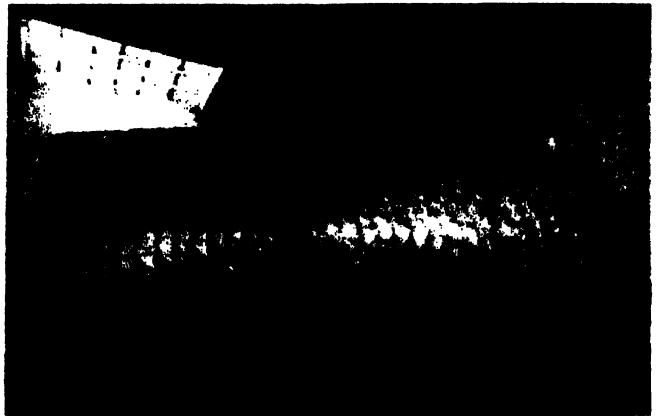
করে নাই—এই মহাপ্লাবন বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মালদহ, ২৪-পরগনা জেলায়ও তাহার ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে।

১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সংঘটিত প্রলয়ংকর বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলায় যে বাড়ি, ঘরদুয়ার, গৃহ, সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ১৯৫৬

সালে ডিসেম্বরে গঠিত তদন্ত কমিটি একটি রিপোর্ট দিয়াছেন। সেই রিপোর্টে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, গঙ্গায় জলস্ফীতি বন্যার অন্যতম কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের বন্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বন্যার কারণ সম্বন্ধে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। পশ্চিমবাংলা সরকার সেই ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করিবার পূর্বেই ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে ও অক্টোবরের প্রথম দিকে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নামিয়া আসে—এবং প্রবল বন্যাস্রোতে দেশ প্লাবিত হয়। এই বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কারণগুলি অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠিত হইয়াছিল (মানসিং কমিটি)। সেই রিপোর্টও ১৯৬২ সালে বাহির হইয়াছে।

গভর্নমেন্টের ত্রুটিপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা না করিয়া সেচের ক্যানেল খনন এবং বারাজ ও জলাধার নির্মাণ, বালি ও পলিমাটির দ্বারা নদীসমূহের সংস্কার না করা, নদীমুখ এবং নদীনালা সংস্কার না করা, নদী এবং গ্রামাঞ্চলের খাল প্রভৃতির জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাব ১৯৫৬ সালের বন্যা ধ্বংসরূপ নিয়াছিল। তদুপরি অতিবৃষ্টি, দামোদর ভ্যালী ক্যানেল এবং ময়ূরাক্ষী জলাধার ও বারাজ জলের চাপ বৃদ্ধির দরুন হঠাৎ জল ছাড়িয়া দেওয়া বন্যার অন্যতম কারণ ছিল।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে ১৯৫৬ সনে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করিয়া বীরভূমের বন্যাপীড়িত অধিবাসীদের কি রকম ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। আমরা ইহাও জানি যে গভর্নমেন্টের ত্রুটিপূর্ণ সেচ পরিকল্পনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা না করিয়া সেচের ক্যানেল খনন এবং বারাজ ও জলাধার নির্মাণ, বালি ও পলিমাটির দ্বারা নদীসমূহের সংস্কার না করা, নদীমুখ এবং নদীনালা সংস্কার না করা, নদী এবং গ্রামাঞ্চলের খাল প্রভৃতির জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাব ১৯৫৬ সালের বন্যা ধ্বংসরূপ নিয়াছিল। তদুপরি অতিবৃষ্টি, দামোদর ভ্যালী ক্যানেল এবং ময়ূরাক্ষী জলাধার ও বারাজ জলের চাপ বৃদ্ধির দরুন হঠাৎ জল ছাড়িয়া দেওয়া বন্যার অন্যতম কারণ ছিল। 'মণ্ডল কমিটির' রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে—'১৯৫৬ সালের বন্যার সময় পাঞ্চেৎ হিল ড্যামের নিকটে দামোদর নদীর বাঁধ দেওয়া হয় নাই সুতরাং এই জলাধার ড্যাম্প বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও সাহায্যই আসে নাই।'

১৯৫৬ সালের বন্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের মূল বক্তব্য হইতেছে যে, ১৯৫৬ সালে নিম্নভূমিতে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, পশ্চিমবাংলার পূর্ব ও মধ্যভাগ এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলির ভেতর দিয়া প্রবাহিত নদীসমূহের অনিয়ন্ত্রিত জলগ্রহের জন্য এই অস্বাভাবিক বন্যা সংঘটিত হইয়াছিল। ভাগীরথী সহ উপরের নদীগুলির জলগ্রহ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বন্যাস্রোতের দ্বারা নদীগুলি আগে হইতেই স্ফীত হইয়াছিল। জলবৃদ্ধির জন্য ভাগীরথীও ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবিরাম মুষলধারায় বৃষ্টিপাতের আগেই টিপটিপ করিয়া বৃষ্টিপাতের দরুন সমস্ত জমি সরস হইয়া উঠিয়াছিল এবং অতিক্রান্ত প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছিল। সাধারণভাবে জলনিকাশের শোচনীয় অবস্থা, ভাগীরথীই সমুদ্রজল নির্গমনের একমাত্র পথ বা জলপ্রণালি এই দুর্বার জলস্রোতকে সমুদ্রে টানিয়া লইতে অসমর্থ হইয়াছিল। হুগলী নদীর জলবৃদ্ধি, উপর্যুপরি কয়েকটি জোয়ার এবং কোটালে বান এই গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল; বন্যাস্রোত প্রবাহের পথে সাংঘাতিকভাবে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বন্যাকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়াছিল। এইসব প্রতিকূল কারণগুলি একই সঙ্গে ঘটিয়াছিল, যাহা সচরাচর ঘটনা। এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা হইয়াছিল। কুঁয়ে, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ ভাঙিয়া বীরভূমের ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল এবং শত শত গ্রাম ধ্বংস হইয়াছিল। কুঁয়ে, ময়ূরাক্ষী, কানামোর, দ্বারকা নদীর উপরিভাগের জলগ্রহক্ষেত্র হইতে বালির পলিমাটি আসিয়া মজুত হওয়ায় সমস্যা আরও সঙ্গীন হইয়াছিল। উত্তরায়ণ বাবলা খালের জলনিকাশের অনুপযুক্ততা, রেলের ব্রিজের জলনিকাশের অনুপযুক্ততা, নদীমুখে পলিমাটি ভরাট হওয়ায় হিজল, বাবলা এবং অন্যান্য বিল ও নদীর জলধারণের অক্ষমতা, ভাগীরথী নদীর শোচনীয় অবস্থা এবং পল্লি অঞ্চলের নদীগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে বন্যার জল প্রবাহিত হওয়ার ফলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ছিল প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় কারণগুলি—নদীসমূহের জলনিকাশের সুব্যবস্থা না থাকা, জলনিকাশের অপব্যবস্থা, পলিমাটি ও বালির দ্বারা নদীর ভরাট এই শোচনীয় অবস্থার অপর কারণ।

বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত ঠিবা গ্রাম ১৯৫৬ সালের বন্যার ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজও বহন করিতেছে। সরকার ঠিবায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি মডেল ভিলেজ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা ভেস্তে গিয়াছে।

বীরভূমের কৃষি সেচব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়ন এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি তাহা বীরভূমবাসীর নিকট অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া আমি আশা করি।

'ধূসরমাটি স্মারক সংখ্যা' ১৯৮৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত—সম্পাদক

মতিচুর মসজিদ (রাজনগর) ভিতরের দেওয়াল
— সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

চন্দ্রনাথ শিবমন্দির (হেতমপুর)
— সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ
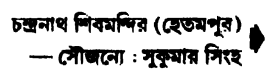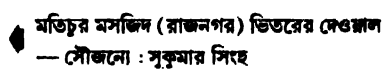
ময়ূরাক্ষী ক্যানেল — ছবি : পাপাম ঘোষ

বীরভূম জেলার কৃষি, প্রযুক্তি, পণ্য ও বাজার

কাজী এম বি রহিম ও দেবাশিস সরকার

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত রাঢ় বঙ্গের একটি অন্যতম জেলা বীরভূম। এই জেলার ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করলে দেখা যায় বেশ কিছু নদ, নদী ও শাখা নদীর জন্য এই জেলার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নত হয়েছে। এই জেলার প্রধান দুটি নদী হল অজয় এবং ময়ূরাক্ষী। এছাড়া জেলার পশ্চিমাংশে বহমান হিঙ্গলো নদীটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু ছোট ছোট নদী যেমন—ব্রাহ্মণী, দ্বারকা এবং কোপাই এই জেলার মানচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

বীরভূমের মাটি প্রধানত লাল ও কাঁকর মাটি। এজন্য সামগ্রিকভাবে এই জেলাকে লাল মাটির দেশ বলা হয়ে থাকে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের মাটি যেমন—এঁটেল, মেটেল, বাঘা এঁটেল, পলিমাটি, বিন্দি, বেলে, দোঁয়াশ, কাঁকর এবং বাস্তু মাটিও দেখা যায়। এইসব মাটির প্রতিফলন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মাটির বৈচিত্র্যের ফলে এই জেলার বেশ কিছু অঞ্চল এক ফসলা

থেকে দোফসলা অঞ্চলে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বেশ কিছু অঞ্চল সেই এক ফসলাই থেকে গেছে, কৃষিতে প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও।

কোনও দেশের কৃষিতে উন্নতির ছবি প্রকাশ পায় মূলত কৃষি জমির ব্যবহারিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন সময়ের সরকারি তথ্য অনুযায়ী এটা দেখা যায় যে এই জেলায় কম বেশি ৭৩ শতাংশের মতো এলাকায় ফসল উৎপাদিত হয়। আবার এর মধ্যে ২৯ শতাংশের মতো অংশে একবারের অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। এটা সম্ভব হয়েছে সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে। এ সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

এখন এটা দেখতে হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কৃষি উন্নয়নের যে ধারা এই জেলা বহন করে আসছে তা কি সত্যিই আশাব্যঞ্জক ? এ সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করতে হলে নীচে প্রদত্ত বিভিন্ন সারণির তথ্যগুলিকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। সারণি-১ থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৯৬০-৬১ সালে সমগ্র বীরভূমে নথিভুক্ত ভূভাগের পরিমাণ ছিল ৪৫১.৪ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে কর্ষিত জমির পরিমাণ ছিল ৩৪৩.৭ হাজার হেক্টর অর্থাৎ মোট ভূ-ভাগের ৭৬ শতাংশ। এছাড়া একবারের অধিক শস্যের চাষে নিয়োজিত জমির মোট পরিমাণ ছিল ৪৪.৫ হাজার হেক্টর অর্থাৎ মোট ভূ-ভাগের ৯.৮৫ শতাংশ। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি অথবা অবনতি বোঝার জন্য আরও একটি তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। তা হল পতিত জমির পরিমাণ। উন্নত কৃষি ব্যবস্থায় যেমন বেশি ফসল ওঠে, ঠিক সে রকম অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থায় পতিত জমির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। ১৯৬০-৬১ সালের তথ্যে আমরা দেখতে পাই এই জেলার মোট পতিত জমির পরিমাণ ছিল ১৮.১ হাজার হেক্টর অর্থাৎ মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৪ শতাংশের বেশি। এই পতিত এলাকায় কৃষিকার্য করা সম্ভবপর ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পতিত জমির পরিমাণ শুধু যে কমেছে তাই নয়, পাশাপাশি শস্য রোপণের নিবিড়তাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের তথ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট কর্ষিত এলাকার প্রায় ২৯ শতাংশ এলাকা একের অধিক ফসলের আওতাভুক্ত ছিল অর্থাৎ এই দশ বছরে একের অধিক ফসলের আওতাভুক্ত এলাকার বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৯১ শতাংশের মতো। সেই সঙ্গে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে এখন অবধি অর্থাৎ গত চল্লিশ বছরে শস্য রোপণের নিবিড়তার যে চিত্র আমরা পাই তাতে এই জেলার কৃষি উন্নয়নের চালচিত্রটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কৃষি উন্নয়নের একটি আবশ্যিক উপাদান হল সেচ। সেচের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও তার বিস্তার একদিকে যেমন কৃষি উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারণ করে অপরদিকে কৃষির বিভিন্ন দিকও খুলে দেয়। তবে বিশেষভাবে এই জেলার এবং সামগ্রিকভাবে পুরো পশ্চিমবঙ্গে সেচ সম্বন্ধীয় তথ্য অপ্রতুল। সেচের যে তথ্য পাওয়া যায় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ। এই জেলায় সেচের যে তথ্য আমরা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৯৭-৯৮ সালের মধ্যে সরকারি ক্যানাল থেকে সেচ পাওয়া এলাকা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি-১ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৬০-৬১ সালে সরকারি ক্যানাল থেকে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ১৩৩ হাজার হেক্টর এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে

সারণি-১
বীরভূমে জমির বিভিন্ন ব্যবহার
(জমির পরিমাণ '০০০ হেক্টরে)

বৎসর	মোট ভূ-ভাগের পরিমাণ	মোট কর্ষিত জমি	একবারের অধিক ফসলের জমি	কৃষিযোগ্য পতিত জমি	সরকারি ক্যানেল থেকে সেচপ্রাপ্ত জমি	শস্য রোপণের নির্ভরতা (সূচক)
১৯৬০-৬১	৪৫১.৪	৩৪৩.৭ (৭৬.১৪)	৪৪.৫ (৯.৮৫)	১৮.১ (৪.০১)	১৩৩.০ (৩৮.৭০)	১১২.৯৫
১৯৭০-৭১	৪৫২.৪	৩৪০.৮ (৭৫.৪৯)	১২৯.৫ (২৮.৬৯)	১০.৬ (২.৩৫)	১৬৬.৮ (৪৮.৯৪)	১৩৭.৯৯
১৯৮০-৮১	৪৫১.৪	৩৪১.৯ (৭৫.৭৪)	১০০.৮ (২২.৩৩)	৩.৩৯ (০.৭৫)	১৯১.৬ (৫৬.০৩)	১২৯.৪৮
১৯৯৭-৯৮	৪৫২.১	৩৩১.১ (৭৩.২৩)	১০৪.৮ (২৩.১৮)	৪.৫৪ (১.০০)	১৭১.৪ (৫১.৭৭)	১৩১.৬৫

টিকা : নীচে বন্ধনীর সংখ্যাগুলি মোট জমির উপর শতাংশের হিসাব

উৎস : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষি কাজ ছবি : পাপান ঘোষ

আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন ১৯৮৭ সালের তথ্যে আমরা পাচ্ছি সমগ্র বীরভূমে সরকারি গভীর নলকূপ ও নদী থেকে তোলা সেচের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৪ এবং ১০৩টি। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৯৭-৯৮ সালে সরকারি গভীর নলকূপ, কুয়া এবং নদী থেকে তোলা সেচের যে সংযোজন ঘটেছে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২০, ৯৫০ এবং ১১৪। অর্থাৎ গভীর নলকূপ এবং নদী থেকে তোলা সেচের এই দশ বছরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘটেছে শতাংশের হিসাবে যথাক্রমে ১৭২.৭৩ এবং ১০.৬৮ শতাংশ।

তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭১.৪ হাজার হেক্টর অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে এই বৃদ্ধির হার হল প্রায় ২৯ শতাংশ। এছাড়া সেচের যে অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি আছে যেমন গভীর ও অগভীর নলকূপ, পুকুর, নদী থেকে তোলা সেচ ইত্যাদি। সেগুলি এই সময়ের মধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচের এইসব ব্যবস্থাগুলি থেকে কতটা এলাকায় সেচের বিস্তার ঘটেছে সে সম্বন্ধীয় তথ্য অপ্রতুল। অবশ্য সংখ্যা দিয়ে এই বিস্তারের সম্বন্ধে কিছুটা

সেচের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে এই জেলার সার্বিক সেচ এলাকার বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২.৫ শতাংশ। সেচ এলাকার বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে মালিকানাভুক্ত অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। পাশাপাশি

সারণি-২

বীরভূমের মোট এবং সার্বিক সেচ ব্যবস্থা

(জমির পরিমাণ '০০০ হেক্টরে)

সেচের উৎস	মোট সেচপ্রাপ্ত জমি	সার্বিক সেচপ্রাপ্ত জমি	
	১৯৮৫-৮৬ সালে	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬
১। গভীর নলকূপ			
(ক) সরকারি	১.২	২.৪	২.৪
(খ) এম আই সি	০.২	০.৫	০.৫
(গ) আই টি ডি পি	—	—	—
২। নদী থেকে তোলা সেচ			
(ক) সরকারি	৩.৪	৬.০	৬.০
(খ) এম আই সি	০.৩	০.৮	০.৮
৩। অগভীর নলকূপ			
(ক) সরকারি	১.১	২.০	২.০
(খ) এ এফ পি পি	০.৩	০.৬	০.৬
(গ) ব্যক্তিগত	১৫.২	২৭.৮	৩০.৬
৪। কুয়া	০.৪	০.৭	০.৭
৫। পুকুর	৩৯.৫	৮.০	৮.০
৬। ক্যানাল	১৬.৩	১৯.৯	২০.৩
৭। এস আই স্কীম	৫.৪	৬.০	৬.৫

উৎস : অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান, বীরভূম জেলা (১৯৮৬-৮৭)

ছোট ছোট কূপের বৃদ্ধির ফলেও সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে সেচ এলাকার বিস্তারের হার বোরো চাষের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং এই বৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশের মতো। অপরদিকে খরিফ এবং রবি চাষে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.১৪ এবং ৫.২২ শতাংশের মতো। সব মিলিয়ে এই সময়ে মোট ৭০ শতাংশ কর্ষিত এলাকার সেচের বিস্তার ঘটেছে। তথ্যগুলি থেকে জেলার সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা না করা গেলেও, এক কথায় বলা যেতে পারে এই জেলায় সেচের বিস্তার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং সাবলীলভাবে ঘটে চলেছে।

এইবার আলোচনা করা যাক বীরভূমের প্রধান প্রধান শস্যগুলির বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো বীরভূমেও সব শস্যই কম বেশি উৎপাদিত হয়। তবে সব শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান শস্য। ধান ছাড়া গম, আলু, আখ এবং কিছু কিছু এলাকায় তৈলবীজও উৎপাদিত হয়। এই জেলায় কৃষি ব্যবস্থায় দানাশস্য উৎপাদনের একটি ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। সারণি-৩ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে যদি প্রত্যেক শস্যকে আলাদা করে দেখা হয় তবে সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব পায় ধান। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে আজ অবধি অর্থাৎ প্রায় ৪০ বছরে এই আপেক্ষিক গুরুত্বের বিশেষরকম হেরফের হয়নি। অপরদিকে কিছু কিছু শস্যের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে তাদের গুরুত্ব কিছুটা কমেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় আখ এবং গম। জেলায় এই দুই শস্যের গুরুত্ব হ্রাসের সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বোরো ধানের চাষ। এই সময়ে প্রধান প্রধান শস্যগুলির এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এটা মূলত সম্ভব হয়েছে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, রোগ পোকা দমনের ওষুধ এবং উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সারণি-৪ থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান

সারণি-৩

বীরভূমের বিভিন্ন শস্যে নিয়োজিত জমি

(জমির পরিমাণ '০০০ হেক্টর)

	শস্য	১৯৬০-৬১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৯৭-৯৮	২০০২-০৩*
১।	আমন ধান	২৭১.১	২৬৯.৯	৩২৫.০	৩১০.০	২৯৪.০২
২।	আউস ধান	৩৪.৭	৫১.৪	৭.৯	৮.৩	১১.৩৬
৩।	বোরো ধান	১.৪	৪.১	২৩.৭	৫০.২	৬২.৯৩
৪।	মোট ধান	৩১০.৩	৩২৫.৪	৩৫৬.৬	৩৬৮.৫	৩৬৮.৩১
৫।	গম	৫.৬	৭৭.৮	২০.৫	২১.০	৩৪.৭৪
৬।	মোট খাদ্য শস্য	৩৬৬.০	৪৪৪.১	৪০৭.৭	৪০১.৭	—
৭।	আখ	৭.০	৪.০	২.৩	১.৯	১.৮৭
৮।	আলু	৫.৫	৫.০	৬.৮	১০.০	১৯.৪১
৯।	সরিষা	০.৪	১.৯	১০.৬	১৮.০	২৬.৩১
	সব শস্য	৩৮৮.২	৪৭০.৩	৪৪২.৭	৪৩৫.৯	—

উৎস : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

** অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান, বীরভূম জেলা (২০০৩-২০০৪)*

সারণি-৪

বীরভূমে রাসায়নিক সারের ব্যবহার

(সারের পরিমাণ টনে)

	সার	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৯৭-৯৮	২০০২-০৩*
১।	নাইট্রোজেন	৬৫৭৫	১২,৮৬৫	৩৩,৯০২	৩৮,০৪৭
২।	ফসফেট	১০৯৭	৪০৫১	১৬,৬৭১	১৮,০৩১
৩।	পটাশ	৫১৭	২৫৫৭	৯৮০৬	১৪,২৩১
	মোট সার	৮১৮৯	১৯,৪৩৭	৬০,৩৭৯	৭০,৩০৯

উৎস : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

** অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান, বীরভূম জেলা (২০০৩-২০০৪)*

ধনধান্যে বীরভূম

ছবি : পাপান ঘোষ

হয় যে এই জেলা রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে। প্রত্যেকটি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। মোট সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ২০০২-০৩ সালের মধ্যে শতাংশের হিসাবে বৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ২৬২ শতাংশের মতো। ঠিক একই রকমভাবে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়। সারণি-৫ থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে মোটামুটি সব ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই উল্লেখনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। শতাংশের হিসাবে এই সময়ের মধ্যে ট্রাক্টর এবং পাওয়ার টিলারের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫৫ এবং ২৯ শতাংশ। অবশ্য উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখনীয় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটেছে যন্ত্রচালিত রোগ পোকা দমনের যন্ত্রের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার প্রায় ২৩০০ শতাংশের মতো। অর্থাৎ এইসব তথ্যগুলি থেকে একটা ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল শস্য উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন সেইসব উপাদানের বৃদ্ধির হার এই জেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্তোষজনক।

সারণি-৫

বীরভূমে কৃষিতে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার

(যন্ত্রপাতি সংখ্যায়)

	যন্ত্রপাতি	১৯৮৯	১৯৯৪
১।	ট্রাকটার	৩১৪	৫০৫
২।	পাওয়ার টিলার	১১৭	১৫৪
৩।	ডিজেল পাম্পসেট	১৮,২৩৭	২৩,৫৭৩
৪।	বৈদ্যুতিক পাম্পসেট	২৯৮৮	৪৬২১
৫।	যন্ত্রচালিত রোগ পোকা দমনের যন্ত্র	৩৪০	৮১৫৭

উৎস : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এখন দেখতে হবে শস্য উৎপাদনের যে ধারা এই জেলা বহন করে চলেছে তা কী জন্য ঘটেছে ? প্রথমত এটা কি ঘটেছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দরুন অথবা কৃষি এলাকার বিস্তারের জন্য ? উৎপাদনশীলতার যে চেহারা আমরা সারণি-৬ এর মধ্য দিয়ে পাচ্ছি তাতে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদনশীলতার হার সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আলু এবং আখের

সারণি-৬

বীরভূমে বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা

(উৎপাদন '০০০ টনে, উৎপাদনশীলতা কেজি প্রতি হেক্টরে)

শস্য	১৯৬০-৬১		১৯৭০-৭১		১৯৮০-৮১		১৯৯৭-৯৮		২০০২-০৩*	
	উৎপাদন	উৎপাদন-শীলতা	উৎপাদন	উৎপাদন-শীলতা	উৎপাদন	উৎপাদন-শীলতা	উৎপাদন	উৎপাদন-শীলতা	উৎপাদন	উৎপাদন-শীলতা
১। আমন ধান	৩৮১.৪	১৩৯১	৫০৪.৫	১৮৬৯	৫১৮.১	১৫৯৪	৮৪০.৯	২৭১২	৭৮৬.১৮	২৬৭৪
২। আউস ধান	৩৩.২	৯৫৭	৯১.৫	১৭৮০	১২.০	১৫২০	২০.৩	২৪৩৩	২৬.৭৩	২৩৫১
৩। বোরো ধান	২.০	১৪২৯	১৩.৭	৩৩৪১	৫৫.৭	২৩৫০	১৫৮.৯	৩১৬৯	১৮৫.৭৮	২৯৫২
৪। মোট ধান	৪১৬.৬	১৩৪৩	৬০৯.৭	১৮৭৩	৫৮৫.৮	১৬৪৩	১০২০.১	২৭৬৮	...	...
৫। গম	৩.৫	৬২৫	১১৭.৪	২২৮০	৩৩.৫	১৬৩৩	৫৯.২	২৮১৯	৯৭.৪৮	২৮০৬
৬। আখ	৩৩.০	৫০০০	২৭.০	৬৭৫০	১২.৭	৫৬২৩	৭৯.৮	৪২২১২	১৩৪.৮১	৭২০৯০
৭। আলু	৫১.১	৯২৯১	৫৫.৮	১১১৬০	৫৮.৩	৮৫৮৭	১৮০.৯	১৮০২৭	৪৬২.৪৭	২৩৮২৬
৮। সরিষা	০.২	৫০০	০.৬	৩১৬	৮.৭	৮১৫	১৮.৪	১০১৯	২৭.৭৩	১০৫৪

উৎস : ফলিত অর্থনীতি ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

** অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান, বীরভূম জেলা (২০০৩-২০০৪)*

ক্ষেত্রে। ধান, গম, সরিষা প্রমুখ অন্যান্য শস্য অধিকার করে রয়েছে দ্বিতীয় স্থান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো ঘটনা এই যে, কিছু কিছু শস্যের ক্ষেত্রে এই জেলায় উৎপাদনশীলতার হার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গড় উৎপাদনশীলতার থেকেও অধিক। যেমন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭-৯৮ সালে ধানের উৎপাদনশীলতার হার ছিল ২২৪৩ কেজি প্রতি হেক্টরে সেখানে বীরভূমে এই হার ছিল ২৭৬৮ কেজি। আবার যদি ধানগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখা হয় তবে দেখা যায় যে ১৯৯৭-৯৮ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আউস, আমন এবং বোরো ধানের উৎপাদনশীলতার হার ছিল যথাক্রমে ১৭৭৭ কেজি, ২০৮৮ কেজি এবং ২৯৫৮

ধান তোলার অপেক্ষায়, নানুর/বীরভূম — ছবি : পাপান ঘোষ

কেজি প্রতি হেক্টরে। অপরদিকে বীরভূমে ওই সময়ে এইসব ধানের হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীলতার হার ছিল যথাক্রমে ২৪৩৩ কেজি, ২৭১২ কেজি এবং ৩১৬৯ কেজি। ঠিক একই রকমভাবে গমের ক্ষেত্রেও এই জেলার উৎপাদনশীলতার হার সমগ্র গড় উৎপাদনশীলতার থেকেও অধিক। অবশ্য আলু এবং আখের ক্ষেত্রে এই জেলার উৎপাদনশীলতার হার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা কম।

উপরের, তথ্যগুলি থেকে একটি চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হয় যে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পিছনে যে যে শক্তিগুলি কাজ করে বলে মনে হয় তার প্রয়োজনভিত্তিক সুষম ব্যবহার এবং বৃদ্ধির হার এই জেলায় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঘটে চলেছে। একথা অনস্বীকার্য যে কৃষিতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নির্ভর করে অনেকগুলি উপাদানের বৃদ্ধি ও সুষম পরিকল্পিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সেই সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ বলে ধরা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ এবং তার সুযোগ্য ব্যবহার এইসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। গত চার শতাব্দী ধরে এই জেলায় এইসব শক্তিগুলির বৃদ্ধি ও তার সুষম ব্যবহার শস্য উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার গতিকে বেশ কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন আমরা দেখব উৎপাদন সম্পর্কে এবং ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে এই জেলার চালচিত্রটি কি ধরনের ? আমরা সবাই কম বেশি জানি যে উৎপাদন সম্পর্কের মূল চরিত্রের লক্ষণ চারটি। যেমন জমি ও উৎপাদনের উপর মালিকানা, ভূমি তথা উৎপাদনের উপর স্বত্ব না থাকা, ক্ষুদ্র জমি এবং জমির অসম বন্টন। এই জেলায় জমির আয়তনের বিভিন্ন রকমের বিভেদ বিদ্যমান। বৃহৎ আয়তনের জমি প্রায় না থাকারই মত। অপরদিকে এক হেক্টরের চেয়েও ছোট আয়তনের জমি শত করা প্রায় ৫০ ভাগ। সেই সঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র হল জমির অসম বন্টন। কৃষির উপর নির্ভরশীল একটি বড় অংশের মানুষ বস্তুত ভূমিহীন কৃষক। ১৯৯১ সালের সেনসাস তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় শতকরা ১১.৩৭ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন খেতমজুর। সারণি-৭ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ছোট জমির সংখ্যা এই জেলায় শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ। পাশাপাশি এটাও দেখা যাচ্ছে, যে সকল মানুষের কাছে জমি আছে তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক মানুষের জমি এক হেক্টরের থেকে কম। কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যে সকল মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত তাদের কাজের চরিত্র এবং উৎপাদন অংশে তাদের স্বত্ব। সাধারণত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল মানুষ যুক্ত তাকে আমরা দুইভাগে ভাগ করি যেমন জমির মালিক এবং সেই জমি চাষ করা কৃষক। জমির মালিককে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়, যেমন জমির মালিক যে সরাসরি চাষের সঙ্গে যুক্ত এবং জমির মালিক যে অপরকে দিয়ে চাষ করিয়ে নেয়। অপরদিকে অন্যের জমি চাষ করা কৃষককে আমরা দুইভাগ করতে পারি যেমন জমি এবং উৎপাদনের উপর স্বত্ব থাকা কৃষক যাকে ভাগচাষী বা বর্গাদার বলা হয় এবং অপরজন হল খেতমজুর বা কৃষি শ্রমিক। বীরভূম জেলায় এইসব উপাদান সম্পর্কের চরিত্রগুলির বিকাশ অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলছে বলে মনে হয়। যেমন একটি তথ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৭ সাল অবধি সমগ্র বীরভূমে ১৫,৭৩৬.৮১ হেক্টর উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন দুর্বল মানুষের কাছে বিতরণ করা হয়েছে এবং তাতে উপকৃত হয়েছেন ৬৩১৯৭ জন তপসিল সম্প্রদায়ভুক্ত, ৩১,১১৪ জন আদিবাসী এবং ৩৬,১৭০ জন অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির মানুষ। ঠিক একইভাবে ১৯৯৭ সাল অবধি নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ১,০৯,১৩৮ জন যার মধ্যে ৪৪,৪৩৯ জন তপসিল সম্প্রদায়ভুক্ত ১৬৮৭৫ জন আদিবাসী এবং ৪৭৮২৫ জন অন্য জাতি ও

সারণি-৭

বীরভূমে মালিকানাভুক্ত জমির বিন্যাস

জমির পরিমাণ	জোতের সংখ্যা	শতকরায় জোতের সংখ্যা	জোতের এলাকা (হেক্টর)	শতকরায় জোতের এলাকা
১ হেক্টর অবধি	১৮,১১৪	৬৬.১	১,৫৬,০৭৪	৪৭.২৫
১-২ হেক্টর	৬২,৪৭২	২২.৮	৬৩,২২২	১৯.১৪
৩-৪ হেক্টর	২৪,১১২	৮.৮	৬০,১৮৪	১৮.২২
৪ হেক্টরের বেশি	৬৩০২	২.৩	৫০,৮৩৬	১৫.৩৯
মোট	২,৭৪,০০০	১০০.০.	৩,৩০,৩১৬	১০০.০০

উৎস : অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান, বীরভূম জেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জলবিভাজিকা

সম্প্রদায়ভুক্ত। (সারণি-৮ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ এই জেলায় সামগ্রিকভাবে কৃষিকার্যে যুক্ত কৃষকের শস্য উৎপাদনের সত্ত্বে অনেকাংশেই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে

সারণি-৮

বীরভূম ও পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র

	বীরভূম	পশ্চিমবঙ্গ
১। মোট জমি বণ্টন	১৫৭৩৬.৮১ (৩.৯৮)	৩৯৪৯০৪.১৪
২। উপকৃত মানুষ	১৩০৪৮১ (৫.২১)	২৫০৬৬৮৯
(ক) তপসিল সম্প্রদায়	৬৩১৯৭ (৭.২০)	৮৭৮২৭৯
(খ) আদিবাসী	৩১১১৪ (৬.৪১)	৪৮৫০৯৬
(গ) অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়	৩৬১৭০ (৩.১৯)	১১৪৩৩১৫
(ঘ) বর্গাদারের সংখ্যা	১০৯১৩৮ (৭.৩৭)	১৪৮১০২৫
৩। বর্গাকৃত জমি	৪৪৯৮৮.২০ (১০.১৩)	৪৪৩৯৬২.৬৪
(ক) তপসিল সম্প্রদায়ের জমি	১৯৫২৩.৮৯ (১৩.৩৬)	১৪৬১৫৭.০৭
(খ) আদিবাসীদের জমি	৭৮৮৩.৮১ (১২.৬০)	৬২৫৬৭.০০
(গ) অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের জমি	১৭৫৮০.৫০ (৭.৪৭)	২৩৫২৩৮.৫৭

টিকা : নীচের বন্ধনীর সংখ্যাগুলি শতকরা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে
উৎস : আর্থিক সমীক্ষা (১৯৯৭-৯৮), পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যায় এই জেলা পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে। আবার যদি বর্গাকৃত জমির হিসাব দেখা হয় তবে এই জেলার স্থান তৃতীয়। ১৯৯৭ সাল অবধি এই জেলায় ৪৪,৯৮৮.২০ হেক্টর জমি বর্গা নথিভুক্ত হয়েছে যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা হিসাবে ১০.১৩ শতাংশ। সুতরাং এক কথায় বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকৃত ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার সুফল এই জেলার কৃষিজীবী মানুষ অনেকটাই পেতে শুরু করেছেন এবং এর ফলে উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রগুলি অনেকাংশেই স্পষ্ট ও সাবলীল হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

সর্বশেষ আমরা যে ব্যাপারে আলোচনা করব তা হল কৃষি পণ্যের বাজার। আমরা সবাই জানি, যে যে প্রণালীতে বা যে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য উৎপন্ন হওয়া জায়গা থেকে যাত্রা করে উপভোক্তার কাছে গিয়ে পৌছায় সেই প্রণালীর বা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত ব্যবস্থাকে বাজার বলা হয়। এখন দেখতে হবে এই জেলায় কৃষি পণ্যের বাজারগুলি কতরকমের এবং আর বিস্তারই বা কিভাবে হয়েছে। পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে এইসব বাজারে কী কী ধরনের কৃষিপণ্যের আমদানি হয় এবং বাজারের চরিত্রগুলিই বা কি প্রকারের ? সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই জেলায় মধ্য পাইকারি বাজারের সংখ্যা ১৪টি যা জেলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বাজারগুলি থেকে সারা জেলায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরেও উপভোক্তার কাছে কৃষি পণ্যের সরবরাহ হয়ে থাকে। এর সঙ্গে এই জেলায় ৭টি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে

রয়েছে বাজার সম্বন্ধীয় তথ্য দেওয়ার কেন্দ্র। জায়গাগুলি হল সিউড়ি, সাঁইথিয়া, বোলপুর, দুবরাজপুর, আমোদপুর, রামপুরহাট ও নলহাটি। পাশাপাশি সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে বোলপুরে। এই জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে সর্বসমেত ৮টি হিমঘরও রয়েছে। অর্থাৎ কৃষিপণ্যের বাজারের যে বিস্তার এই জেলাতেই সংঘটিত হয়েছে তা অবশ্যই আশাপ্রদ। এই জেলার ১৪টি মধ্য পাইকারি বাজারের যে সংখ্যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি তা আলাদা আলাদা করে বিচার করলে এই বাজারগুলির বিভিন্ন চরিত্রগুলির সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সারণি-৯ থেকে আমরা একটা আন্দাজ পেতে পারি এই বাজারগুলিতে আমদানির বহরের উপর। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ধান কেনা বেচার জন্য বোলপুর, মল্লারপুর, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর ইত্যাদি বাজারগুলি অন্যতম আবার শাকসবজির বাজার হিসাবে নলহাটি, রামপুরহাট, মল্লারপুর ইত্যাদি বাজারগুলিকে আলাদা করা যায়। পাশাপাশি আলুর বাজার হিসাবে সাঁইথিয়া এবং দুবরাজপুরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এইসব বাজারের একটা বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় যেমন কিছু কিছু বাজারে এমন কিছু কৃষিপণ্য বিক্রি হয় যা জেলার অন্য কোনো বাজারে দেখা যায় না। এই কৃষিপণ্যগুলি হল পশুর চামড়া, শালপাতা, গরু ও ছাগল ইত্যাদি। পশুর চামড়া বিক্রি হয় এমন কয়েকটি বাজার হল সাঁইথিয়া এবং মুরারই ; আবার বিপুল পরিমাণে শালপাতা বিক্রি হয় রাজনগরের বাজারে। সারণি-১০ থেকে আমরা দেখতে পাই যে এই বাজারগুলিতে বিভিন্ন দিনে হাট বসে এবং সেখানে বিভিন্ন জিনিসের কেনাবেচা হয়। এই বাজারগুলির আয়তন অনুসারে ব্যবসাদারের সংখ্যাও বিভিন্ন। কোনো কোনো বাজারে পাইকারি ব্যবসাদারের সংখ্যা অনেক যেমন সাঁইথিয়া, আবার কিছু বাজারে ফড়িয়ার সংখ্যা প্রচুর যেমন বোলপুর। এইসব বাজারে বিশেষ বিশেষ কিছু কৃষিপণ্য বিক্রির জন্য সপ্তাহের কিছু নির্দিষ্ট দিনে হাট বসে। যেমন মুরারইয়ের বাজারে ধান, চাল ও শাকসবজি বেচাকেনা হয় ; মঙ্গলবারের ও শনিবারের হাটে আবার অন্যান্য কৃষিপণ্য বেচার জন্য রবি ও বৃহস্পতিবার হাট বসে এবং শুধু গরু-ছাগল বেচা-কেনার জন্য শুক্রবার হাট বসে। ঠিক একই রকমভাবে সাঁইথিয়ায় প্রত্যেক সপ্তাহের শনিবার হাট বসে পশুর চামড়া এবং পশু-পাখি বিক্রির জন্য। অর্থাৎ এই জেলায় সমগ্র বাজার ব্যবস্থার যে বিস্তার ও পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা সন্তোষজনক। এইসব বাজারগুলিতে এক বা গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর একচেটিয়া দখল বজায় নেই কারণ এইসব

সারণি-৯

বীরভূমের বাজারে কৃষিপণ্যের আমদানি

বাজার	বাজারের আমদানিকৃত কৃষিপণ্য ('০০০কুইন্টাল)							
	ধান	চাল	গম	আলু	পেঁয়াজ	ডাল	সরিষা	শাকসব্জী
১। আমোদপুর	১৬০.০০	১০০.০০	৬.০০	২০.০০	২০.০০	১০.০০	২০.০০	৪০.০০
২। বোলপুর	৩৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০	৯২.০০	—	৪৫.০০	৫৫.০০	৫৫.০০
৩। মুরারই	৭৫.০০	১৫.০০	—	৪০.০০	১.৮	২০.০০	৩.৫০	১৪৫.০০
৪। দুবরাজপুর	১৬০.০০	১১০.০০	২০.০০	১১০.০০	১৫.০০	৫.০০	২৫.৫০	৬০.০০
৫। মহম্মদবাজার	৪০.০০	২৫ ০০	১২.০০	১৫.০০	—	—	—	—
৬। নলহাটি	১৩৫.০০	—	১০.০০	৬০.০০	১৫.০০	৩০.০০	৭.৫০	২২৫.০০
৭। সাঁইথিয়া	১৮০.০০	১১০.০০	৬১.০০	৩০০.০০	১৮.০০	১১০.০০	১৭৫.০০	৭০.০০
৮। রাজনগর	৩৫.০০	১৫.০০	৬.০০	১২.০০	—	—	—	—
৯। সিউড়ি	৮০.০০	৬০.০০	৬.০০	—	৫.০০	৫.০০	—	২০.০০
১০। রামপুরহাট	৯০.০০	২৫.০০	৫.০০	৬০.০০	৩.৫০	৩৫.০০	১২.০০	২০৯.০০
১১। মল্লারপুর	২৫০.০০	১৮.০০	৩.৫০	৫০.০০	১.৫০	১২.০০	৬.০০	১৭৫.০০
১২। লাভপুর	৭৫.০০	৯০.০০	২০.০০	৮০.০০	—	৪৫.০০	৪৫.০০	৩৫.০০
১৩। কীর্ণাহার	৮০.০০	১১০.০০	৩৫.০০	৫০.০০	—	২০.০০	২০.০০	৩০.০০
১৪। ইলামবাজার	১৫০.০০	২০.০০	২৪.০০	৩০.০০	—	২২.০০	২০.০০	২৪.০০

উৎস : পশ্চিমবঙ্গের হাট ও বাজার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮৬)

সারণি-১০

বীরভূমের বাজারে কিছু তথ্য

বাজার	বাজার বসার দিন	হাটের দিন	বাজারে ব্যবসাদারের সংখ্যা		
			পাইকারী	দালাল	ফড়িয়া
১। আমোদপুর	প্রতিদিন	রবিবার ও বুধবার	১৫	৫০	৮০
২। বোলপুর	প্রতিদিন	বৃহস্পতিবার ও রবিবার	৩৬	৩৫	১৫০
৩। মুরারই	প্রতিদিন	শুক্র, শনি, রবি, মঙ্গল, বৃহ	১২	০	১২
৪। দুবরাজপুর	প্রতিদিন	সোমবার ও শুক্রবার	২০	১০	৩৩
৫। মহম্মদবাজার	প্রতিদিন	মঙ্গলবার ও বুধবার	৪	৬	১১
৬। নলহাটি	প্রতিদিন	রবিবার ও বুধবার	১৯	০	১৫
৭। সাঁইথিয়া	প্রতিদিন	সোমবার, শুক্রবার ও শনিবার	৫৫	৩০০	২৫০
৮। রাজনগর	প্রতিদিন	বৃহস্পতিবার ও রবিবার	৪	২	২
৯। সিউড়ি	প্রতিদিন	প্রতিদিন (বৃহস্পতিবার বাদে)	১২	৫	১৭
১০। রামপুরহাট	প্রতিদিন	সোম, শুক্র ও বৃহস্পতিবার	২৫	...	৩৫
১১। মল্লারপুর	প্রতিদিন	বুধবার ও শনিবার	১৯	...	১২
১২। লাভপুর	প্রতিদিন	সোমবার ও শুক্রবার	৪	৫	২০
১৩। কীর্ণাহার	প্রতিদিন	বুধবার ও রবিবার	১৯	৯	৫০
১৪। ইলামবাজার	প্রতিদিন	বুধবার ও রবিবার	২	৩	...

উৎস : পশ্চিমবঙ্গের হাট ও বাজার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৮৬)

বাজারগুলিতে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা যথেষ্টই বেশি। এর ফলে এই জেলার কৃষিপণ্যের বাজারে একটি সুস্থ, সফল এবং সার্থক প্রতিযোগিতা কাজ করে বলে মনে হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই জেলার সমগ্র কৃষির যে পরিপূর্ণ কাঠামো আমাদের কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই কৃষি ব্যবস্থার ফলে এই জেলায় সমস্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের ঢেউ উঠেছে তা একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়ে। কৃষি ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনগুলিও এই জেলায় অত্যন্ত সবল। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কৃষি ব্যবস্থায় সামান্য কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যেমন উন্নত সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শস্য রোপণের নিবিড়তার বৃদ্ধি পাওয়ার হার সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটেনি। পাশাপাশি এই জেলার কিছু এলাকায় সেচ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেনি। অবশ্য এইসব অপরিপূর্ণতা সত্ত্বেও এই জেলার কৃষি ব্যবস্থার মান যথেষ্টই ভাল বলে মনে হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার কৃষি মানচিত্র সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা করা যেতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

তিলপাড়া জলাধার
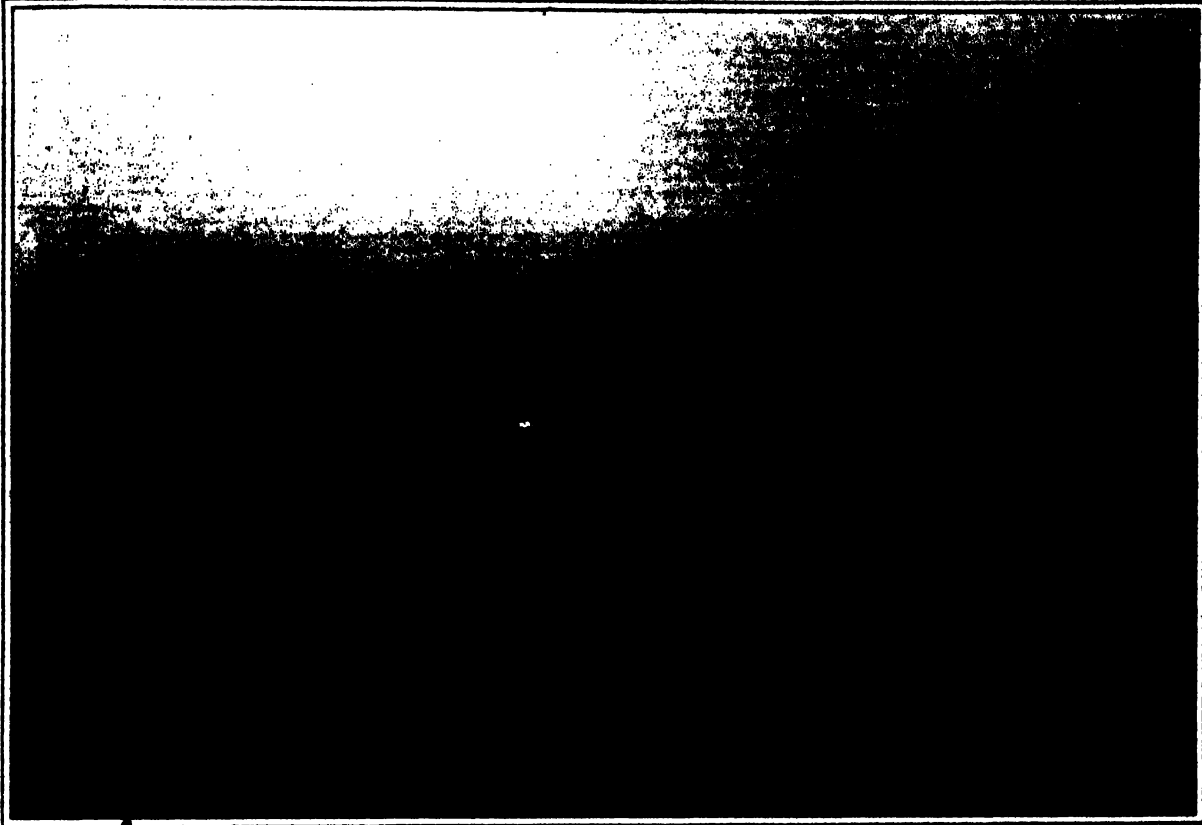
ছবি : সুকুমার সিংহ

বীরভূম জেলার সেচ প্রসঙ্গে

মহম্মদ সেলিম

ভূমিকা

৫৮ বছরের পরও স্বাধীন ভারতবর্ষ কী উৎপাদন ক্ষেত্রে, কী প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, অনেক অনেক বিষয়ে পিছিয়ে। আমাদের দেশের তথ্য এই বলে। পানীয় জলের জন্য, জমিতে জলসেচের জন্য এতই অপ্রতুল ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষের মানব সমাজে দুগর্তির আর শেষ নেই। শিক্ষাই সম্পদ—সেখানে দেখা যাচ্ছে এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের ১.১৮ শতাংশ বরাদ্দ করেছে।

বর্তমানে কিছু তথ্যে জানা যাচ্ছে—জেলার আয়তন ১৭৪২.৯ বর্গমাইল। বর্তমানে তিনটি মহকুমা। ২০০১ সালের আদমসুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা ৩০১২৫৪৬ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমিতে ৬৬৩ জন। বৃদ্ধির হার ১৭.৮৮। তপশিলি সম্প্রদায় ৭৮৪০৬২ জন। শতকরা ৩১.৬৮ জন। আদিবাসী ১২৭৫০১ জন। শতকরা ৬.৯৫ জন।

পশ্চিম কালিপুর গ্রামের কাছে কুয়ে নদীর হাঁসুলি বাঁক

ছবি : মানস দাস
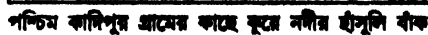
পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মতো সম্পদশালী দেশ খুব কমই আছে। উপরে উর্বর ভূমি, জল ও বনসম্পদ। মাটির নীচে কালো হিরা (কয়লা); সাদা হিরা (খড়িমাটি) অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, কালো পাথরের অফুরন্ত ভাণ্ডার। গিরি (লাল রঙের পাথর) পাথর, বিরুলি পাথর (এক ধরনের বিরুল পোকা থাকার জন্য), মার্বেল ও মার্বেল জাতীয় পাথর। ছোটবড় পাহাড়-পর্বতমালা আর সারি সারি বনবীথিকায় এই অপূর্ব সৌন্দর্যের রূপে রূপবান ভারতবর্ষ। এছাড়া আছে নদী নালা খাল খন্দর ঝর্না অসংখ্য। এবার বীরভূম জেলায় আসি। এ জেলাকে ঘিরে বহু গুণীজন লিখেছেন, বর্ণনা দিয়েছেন। রূপসী বাংলা মনমোহিনী রূপে যেন সেজে রয়েছে। ধূসর গিরিপ্রান্তর। চোখ জুড়িয়ে যায়। পর্যটন শিল্প পরিকল্পনা করলে বীরভূমে অনেক স্থান পাওয়া যেত। সম্প্রতিকালে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির জলাধার দেখলে মনে হবে, এই 'সাগরের তীরে আমরা ঘর বাঁধিব, জুড়াবে মন জুড়াবে প্রাণ।'

সেচব্যবস্থা :

বীরভূমে পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার কৃষির উন্নয়ন ও জলসেচের জন্য কোনও সুব্যবস্থা করেনি। মাত্র একটা ছোট ও বড় সেচব্যবস্থা ছিল। এই খালটার কাজ শেষ হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে। খালটার নাম বক্রেশ্বর নদী। খরচ হয়েছিল ৩,৮৮,০০০ (তিন লক্ষ অষ্টাশি হাজার টাকা)। খালের দৈর্ঘ্য ছিল ২৩ মাইল, ১,৯১৫ ফুট। খালের জলে মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা ছিল, ক্যানেল কর অত্যন্ত বেশি ছিল। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ছোটখাটো সেচ পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছিল, ১৯৫২ সালে ৪০টি। ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৫টি, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪০টি ছোট সেচ পরিকল্পনা কিন্তু পরিকল্পনাগুলি সরকারি গাফলতিতে তদারকি ভালভাবে না করার ফলে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেনি।

সর্বাপেক্ষা বড় সেচ পরিকল্পনাটি হচ্ছে ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা। ঘোষণা ছিল ৬ লক্ষ একর খরিফ ফসলের জমিতে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত জল দেবে। ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে রবি চাষ হবে। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত সেচের কাজ চলবে। তাছাড়া বিহারে ৩২,৫০০ (বত্রিশ হাজার পাঁচশো) একর জমিতে জল দেবে।

বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সাঁওতাল পরগনা জেলায় মশানজোড় নামে জায়গায় এক সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথে ময়ূরাক্ষী নদীর খরস্রোতা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়। পার্বত্য নদীটির উৎসমুখ হল সাঁওতাল পরগনার মালভূমিতে। ১৫৪ মাইল জনপথ অতিক্রম করে ভাগীরথীতে বিলীন হয়েছে। মশানজোড় জলাধার, তার মধ্যে এটি ব্যারেজ। একটা পাশজলনালি, জলসেচ, কিছু শক্তি উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। আগে জলবিদ্যুৎ তৈরি হত। নির্মাণ খরচ ১৬ কোটি ১০ লাখ টাকা। কানাডার কাছ থেকে অর্থসাহায্যকে স্মরণীয় করে মশানজোড় বাঁধকে কানাডা বাঁধ বলা হয়েছে।

বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি উত্তর থেকে পশ্চিমে বিহার-বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চল মশানজোড়ের দূরত্ব ৪০ মাইল। বাঁধের উচ্চতা ১২৩ ফুট। মূল ভিত্তি থেকে ১৫৫ ফুট। দৈর্ঘ্য ২১৭০ ফুট। বাঁধের দুপাশে পাহাড় যুক্ত হয়েছে। বাঁধের উপরিভাগে নির্মিত হয়েছে একটি কংক্রিটের সেতু। জলধারটির গভীরতা ও ঘনত্ব হল ৩৯৮০০০ ফুট। সংরক্ষণ গভীরতা বা ঘনত্ব ৩৪৯০০০ ফুট। জল পরিপূর্ণ থাকাকালে এর পরিমাপ হল ১৬৬৫০ একর এবং সংরক্ষণ মাত্রা ৫০০০০০ একর ফুট। সব

জলাধারগুলির জলধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। পলি ও বালি পড়ে বুজে যাচ্ছে, অবিলম্বে সংস্কারের প্রয়োজন।

প্রবহমান নদীর ২০ মাইল নিম্নভাগে তিলপাড়া নামে জায়গায় ময়ূরাক্ষীর ওপরে যে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে তার নাম তিলপাড়া ব্যারেজ। সেতুবাঁধটা ১০১৩ ফুট দীর্ঘ। তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ছোটখাটো নদীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—বক্রেশ্বর, কোপাই, শাল, দ্বারকা, ব্রহ্মাণী, চন্দ্রভাগা, কুলতোড়। শোনা যায় সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল বিহার সীমান্তে মূল প্ল্যানে নাকি অন্তর্ভুক্ত ছিল পরবর্তী সময়ে ছাঁট করে দেওয়া হয়। ময়ূরাক্ষী তার কমান্ড এরিয়ায় জল দিতে পারে না এর অন্যতম একটা কারণ। জলাধার নিয়ন্ত্রণের গাফলতিতে তিনবার বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম এলাকা খরা কবলিত। সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল নদী দুটি যুক্ত থাকলে এবং অজয় নদে জলাধার করলে বীরভূমে প্রায় সর্বত্র সেচনের সুযোগ পেত। বর্তমানে দেখা যায় হিংলো ক্যানেল পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে মনে হয় সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা বিশেষ গুরুত্ব দেননি। সরজমিনে দেখলে খুব সহজভাবে বোঝা যাবে দীর্ঘ একটা বড় নালা ছাড়া কিছু নয়। খয়রাশোল এমনিতে খরাপ্রবণ এলাকা। এখন খরাই থেকে গেল। এখনও সুযোগ আছে। যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার বা নতুনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে খয়রাশোলকে বাঁচানো যায়।

●	জেলায় মোট চাষযোগ্য জমি	৩৩২৯০৫ হেক্টর
●	বনভূমি	১৫০৫০ হেক্টর
●	পতিত জমি ও চলতি পতিত জমি	২০২০ হেক্টর
●	নীট চাষযোগ্য জমি	৩৩০৬২০ হেক্টর

উৎস	সংখ্যা	সেচসেবিত এলাকা (হেক্টর প্রতি)
ক্যানেল	৩	১৭৭৬০০
নদী বা কান্দর থেকে উত্তোলন	১১০	৭২৮০
গভীর নলকূপ	১১৪	৫৭০০
অগভীর নলকূপ/ মাঝারি নলকূপ	৯২	৬১০
অগভীর নলকূপ	১৫৫০৫	৫৭৬৬৪
সাবমারসেবল	৪০৭২	৩২৬০০
মাঠবুয়ো	১২৬৬	৫০৮
পুকুর	২৭২০০	৩২৭৫৪
অন্যান্য উৎস	—	৯৭৭০
মোট :	—	৩২৬৫৬৪

জমির অবস্থান	পরিমাণ
উঁচু জমি	১০২০০০
মাঝারি জমি	১৬৬২০৫
নীচু জমি	৮৪০০০
বন্যাপ্রবণ এলাকা/বন্যাপ্রবণ	২১০০০

জেলার পূর্ব-দক্ষিণ (বোলপুর সাব ডিভিশন) বন্যাপ্রবণ এলাকায় অনিশ্চয়তার মধ্যে কৃষকদের থাকতে হয়। এর পরিমাণ ২১০০০ হেক্টর। পতিত জমির পরিমাণও কম নয়, ২০২০ হেক্টর।

উল্লেখ্য, বহু রক্তঝরা দিনগুলি অতিক্রম করে বহু সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে ঐতিহাসিক বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। গণতন্ত্রের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। সামগ্রিক এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হল কৃষক সমাজে। বাম গণতান্ত্রিক মানুষের অস্থিরতার দিন সাময়িকভাবে কেটে গেল। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রসারিত করার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে এটা ভুললে চলবে না।

কৃষি সেচে গভীর নলকূপ

এই সময় ১৯৭৮ সালে ১৯ আগস্ট তারিখে বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে পশ্চিমবঙ্গের সেচ, বন্যা ও নদীবাঁধ ভাঙনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে। জানা গেল ৬৭-৭০ ভাগ আবাদযোগ্য জমি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গের ৫টি জেলায় উল্লেখযোগ্য কোনও সেচব্যবস্থা না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তিস্তা সেচ প্রকল্প বাস্তবায়িত করার কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করল। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ১৩০ কোটি টাকা খরচ করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫ কোটি টাকা সাহায্য করেছে। এতবড় প্রকল্প রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ভারতবর্ষের সেচপ্রকল্পের জন্য যেমন ভাকরা নাঙ্গাল, অর্জুনসাগর, সারদা সরোবর, কোশী, তেহরি প্রভৃতি নদীগুলির সেচপ্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফারাক্কা প্রকল্পের অবৈজ্ঞানিক কাজের জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। বর্তমানে তার কুফল ভোগ করতে হচ্ছে কৃষক সমাজকে। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ১৪-১৫ হাজার একর জমি জলমগ্ন হয়ে থাকছে। কান্দি মহকুমায় বন্যার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভপুর থানার অন্তর্গত 'লাঙ্গলহাটা বিল'। বন্যাপ্রবণ এলাকা। জল ধারণ করা ও নিষ্কাশনের বিষয়টাই প্রধান সমস্যা। এই বিলটা নিয়ে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরও আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। এলাকার কৃষক সমাজ সংগঠিতভাবে গণ-উদ্যোগ গ্রহণ করেন। খরার সময় মাটির বাঁধ দিয়ে জল আটকে রেখে চাষ করেন। ১৪ লক্ষ কুইন্টাল ধান উৎপাদন হয় এবং ১০ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়। এই বিল থেকে জল পায় বীরভূম জেলা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের কিছুটা অংশ। বিলের মোট এরিয়া ৭৫০ বর্গমাইল। মৌজার সংখ্যা ৬০টি। বর্ষায় কোনও ফসল হয় না, প্রাণ ও জমি রক্ষার আশঙ্কা দেখা দেয়।

সরকারের আর্থিক সাহায্যে বৈজ্ঞানিকভাবে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা যদি প্রস্তুত হয়, তাহলে দুবার ধান বা অন্যান্য ফসল হবে। এখনই গ্রীষ্মচাষে ৪ লক্ষ কুইন্ট্যাল ধান গরিব কৃষকরা বহু কষ্টে পাচ্ছেন। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্ল্যান এস্টিমেট নিয়ে দাবিসনদ পেশ করা দরকার এবং এলাকায় সংগ্রাম গড়ে তোলা দরকার।

১৯৭৮ সালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নদী সেচ সম্পর্কিত একগুচ্ছ (প্যাকেজ ডিল) গৃহীত হয়। এই চুক্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সায় ছিল। এ চুক্তির বিষয়গুলি ছিল—

১। মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের উচ্চতা ৫ ফুট বাড়বে।

২। সিদ্ধেশ্বরী নুনবিল প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে।

৩। অজয় নদীর ওপর জলাধার নির্মাণ করা হবে।

ওই প্রকল্পগুলির কোনও কাজ অগ্রসর হয়নি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই ছিল না। অথচ দেশের সার্বিক সমস্যা সমাধানে বর্তমান পর্যায়ে মৌলিক ভূমিসংস্কারই অন্যতম প্রধান কাজ। লতা যেমন একটা গাছকে জড়িয়ে নিজেকে ও গাছটিকে সুন্দর করে তোলে— তেমনি ভূমি সমস্ত মানব সমাজকে জড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জমির অপর নাম জীবন। *('পশ্চিমবঙ্গ' বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত। বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৪৭-৫০/৭, ১১, ২৮ জুন, ২০০২)।*

আইনসঙ্গতভাবে সরকারি ন্যস্ত জমি ও বর্গা রেকর্ডের ফলে প্রতি বছর ৬০০ কোটি টাকার উৎপাদিত ফসল কৃষকের হাতে আসছে—এই টাকাটা যেত জমিদার-জোতদারদের হাতে। জমিদার-জোতদাররা সরকারি আইন কোন কালেই মানে না। আজও না। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত ভূমি সম্পর্কিত কমিটি, ১৯৬৯ সালে মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ভারতে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর সরকারি জমি বিলি হয়নি।

১৯৭১ সালে টাস্কফোর্স রিপোর্ট—রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ভূমিসংস্কারে বাধা।

১৯৭১ সালে ভূমিসংস্কারের সংশোধনী—আর একটি ব্যর্থতা।

রাজ্যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা প্রসারিত হয়েছে। এই সুবিধা ১৯৮০-৮১ সালে অতিরিক্ত ২২ কোটি ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেচের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে।

(সূত্র : বামফ্রন্ট সরকার ও ভূমিসংস্কার, পৃষ্ঠা ৭)।

লেখক : কৃষক আন্দোলনের সংগঠক

সূত্র :

১। *বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির সেচ ও নিকাশি সম্প্রসারণের দাবিতে রাজ্য কনভেনশন।*

২। *রঞ্জিত দত্ত কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত সারা ভারত কৃষকসভা কী ও কেন ?*

৩। *ধূসরমাটি, পঁচিশ বছর পূর্তি স্মারক সংখ্যা—বীরভূমের সেচব্যবস্থা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে।*

সাঁওতাল পল্লী, শান্তিনিকেতন

বীরভূমের কর্মসংস্থানে মৎস্য, প্রাণীসম্পদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম

শেখ ইসলাম

ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল স্তম্ভ হল কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। বর্তমানে জাতীয় অর্থ, শিল্প ও কৃষিনীতির কারণেও নানা সংকট দেখা দিচ্ছে। কর্মসংস্থানের সুযোগও কমছে। দেশের শতকরা মাত্র ২.৭ ভাগ জমি দেশের জনসংখ্যার ৮ শতাংশের বেশি ভার আমাদের রাজ্যকে বহন করতে হচ্ছে। এ ছাড়াও নগরোন্নয়ন ও অন্যান্য কারণে কৃষিজমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে। এর ফলে কৃষিতে কাজের সুযোগ কমছে। এই পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ গ্রামের মানুষের বিকল্প জীবিকার একটি প্রধান উৎস। এই উৎসকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষিকাজ, পরিবহন ছাড়াও দুধ উৎপাদন ও পুষ্টির জোগানে প্রাণী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গরিব মানুষের আর্থিক সচ্ছলতায় বেকারদের কর্মসংস্থানে, মহিলাদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রাণীসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ।
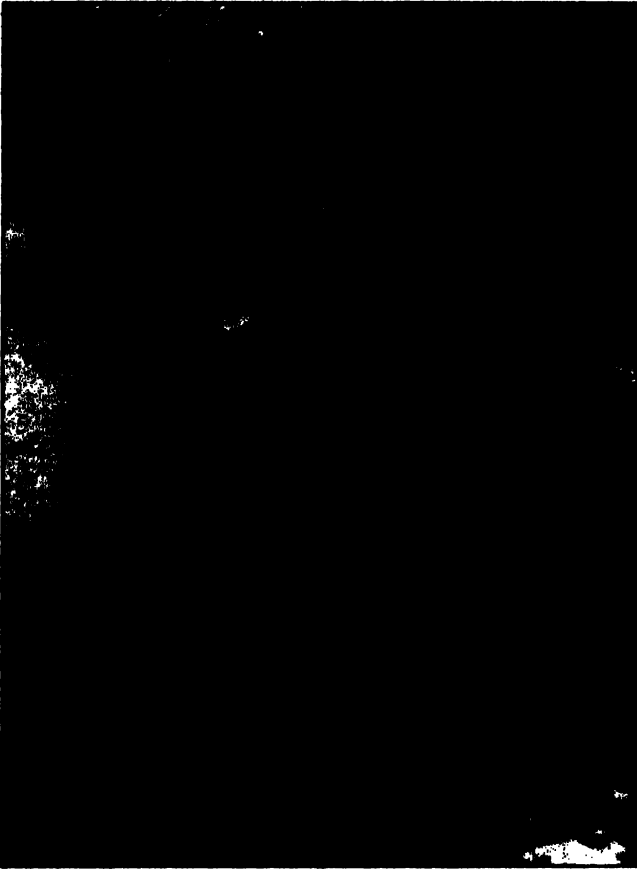
শূকর পালন

প্রাণীসম্পদ বিকাশের জন্য প্রধানত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও বিভাগীয় আধিকারিক এবং কর্মীদের ৫টি কাজে বিশেষ নজর দিতে হবে : (১) প্রাণী প্রজাতিগত মানোন্নয়ন, (২) পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান, (৩) প্রাণীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, (৪) পরিচালনা ও বিপণন ও (৫) প্রশিক্ষণ। প্রাকৃতিক কারণেই আমাদের রাজ্যে স্বীকৃত উন্নত জাতের প্রাণী নেই। ফলে উৎপাদনশীলতা কম। আমাদের সামনে বড়ো কাজ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উন্নত জাতের বেশি উৎপাদনক্ষম প্রাণীতে পরিণত করা। আমাদের লক্ষ্য, আগামী ৫ বছরে নিবিড় গো-প্রজনন কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্ত গরু-মহিষকে উন্নত প্রজননের আওতায় নিয়ে আসা। উন্নতমানের উৎপাদনে প্রয়োজন উন্নত পুষ্টিকর গো-খাদ্যের। প্রাণীদেহের পুষ্টি ও উৎপাদন ক্ষমতা সুনিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট মানের ও নির্দিষ্ট পরিমাণ সুষম খাদ্যও প্রয়োজন।

শুধু প্রাণীপালন নয়, প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিও নজর দিতে হবে। এজন্য রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার পরি-কাঠামোকে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। জেলা, ব্লক ও অতিরিক্ত ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়োগ করা হয়েছে প্রাণী বিকাশ সহায়ক। প্রাণী-রোগ প্রতিরোধ যাদের প্রধান কাজ। এ ছাড়া নিয়োগ করা হয়েছে প্রাণীবন্ধু, তাদের কাজ হচ্ছে কৃত্রিম গো-প্রজনন, প্রাথমিক প্রাণীস্বাস্থ্য পরিচর্যা, গো-খাদ্য উন্নয়ন প্রভৃতি পরিষেবা প্রাণী পালকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বীরভূম জেলায় ১৬৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২৫ জন প্রাণীবন্ধু কাজ করছে। ১২০ জন প্রাণী সহায়ক কাজ করে চলেছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশের সবচেয়ে বড়ো কাজ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ। এই লক্ষ্যে প্রত্যেকটি জেলায় গড়ে উঠেছে একটি করে বড়ো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বীরভূম জেলায় সিউড়ি ১নং ব্লকের বড়মহুলায় এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। গত আর্থিক বছরে ২০০৩-২০০৪ সালে এ জেলায় ২৫০৫ জন শিক্ষিত বেকার যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০০৪-২০০৫ সালে প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে দু দিনের এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে সাত দিনের প্রাণীপালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

প্রশিক্ষণের পর্যালোচনামূলক চিত্র

	লক্ষ্যমাত্রা	জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত হয়েছে	শতকরা
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে	৩৩৪০ জন	২০৪৮	৬৬ শতাংশ
পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে	৯৫০ জন	১৩৩৭	১৪১ শতাংশ
জেলা স্তরে	৫৩৫ জন	৪৩৮	৭৮ শতাংশ

এ ছাড়াও জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ ভবনে নিয়মিতভাবে হাস মুরগি পালন, গো-পালন, শূকরপালন ও ছাগপালনের এক মাসের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ সর্বস্তরের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের ভূমিকা

বর্তমানে এ রাজ্যে গ্রামীণ জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। স্বাভাবিকভাবেই স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রাণীসম্পদের কর্মসূচিকে সফল করতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আগামি পাঁচ বছরে প্রাণীসম্পদ বিকাশের জন্য পঞ্চায়েত থেকে যে কাজগুলি করা যেতে পারে—(ক) গ্রাম সংসদ স্তর থেকে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের তথ্য সংগ্রহ করা ও প্রাণীসম্পদ বিকাশের সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করা। (খ) প্রাণীসম্পদ কর্মসংস্থানের হাতিয়ার এই উপলব্ধি বা চেতনা গড়ে তুলতে গ্রাম সংসদ স্তরে সভা করা, আলোচনার ভিত্তিতে এস জি এস ওয়াই প্রকল্পে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের ওপর স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা। (গ) এলাকার বেকার আগ্রহী যুবক-

বীরভূম জেলায় প্রায় ৮ হাজার পুকুর আছে। বীরভূমে হ্যাচারি প্রায় নেই, বহরমপুর বাঁকুড়া হ্যাচারি থেকে ডিমপোনা আসে — সৌজন্যে, আনন্দবাজার/পার্থ দুবে

যুবতী এবং বিশেষ করে মহিলাদের চিহ্নিত করা এবং উৎসাহিত করা। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। (ঘ) প্রাণীস্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া। এ কাজে প্রাণী-বন্ধুদের পরিকল্পনামাফিক যাতে সদ্ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। (ঙ) নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করে যেসব এলাকায় হিমায়িত গো-বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, সেখানে আগামী পাঁচ বছরে ব্যবস্থা করতে হবে। (চ) গাভীপালন, হাঁস ও মুরগি, ভেড়া-ছাগল ও অন্যান্য পশুপালনের যে কর্মসূচি আছে তাকে আরও সুষ্ঠু ও দ্রুত রূপায়ণের চেষ্টা করতে হবে। (ছ) জেলার জলাশয়গুলির সংস্কার ও মাছচাষের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রকল্পগুলি রূপায়ণে প্রয়োজনীয় অর্থ

(১) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ ছোটো ছোটো গোষ্ঠী গঠন করে ডি আর ডি সি থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করার প্রচুর সুযোগ আছে। জেলায় মোট ২০৪৬টি গ্রুপ আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। (২) যারা দারিদ্র্যসীমার একটু উপরে তারা ৫-১০ জনের স্বনিযুক্ত প্রকল্পের গোষ্ঠী গঠন করে ব্যাঙ্ক বা নাবার্ডের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থ নিতে পারে। (৩) বেকার যুবক-যুবতীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। (৪) তপশিলি সম্প্রদায় ও আদিবাসী উদ্যোগীরা তপশিলি ও আদিবাসী বিত্ত নিগমের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। (৫) শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে। (৬) এ ছাড়া গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলি থেকেও আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। (৭) এস জি আর ওয়াই থেকে প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পঞ্চায়েত অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। উদ্যোগীদের জন্য ছোটো বাজারের পরিকাঠামো তৈরি করে দিতে পারে যা উদ্যোগীদের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কাজে লাগবে।

জেলায় মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা

জেলায় মৎস্য চাষের উপযোগী জলাশয় আছে ২১,৩৭৬ হেক্টর। এর মধ্যে খাস পুকুরের জলাশয় ২৪২২ হেক্টর। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর ১৭১৭৫ হেক্টর।

আমাদের পরিকল্পনার প্রথম কাজ হচ্ছে জলাশয়ের সদব্যবহার। দ্বিতীয় কাজ মাছচাষ বৃদ্ধি। তৃতীয়ত উন্নত প্রথায় বা বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি। চতুর্থত হাজামজা পুকুরগুলি সংস্কার করে মাছচাষের উপযোগী করে গড়ে তোলা। পরিশেষে স্থানীয় বাজারে মাছের চাহিদার কথা বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা।

জেলায় ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরে চাহিদা ছিল ২৯,১০০ মেঃ টন। উৎপাদন হয়েছিল ২১,০০০ মেঃ টন। ঘাটতি ছিল ৮,১০০ মেঃ টন। ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে চাহিদা বেড়েছে ৩০,৯০০ মেঃ টন। লক্ষ্যমাত্রা আছে ২৬,৫০০ মেঃ টন। ঘাটতি হবে ৪,৪০০ মেঃ টন।

জেলায় মাছের চাহিদা আছে, আরও বাড়বে—তাই মৎস্য চাষ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগও আছে। মাছচাষ বৃদ্ধির জন্য জেলার হাজামজা পুকুরগুলিকে সংস্কারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে সমস্ত পুকুর ব্যক্তিমালিকানাধীনে কিন্তু মাছচাষ হয় না ওই পুকুরগুলি স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যক্তি-উদ্যোগে মাছ- চাষের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে ব্যক্তি- মালিকানাধীন পুকুরগুলি পঞ্চা-য়েতের উদ্যোগে নিজ বন্দো-বস্তের ব্যবস্থা করা এবং স্বল্প-মেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা করা। এই প্রকল্পে চলতি আর্থিক বছরে ২৫০ হেক্টর পুকুরে মাছচাষ করা হয়েছে। আগামী ৫-৬ বছরে ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ হেক্টর করা হবে। এ ছাড়াও সরকারি খাস পুকুর, বড়ো জলাশয়-গুলিকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মাছচাষ করার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও দপ্তরের সহায়তায় সিউড়ি ১নং ব্লকের লম্বধরপুর সায়রে প্রায় ১৯ একর জলাশয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মাছচাষ শুরু করা হয়েছে। মাছচাষের সঙ্গে একটা হাঁসচাষের প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশে জেলার পরিকল্পনা

রাঙামাটির বীরভূম জেলায় কৃষির পাশাপাশি মৎস্য ও পশুপালন এক চিরাচরিত প্রথা। এ জেলায় কোনো বড়ো শিল্প গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থানের সুযোগও কম। তাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য ও প্রাণীপালন জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার শুধু পরিবর্তন ঘটাবে না, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে জেলার চাহিদামতো মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি পুষ্টির জোগান দিতে সাহায্য করবে।

যেখানে মানুষের গড়ে দৈনিক ২৮০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন সেখানে রাজ্যের মানুষ পান ১২০ গ্রাম। বীরভূমের মানুষ পান আরও কম, মাত্র ৮৬ গ্রাম। জেলার দুধের ও মাংসের চাহিদা মেটাতে উন্নত প্রথায় প্রাণীপালন ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

জেলার প্রাণিসম্পদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ

দেশি গবাদি প্রাণী ৯,৫৩,৩৯৩, সংকর গবাদি ৪৬,২০৮, মোট গবাদি প্রাণী ৯,৯৯,৬০১।

মহিষ	—	৬৬৮৯৫	ছাগল	—	৭২৮১০৬
ভেড়া	—	১৮৬২৮১	মুরগি	—	২৩০২৬৯০
হাঁস	—	১২৭৩৬৭৬	শূকর	—	৫৭৬৮০

বিশাল সংখ্যক দেশি প্রজাতির প্রাণীর কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে উন্নত প্রজাতির প্রাণীসম্পদ গড়ে তুলতে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে জেলার প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

> এ জেলায় কোনো বড়ো শিল্প গড়ে ওঠেনি। কর্মসংস্থানের সুযোগও কম। তাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য ও প্রাণীপালন জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার শুধু পরিবর্তন ঘটাবে না, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে জেলার চাহিদামতো মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি পুষ্টির জোগান দিতে সাহায্য করবে।

কৃত্রিম প্রজনন

উন্নত প্রজাতির গো-বীজের সাহায্যে দেশি গাভীকে প্রজননের মাধ্যমে সংকর বাছুর উৎপাদন করা যায়। দুধের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃত্রিম প্রজনন একটা প্রকৃষ্ট উপায়। জেলায় কৃত্রিম প্রজননের জন্য পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃত্রিম প্রজননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছর (২০০৩-২০০৪) কৃত্রিম প্রজনন হয়েছিল ৩৪৪৪৭টি, ২০০৪-২০০৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা হয়েছে ৪২০০০। জানুয়ারি ২০০৫ পর্যন্ত হয়েছে ৩৫২৫১। আশা করা যায় পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে দপ্তরের উদ্যোগ আমাদের জেলায় কৃত্রিম প্রজননে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। লাভপুর ব্লক জেলা স্তরে ১ম স্থান ও ইলামবজার ব্লক ২য় স্থান অধিকার করেছে।

সবুজ গোখাদ্য চাষ

উন্নতমানের প্রজাতির জন্য উন্নতমানের খাদ্য প্রয়োজন। প্রাণীর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও প্রাণীখাদ্য সুরক্ষার জন্য সবুজ ঘাসের চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জেলার কয়েকটি ব্লককে চিহ্নিত

বীরভূমের পোল্ট্রি শিল্প

করে সবুজ গোখাদ্য চাষের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও এবছর সারা রাজ্যে আমরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি তবুও আত্মসন্তুষ্টি নয়। আমাদের লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে সবুজ গোখাদ্য উৎপাদনে মুরারই ১নং ১ম স্থান, বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক ২য় স্থান অধিকার করেছে।

ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি

দেশি হাঁস ও মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা কম। সে ক্ষেত্রে খাকি ক্যাম্বেল হাঁস, আর. আই. আর মুরগি এই জলবায়ুর পক্ষে উপযুক্ত। ডিম ফুটিয়ে উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগির বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। ওই বাচ্চা কম দামে প্রাণীপালকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বড়মজলা ফার্মে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর জন্য ডি আর ডি সি-এর আর্থিক সহায়তায় ৫০০০ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইনকিউবেটার মেশিন বসানো হয়েছে। তাতে বাচ্চা ফোটানোর কাজ চলছে। জেলায় গত বছরে ১৩৩৮২টি মুরগির বাচ্চা সরবরাহ করা হয়েছে, যা চাহিদার তুলনায় কম। আগামী ২০০৫-২০০৬ আর্থিক বছরে জেলার চাহিদা পূরণ করতে আরও ৪টি ইনকিউবেটার মেশিন (প্রতিটি ৫০০০ ক্ষমতাসম্পন্ন) বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর জেলাভিত্তিক মূল্যায়নে সারা পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলা ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। আগামী দিনে আমাদের প্রয়াসকে আরও উন্নত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি

সুসংহত দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে জেলায় ৬০টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি আছে। গত বছরে ১৬টি সমবায় চালু ছিল, বর্তমানে ৩৮টি সমবায় কার্যকরীভাবে চলছে। ময়ূরাক্ষী দুগ্ধ উৎপাদক ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে সমিতিগুলি দুধ সংগ্রহ করে বোলপুর চিলিং প্ল্যান্টে পাঠানো হয়। দুগ্ধ উৎপাদকদের ন্যায্য দাম দিতে এই ইউনিয়ন কাজ করে চলেছে। গত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে সমিতিগুলির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বেড়েছে ৪৮.৬ ভাগ। দুধ সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে ৩৪ ভাগ। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদকদের ন্যায্য দামের সুযোগ বৃদ্ধি করতে আরও দুগ্ধ সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। ব্লকভিত্তিক ২টি করে সমবায় ২০০৪-২০০৫ সালের আর্থিক বছরে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। নিষ্ক্রিয় দুগ্ধ সমবায়গুলি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রাণীস্বাস্থ্য সুরক্ষার কর্মসূচি

জেলার প্রাণীসম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষা করার জন্য ৭টি রাজ্য প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৯টি ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৭টি অতিরিক্ত ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩টি সমবায়, ৩টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র ও বছরে একটি রোগ অনুসন্ধান কেন্দ্র ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। এ ছাড়া প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করে প্রাণী সহায়কের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা, টিকাদান ইত্যাদির কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে। এ ছাড়াও জেলার প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে গ্রাম গঞ্জে বিভিন্ন বিভাগীয় কেন্দ্রের সাহায্যে বিশেষ ক্যাম্প করে প্রাথমিক চিকিৎসা, টিকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। এই জেলায় ২০০৩-২০০৪ সালের এরূপ ৪৪২টি বিশেষ ক্যাম্প করা হয়েছে। প্রাণীস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য ৫০১টি বিশেষ শিবির করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। প্রাণীস্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে জেলায় ইলামবাজার ব্লক ১ম স্থান ও ময়ূরেশ্বর ১নং ও নলহাটি ২নং ব্লক ২য় স্থান অধিকার করেছে।

সার্বিক পরিকল্পনা

(১) কোটাসুরে ৪০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ক কুলার ২০০৪ সালের মধ্যে চালু করা হবে। ১১ মার্চ ২০০৫, বিভাগীয় মন্ত্রী আনিসুর রহমান উদ্বোধন করেছেন।

(২) বড়মহলায় বল্ক চিলিং প্ল্যান্ট এই আর্থিক বছরের মধ্যেই চালু করা হবে।

(৩) নলহাটি ১নং ব্লকে ৪০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ক কুলার স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) বোলপুর চিলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ৪০০০ লিটার বৃদ্ধি করে ১০০০০ লিটার করা হবে।

জেলায় প্রাণীসম্পদ বিকাশের সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে ও পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করতে জেলায় প্রাণীসম্পদের ওপর (সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে জোর দিতে হবে। জেলায় বর্তমানে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে মোট ৩৫১১টি। এর মধ্যে প্রাণীসম্পদের ওপর ২৩৮৩টি। মোট গোষ্ঠীর শতকরা ৬৮ ভাগ, যা গ্রেড ওয়ান ভুক্ত। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্লকে অনেক গ্রুপ গড়ে উঠছে। এই আর্থিক বছরের মধ্যেই আরও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের মাধ্যমে জেলায় প্রাণীসম্পদ বিকাশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগতে হবে যার মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ঘটবে।

কর্মসংস্থানে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধানসভায় গৃহীত ডব্লিউ বি এম ডি এফ সি অ্যাক্ট ১৯৯৫-এর আদেশবলে ১৯৯৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য মূলত ধর্মীয় সংখ্যালঘু পাঁচটি জাতি (মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও পারসিক) নিয়ে কাজ শুরু করে। এই কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য হল :

১। স্ব-নিযুক্ত ব্যবসা উন্নয়নের জন্য ঋণ (কম সুদে সাড়ে ছয় শতাংশ বাৎসরিক)।

২। স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের উন্নতির লক্ষ্যে সঠিক ব্যবসায়ী নির্বাচন।

৩। স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঠিক দামের সঠিক জিনিস সঠিক জায়গা থেকে কেনার ব্যবস্থা করা।

৪। স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতার বৃদ্ধিকরণ।

৫। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণের নিমিত্ত নিজেদের অনুমোদিত প্রকল্পগুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ মন্ত্রকের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ বাবদ যে অর্থ পায় তার উপর ভিত্তি করেই চলে। কোন ব্যবসায় ঋণদানের ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ঋণ এবং ১০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত ঋণ এবং ৫ শতাংশ নির্দিষ্ট ঋণ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে W.B.M.D.F.C. কেন্দ্রীয় সরকারের N.M.D.F.C.-এর SCA (STATE CHANELLIG AGENCY) বা সহকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম (WBMDFC) অর্থকরী ভাবে লাভজনক যে কোনও প্রকল্পকে অনুমোদন দিতে পারে যাতে করে সংখ্যালঘু মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবসার মূলত চারটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১। ছোট ছোট ব্যবসা। পোষণমূলক ব্যবসা। (Service Sector)

২। কৃষি এবং কৃষিজাত সামগ্রীর ব্যবসা।

৩। ক্ষুদ্রশিল্প ও হস্তশিল্প।

৪। পরিবহন ক্ষেত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের অধীন বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প :

১। **টার্ম লোন বা মেয়াদী ঋণ প্রকল্প** : এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে যে কোন সংখ্যালঘু মানুষ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন। ঋণের শর্তগুলি হল—(ক) প্রার্থীকে নিজস্ব এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। (খ) অবশ্যই স্বাক্ষর হতে হবে। (গ) বাৎসরিক পারিবারিক আয় ৩৯,৫০০ টাকা (গ্রামীণ এলাকার জন্য) এবং ৫৪,৫০০ টাকা (শহর এলাকার জন্য) হতে হবে। (ঘ) যে প্রকল্পের জন্য ঋণ চাইবেন সেই প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে। (ঙ) কোন সরকারি ব্যক্তিকে যার বয়স ৫৩ বছর সেই ব্যক্তি জামিনদার হতে হবে। এক্ষেত্রে লোনের পরিমাণ সর্বাধিক ১ লাখ টাকা। প্রার্থীকে বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ হারে ২০টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৫ বছর ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ১ লাখ টাকার উপর যে কোন ঋণ N.M.D.F.C.-এর অনুমোদনক্রমে দেওয়া হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম (WBMDFC) অর্থকরী ভাবে লাভজনক যে কোন প্রকল্পকে অনুমোদন দিতে পারে যাতে করে সংখ্যালঘু মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

২। **CLUSTER LOAN বা গুচ্ছ ঋণ প্রকল্প** : কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যেখানে সংখ্যালঘু মানুষ বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন এবং বেশিরভাগ মানুষ ব্যবসায় নিযুক্ত সেইরকম জায়গাকে জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন কমিটি দ্বারা নির্বাচন করা হয়। এছাড়া জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের যুগ্ম সহযোগিতায় ওই এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিনা জামিনদারে ৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। **MICRO CREDIT LOAN (ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প)** : সংখ্যালঘু মানুষ যারা খুবই ছোট ছোট ব্যবসায় যুক্ত আছেন তাদের অর্থনৈতিকভাবে আরো উন্নত মানে পৌঁছানোকে সুনিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে N.G.O.-এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বাধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নানা ধর্ম, নানা বর্ণের, নানা ভাষার মানুষের বসবাস এদেশে। ধর্মের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের মানুষ যেমন বাস করেন, তেমনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথা—মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, পারসিক, বৌদ্ধ ধর্মের মানুষও বসবাস করেন। তাই আমাদের দেশের সংখ্যালঘু মানুষের উন্নতির অন্যতম শর্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ গড়ে তোলা।

দেশের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলির সাংবিধানিক কর্তব্য হচ্ছে সংখ্যালঘু মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার পরিবেশ, ধারাবাহিকভাবে বিকাশের ফলেই তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বা অধিকার বোধের বিস্তার ঘটেছে। ঘটেছে শিক্ষার বিস্তার। এ রাজ্যে নারী শিক্ষার বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেড়েছে। মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ রাজ্যে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ভাল ফলাফল করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা। সার্বিকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ বাড়ার ফলে তাদের কর্মসংস্থান বা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বনের প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো ও নয়া অর্থনীতির ফলে গত এক দশকে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরসহ শিল্প কলকারখানার কর্মসংস্থানের সুযোগ কমেছে। তাই স্ব-নিযুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বনের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

এ রাজ্যে ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রামের ক্ষেতমজুর বর্গাদার গরিব কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। এর ফলে বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাব পড়ছে। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র কুটির ও শিল্প। গড়ে উঠেছে নানা প্রশিক্ষণকেন্দ্র। জন্ম হয়েছে নানা পেশার। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের এক একটি বিশেষ পেশাগত উৎকর্ষতা বা দক্ষতা রয়েছে। সংখ্যালঘুদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম।

আমাদের রাজ্যে রাঢ় বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা বীরভূম। এ জেলার পশ্চিম দিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য, পূর্ব ও উত্তরপূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। ওই জেলা সংখ্যালঘু প্রধান। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে শিল্পে উন্নত বর্ধমান জেলা অবস্থিত। বীরভূম মূলত কৃষিপ্রধান ও শিল্পে অনুন্নত জেলা। ১০৬৪টি ক্ষুদ্র শিল্প আছে। ৯৪৭৬ জন কাজ করে। ২০০১

সালের জন গণনায় জেলার মোট লোকসংখ্যা ৩০,১৫,৪২২ জন। ৩৩.০৬ ভাগ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যা জেলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। জেলাস্তরে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ সমিতি আছে। ওই কমিটির চেয়ারম্যান সভাধিপতি, জেলা পরিষদ। জেলা স্তরে বিত্তনিগমের নিজস্ব কোন পরিকাঠামো নেই।

জেলায় সংখ্যালঘুদের ঋণ আর্থিক সহায়তার পরিসংখ্যান টার্ম লোন (Term Loan)

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	১৯৯৭-১৯৯৮	৪৭ জন	২৯.৮২ লাখ টাকা
২	১৯৯৮-১৯৯৯	১২ জন	৭.১১ লাখ টাকা
৩	১৯৯৯-২০০০	৯২ জন	৪৪.১১ লাখ টাকা
৪	২০০০-২০০১	২১৯ জন	১৩৮.১০ লাখ টাকা
৫	২০০১-২০০২	৩৩৬ জন	১৩৯.০০ লাখ টাকা
৬	২০০২-২০০৩	৩৭৪ জন	১৩৫.০০ লাখ টাকা
৭	২০০৩-২০০৪	৩৭৩ জন	১৪০.০০ লাখ টাকা
৮	২০০৪-২০০৫	৪৬০ জন	৩০০.০০ লাখ টাকা
	মোট	১৯১৩ জন	৯৩৩.১৪ লাখ টাকা

রাঢ় বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলো বীরভূম। এ জেলোর পশ্চিম দিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য, পূর্ব ও উত্তরপূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলো অবস্থিত। ওই জেলো সংখ্যালঘু প্রধান। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে শিল্পে উন্নত বর্ধমান জেলো অবস্থিত। বীরভূম মূলত কৃষিপ্রধান ও শিল্পে অনুন্নত জেলো। ১০৬৪টি ক্ষুদ্র শিল্প আছে। ৯৪৭৬ জন কাজ করে। ২০০১ সালের জন গণনায় জেলোর মোট লোকসংখ্যা ৩০,১৫,৪২২ জন। ৩৩.০৬ ভাগ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যা জেলোর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

ক্লাস্টার লোন

ক্রমিক সংখ্যা	সাল	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	সিউড়ি পৌরসভা	২৬৮ জন	৩২,৩৯,০২৫ টাকা
২	রামপুরহাট পৌরসভা	১১৪ জন	১৪,০৩,৬২৫ টাকা
৩	মুরারই গ্রামপঞ্চায়েত		
৪	মাড়গ্রাম গ্রামপঞ্চায়েত	২৪১ জন	২৮,৯১,৩২৫ টাকা
৫	ইলামবাজার গ্রামপঞ্চায়েত	৯৪ জন	১৩,০৪,৮২৫ টাকা
৬	দুবরাজপুর পৌরসভা	৮৪ জন	১০,৫১,১৭৫ টাকা
৭	নলহাটি পৌরসভা	১৬৫ জন	২১,৮৩,১০০ টাকা
৮	পাকুই গ্রামপঞ্চায়েত	১০৭ জন	১,৪৪,০০০ টাকা
৯	মল্লারপুর গ্রামপঞ্চায়েত	৬৬ জন	১০,১০,০০০ টাকা
১০	জয়দেব গ্রামপঞ্চায়েত	১০০ জন	১৩,৩৪,০০০ টাকা
১১	২০০৪-২০০৫ (আর্থিক বছরে টার্ম ও ক্লাস্টার ঋণ)	১১৯৬ জন	১,০০,০০,০০০ টাকা
	মোট	২৪৩৫ জন	২,৫৮,৫৭,০০০ টাকা

জেলায় ৪৩৪৮ জনকে ১১ কোটি ৯১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ঋণের আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। ৪৩৪৮ জন যেমন স্বাবলম্বী হয়েছে, অন্যদিকে তাদের অধীনে ৬৩৮৫ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। বিত্তনিগম স্ব-নিযুক্তির কাজে যুক্ত বা উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

স্বাবলম্বীদের সংক্ষিপ্ত চিত্র

১। মুরারই-এর বাসিন্দা খন্দেকর সারিদুর রহমানের কন্যা খন্দেকর হাসিনা বেগম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম থেকে ঋণ গ্রহণের পূর্বে বাড়ি বাড়ি শাড়ি ও মেয়েদের পোশাক বিক্রয় করে মাসে প্রায় ১০০০ টাকা রোজগার করত। ২০০২ সালের মার্চে বিত্তনিগম থেকে ৩৮,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুরারই বাজারে সাজঘর নামে একটি মনহারীর দোকান করে। ঘর ভাড়া বাবদ ৭৭৫ টাকা (মাসিক) দিয়েও বর্তমানে তার মাসিক রোজগার ২৫০০ টাকা। অতিরিক্ত আয়ের জন্য সে তার দোকানে একটি পে-ফোন রেখেছে। এর থেকে মাসে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা অতিরিক্ত আয় হয়।

এই সফল মহিলা উদ্যোগী মাসে ৩০০০ টাকার বেশি আয় করে স্বাবলম্বী হয়েছে।

২। মুরারই-এর বাসিন্দা সর্দার গুরবচ্চন সিং-এর পুত্র সর্দার অরবিন্দ সিং একজন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। অরবিন্দ স্টোর কাপড় দোকানের মালিক। তার বাবা প্রথমে ৪০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি মাটির ঘরে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। দুর্ভাগ্যবশত ২০০০ সালে বন্যায় দোকান ভেঙে যায়। ফলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। কোনরকম একটি বাড়ি তৈরি করেন। কিন্তু অর্থের অভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারেননি। সর্দার সিং ২০০০-২০০১ সালে ২০,৯০০ টাকা স্বল্পমেয়াদী ঋণ পান এবং ব্যবসা পুনরায় শুরু করেন। এখন তার মাসিক আয় ২৫০০-৩০০০ টাকা। দোকানে মজুত মালের পরিমাণ, বেচা-কেনাও বেড়েছে।

৩। আব্দুর রকিব, পিতা আব্দুল আলিফ, সিউড়ি সোনাতোর পাড়া, বীরভূম। সে সিউড়ির হেদায়েৎতুল্লা বাজারে ৩৫০ টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি ঘর নিয়ে প্রাথমিক মূলধন ২৫০০০ টাকা দিয়ে সিউড়ি মেডিক্যাল নামে একটি খুচরো ওষুধের দোকান খোলেন। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম উক্ত দোকানের কলেবর বৃদ্ধির জন্য ৮১,৭৫০ টাকা মেয়াদী ঋণ অনুমোদন করেন। বর্তমানে সে পাঁচজন বেকার যুবককে ৪০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত বেতন দিয়ে কর্মসংস্থান করেছেন। তার মাসিক আয় ৭০০০ টাকা এবং মূলধন প্রায় দুই লাখ টাকা। এই উদ্যোগ নিয়ে সে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছে শুধু তাই নয় পাঁচজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান করে দিয়েছে যা এক অনন্য নজির বা জ্বলন্ত উদাহরণ।

৪। সিউড়ি সোনাতোর পাড়ার মহঃ তারিক, পিতা আসাদ আলি। সে একটি দোকানঘর মাসিক ২৭৫ টাকা হারে ভাড়া নিয়ে দ্বিচক্রযানের যন্ত্রাংশের দোকান করে। সে ১৯৯৯-২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম থেকে ৩৮,০০০ টাকা মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে এবং ২০০১ সালের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে। ২০০১ সালে পুনরায় তাকে ৭৫,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৫,০০০ টাকা এবং তিনি তিনজন দৈনিক ৬০ টাকা থেকে ৮০ টাকা মজুরি দিয়ে দ্বিচক্রযানের মেরামতির ব্যবসা করেন।

জেলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ জেলায় বিত্তনিগম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪৩৪৮ জন উদ্যোগীকে মোট প্রায় ১২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয় ৬৩৮৬ জন বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে রোজগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। একথা মাথায় রেখেই মোট উদ্যোগীর তিন ভাগের এক ভাগ মহিলা উদ্যোগীকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাবলম্বী মহিলাদের পারিবারিকও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামি দিনে আরও বেশি করে মহিলা উদ্যোগীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ১১৯৬ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে।

বিরাট অঙ্কের টাকা জেলার বাজারে লেনদেন করার ফলে অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে। জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। একথা মাথায় রেখেই মোট উদ্যোগীর তিন ভাগের এক ভাগ মহিলা উদ্যোগীকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাবলম্বী মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামি দিনে আরও বেশি করে মহিলা উদ্যোগীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ১১৯৬ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। মার্চ ২০০৫-এ ঋণপত্র তুলে দেওয়ার আশা রাখছি। অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে এ জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মানুষের আর্থিক উন্নয়ন যেমন ঘটছে তেমনি তাদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ গড়ে উঠছে, যা আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করছে।

লেখক : কর্মাধ্যক্ষ, বীরভূম জেলা পরিষদ

আকালিপুর মন্দির

মতিচুর মসজিদ (রাজনগর)

সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

আমার কুটির, শান্তিনিকেতন, বাটিক শিল্প — ছবি : পাপান ঘোষ

বীরভূমের স্বনির্ভর গোষ্ঠী—একটি প্রতিবেদন

সৌরকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমবায় নীতি প্রবন্ধে বলেছেন—'মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্রে বাস করতে চায়। একলা মানুষ কখনও পূর্ণ মানুষ হতে পারে না, অনেকেরই যোগে তবে নিজেকে ষোল আনা পেয়ে থাকে। দল বেঁধে থাকা দল বেঁধে কাজ করা মানুষের ধর্ম বলেই সেই ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পালন করা মানুষের কল্যাণ, তাঁর উন্নতি।' স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনায় এই দল বেঁধে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম রোজগার যোজনা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। এই প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষকে সরকারি সহায়তা দানের মাধ্যমে দারিদ্র্যরেখার নিচে থেকে উপরে তুলে আনা। ১৯৯৯-র পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজ করার চেষ্টা করেন। সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে একলা মানুষের উন্নতি সাধনে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল না মেলায় স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনায় দল বেঁধে কাজ করার উপরে গুরুত্ব

রেশমের শাড়িতে বাটিকের কাজ ছবি : মানস দাস

আরোপ করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে ন্যূনতম ১০ জন মিলে একটি দল গঠন করতে হবে। এই দলটির প্রত্যেকে প্রতিমাসে ন্যূনতম ১০ টাকা জমা করবেন। প্রত্যেকে টাকা জমা দেওয়ার ফলে দলের কাছে প্রত্যেকেরই একটা দায়বদ্ধতা থাকছে। দলটিকে সরকারি খাতায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ছমাস বাদে দলটির কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেলের পক্ষ থেকে দলটিকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হবে। সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনায় গুরুত্বের জায়গাটা ব্যক্তি মানুষ থেকে দল বেঁধে কাজ করার দিকে সরে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বছরে স্বনির্ভর দল গঠনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রত্যেকটি জেলায় স্বনির্ভর দল গঠনের কাজ সমানভাবে না এগোলেও পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর দলের সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বীরভূম জেলাতেও এস.জি.এস.ওয়াই প্রকল্পের অধীনে সাড়ে তিন হাজারের অধিক স্বনির্ভর দল তৈরি হয়েছে। বীরভূমের ১৯টি ব্লকের সর্বাপেক্ষা বেশি দল গঠিত হয়েছে লাভপুর ব্লকে ৪৫৬টি দল এবং সর্বাপেক্ষা কম দল গঠিত হয়েছে ৮৫টি, রামপুরহাট ১নং ব্লকে দ্রষ্টব্য—সারণি-১। একটি স্বনির্ভর দল গঠন হওয়ার ছয়মাস পর কাজের মূল্যায়ন করা হয়। ছয় মাসের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দলগুলিকে জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেল ও ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করা হয়। এই অর্থের পরিমাণ প্রকল্প অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়। তবে একটি দল ন্যূনতম ৫০০০.০০ টাকা পান। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দলগুলিকে অনুদানের চারগুণ অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়। ছমাস বাদে পুনরায় দলগুলির কাজ পর্যালোচনা করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা অবধি হতে পারে। এইভাবে দলগুলিকে গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ, পরামর্শদানের মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সার্বিক সহায়তার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে বীরভূম জেলায় ৩৮২টি স্বনির্ভর দলকে মোট ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা গ্রাম উন্নয়ন সেলের পক্ষ থেকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২০৪৬টি দলকে আবর্তিত তহবিল (Revolving Fund) দেওয়া হয়েছে ১১.২ কোটি টাকা। স্বনির্ভর দলগুলি যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রোজগারের পথ বেছে নিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

(১) ধান, (২) ক্ষুদ্রসেচ, (৩) সব্জি ও মাশরুম চাষ, (৪) ডেয়ারি, (৫) ছাগপালন, (৬) ব্রয়লার মুরগি পালন, (৭) হাঁস পালন, (৮) শূকর পালন, (৯) মৎস্য চাষ, (১০) তাঁত শিল্প, (১১) হাঁড়ির কাজ, (১২) কাঁথা-স্টিচ্, (১৩) বাটিকের কাজ, (১৪) চর্মশিল্প, (১৫) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, জ্যাম, জেলি, আচার, পাঁপড় প্রভৃতি, (১৬) সব্জি বিক্রি, (১৭) শালপাতার থালা, (১৮) রেশম শিল্প, (১৯) শোলার কাজ, (২০) গুঁড়ো সাবান তৈরি, (২১) চানাচুর তৈরি, (২২) খেলনা তৈরি, (২৩) ফিনাইল তৈরি।

এর মধ্যে প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ ছাগল, হাঁস, শূকর পালন ও ডেয়ারি প্রভৃতি রোজগারের পথ বেছে নিয়েছেন স্বনির্ভর দলগুলির ৫৫ শতাংশ। অন্যান্য ব্যবসার মধ্যে রেশম শিল্প উল্লেখযোগ্য। মোট দলের ১৫ শতাংশ এই ব্যবসাটিকে বেছে নিয়েছেন। এর বাইরে ধান প্রক্রিয়াকরণ উল্লেখযোগ্য। ধান প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে ১০ শতাংশ দল রোজগার-এর পথ বেছে নিয়েছে।

এই স্বনির্ভর দলগুলি যাতে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারেও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বীরভূমের গ্রাম উন্নয়ন সেল। শুধু বীরভূমের বিভিন্ন মেলাতেই নয়, এই দলগুলি
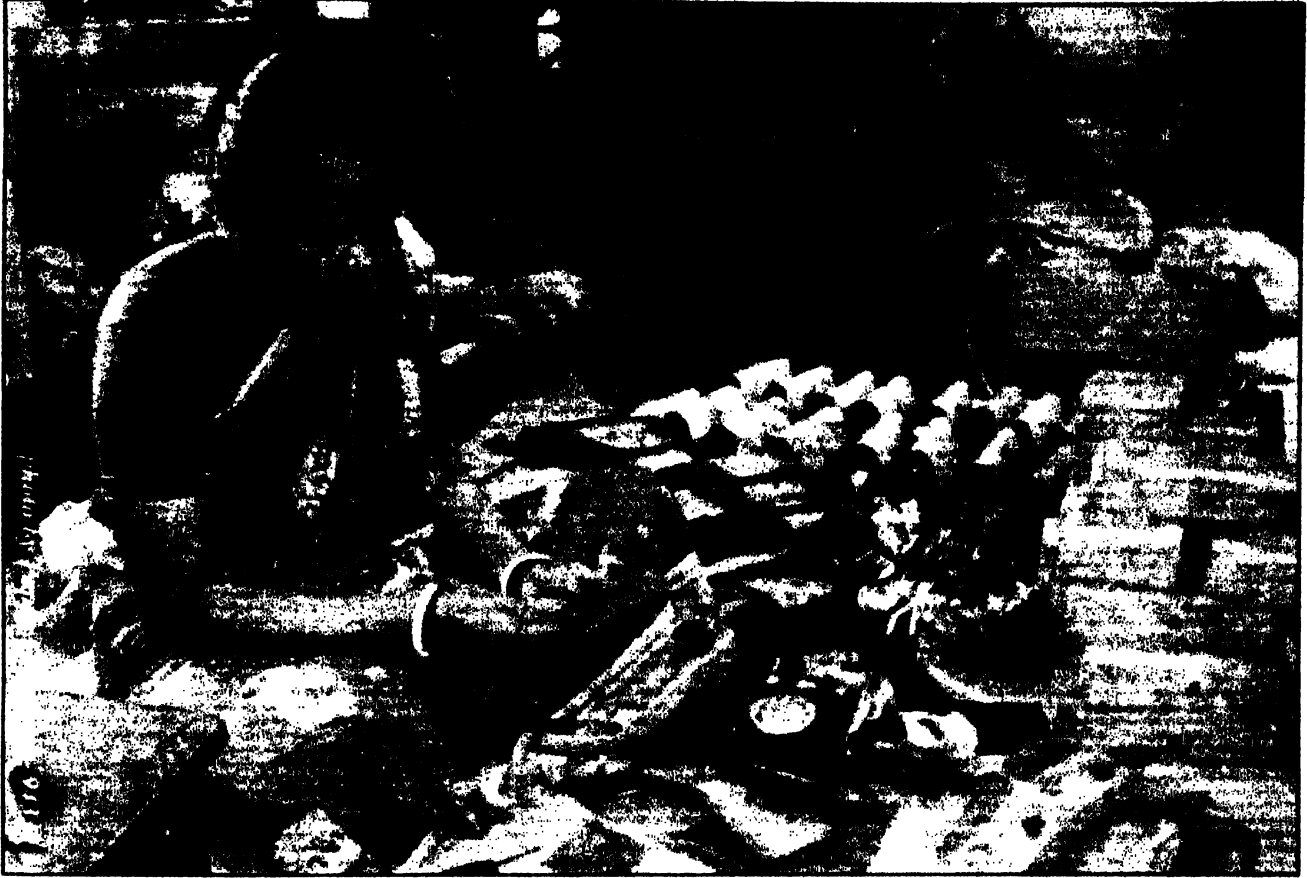
আমার কুটিরে কর্মরত মহিলা হস্তশিল্পী

ছবি : পাপান ঘোষ

কলকাতা সহ, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দিল্লি, মুম্বাই, লক্ষ্ণৌতেও যান তাদের তৈরি শিল্প-সামগ্রী নিয়ে। এক্ষেত্রে দলগুলির যাতায়াতের খরচ বহন করে গ্রাম উন্নয়ন সেল। তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ও খাবার জন্য তাদের দৈনিক ভাতা দেওয়া হয়। বিগত ২০০৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস অবধি মোট ১৯টি মেলাতে দলগুলি অংশগ্রহণ করেছে। এই ১৯টি মেলার মধ্যে ৫টি মেলা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, দিল্লি, বম্বে এবং লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তিনটি মেলাতে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৬২ টাকার শিল্পসামগ্রী দলগুলি বিক্রি করেছে। দিল্লির প্রতিটি মেলায় ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে। মুম্বই এবং লক্ষ্ণৌতে বিক্রির পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। এখানেও ২৪টি দল অংশগ্রহণ করেছে। কলকাতাতে তিনটি মেলায় বিক্রির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৪ টাকা। তবে কলকাতাতে দলগুলি অনেক বেশি শিল্পসামগ্রী নিয়ে গিয়েছিল। দিল্লিতে দলের সংখ্যা অনেক কম ছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে দিল্লির বাজারে দলগুলির তৈরি শিল্পসামগ্রীর চাহিদা কলকাতা থেকে বেশি। বীরভূমের মধ্যে শান্তিনিকেতন পৌষ মেলাতে সর্বাপেক্ষা বেশি দল অংশগ্রহণ করেছে এবং পৌষমেলাতে বিক্রির পরিমাণও বীরভূমের অন্যান্য মেলার চেয়ে অনেক বেশি। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিগত ১ বছরে ১৯টি মেলায় ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১২৩ টাকার শিল্পসামগ্রী গোষ্ঠীগুলি বিক্রি করেছে। দ্রষ্টব্য—সারণি-১

সম্প্রতি বীরভূম জেলার গ্রামীণ উন্নয়ন সেল মহিলা দলগুলির হাতের কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশান টেকনোলজির সঙ্গে তিন বছরের জন্য ৬৭ লক্ষ টাকার একটি চুক্তি করেছে। এই চুক্তি অনুসারে উল্লিখিত ইনস্টিটিউটটি ২১টি দলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন রীতির নক্সা তৈরির কাজে পারদর্শী করে তুলছে। কাঁথা সেলাই, বাটিকের কাজ, শোলার কাজ, ম্যাকরনের গয়না এবং টেরাকোটা এই কয়টি বিষয়ে এখন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২১টি দলকে বছরে ৫ বার ২১ দিনের জন্য এই চুক্তি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখন অবধি ৮টি প্রশিক্ষণ

সারণি—১

ক্রমিক নং	মেলার নাম	তারিখ	মোট দিন	মোট স্বনির্ভরগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ	মোট বিক্রয় (টাকা)
(১)	সারস (দিল্লি হাট)	১৬.০৮.০৩ থেকে ৩১.০৮.০৩	১৬	১১	১১০০০০
(২)	হস্তশিল্প মেলা (কলকাতা)	০৭.১১.০৩ থেকে ১৩.১২.০৩	২৪	১২	২২০০০
(৩)	আই আই টি এফ-২০০৩ (প্রগতি মেলা)	১৪.১১.০৩ থেকে ২৯.১১.০৩	১৬	১১	৯০৬৩৭
(৪)	শান্তিনিকেতন "পৌষ মেলা"	২৩.১২.০৩ থেকে ২৬.১২.০৩	৪	৩৫	১৮৫৬৭৮
(৫)	বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ গ্রামীণ শিল্প মেলা	০২.০১.০৪ থেকে ০৭.০১.০৪	৬	১৫	৩৩৬৯২
(৬)	জয়দেব মেলা	১৫.০১.০৪ থেকে ১৯.০১.০৪	৫	২৩	২৩০৩৬
(৭)	মাঘ মেলা (বোলপুর-শান্তিনিকেতন)	০৬.০২.০৪ থেকে ০৮.০২.০৪	৩	১০	৫৭৯২৬
(৮)	বসন্ত উৎসব (বোলপুর-শান্তিনিকেতন)	০৫.০৩.০৪ থেকে ০৭.০৩.০৪	৩	১৪	৪৯৫০০ ১৫৬৫০
(৯)	আঞ্চলিক সারস (দিল্লিহাট)	০১.০৪.০৪ থেকে ১৫.০৪.০৪	১৫	১৪	১১২৪২৫
(১০)	জল দিবস উপলক্ষে মেলা	৩০.০৬.০৪ থেকে ০১.০৭.০৪	২	১০	১২৬৪৫
(১১)	প্রদর্শনী ও মেলা মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া	৩০.০৮.০৪ থেকে ১০.০৯.০৪	১২	২০ গ্রুপ	৩৬০৭৯৯
(১২)	আই আই টি এফ-২০০৪ (প্রগতি ময়দান)	১৪.১১.০৪ থেকে ২৭.১১.০৪	১৪	১১	১৩৮২৯১
(১৩)	শান্তিনিকেতন পৌষমেলা	২৩.১২.০৪ থেকে ২৬.১২.০৪	৪	৩০ গ্রুপ	৩০৯৯১৩
(১৪)	মুম্বাই সারস	১৪.১১.০৪ থেকে ২৭.১১.০৪	১৩	১২	৪১৯৭১
(১৫)	জয়দেব মেলা	১৪.০১.০৫ থেকে ১৭.০২.০৫	৪	১০	৩১৬৫০
(১৬)	মাঘ মেলা (বোলপুর-শান্তিনিকেতন)	০৬.০২.০৫ থেকে ০৮.০২.০৫	৩	২০	৬০৭৫০
(১৭)	লখনউ সারস	০৫.০২.০৫ থেকে ১৬.০২.০৫	১১	৮	২৩৫৯৫
(১৮)	হেতমপুর সরস্বতী মেলা	১৩.০২.০৫ থেকে ১৭.০২.০৫	৫	৫	২০১৫০
(১৯)	হস্তশিল্প এক্সপো (কলকাতা)	১৫.০২.০৫ থেকে ০৭.০৩.০৫	২১	১৬	৭৫৮১৫
	মোট—সতের লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত তেইশ টাকা				১৭৭৬১২৩

ছাগপালনের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতা অর্জন

শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিন বছরে যে সমস্ত শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, পরবর্তীকালে তারাই মাস্টার ট্রেনার হিসেবে জেলার অন্যান্য দলগুলিকে প্রশিক্ষিত করে তুলবেন।

এছাড়াও জেলাতে দুটি কম্পিউটারের মাধ্যমে নক্সা শেখানোর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। একটি বোলপুরে অপরটি নলহাটিতে। এই কেন্দ্রগুলিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে উন্নতমানের নক্সা তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, যাঁরা হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁরা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কথা ভেবেই এই কেন্দ্র দুটি গঠিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় নক্সাযুক্ত শিল্পসামগ্রী তৈরি করে মেলায় বিক্রি করেছেন। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত মেলাগুলিতে তাঁদের বিক্রির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রশিক্ষণের ফলে তাঁদের শিল্পসামগ্রীর চাহিদার পথ অনেক প্রশস্ত হয়েছে।

এস জি এস ওয়াই প্রকল্পের বাইরে নাবার্ডের সহযোগিতায় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, গ্রাম পঞ্চায়েত ও এন জি ও-র যৌথ উদ্যোগে এখনও অবধি ৫৮৭১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। এই ৫৮৭১টি গোষ্ঠী বীরভূমের বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলিতে তাঁদের সঞ্চিত অর্থ মজুত রেখেছে এবং তিন হাজার আঠাশটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাঙ্কের কাছে থেকে ঋণ পেয়েছে। এই ঋণের অঙ্ক ১২ কোটি টাকারও অধিক। বীরভূমের মোট ১২টি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সহ ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক এই গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ দিয়েছে। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক সবথেকে বেশি গোষ্ঠীকে ঋণ দিয়েছে। এর সংখ্যা ২৭৫। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি সর্বমোট ৫৬০টি গোষ্ঠীকে ঋণ দিয়েছে। সেখানে ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক মিলে ২৯৬৮টি গোষ্ঠীকে ঋণ দিয়েছে। এর মধ্যে ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একলাই ১৯৮৪টি গোষ্ঠীকে ঋণ দিয়েছে। এই ঋণের পরিমাণ ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ মোট ১২ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে ৬৬ শতাংশ-এর বেশি। ১২টি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার কিছু অধিক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শ্রীনিকেতন ব্রাঞ্চটিকে নাবার্ড Self help promoting Unit বলে ঘোষণা করেছে। এই ব্রাঞ্চটির উদ্যোগে বোলপুর শ্রীনিকেতন অঞ্চলে ২৭৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ২৬০টি গোষ্ঠী
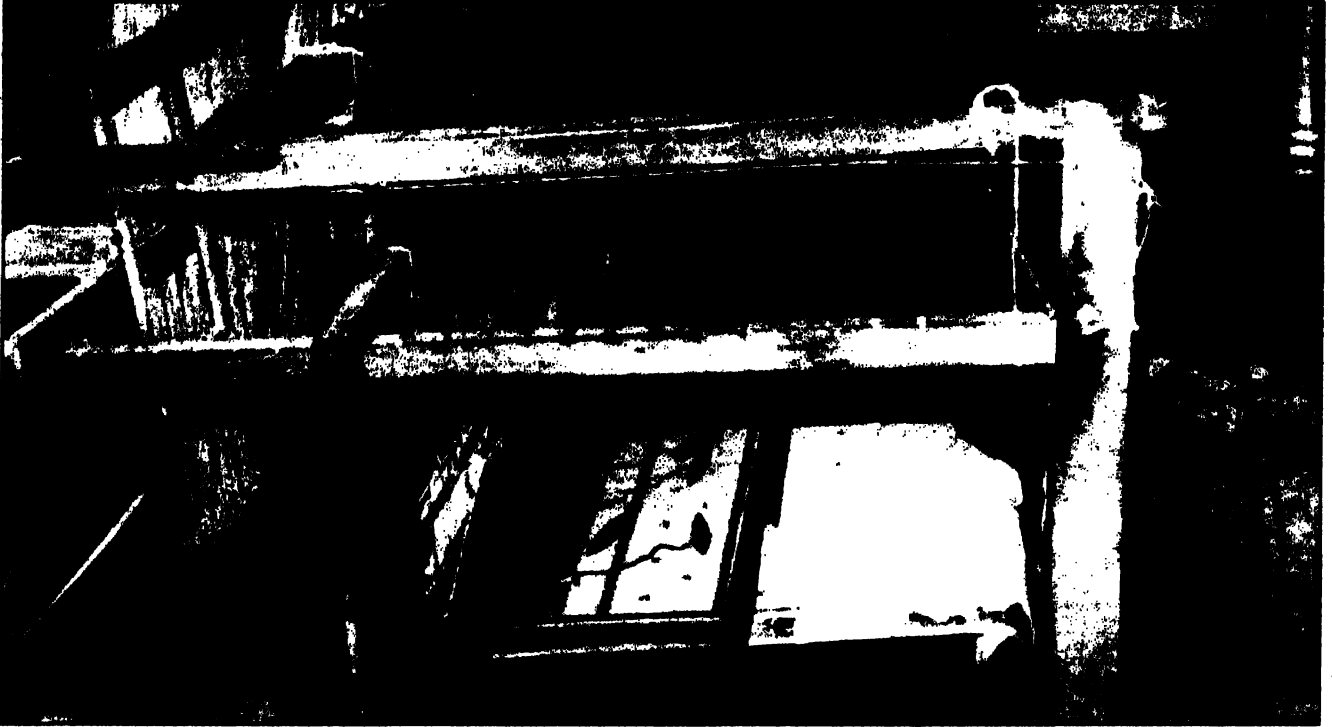
সিল্কের শাড়ি তৈরি করছেন শিল্পী ছবি : মানস দাস

ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৩৩ লক্ষ টাকা সঞ্চিত রেখেছে। এবং এই ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্কটি এখনও অবধি ২২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২½ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ময়ূরাক্ষী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১০০ শতাংশ।

বীরভূমের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রামপুরহাট ২নং ব্লকের ভূমিহীন শ্রমিকরা অত্যন্ত দরিদ্র। রামপুরহাট ২নং ব্লকের ভূমিহীন পরিবারের মহিলারা (যাঁদের মধ্যে ৪ জন তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত) ১৯৯৭ সালে অভ্যর্থনা নামে একটি স্বনির্ভর দল গঠন করে। এই দলটি গঠনের সময় দলের সদস্যদের মাসিক আয় ছিল মাত্র ৩৫০ টাকা। তখন নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁদের দিন কাটত। জেলা গ্রাম উন্নয়ন সেল-এর সহায়তায় এই দলটি ইম্যুনাইজেশন, রক্তদান শিবির প্রভৃতি কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তাঁরা রেশম শিল্পের ব্যবসা শুরু করে। জেলা গ্রামীণ সেল এই দলটির জন্য রেশম উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রেশম উৎপাদন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। উৎপাদনের কাজের প্রতিও তাঁদের আগ্রহ জন্মায়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এরা উৎপাদনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০০১ সালের প্রথমদিকে এঁদের মাসিক আয় বেড়ে গিয়ে ১১০০ টাকা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে তাঁদের ব্যবসার কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। রামপুরহাটের বিষ্ণুপুরে অবস্থিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অবশেষে দলটিকে ঋণ প্রদান করে সহায়তা করে। বীরভূম জেলার রেশম শিল্প বিভাগ ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই দলটির জন্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার একটি প্রকল্প তৈরি করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দলটি পুনরায় প্রশিক্ষণ পায় এবং রেশম উৎপাদন কাজে ক্রমশ পারদর্শী হয়ে ওঠে। বর্তমানে দলটির ব্যবসা বীরভূম জেলা ছাপিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়ে পৌঁছেছে। দলটির বাজার বৃদ্ধির ফলে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন এই দলটির সদস্যদের মাসিক গড় আয় ৪৫০০ টাকা। এই দলটির দলনেত্রী অন্নপূর্ণাদেবীর কাছ থেকে জানা যায় যে, বোলপুরের হস্ত তাঁত বিভাগের সহায়তায় নক্সা তৈরির বিষয়ে তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর নেতৃত্বে দলটি এখন নতুন ধরনের নক্শাযুক্ত শিল্পসামগ্রী তৈরি করছে। বাজারে তাঁদের শিল্পসামগ্রীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীরভূমের বিভিন্ন মেলা, কলকাতার হস্তশিল্প মেলা, দিল্লি ও লক্ষ্ণৌর বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পসামগ্রীর একটি বাজার তৈরি হয়েছে। আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি 'মহিলা' দলটির সদস্যদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজও আজ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অভ্যর্থনা দলটির দলনেত্রী জানালেন প্রথম দিকে বাড়ির বাইরে বেরোতে তাঁদের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হত। বাড়ির লোকজন নানা কৈফিয়ত দাবি করতেন। আজ অর্থ সমাগমের ফলে সেই বাধাগুলি ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। সামাজিক স্বীকৃতির পাশাপাশি পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাঁদের

মতামত অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। অভ্যর্থনা স্বনির্ভর দলটির অধিকাংশ মহিলা সদস্যাই আজ সাক্ষর। দলের প্রত্যেকটি সদস্য নিজেদের বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করেছেন এবং তা ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরো দলটিই আজ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

ইলামবাজার থেকে জয়দেব যাবার রাস্তার ধারে আকন্দা গ্রাম। গ্রামটিতে ২২১টি পরিবারের বাস। গ্রামটি সম্প্রতি নির্মল গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গ্রামটির সবকটি বাড়িতে এখন শৌচাগার নির্মিত হয়েছে এবং তা ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামটির এককোণে কয়েক ঘর ডোম পরিবারের বাস। একটি ডোম পরিবারের ঘরের দাওয়ায় বসে পরিবারের কর্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন লোক কল্যাণ পরিষদের কয়েকজন সদস্য ও গ্রামের মানুষ।

সারণি—২

পঞ্চায়েত সমিতির নাম	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা
সিউড়ি—১	৭	১৩৩
সিউড়ি—২	৬	১৪৩
সাঁইথিয়া	১২	১২৩
মহঃবাজার	১২	১০১
রাজনগর	৫	২৫১
খয়রাশোল	১০	২৮৪
দুবরাজপুর	১০	৯১
ইলামবাজার	৯	১৯১
বোলপুর-শান্তিনিকেতন	৯	১৫৩
নানুর	১১	১২৪
লাভপুর	১১	৪৫৬
ময়ূরেশ্বর—১	৯	২৩১
ময়ূরেশ্বর—২	৭	৩৮৩
রামপুরহাট—১	৯	৮৫
রামপুরহাট—২	৯	১০৩
নলহাটি—১	৯	২২৮
নলহাটি—২	৬	১৬৫
মুরারই—১	৭	১৪৭
মুরারই—২	৯	১১৯
মোট	১৬৭	৩৫১১

আমরা যেখানে বসে কথা বলছিলাম তার পিছনেই একটি পুকুর সেখানে হাঁস চরে বেড়াচ্ছে। এই পুকুরটিই ডোম পরিবারগুলির দৈনন্দিন জীবনের ছবি বদলে দিয়েছে। কয়েক বছর আগেও এটি ছিল একটি মজে যাওয়া পুকুর। এই পুকুরটি পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছে এই দলটি। পুকুরে শুধু মাছ চাষই নয়, পুকুরের ধার ঘেঁষে যে জমি সেখানে মাচা করে ফলানো হয়েছে শিম, লাউ প্রভৃতি ফসল। পুকুরের পাড়ে চাষ হচ্ছে টমাটো, বেগুন, কলা প্রভৃতি। আর ঘরের দাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগির দল। আড়াই বছর আগে স্বনির্ভর দল গঠন করার পর অবস্থা ফিরে গেছে ডোম পাড়ার বউদের। বাচ্চা কোলে করে একটি বউ জানালো আগে দুবেলা খাবার জুটতো না, এখন এই পুকুর থেকে মাছ ধরে ছেলেদের মাছ খাওয়াতে পারছি। মুরগির ডিমও বাচ্চাদের মুখে তুলে দিতে পারছি হপ্তায় দুদিন। কিছুদিন আগেও এই অবস্থার কথা ভাবা যেত না। পঞ্চায়েত আর লোককল্যাণ পরিষদের সহযোগিতায় গ্রামের কৃষকেরা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ-এ কাঁচা সার, নিম পাতা থেকে সার, আকন্দা গাছ কেটে জৈব সার প্রভৃতির ব্যবহার শেখানো হয়েছে। এই সার ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার সার কেনার খরচও কমেছে।

গ্রামের পুকুরগুলোর ধার দিয়ে এখন গাছ লাগানো হচ্ছে। এই বৃক্ষরোপণের ফলে বিভিন্নভাবে গ্রামের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। গাছ থেকে তাঁরা জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারছেন। আবার গাছ লাগানোর ফলে মাটিতে ঘাস জন্মাচ্ছে। এই ঘাস গরুছাগলের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কথাগুলো বলছিলেন—গোঁসাইবাবা স্বনির্ভর দলের সদস্যা শীতলা ডোম। আগে এই গ্রামের মানুষ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে অজয় নদের পার হয়ে কয়েক কিলোমিটার দূরে বর্ধমানের গড় জঙ্গলে যেতেন, গরু-ছাগলের খাবারের খোঁজে। এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম তার কিছু দূরেই দেখা যাচ্ছিল গাছের ঘন সমাবেশ। ওটা আর কিছুই নয়। পতিত জমিতে গোঁসাইবাবা আর অগ্রগামী স্বনির্ভর দলের গড়ে তোলা নার্শারি। ৭-৮ কাঠার এই জমিতে লাগানো হয়েছে সোনাঝুরি, হিমঝুরি, করঞ্জ, কৃষ্ণচূড়া, শ্বেতশিমূল, গামার, মহুয়া, নিম প্রভৃতি গাছ। ওই নার্শারি থেকে এ বছর ১৪,০০০.০০ টাকার চারা বিক্রি হয়েছে। পঞ্চায়েত এই চারা কিনে নিয়েছে।

বীরভূমের গ্রামে গ্রামে এখন একই চিত্র।

বীরভূম জেলায় স্বনির্ভর দল গঠনের প্রক্রিয়া এখন নিরন্তর চলছে। এখন পর্যন্ত বীরভূমে প্রায় ১০ হাজার দল গঠিত হয়েছে বলে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে। এই দলগুলির মধ্যে ৮৫ শতাংশেরও বেশি দল মহিলাদের। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বীরভূম জেলার এক লক্ষেরও বেশি মানুষ বিকল্প কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। দারিদ্র সীমারেখার নিচে অবস্থিত মানুষের সক্ষমতা অর্জনের পথে অন্যতম হাতিয়ার আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠী। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে মহিলারা আজ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই তৈরি করছেন।

লেখক : জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, বীরভূম

৩০০ বছরের পুরাতন চন্দ্রচূড় শিব মন্দির, ভরাসি
— সৌজন্যে : সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬৯ বছরের পুরাতন লক্ষ্মী-জনার্দন জীউয়ের মন্দির, ঘুড়িষা
— সৌজন্যে : অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বীরভূমের অহংকার : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

স্মরজিৎ প্রামাণিক

সভ্যতার চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। শিল্পের অপরিহার্য উপাদান বিদ্যুৎ। দৈনন্দিন জীবনযাপনে অঙ্গাঙ্গি জুড়ে বিদ্যুৎ। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য আনতে রাজ্যের বিদ্যুৎ মানচিত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্লভ নজির স্থাপনকারী বক্রেশ্বর বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বীরভূম জেলা পরিষদের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও তাঁদের সংগঠনের নিরলস অবদান। রাজ্যের বিদ্যুৎক্ষেত্রের পাশাপাশি বীরভূম জেলা-মানচিত্রে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এক অবিসংবাদিত দিকচিহ্ন।

বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকের প্রথম থেকে ভারতের অন্যান্য অংশের মতো এরাজ্যেও ছিল ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতির সমস্যা। সাঁওতালডিহি, ব্যান্ডেল ও কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরে দরকার পড়ে আরো বিদ্যুতের। এই অভাব দূর করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাইরের ছবি

রানিগঞ্জ কয়লাখনি এলাকা থেকে ৩১ কিমি দূরে বীরভূমের চিনপাই ও ভুরকুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এখানেই রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (ডব্লু বি পি ডি সি এল) বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার দায়িত্ব পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি ইউনিট অর্থাৎ মোট ৬৩০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য ভারত ও জাপান সরকারের মধ্যে আই ডি পি-৮৯ এবং আই ডি পি-৯৭ নামে দুটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাপান ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জে বি আই সি) এই কাজে ৮০.৮ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ ২৫২৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৩৫৬ কোটি টাকা। অবশ্য সরবরাহ খাতে ব্যয় বা ট্রান্সমিশন কস্ট বাবদ ৩০০ কোটি টাকা এই হিসাবে ধরা হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই জাতীয় প্রকল্পে সচরাচর যতটা ব্যয় হওয়া উচিত তার তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেকটাই কম। এছাড়া মেগাওয়াটপিছু ৪ কোটি টাকারও কম খরচে নির্মিত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যয় সাশ্রয়ের দিক দিয়ে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শুধু তাই নয় শিলান্যাস থেকে শুরু করে দ্রুতগতিতে কাজ করার সুবাদে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে প্রকল্প রূপায়িত করে আরেকটি রেকর্ড স্থাপন করেছে বক্রেশ্বর। ১৯৮৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। প্রতিনিয়ত নিরলস পরিশ্রমের পরিণামে প্রথম ইউনিটটি ১৯৯৯-র ১৭ জুলাই ৩৭ মাসের রেকর্ড সময়ে শেষ হয়। বাকি দুটি ইউনিট সম্পূর্ণ হয় এর ১৭ দিনের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূল প্রকল্পের প্রতিটি পর্ব সমাপ্ত হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। যেমন হাইড্রলিক টেস্ট বয়লারে নির্ধারিত সময়ের এক মাস আগে হয়েছে। প্রথম ইউনিটের বয়লারে অগ্নিসংযোগ 'লাইট আপ' ৩০ মে ১৯৯৯ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা ৩৬ দিন আগেই ২৪ এপ্রিল হয়ে যায়। সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (সি ই এ)-র মানদণ্ড অনুযায়ী ২০০ বা ২৫০ মেগাওয়াটের ক্ষেত্রে প্রস্তুতির সময়সীমা ৪৮ মাস। ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি ইউনিট বাণিজ্যিকভাবে কাজ শুরু করে পর্যায়ক্রমে ২৯ নভেম্বর ২০০০, ১ এপ্রিল ২০০১ এবং ১১ অক্টোবর ২০০১-এ। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অর্থ সহায়তাকারী জাপান সরকার তথা জে বি আই সি এই নজিরবিহীন সময়ে যাবতীয় গুণমান বজায়

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণরত বিদ্যুৎমন্ত্রী

রেখে কাজ শেষ করায় এবং বরাদ্দ অর্থ ও সময়ের সুনিপুণ ব্যবহারের জন্য বক্রেশ্বরকে সারা বিশ্বকে দেখানোর মতো প্রকল্প বলে বর্ণনা করেছে।

এই অবসরে একটু ফিরে দেখা যাক সলতে পাকানোর দিনগুলো। ১৯৮৮ সালে বক্রেশ্বরের শিলান্যাস। তখন বিদেশি ঋণ নিয়ে কোনো রাজ্য সরকারের নিজের কোনো প্রকল্প না করার নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। করতে হবে এন টি পি সি-র মাধ্যমে। পরে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর সময়ে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঋণ নিয়ে বক্রেশ্বর গড়ে তোলার কথা স্থির হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও সম্মত হয়। এরপর এদেশের এ বি এল সংস্থাকে তিনটি বয়লার ও ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) -কে তিনটি টারবাইনের অর্ডার দেয় ডব্লু বি পি ডি সি এল। ১৯৯১-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে ওই চুক্তিও স্বাভাবিক কারণে বাতিল হয়ে যায়।

পরের ধাপে নতুন করে জাপানের ওভারসিজ কর্পোরেশন ফান্ড থেকে ঋণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আগের সমস্ত পরিকল্পনা বাদ দিয়ে নতুন করে কাজ শুরুর শর্ত দেয় তারা। সেই মতো ঠিক হয় ভেল তাদের অর্ডার বাতিল করে দেবে। কিন্তু সময়ের তালে তালে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। সেজন্য ডব্লু বি পি ডি সি এল দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডি সি এল এবং কুলজিয়ান কর্পোরেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর সঙ্গে বক্রেশ্বরের চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিট স্থাপনের জন্য যৌথভাবে সমঝোতাপত্র প্রস্তুত করে। স্থির হয় আগের অর্ডার অনুযায়ী বয়লার ব্যবহার হবে এই দুই ইউনিটে। প্রথম তিনটি ইউনিট স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রে জাপানের ইতচু নির্বাচিত হয়। তদানীন্তন ইতচু-র প্রধান কে মিটা পশ্চিমবঙ্গকে দক্ষিণ এশিয়ার সুপ্ত শিল্পদৈত্য হিসাবে অভিহিত করেন। গ্লোবাল টেন্ডারের মাধ্যমে ১১৭২ কোটি টাকার টার্ন-কি প্রকল্পটি ২ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত রূপায়িত করার প্রতিশ্রুতি দেয় সংস্থাটি। ইতচু সিদ্ধান্ত নেয় এই প্রকল্পের জন্য জাপানের ফুজি প্রস্তুত করবে টারবাইন এবং ভারতের ভেল তৈরি করবে বয়লার। শর্তানুসারে ১৯৯৪-র জানুয়ারিতে জাপানের ঋণ অনুমোদিত হয়। ইতচু চূড়ান্ত অর্ডার পায় ৩১ মে ১৯৯৬। বয়লার বসানো আরম্ভ হয় ১ আগস্ট ১৯৯৭। সামগ্রিক প্রকল্প রূপায়ণের ৮৫ শতাংশ অর্থ প্রদান করে জাপান, বাকি ১৫ শতাংশ অর্থ রাজ্য সরকারের।

বক্রেশ্বরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র যেখানে উৎপাদনের পাশাপাশি ট্রান্সমিশন বা সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে আরামবাগ ও জিরাটের ৪০০ কেভি এবং দুর্গাপুরের বিধাননগর, সাতগাছিয়া ও গোকর্ণের ২২০ কেভি সাব-স্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

এদিকে বক্রেশ্বরের এক্সটেনশন ইউনিট ৪ ও ৫ (২১০ মেগাওয়াট x ২) নির্মাণের জন্য জে বি আই সি ৩৬.৭৭১ বিলিয়ন ইয়েন অর্থাৎ আনুমানিক ১৪৭০ কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে কর, শুল্ক ও পরিকাঠামোগত ব্যয় বহন করবে। চতুর্থ ইউনিটটি ২০০৬-এর ডিসেম্বরে এবং পঞ্চম ইউনিটটি ২০০৭-এর মার্চে চালু হবে বলে ঠিক আছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, বক্রেশ্বরের প্রথম ইউনিটের উৎপাদন শুরুর কথা ১৯৯৯-এর অক্টোবরে থাকলেও বাস্তবে তা আগস্টেই করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ শুরু হয়েছে ২০০০-এর ফেব্রুয়ারিতে। বক্রেশ্বরে নষ্ট হয়নি কোনো শ্রম দিবস। এসব সম্ভব হয়েছে যথাসময়ে ঋণবাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কর্তৃপক্ষ থেকে শ্রমিক সবার সমবেত টিমওয়ার্ক, সুনিপুণ কর্মসংস্কৃতি এবং একাগ্র মনোবলের কল্যাণে।

বক্রেশ্বরে রয়েছে কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থা। ১৯৯৭ থেকেই প্রত্যেক সপ্তাহে বক্রেশ্বরে বৈঠক বসে অগ্রগতি বিষয়ে। মাসে একবার কলকাতায় ডব্লু বি পি ডি সি এল-এর সদর কার্যালয়ে। আছে গুণমান যাচাইয়ের বন্দোবস্ত। যন্ত্রাংশ কেনা থেকে বসানো পর্যন্ত উৎকর্ষতা পরীক্ষা অব্যাহত, একাজে পরামর্শদাতা বা কনসালট্যান্ট-এর ভূমিকা এন টি পি সি-র। স্থানীয় কনসালট্যান্ট ডি সি এল এবং বিদেশি কনসালট্যান্ট জাপানের ইলেকট্রিক পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইন্টারন্যাশনাল। এই জাতীয় উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এদেশে অভূতপূর্ব।

পশ্চিমবঙ্গের সবগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার ও অপারেটরদের প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ব ভারতের প্রথম উন্নতমানের সিমুলেটর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে বক্রেশ্বরে। এখানে রয়েছে হাইড্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্র। আছে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। আর আছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেডিও ট্রাঙ্কিং সিস্টেম।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লানির্ভর প্রকল্প। এর মুখ্য উপকরণ কয়লা। কয়লা পুড়িয়ে সৃষ্ট তাপশক্তি রূপান্তরিত হয় যান্ত্রিক শক্তিতে। আর সেই যান্ত্রিক শক্তিকে টারবাইন বা জেনারেটর ঘোরানোর মাধ্যমে পরিণত করা হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিপুল পরিমাণ কয়লার যোগান আসে স্থানীয় রানিগঞ্জ এবং সন্নিহিত ইস্টার্ন কোল ফিল্ড-এর ডালুর বাঁধ, পুরুষোত্তমপুর, শংকরপুর, কাজোরা, পাণ্ডবেশ্বর ইত্যাদি ওপেন কাস্ট মাইন এবং ডব্লু বি পি ডি সি এল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও এমটা গোষ্ঠীর যৌথ মালিকানাধীন তানোরা ও তারা খনি থেকে। কয়লা আনা হয় অণ্ডাল-সাঁইথিয়া ব্রডগেজ লাইনের মাধ্যমে। বক্রেশ্বরের বর্তমান তিনটি ইউনিট পূর্ণমাত্রায় চালাতে রোজ ৮০০ মেট্রিক টন কয়লা লাগে। এই প্রকল্পের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের আনুমানিক ৯২ শতাংশ যায় প্রধান কাঁচামাল কয়লা খাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোল রেট বা ইউনিটপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ৫৪০ গ্রাম কয়লা লাগে। ২০০২-০৩ সালে কোল রেট ছিল কিলোওয়াট পিছু ০.৫৪১ কেজি এবং ২০০৩-০৪-এ এই হার ছিল ০.৫৪৬ কেজি। এই দুই সালে হিট রেট ছিল যথাক্রমে ২৬৭৯.৭ ও ২৬৯৫.৬।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ডিজেল-এর ব্যয়ও বক্রেশ্বরে ন্যূনতম। জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তেল ব্যবহারের মাত্রা কিলোওয়াট আওয়ার পিছু ৩.৫ মিলি, সেখানে বক্রেশ্বরে বিগত দুবছরে এই পরিমাণ ছিল ১.০৮৩ ও ০.৪৬।

আরো আছে। জল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বক্রেশ্বর নজির গড়েছে। হিসাবমতো ২১০ মেগাওয়াটের ইউনিটপিছু জলের দরকার ১৩ কিউসেক। অথচ জাতীয় গড় প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর-এর তুলনায় ৪০ শতাংশের বেশি রেখেও বক্রেশ্বরের জলের ব্যবহার ৭.৫ কিউসেকের মধ্যে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দুবছরে বক্রেশ্বরের তিনটি ইউনিট চালাতে কাঁচা জল লেগেছে ১৬৭৭৪৭৮৫ ও ১৩৩৪৯৩৩৯ ঘনমিটার। এই কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জল আসে ময়ূরাক্ষী নদীর উপরে নির্মিত তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে। তদুপরি বক্রেশ্বর নদীর উপর ১০৯.৪২ বর্গকিমি ক্যাচমেন্ট এলাকা জুড়ে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এর জল ধারণ ক্ষমতা ২৪.৯ মিলিয়ন ঘনমিটার। এই বাঁধে বর্ষার জল ও নদীর বাড়তি জল ধরে রাখা হয়। এর ফলে গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ও সন্নিহিত এলাকার চাষের কাজে কোনো জল সংকট হয় না। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এলাকার পরিবেশ দূষণ রোধ হয়েছে। জলের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। বন্যার প্রকোপ থেকে এলাকা রক্ষা পাচ্ছে। বক্রেশ্বর বাঁধে 'নীল নির্জন' নামে একটি পর্যটন কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। বাঁধের জলে মাছ চাষও এক জীবিকার সন্ধান দিয়েছে।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ রোধে এক অনুসরণযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। উচ্চ ক্ষমতার ইলেকট্রো স্ট্যাটিক প্রিসিপিটেটর, ডি ই এবং ডি এস ব্যবস্থা, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপনগরী এলাকায় ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ, চিমনি থেকে নির্গত সালফার ও নাইট্রোজেন অক্সাইড সহ নানা ধরনের ক্ষতিকর গ্যাস নিরাপদ মাত্রার মধ্যে আছে কিনা, জলে কোনো দূষিত রাসায়নিক মিশে যাচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকারের বিশেষ পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পৃথিবী জুড়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই এক মাথাব্যথার কারণ। বক্রেশ্বরে এই সমস্যার মোকাবিলায় ২৫৭.২৫ একর এলাকা জুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাশ পন্ড বা ছাই পুকুর স্থাপন করা হয়েছে। তিনটি ইউনিট থেকে নির্গত ছাই আগামি ২৫-৩০ বছর এই পুকুরেই জমিয়ে রাখা যাবে। পরবর্তী দুটি ইউনিট ও ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য আরেকটি অ্যাশ পন্ডের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি সিমেন্ট কোম্পানি এখান থেকে সিমেন্টের উপাদান হিসাবে ছাই সংগ্রহ করে থাকে। এর ফলে ছাইয়ের সমস্যা অনেকটা কমে।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উপনগরীতে রয়েছে ইংরাজি মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৭-এ বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিকে জেলায় মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে স্কুলটি রাজ্যের মধ্যে অগ্রণী বিদ্যালয়ের সম্মান পেয়েছে। এসবের পাশাপাশি কর্মীদের বিনোদন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চার এক উৎসাহব্যঞ্জক বাতাবরণ রচিত হয়েছে বক্রেশ্বরে।

সবদিক দিয়ে বক্রেশ্বর সারা রাজ্যে তো বটেই, সেইসঙ্গে বীরভূম জেলারও এক গৌরবোজ্জ্বল অহংকার। অলংকার।

গাঁ ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ, সোনাঝুরি বনসৃজন — ছবি : পাপান ঘোষ

বীরভূমের বন উদ্ভিজ্জ ও বন্যপ্রাণ

কানাইলাল ঘোষ

রাঢ় ভূমি বীরভূম। দক্ষিণবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সীমানা বরাবর এই জেলার ভূপ্রকৃতি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ দক্ষিণপূর্বদিকে ঢালু হয়ে গেছে। 'ল্যাটেরাইট' বা লাল কাঁকুরে মাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছোটনাগপুর মালভূমির বর্ধিতাংশ যে কটি ব্লককে ছুঁয়ে আছে যেমন—খয়রাশোল, রাজনগর, দুবরাজপুর, মহম্মদবাজার, সিউড়ি-১নং, রামপুরহাট-১নং, নলহাটি-১নং, লাভপুর, বোলপুর এইসব এলাকাগুলিতে কিছুটা হলেও সরকারি বনভূমির অস্তিত্ব রয়েছে। ব্যতিক্রম ইলামবাজার ব্লক যেখানে মাটিতে পলির ভাগ বেশি হলেও বীরভূমের শাল জঙ্গলের একটি বড় অংশ এখানে বিদ্যমান, আর সেটি হল ইলামবাজারের চৌপাহাড়ি জঙ্গল, যা জেলার অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ ও আয়তনের প্রায় ১৩.৯০ বর্গ কি.মি.। তথ্যের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাই, জেলার ভৌগোলিক আয়তন ৪৫৪৫ বর্গ কি. মি যার মধ্যে ৩৩৭৫.৩০ বর্গ কি. মি কৃষিজমি, অর্থাৎ শতকরা ৭৪ ভাগ জমি কৃষিকাজে ব্যবহৃত।' জেলার মোট

জনসংখ্যা ৩০.১২৫ লক্ষ যার ৯১ শতাংশের গ্রামে বাস[২] এবং প্রায় সমসংখ্যক মানুষ কৃষিজীবী। পক্ষান্তরে, সরকারি বনভূমি মাত্র ১৫৯.২৬ বর্গ কি. মি অর্থাৎ ভৌগোলিক আয়তনের কেবল ৩.৫ শতাংশ[৩]। জেলার জনসংখ্যার হিসাব ধরলে মাথাপিছু ০.০০৬ হেক্টর বরাদ্দ। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গড় হল ০.০২ হেক্টর। পরিসংখ্যান বলছে, শতকরা হিসাবে চব্বিশপরগনা (দক্ষিণ), দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, অবিভক্ত মেদিনীপুর ও বর্ধমানের পরে বীরভূমের স্থান। বাকি জেলাগুলির তুলনায় অবশ্য বীরভূম অনেকটাই আগে, কারণ কেউই ১ শতাংশের ঊর্ধ্বে নয়। এমনকি কলকাতা, হাওড়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনায় সরকারি বনভূমি শূন্য শতাংশ[৩]।

তবে এতে শ্লাঘার কারণ নেই। জনসচেতনতার রকমফেরে, আর্থ-সামাজিক অথবা অবস্থানগত কারণে, অন্যান্য জেলার তুলনায় জঙ্গলের উপর জনসংখ্যার চাপ বীরভূমে কিছু কম নেই। গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার তথা জোগান এখানে অনেক সীমিত, বনের উপর আংশিক অথবা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি।

প্রাথমিকভাবে উদ্ভিজ্জ সম্পদের বৈচিত্র্য নির্ভর করে প্রাকৃতিক বনের অর্থাৎ শাল-পিয়াল-মহুল-পিয়াশাল-কেঁদ-হলুদ-হরিতকী-বহেড়া ইত্যাদি প্রজাতির উপর। এতে শুধু জঙ্গলের সৌন্দর্যই বাড়ে না, ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ সংগ্রহও হয় এইসব এলাকা থেকে। ওই সব দেশজ গাছের ছায়ায় বেড়ে ওঠে বিভিন্ন লতাগুল্ম যেগুলি ভেষজ গুণসম্পন্ন, যেমন সর্পগন্ধা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, অনন্তমূল, কালমেঘ, বাসক, চিরতা, কুর্চি প্রভৃতি। বীরভূম জেলায় এরকম প্রাকৃতিক জঙ্গল কেবল কয়েকটি স্থানে সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে ইলামবাজারের বোলপুর-ইলামবাজার রাস্তা বরাবর প্রায় সাত কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চৌপাহাড়ি শাল জঙ্গলের কথা আগেই বলা হয়েছে ; এ ছাড়া আছে মহম্মদবাজারের গণপুর এলাকার মৌবেলিয়া-ঘাঘা-চাঁদপুরের শাল জঙ্গল, রাসপুর এলাকার রাসপুর-চরিচা-রঘুবরপুরের শাল জঙ্গল এবং খয়রাশোল এলাকার গঙ্গারামপুর-বাস্তবপুরের জঙ্গল। এইসব প্রাকৃতিক বন এখনও কিছুটা স্বাভাবিক চেহারা ধরে রেখেছে বিভিন্ন ভেষজ গুণসম্পন্ন দেশীয় গাছ-গাছড়া, লতাগুল্ম সহ। বন সন্নিহিত এলাকার জনজাতি এখনও ছোটখাট রোগ-ব্যাধিতে সে সবের ব্যবহার করে। সীমিত পরিমাণে উৎপন্ন এসব ভেষজ উদ্ভিদ, বিড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত কেন্দুপাতা, শালবীজ, শালপাতা, বিভিন্ন প্রজাতির খাদ্যোপযোগী ছাতু স্থানীয়ভাবেই নিঃশেষ হয়ে যায়, রপ্তানি করার মতো পর্যায়ে পৌঁছয় না। তবে নানারকমের ক্রমবর্ধমান চাপে শাল ও দেশজ জঙ্গল ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে এর উপর নির্ভরশীল ছোট ছোট গাছপালা ও পশুপাখি। কৃত্রিম উপায়ে একটা 'বটানিকাল গার্ডেন' বা 'চিড়িয়াখানা' তৈরি করা যায়। কিন্তু মানুষের চাহিদা ও লোভের কাছে নতি স্বীকার করা প্রাকৃতিক বন ও উদ্ভিজ্জ সম্পদের পুনর্বাসন কতটা দুরূহ তা বর্ণনা করা অসম্ভব।

সোনাঝুরি খোয়াই ছবি : সজল মন্ডল   সৌজন্যে : টেলিগ্রাফ

বীরভূমের গণপুর অরণ্য   ছবি : কাঞ্চন দাস   সৌজন্যে : টেলিগ্রাফ

বিশ্বকবির ভাষায় 'দাও ফিরে সে অরণ্য' বলে আমরা বিলাপ করতে পারি, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে অরণ্যের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ বলে কার্যত মেনে নিতেই হয়। আমাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাসস্থান চাই, কৃষিজমি চাই, চাই শিল্পের উন্নয়ন ও ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সুন্দর রাস্তা। এতসব চাওয়ার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু দেশজ বনভূমির দীর্ঘশ্বাস শোনার অবকাশ আর মানসিকতা কোথায় ?

সামাজিক বনসৃজন

তবু, অতীতের অবিমৃষ্যকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশের প্রতিকূলতাকে কিছুটা হলেও সামাল দিতে গত দু দশকে বনজ সম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের যে জোয়ার এসেছে তার বেশ কিছুটা বীরভূম জেলাতেও প্রভাব ফেলেছে। আশির দশকে সামাজিক বনসৃজনের ফলশ্রুতি হিসাবে রাস্তা, নদী বা কৃত্রিম খালগুলির দুই পাশ এক সময় সবুজের সমারোহে ভরে উঠেছিল, দেশি গাছপালার সৌন্দর্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী তাতে হয়তো নেই, কিন্তু প্রাথমিক চাহিদার তালিকায় উঠে আসা ভূমি ও জল সংরক্ষণে তাদের অবদান অথবা দৈনন্দিন জঠরজ্বালা নিবারণে 'দিন-আনি-দিন-খাই' মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সংস্থানে এইসব কৃত্রিম বনাঞ্চলের ভূমিকা তো সবার উপরে। এক সময় যে বীরভূমে কাগজে কলমে কিছু বনভূমি থাকলেও কার্যত তেমন কিছু ছিল না, সেখানে ১৯৮৮ সালে অরণ্যের বিস্তার ১৭১.৬৭ বর্গ কি. মি এবং সবুজের মোট আস্তারণ ৯৫৭.১৮ বর্গ কি. মি, ১৯৯৭ সালের তথ্য থেকে যা যথাক্রমে ১৮৯.৫১ বর্গ কি. মি ও ১০৫৬.০৪ বর্গ কি. মি বলে জানা যাচ্ছে।[৫] স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে এই বৃদ্ধির ধারা পরবর্তী সময়েও ধরে রাখা গিয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সবুজায়নের মাধ্যমে এবং সার্বিক জনসচেতনতা বৃদ্ধির কারণে। এই উদ্যোগকে কেবলমাত্র ধরে রাখা নয়, তার প্রসার ও প্রচার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আরও বেশি মাত্রায় করা দরকার। প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ও কয়লার ভাণ্ডার ক্রমশ নিঃশেষিত হবে, ক্রমাগত ঘটবে তাদের মূল্যবৃদ্ধি। পুনঃসৃজনশীল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বনই হতে পারে বিকল্প শক্তির উৎস—তা সে গ্যাসিফায়ার নামে যন্ত্রের মাধ্যমে ছোট ছোট ডালপালা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেই হোক বা জ্যাট্রোফা প্রজাতির গাছের হাইড্রোকার্বন জাতীয় ডিজেলের বিকল্প জ্বালানি তেল থেকেই হোক। সেক্ষেত্রে বীরভূম জেলায় উদ্ভিদ সম্পদকে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা এখনও আছে, কেননা চাষযোগ্য জমির বাইরে বেশকিছু পরিমাণ অনুর্বর পতিত জমিও এই জেলায় রয়েছে যাতে উপযুক্ত প্রজাতির গাছ

লাগিয়ে বিকল্প শক্তির উৎস উৎপাদন করা সম্ভব। সুখের বিষয়, এ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পে বীরভূমের উষর লাল মাটিকে কাজে লাগানোর কথা বর্তমানে ভাবা হচ্ছে।

বন্যপ্রাণ

যদি বনজ সম্পদের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বন্য প্রাণীকুলকে প্রাণীসম্পদের মধ্যে বিবেচনা করা হয়, তবে আমাদের জেলা তেমন জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর নয়। বন্যপ্রাণীরা প্রাকৃতিক জঙ্গলকেই পছন্দ করে, তাকে নির্ভর করেই বেড়ে ওঠে, বংশবৃদ্ধি করে, সৃজিত বনের সোনাঝুরি-ইউক্যালিপটাস-সুবাবুল তাদের পছন্দের তালিকায় আসে না। বীরভূমের যেকটি প্রাকৃতিক শালবন আছে সেখানেও বন্যপ্রাণীর ততটা প্রাচুর্য নেই। প্রথমত প্রাণীদের নিরাপদে থাকার মতো ঘনত্বের গাছপালার অভাব, দ্বিতীয়ত বহুদিন আগে থেকেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে জনজাতিদের শিকার উৎসবের ছল করে প্রাণীহত্যাকারীদের আচমকা হামলা। বিষয়টি স্পর্শকাতর হওয়ায় তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই ছোটখাট বন্য প্রাণীদের খেদানো শুরু হয়ে যায়, যদিও সেসব জঙ্গলে কাঠবেড়ালি ও মেঠো খরগোশ জাতীয় সামান্য কিছু নিরীহ প্রাণীরাই দেখা মেলে। নানা প্রজাতির পাখিও এসব জঙ্গলে কমবেশি আছে যারা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

আনন্দের বিষয়, জেলায় সবুজের আস্তরণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদের সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন ঘটছে, প্রাণী বৈচিত্র্যও কিছুটা বাড়ছে। বক্রেশ্বর ও ব্রাহ্মণী নদীর ধারে যেখানে পলিমাটি আছে, সেসব এলাকায় বনদপ্তরের লাগানো শিশু-গামার-অর্জুন-হরিতকী-বহেড়ার জঙ্গলে বেশ কিছু পশুপাখি বাসা বাঁধছে, বিগত দিনগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাবে যাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল। এসব জঙ্গলে এমনকি দলছুট নেকড়ে বা বন্য শূকরের প্রাদুর্ভাবও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আর আছে কখনও বাঁকুড়া-বর্ধমান হয়ে দলমার দলছুট দু-একটি হাতির ইলামবাজার জঙ্গলে অথবা ম্যাসাঞ্জোর পার হয়ে দুমকার দিক থেকে আসা ১৩-১৪টি হাতির মহম্মদবাজার বা রাজনগর এলাকার জঙ্গলে মাঝেমধ্যে আনাগোনা। এখানে জঙ্গল বাড়ার সঙ্গে ওদের আসার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আশঙ্কা থাকছে, কালক্রমে অন্য দু-একটি জেলার মতো দলবদ্ধ হাতির দীর্ঘদিনের চারণভূমি হওয়ার চাপ বীরভূম জেলা আদৌ নিতে পারবে না, কারণ এখানে বনভূমির পরিমাণ অতি সীমিত, খণ্ড বিখণ্ড এবং কৃষিজমি এবং জনবসতি দিয়ে ঘেরা।

বীরভূম জেলায় একমাত্র অভয়ারণ্যটি আছে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে, নাম বল্লভপুর অভয়ারণ্য ও মৃগদাব। প্রায় দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে এর বিস্তার। আছে শতাধিক চিতল হরিণ, শজারু ও ছোটখাট দু-একটি জীবজন্তু। এছাড়া আছে তিনটি মাঝারি আকারের ঝিল

বল্লভপুর অভয়ারণ্য ও মৃগদাব

যাতে শীতকালে পরিযায়ী পাখিরা বেশ কিছুদিনের জন্য আসে। অন্তত ১৮—২০টি প্রজাতির মোট সাড়ে চার হাজারেরও বেশি পরিযায়ী পাখির হিসাব ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে এক তথ্যানুসন্ধানী দলের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এইরকম পাখির ভিড় হয় সিউড়ির অদূরে তিলপাড়া ব্যারেজে এবং বীরভূমের গর্ব বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রায় ২.৫০ বর্গ কি. মি. ব্যাপী জলাধারে। কিছু অনামা, অখ্যাত জলাশয়েও পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখিদের প্রাচুর্য এখানে পক্ষী প্রেমিকদের আকর্ষণ করে।

প্রকৃতির অকৃপণ দান বীরভূম জেলা পায়নি। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে জেলার অর্ধেকের বেশি অংশে লাল ও বন্ধ্যা মাটির প্রাচুর্য ভূমিকে রুক্ষ ও শুষ্ক করে রেখেছে। পাথর খাদান ও মোরাম তোলার বৈধ ও অবৈধ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে পরিবেশ চেতনার বদলে সৃষ্টি করেছে অর্থের আকাঙ্ক্ষা, বন ও বন্য প্রাণীর প্রতি মমত্বের পরিবর্তে এখনও কাজ করে ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তিস্বার্থ। তবু এ সবের মধ্যেও সহাবস্থান করছে এখানকার বন ও বন্যপ্রাণ, যেমন টিকে থাকে মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। হয়তো আশায় আছে একদিন মানুষের শুভচেতনার জয় হবে, প্রকৃতির প্রতিকূলতা কাটিয়ে পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠবে তারা।

তথ্যপঞ্জি :

(১) ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক, বীরভূমে (২০০১) : ৫৩
(২) ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক, বীরভূম (২০০১) : ১৭
(৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফরেস্ট রিপোর্ট (২০০০) : ১১
(৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফরেস্ট রিপোর্ট (২০০০) : ১৭
(৫) ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক, বীরভূম (২০০১) : ৬৫

লেখক : বিভাগীয় বনাধিকারিক বীরভূম বনবিভাগ

সুরুলের প্রাচীন মন্দির (ছোটবাড়ি) ছবি : পাপাম ঘোষ

পর্যটন বৈচিত্র্যে বীরভূম জেলা

জয়দীপ সরকার

নেই কোন কূল ছাপানো নদী, যেখানে বারো মাস কূল ছাপানো জল থাকে, নেই কোনো সমুদ্রতট যেখানে দাঁড়িয়ে শেষ দেখা যায় না। জলের অভাব এ জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। তবে এর বাইরে কি নেই বীরভূমে ? পাহাড়, বন জঙ্গল উষ্ণ প্রস্রবন, হরেক নদী, অভিনব লোকসংস্কৃতি, বাউল ফকির, মন্দির মসজিদ, গীর্জা প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস থেকে শুরু করে কবি জয়দেব চণ্ডীদাস বা সব ছাপিয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। বীরভূমের মানুষজনই গর্ব করে বলতে পারেন বর্ষা, শীত বা প্রখর গ্রীষ্ম প্রতিটি সময়ের এক আলাদা স্বতন্ত্রতা বীরভূমের আছে, আর তাই প্রতিদিন কয়েক হাজার পর্যটক আসেন বীরভূমে। কোন উৎসব অনুষ্ঠান হলে সেই হাজার সংখ্যাটা বহু গুণ বেড়ে যায়। তবে এই বিরাট সংখ্যার পর্যটকদের বাঁধা কেন্দ্র তারাপীঠ থেকে বোলপুর, সময় থাকলে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবন বা বেশি ইচ্ছে জাগলে সীমানা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডের মশানজোড় ঢুঁ মেরে দেওঘরে যাওয়া, তবে যেতে হবে সেই বীরভূমের পথ বেয়েই। কিন্তু

জয়দেবের কেন্দুলি মন্দিরগাত্র : পোড়া মাটির কাজ ছবি : পাপান ঘোষ

তারাপীঠ বোলপুর-শান্তিনিকেতন বা বক্রেশ্বরের মতন আকর্ষণীয় কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে আরও অনেক কেন্দ্র আছে যা পর্যটকদের নজর কাড়বে, জোগাবে মনের খোরাক।

অনেক চেনা বোলপুর-শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করেই যাওয়া যাবে অনেক নতুন কেন্দ্রে।

বোলপুর শহর থেকে কঙ্কালিতলার মন্দির মাত্র ৯ কিমি। হিন্দু শাক্ত ধর্মাবলম্বীদের কাছে পুন্যার্জনের ঐ কেন্দ্রে ভিড় আছে সবসময়। এখানে মেলা বসে প্রতি বছর।

কঙ্কালিতলা থেকে ঘোরা পথে লাভপুর দূরত্ব ২৮ কিমি। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুর এবং সংলগ্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই রচেছিলেন সমাজজীবনের নানা গল্পগাঁথা। সময় বদলের সঙ্গে লাভপুর বদলালেও এখানকার গ্রামজীবনের চেনা ছন্দ বদলায়নি। আছে কিছু পুরোনো মন্দির আছে লেখকের বিভিন্ন রচনায় বর্ণিত অনেক ছবি। লাভপুর রেলস্টেশনও এক অনবদ্য আকর্ষণ কেন্দ্র। ছোট পথের ট্রেন বা রেল স্টেশনও যেন এক ভিন্ন আঙ্গিকের। লাভপুরের অন্যতম আকর্ষণ এখানকার ফুল্লরা মন্দির। এখনও অনেক পর্যটক আসেন। ভরসা পঞ্চায়েত সমিতির ডরমিটারি। থাকতে গেলে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আছে তারাশঙ্কর সংগ্রহশালা।

লাভপুর থেকে নানুর, চণ্ডীদাসের দেশ। আছে বহুশ্রুত বাঁশুলি মন্দির। আছে এক স্তূপ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একসময় যা খনন করে অতীতের নানা নিদর্শন পেয়েছিলো, কিন্তু খনন বন্ধ থাকায় সেই স্তূপ এখনও রহস্যাবৃত। চণ্ডীদাসের মেলা বসে প্রতি শীতে।

বোলপুর থেকে বল্লভপুর, মাত্র চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। এক নতুন পর্যটন কেন্দ্র। এখানে ভবিষ্যতে পাখীরালয় গড়ে উঠবে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে। শুধু শীতে নয় বছরের ৮ মাস দেশ বিদেশের নামগোত্রহীন পাখিদের ভিড়ে বল্লভপুর থাকে মুখরিত। বল্লভপুরের বৈশিষ্ট্য এখানে পরিযায়ী পাখিরা বছরের বেশি সময় থাকে।

বোলপুর বা শান্তিনিকেতনে পর্যটনের নির্দিষ্ট কোন এলাকা হতে পারে না। যে শান্তিনিকেতনের আশ্রম, বল্লভপুরের ডিয়ারপার্ক, খোয়াই, শ্যামবাটি, প্রান্তিক বা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো বিভিন্ন নিদর্শন আর পৌষ মেলা বা বসন্ত উৎসবের
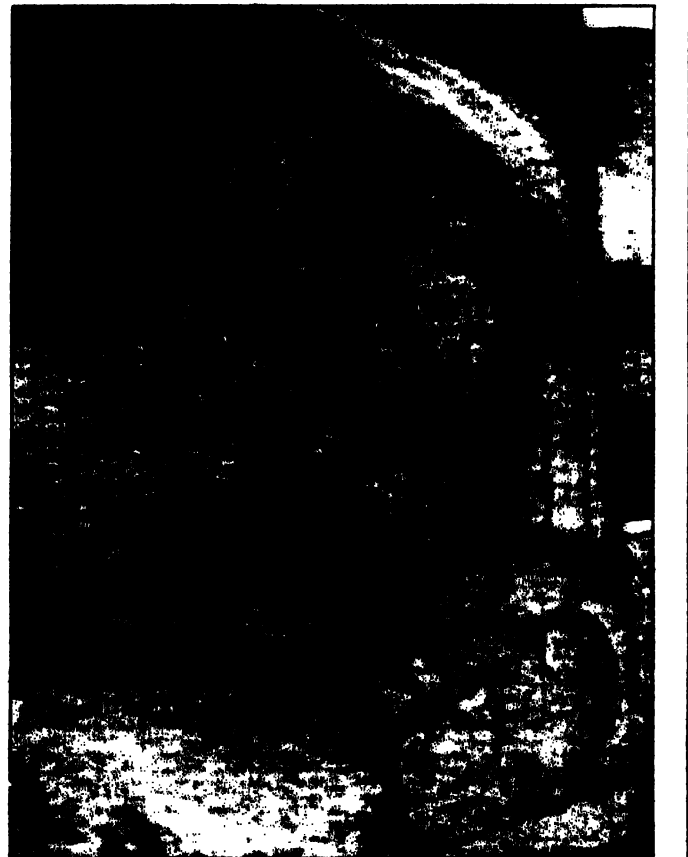
বাশুলি দেবীমূর্তি (চণ্ডীদাস—নানুর) সৌজন্যে : দেবাশিস দাস
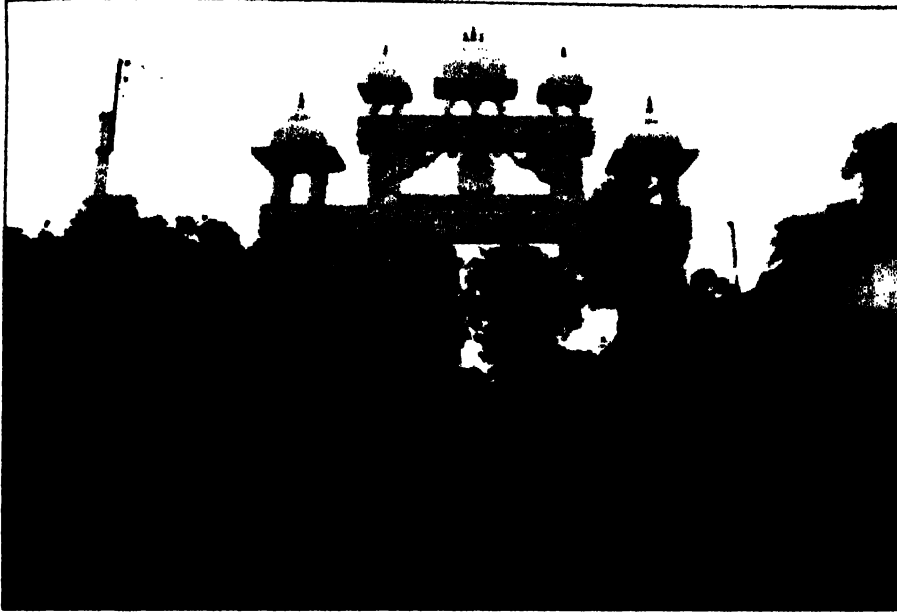
বীরচন্দ্রপুর : নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান

মতন অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতিটি দিনই কোনো না কোনো নতুন আকর্ষণ নিয়ে চিরনবীন এই কেন্দ্র বিশ্বের পর্যটকদের নজর কেড়ে চলেছে।

বোলপুর থেকে ইলামবাজারের পথ। একসময় গেটওয়ে বলে পরিচিত ছিল, বিরাট বনভূমিতে হিংস্র পশু বা ডাকাত দলের আস্তানা অনেক কিছু ছিল। তারপরে সেই বনভূমি উধাও হয়ে মানুষের জ্বালানীর বস্তু হয়েছিল। তারপর এলাকার কৃষকসভা পঞ্চায়েত মিলে গড়ে তুলেছে নতুন বনভূমি। একদম ঠাসা কোথাও রোদ্দুরও ভালোভাবে ঢুকতে পারে না। এর মধ্যে বনভিলা, বনবিতানের মতন সংস্থা পর্যটকদের মোহিত করবেই। আছে বন দপ্তরের বাংলো শুধু ঐ জঙ্গল নিয়েই দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন এমন পর্যটকেরা এখানে সংখ্যায় অনেক হয়ে উঠেছেন।

ইলামবাজার বীরভূমের এক পুরোনো গঞ্জ। এক সময় নীল চাষ হতো এ অঞ্চলে, তার চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যায়, আছে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভার। অজয় নদীকে ঘিরে এক সময় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা ইলামবাজার এখনও সীমান্ত এলাকার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এখানেই পানাগড়—মোরগ্রাম রাজ্য সড়ক বীরভূমে যুক্ত হয়েছে। অত্যাধুনিক মানের ঐ সড়ক ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলে **কেন্দুলিগ্রাম**। রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের স্মৃতি জড়িত ঐ গ্রাম এখনও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়।

শুধু পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যস্নান শেষে এক মাসের বাউল মেলা নয় কবি জয়দেবের স্মৃতিজড়ানো ঐ গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ রাধাগোবিন্দ মন্দির। যে মন্দিরয়ের নির্মাণ স্থাপত্য, তার টেরাকোটার প্রাচীন কাজ অভিভূত করবে পর্যটকদের। বাউল মেলায় কয়েক হাজার বাউল শিল্পী এখানে সমবেত হন।

২০০৩ সালে মেলার পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। ১৬০টি অস্থায়ী আশ্রম গড়ে এখানে প্রায় এক মাস থাকেন শিল্পীরা। পর্যটক আবাস গড়ে না উঠলেও ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতি এখানে একটা ছোট আবাসন গড়েছে, যোগাযোগ করলে তাও ভাড়া দেওয়া হয়।

কেন্দুলি ছাড়িয়ে সেই প্রশস্ত আধুনিক পথ ধরে **দুবরাজপুর**। বীরভূমের ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই শহরকে জুড়ে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর গঞ্জ এখন পুরো শহর হয়ে

বর্তমান আকালিপুর মন্দির

উঠেছে। রাজার স্মৃতি যেমন আছে এই শহরে তেমন বিরাট হাতির অবয়ব বা বর্গী হানা থেকে রক্ষা পেতে শেষ লড়াইয়ের নিদর্শন। পুরোনো রাজবাড়ির সঙ্গে এই শহরের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মামা ভাগ্নে পাহাড়। অসংখ্য শিলাস্তূপ একের পর এক এমনভাবে সাজানো আছে যা দেখলে বীরভূম আসলে কোন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে তা মনে করিয়ে দেবে। স্থানীয় পুরসভা পাহাড়ের ওপর রোপওয়ে বোটিং পার্ক প্রভৃতি চালু করে আকর্ষণ বাড়াচ্ছে ঐ পাহাড়ের। দুবরাজপুর পুরসভা ইতিমধ্যে অতিথি নিবাস চালু করেছে। এ বিষয়ে পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মশানজোর জলাধার

দুবরাজপুর শহর থেকে বার হয়ে কিছু দূর গিয়ে ঘুরতে হবে 'নীল নির্জন' দেখবার জন্য। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধার হলো এই নীল নির্জন। শেষ দেখতে পাওয়া যায় না ঐ জলাশয়ের নীল রঙের না হলেও জলের রঙ এখানে হরেক। এই জলাশয়ে ভাসমান হোটেল এবং বোটিং চালু অচিরেই, বীরভূমের পর্যটন মানচিত্রে নজরকাড়া নির্জন ইতিমধ্যে আকর্ষণ বাড়াচ্ছে পর্যটকদের। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষ থেকেও এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার ভাবনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, এটাই আশার কথা। এবার শীতে নীল নির্জনের ঠিকানা জেনে পরিযায়ী পাখীরাও ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে।

সিউড়ি বীরভূমের সদর এক প্রাচীন জনপদ। মোরব্বার জন্য বিখ্যাত ঐ শহরে এখনও মোরব্বার বাজার বিরাট হয়ে চলেছে। পর্যটন তালিকায় রসনার সম্ভার না থাকলেই নয়, বীরভূমের নিজস্ব বৈচিত্র্য ধরে রাখা মোরব্বা এখনও সিউড়ির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখেছে। সিউড়ি সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত শহর। সিধু কানু সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে অনেক সম্ভার নিয়ে।

সিউড়ি থেকে ঘুরে বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবন। এক অনাবিল আনন্দের কেন্দ্র। শীত বা বর্ষায় তো কোনো কথাই নেই বাকি সময়ও গরম জলের কুণ্ডে শরীর ডোবানোর লোভ ছাড়া মুশকিল। এখানে আছে অসংখ্য মন্দির। সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ বক্রেশ্বরের মন্দির দেখে লিখেছিলেন 'দেবতাদের গ্রাম' এবং এটাও সত্যি এখানে দেবতাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা মন্দিরের সংখ্যা বিরাট। অবশ্যই শীতে ভিড় বেড়ে যায়, বাকি সময় একদম ফাঁকা থাকে না এই কেন্দ্র। পর্যাপ্ত হোটেল, লজ সমস্ত মানেরই আছে এখানে।

বক্রেশ্বর পার করে রাজনগর। বীরভূমের পুরোনো রাজধানী এই গঞ্জ। জেলার পশ্চিমাংশে রুক্ষ জমির ওপর এই গঞ্জের আকর্ষণ ভগ্নপ্রায় রাজপ্রাসাদ, মতিচূড়-মসজিদ এবং কালীদহ দীঘি। ইতিহাসে ভরা রাজনগর এক ভিন্ন স্বাদ দেবে উৎসুক পর্যটকদের। প্রাচীন স্থাপত্য এবং বিভিন্ন কাহিনীর প্রামাণ্য তথ্য ভরা রাজনগর এক আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র। রাজবাড়ির পেছনে কালীদহ দিঘি। সে দিঘীর মাঝে এক ছোট্ট দ্বীপ। কথিত আছে রাজবাড়ি থেকে সুড়ঙ্গ পথে দীঘির নীচ দিয়ে ঐ দ্বীপে ওঠা যেত। সেই রাজা, নবাব কেউ নেই তাই এখন এক অদ্ভুত নীরবতা সর্বত্র। ভেঙ্গে পড়ছে মতিচূড় মসজিদ, তবুও যেসব নান্দনিক শিল্পকর্ম ঐ মসজিদ জুড়ে আছে তাও স্মৃতির এক সম্পদ হয়ে থাকবে। কালীদহ দিঘীতে এখন পরিযায়ী পাখীরা আসছে। দিঘীর কোনায় আছে পুরোনো গাব গাছ। ঐ গাছে সাঁওতাল বিদ্রোহের সেনানীদের ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। স্মৃতি আর ইতিহাসে ঘেরা রাজনগর বীরভূমে পর্যটনের মানচিত্রে মূল্যবান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

গজনগর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে আছে আরেক উষ্ণ প্রস্রবন। নাম তাঁতলৈ। জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট নালা দিয়ে অবিরাম বইছে গরম জলের স্রোত। জায়গাটা বীরভূমের শেষ প্রান্তে। পাশেই সিদ্ধেশ্বরী নদী, ওপারে ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলা। শুরু সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ী অঞ্চলের। নদীর এপার থেকে সেই নিসর্গ দেখাটাও এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

রাজনগর থেকে সিউড়ি ফেরার পথে পাথরচাপুড়ি, মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থান বলে চিহ্নিত হলেও সবধর্ম মতের মানুষ এখানকার পীরের মাজারে নিয়মিত আসেন। প্রতি বছর গ্রীষ্মে এখানে মেলাও বসে। এছাড়া রোজকার পর্যটকরা আছেনই। পাথরচাপুড়িতে পর্যটকদের আরও উন্নত পরিষেবা দিতে প্রশাসনিক স্তরে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সিউড়ি শহর পার করে তিলপাড়া জলাধার। ময়ূরাক্ষী নদীকে বেঁধে গড়া ঐ জলাধার সম্প্রতি নাম বদলে হয়েছে মিহিরলাল ব্যারেজ। বীরভূমে পুরোনো হয়ে যাওয়া পর্যটন কেন্দ্রগুলের মধ্যে অন্যতম এই কেন্দ্র। ব্যাপক সম্ভাবনা থাক সত্ত্বেও নানা কারণে এখানে গড়ে ওঠেনি পর্যটন কেন্দ্র। তবু বোটিং-এর একটি প্রকল্প এখানে গড়ে উঠতে চলেছে।

পানাগড়-মোরগ্রাম সড়ক যে কত উন্নতমানের তা এ পথে চললেই বোঝা যাবে। সিউড়ি পার করে মহম্মদ বাজার। জেলার প্রধান শিল্প পাথর খনি অধ্যুষিত অঞ্চল, আছে চীনে মাটির কিছু খনি।

এরপর গণপুর বনাঞ্চল। এখনও যথেষ্ট ঘন ঐ বনভূমি। এখানে জলস্তর প্রাকৃতিক কারণে অনেক উঁচুতে ফলে দেউচা থেকে শুরু করে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে মাটির নীচ থেকে ওঠা জলে ভরে থাকা অনেক জলাশয়কে। গণপুরে বন বিভাগের বাংলো আছে। গণপুর শেষ হওয়ার মুখে ছোট্ট ক্যানেল তার পাড় ধরে উঁচু নীচু পথে চলাও এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। গণপুর মল্লারপুর ছাড়িয়ে রামপুরহাট ঢোকার আগে ডান দিকে ঘুরে গিয়ে ১১ কিমি দূরে তারাপীঠ। হিন্দুধর্মের প্রাচীন ধর্মস্থান, যেখানে বাইরে থেকে প্রতিদিন কয়েক হাজার পুণ্যার্থী আসেন। এখানে প্রধান মন্দির কয়েক শতকের পুরোনো, মূল মন্দিরের বাইরেও আছে অসংখ্য মন্দির। দ্বারকা নদীর কোলে এই পর্যটন কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এখন পুরোদমে কাজ চলছে। প্রায় ৩৫০টির মতন লজ হোটেল আছে তারাপীঠে। সবরকম মানের পর্যটকদের ভিড় প্রায় সবসময় থাকায় বীরভূমে সব থেকে বেশি লাভবান তারাপীঠের হোটেল শিল্প।

ডাবুকেশ্বর মন্দির (তারাপীঠের কাছে) ছবি : মানস দাস

তারাপীঠ থেকে ৮ কিমি দূরে বীরচন্দ্রপুর। বৈষ্ণব ধর্মের পুন্যার্থীদের কাছে আকর্ষণ কেন্দ্র। কিছু পুরোনো মন্দির আছে এখনও। তবে পর্যটকদের সংখ্যা কম হওয়ায় এখনও বীরচন্দ্রপুর হিসেবের বাইরেই থেকে গেছে।

তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট, মফঃস্বল শহরের চরিত্র নিয়েই বড় হয়ে উঠছে এই শহর। রামপুরহাট থেকে অনেকে যান দু' ঘণ্টার পথ পার হয়ে ঝাড়খণ্ডের মশানজোড় বা সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ দেওঘরে। দেওঘর যাওয়ার অসংখ্য বাস রামপুরহাট রেল স্টেশন চত্বর থেকে সারাদিন ছাড়লেও মশানজোড় যাওয়ার সরাসরি বাস নেই, তাই গাড়ি ভাড়া করাই সহজ।

রামপুরহাট থেকে যাওয়া যায় নলহাটি। আরেক গঞ্জ, তবে এখানেও নলাটেশ্বরী মন্দির ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ছে। মন্দিরের পেছনে ছোট্ট টিলা; স্থানীয়রা বলেন পাহাড়। বীরভূমের অন্যতম প্রাচীন এই গঞ্জ, আয়ুর্বেদ থেকে কৃষি সবেই সেরা বলে খ্যাত নলহাটি, আছে কিছু ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যও। নলহাটি থেকে ১৩ কিমি পথ পার করে লোহাপুর সেখান থেকে বারা গ্রাম। ঐতিহাসিক স্থান, পুরানের বারনাবত নাকি ঐ গ্রাম, তবে এখনও পালি ভাষায় লেখা শিলালিপি এবং অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে গ্রামের পুকুরঘাট থেকে সর্বত্র। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যে এ গ্রামে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। লোহাপুর থেকে বার হয়ে উল্টো দিকে ভদ্রপুর বা আকালীপুর গ্রাম। এখানে প্রাচীন কালীবাড়ি ধর্মীয় স্থানের তালিকায় আছে। ব্রাহ্মণী নদীর পাড়ে সেই কালীমন্দির এখন ভগ্নপ্রায়, একই জীর্ণদশা রাজ-বাড়ির। তবু ভদ্রপুর গ্রামের এক আকর্ষণ আছে। এ পথ থেকে ঘুরে নলহাটি হয়ে মুরারই সেখান থেকে আধ ঘণ্টার পথ পাইকর। জৈন সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কয়েক শতক আগে এখানে ছিলেন তারা ধর্মাচরণ করার সঙ্গে এখানে যে নানা কাজকর্ম করতেন সে বিষয়ে নানা কাহিনী শোনা যায়। পাইকরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক সম্পদ হারিয়ে গেছে। নাহলে পাইকর তার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলতে পারত। আমাদের এই চেনা ছকের বাঁধা পথের বাইরে থাকছে সাঁইথিয়া। নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের জন্যই কিছু পুণ্যার্থী সাঁইথিয়া যান, সাঁইথিয়ার রেল স্টেশনের পাশে ঐ মন্দিরে একটি পুরোনো গাছ দর্শনীয় বিষয় পর্যটকদের কাছে।

আছে ময়নাডালের মতন জায়গা, কীর্তন গান শেখানোর প্রথম স্কুল চালু হয়েছিল যেখানে, সেখানে এক আশ্রম এখনও আছে, আছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকাচার। আছে সাঁইথিয়া পার হয়ে কল্লেশ্বরের শিবমন্দির।

পর্যটনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জেলার লোকসংস্কৃতি লোকশিল্প। এখনও যা নিয়ে গবেষণা চলছে অন্তহীনভাবে বীরভূমের হাবু, ভাদু, লোটো, কবি, বাউল ফকিরি গান, রায়বেঁশে, দাঁসাই, করম মগয়া নাচ এসব হরেক সম্ভারে আজও সমৃদ্ধ বীরভূম। কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়-এর মতন মানুষের কলমে বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বীরভূমের ছবি, সে ছবি, সময়ের সঙ্গে বদলালেও চরিত্র এখনও অমলিন হয়েই আছে। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মসংগীত উপাসনার ধ্বনি, পাথরচাপুড়ির আজান, তারাপীঠের ঘণ্টার সুর সব মিলেমিশে আছে বীরভূমের পর্যটনের স্রোতের সঙ্গে। এখানে বাউল ফকির গায়কদের মেলা বসে, সরকারি উদ্যোগে ৩০ জুন থেকে ১ জুলাই প্রতি বছর সিউড়িতে বসে জেলার সেরা লোক-সংস্কৃতির আসর।
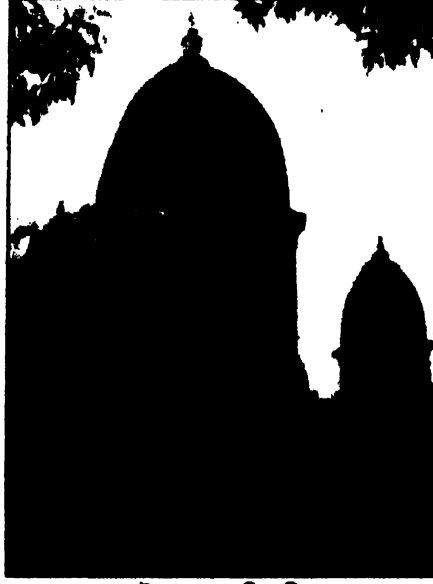
জেলার অন্যতম উচ্চ বক্রেশ্বর শিবমন্দির

ছবি : মানস দাস

বীরভূমের মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় গৌরবময় ঐতিহ্যের নিদর্শন। জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে।

এ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা না হয়েও জেলাকে ঘুরে দেখলে সব ভালোলাগার অংশীদার হতে পারবেন সব পর্যটক।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়াও যুবকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত যুব আবাস

বক্রেশ্বর

(ক) ডরমিটরি ৬৫টি শয্যা। ভাড়া ছাত্র প্রতি ১০ টাকা, ছাত্র নন এমন জনপ্রতি ২০ টাকা। (খ) তিন শয্যার ৩টি, ঘর প্রতি ভাড়া ১০০ টাকা।

বোলপুর

(ক) ডরমিটরি ২২টি শয্যা। ভাড়া ছাত্র প্রতি ১০ টাকা, ছাত্র নন এমন জনপ্রতি ৩০ টাকা। (খ) দুই শয্যার (বাতানুকূল) ২টি, ঘর প্রতি ২৫০ টাকা। (গ) চার শয্যার ১টি, ভাড়া ১৭৫ টাকা।

ম্যাসাঞ্জোর

(ক) ডরমিটরি ২৫টি শয্যা। ভাড়া ছাত্র প্রতি ১০ টাকা, ছাত্র নন এমন জনপ্রতি ২০ টাকা। (খ) দুই শয্যার ২টি (অতিরিক্ত ২টি শয্যা সহ) ভাড়া ঘর প্রতি ৬০ টাকা।

বনবিভাগের বন-বাংলো

গণপুর :

স্যুটের সংখ্যা—২, দুই শয্যা ঘরের সংখ্যা—২। পর্যটকদের জন্য ভাড়া ১৫০ টাকা, সরকারি কাজে গেলে ১৫ টাকা।
বুকিং কর্তৃপক্ষ-বীরভূম, তদারককারী রেঞ্জ, বোলপুর।

বল্লভপুর :

স্যুটের সংখ্যা—১, দুই শয্যা ঘরের সংখ্যা—১। পর্যটকদের জন্য ভাড়া ১৫০ টাকা, সরকারি কাজে গেলে ১৫ টাকা।
বুকিং কর্তৃপক্ষ—বীরভূম, তদারককারী রেঞ্জ, বোলপুর।

ইলমবাজার :

স্যুটের সংখ্যা—২, দুই শয্যা ঘরের সংখ্যা—২। পর্যটকদের জন্য ভাড়া ১২৫ টাকা, সরকারি কাজে গেলে ১৫ টাকা।
বুকিং কর্তৃপক্ষ—বীরভূম, তদারককারী রেঞ্জ, বোলপুর।

অজয়ের তীরে

রসিক যারা পার হয় তারা
তারাই নদীর ধারা চেনে.... (লালন)

সৌজন্যে : আনন্দবাজার পত্রিকা

বীরভূমের মেলা

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

গ্রামকেন্দ্রিক জেলা হল বীরভূম। এ জেলার শহরগুলিও গ্রামের উপর নির্ভরশীল। তাই গ্রামীণ কৃষিশিল্প ও কুটিরশিল্পের বাৎসরিক বাজার বা 'মার্কেট' হিসেবেই এ জেলায় 'মেলা'র সৃষ্টি হয়েছে, এমন অনুমান করেন সমাজবিজ্ঞানীরা। জেলার অর্থনীতির সঙ্গে এইসব বাজার বা হাটগুলি জড়িত। ষাটের দশকের আগে এ জেলায় সিউড়ি ভিন্ন আর কোথাও নিত্য বাজার ছিল না। রামপুরহাট চিহ্নিত ছিল 'হাট-রামপুরহাট' নামে, বোলপুরেও দুটি হাটবার আজও আছে। বিষ্ণুপুরের হাটে মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেঙে আসত মানুষ কৃষির সব জিনিসপত্র কিনতে। দুর্লভ সব বীজ পাওয়া যেত এই হাটে। রাজগ্রাম এবং নলহাটির হাটে আসত কাঠ-কাঁড়ি-দুনি ইত্যাদি থেকে হাঁড়ি-হোলা-কামারঘরের হাতা-খুন্তি পর্যন্ত। নারায়ণপুরের হাটে সাঁওতাল আদিবাসীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রই আসত বেশি। রাজনগর-নারায়ণপুর-রাজগ্রাম প্রভৃতি জায়গার হাটে ঝাড়খণ্ড থেকে খরিদ্দার আসে প্রচুর, সেজন্য সেখানে তাদের প্রয়োজন অনুসারে জিনিসপত্রের

জয়দেব কেঁদুলির মেলায় মানুষের ঢল ছবি : লেখক

পাথরচাপুড়ির দাতাবাবার মেলা, জয়দেব কেঁদুলির বাউলমেলা, আকালিপুরের মেলা, কলেশ্বর-বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা, মুলুকের রামকানাইয়ের মেলা। শ্যামচাঁদ চার ভাইকে ভাড়া করে এনে মেলা। সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্রহ্মদত্তির মেলাই রয়েছে ৫২টি, আছে ধর্মরাজের মেলাও। সবই কিন্তু গ্রামীণ জনজীবনের অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত।

মেলা মিলনের প্রতীক। তবে বীরভূম জেলার মেলাগুলির মধ্যে ভিন্ন এক সুর ও স্বাদ রয়েছে। যা কিনা তার নিজস্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে আজও প্রকাশ করে চলেছে। এ জেলার মেলাগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ মেলা হল শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা। শহর ও গ্রামের মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে একদা এই মেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শ্রীনিকেতনের মাঘমেলা সম্পূর্ণ গ্রামীণ মেলা। তবে গ্রাম-ভারতের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ মেলা হল জয়দেব-কেঁদুলির জয়দেবের মেলা, যা কিনা বর্তমানে বাউলমেলা নামেই পরিচিত। পাথরচাপুড়ির দাতাবাবার মেলা এবং আকালিপুরের কালীতলার মেলাও বেশ বিখ্যাত। এ জেলায় ধর্মকেন্দ্রিক, লোকদেবতা কেন্দ্রিক, এবং বাউল-বৈষ্ণব-শাক্তদের নানান পুজোকে কেন্দ্র করেই মেলাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোথাও নতুন মেলা বসছে, আবার পুরনো ঐতিহ্যবাহী মেলা বন্ধও হয়ে যাচ্ছে।

খুশতিগিরি গ্রামটি বর্তমানে খুষ্টিগিরি হয়েছে। এ গ্রামে মহরম আর শবেবরাতকে কেন্দ্র করে দুটি মেলা বসে। নাম মেদিনীমেলা। গ্রামে শাহ্ আবদুল্লা কেরমানী সাহেবের মাজার আছে, মাজার এবং মসজিদের কাছেই একটি পুকুর—নাম 'গঙ্গাগড়ে'। এই গঙ্গাগড়েতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্যফল অর্জন করতে ডুব-স্নান করেন। মেদিনীমেলা মূলত মেয়েদের মেলা, এ মেলায় মেয়েদের জিনিসপত্রই বেশি বিক্রি হয়। এ মেলার বিশেষ আকর্ষণ হলো 'শাহ খেতাবী সন্দেশ'। দ্বিতীয় মেলাটি হলো এ গ্রামের উরস মেলা। ৯৫৫ হিজরীর ৪ সফর, শাহ্ কেরমানী সাহেব মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁর তিরোধান দিবস উপলক্ষেই এই মেলা। ইসলামপুরেও উরসমেলা হয়। ১৫ ফাল্গুন উরস মেলা হয় সিউড়ি থানার লাঙুলিয়া গ্রামেও। রাজনগরের উরস মেলা ২৩ ফাল্গুন থেকে।

মঙ্গলডিহির রাসমেলা বীরভূম জেলায় সুবিখ্যাত। গ্রামের ছোটবাড়ি এবং বড়বাড়ির বিগ্রহ রাধাবিনোদ এবং রাধামদন-গোপালের সেবকেরাই এই রাসোৎসবের আয়োজন করেন। এই

সঙ্গে শালপাতা এবং জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত বিক্রি হত। খয়রাশোল-পাঁড়ুই-চাতরা-মুরারই-বীরচন্দ্রপুর-কোটাসুর-সাঁইথিয়া-ময়ূরেশ্বর-মাড়গ্রাম-শিমুলিয়াহাট-লাভপুর-নানুর-কীর্ণাহার-ইলামবাজার-দুবরাজপুর সর্বত্রই হাট বসেছে সপ্তাহের বিশেষ একটি বা দুটি দিনে। ক্রেতা কিন্তু সর্বত্রই গ্রামীণ কৃষিকেন্দ্রিক মানুষ। সুতরাং হাঁড়ি-হোলা-জাল-লোহা ও কাঠের জিনিসপত্র-কাঠ-পাতা-বীজ এইসবই ছিল এইসব হাটের মূল বিক্রির উপাদান। এখন সব হাটেরই চরিত্র বদল হয়েছে, সবখানেই গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে 'নিত্য বাজার'। তবে বাটপলশার কাঁচা সবজির হাট বীরভূমে সুবিখ্যাত। এইসব হাটে ঝুড়ি-চাঙারি-খারুই-ধামা-কুলো সবই পাওয়া যায়। আজও পাওয়া যায়।

'মার্কেট' বা 'বাজার' হিসেবেই মেলার উদ্ভব, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা উন্নতির কারণেই 'ডেলি মার্কেট' বা 'নিত্য বাজারের' প্রয়োজন হয়েছে মানুষের। কৃষি-সহায়ক জিনিসপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র, কুটিরশিল্প ইত্যাদি বিক্রির বাৎসরিক বাজার হিসেবেই এ জেলায় এসেছে মেলা। এখন তো পৌষ মেলায় মোটরগাড়ি পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। এ জেলায় পরিকল্পিত মেলাও হয়েছে অনেক, তবে সিউড়ির 'বড় বাগানের মেলা'ই এ বিষয়ে পথিকৃত। কৃষি ও কুটিরশিল্পকে উৎসাহদান, লোকশিল্প চর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই এসব পরিকল্পিত মেলাগুলি উঠে এসেছিল। রামপুরহাটে এমন কৃষি প্রদর্শনীর মেলা বসিয়েছিলেন জে এল ব্যানার্জী। সাঁইথিয়া-আমোদপুরের নেতাজি-বিবেকানন্দ মেলা, সিউড়ির সারদামেলা, দুবরাজপুরের রামকৃষ্ণমেলা, মল্লারপুরের রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের মেলা প্রভৃতি যেমন পরিকল্পিত মেলার তালিকায় রয়েছে, তেমনই ধর্মীয় মেলার তালিকায় আছে

মেলার অন্যতম আকর্ষণ 'বনভোজন', 'বাজি পোড়ানো', 'সাঁওতাল মাঝিদের নাচ-গানের অনুষ্ঠান', 'বিরামভোগ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একসময় মন্দির থেকে শুরু করে রাসমঞ্চ পর্যন্ত দোকান বসত, যাত্রগান হত। এখন কমে এসেছে সবই, তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সবই রয়েছে। মঙ্গলডিহি ছাড়াও এ অঞ্চলেই কোমা এবং দীঘা গ্রামে রাসের মেলা হয়। বাতিকার অঞ্চলের উলুন্দি গ্রামে পার্বতী মা আয়োজিত রাসপূর্ণিমায় আবির খেলা এবং মিষ্টি বিতরণ এখন ছোটখাটো মেলার মতোই আকার ধারণ করেছে। কীর্ণাহারে বসে চণ্ডীদাস পরিকল্পিত মেলা।

এই অঞ্চলের 'কড্ডাং' গ্রামে ধর্মরাজপুজো উপলক্ষে বসে বিরাট মেলা। মেলাটি হয় বুদ্ধপূর্ণিমায়। পুজো, হোম, ভাড়ার, বহন, আগুন খেলা, ধূপ খেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলা চলে তিন দিন। একই সময়ে একই মেলা হয় 'বনশঙ্কা' গ্রামেও। বাতিকার অঞ্চলের জাহানাবাদে চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে, কান্দপুরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় ধরমপুজো উপলক্ষে, কুরমিঠায় আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধরমপুজো উপলক্ষে একবেলার মেলা বসে। লেব্রাশ্বরে শিবের গাজন উপলক্ষে ২/৩ দিনের মেলা বসে। নগরীতে বসে ব্রহ্মচারী মেলা।

পারুই, কাটনা, বনশঙ্কা, রোঙাইপুর, বাতিকার, গড়গড়িয়া, সারাভাসা প্রভৃতি গ্রামে ব্রহ্মদৈত্য পুজো উপলক্ষে মেলা বসে। ১ থেকে ৫ দিনের স্থায়িত্বে এসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোকে 'এক্কেন' পুজোও বলে। সাধারণত মাঘের প্রথম দিন এই মেলা হয়। কাটনার মেলায় কদমা বিক্রি হয় প্রচুর। বাতিকার, গড়গড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের মেলাগুলি সম্প্রতি আর বসছে না। ঋষি পঞ্চমী বা বক পঞ্চমী উপলক্ষে বনশঙ্কা এবং নবগ্রামে শীতলা ও মনসা পুজোর মেলা বসে। সারাদিনের মেলা। এলাকার বিরুলি, করকরি-শীর্ষা এবং কলু-শীর্ষা গ্রামে দশহরা উপলক্ষে একবেলার মেলা বসে। দুবরাজপুর থানার বসহরি এবং খোশনগর গ্রামে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ২/৩ দিনের মেলা বসে। আগে খোশনগরের মেলায় যথেষ্ট পুতুল বিক্রি হত। এখন সেসব কমে গেছে।

তারাপীঠ মন্দির এলাকায় এখন সবসময়ের মেলা। তথাপি আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে বেশ বড় মেলা বসে। কথিত আছে এই তিথিতেই নাকি বণিক জয়দত্তের মৃত একমাত্র পুত্র পুরন্দর মন্দির সংলগ্ন জীয়ৎ বা জীবিত কুণ্ডের জলস্পর্শে পুনর্জীবন লাভ করে। চতুর্দশীর ভোরে মূল মূর্তির মা তারাকে মন্দির থেকে বের করে জীয়ৎকুণ্ডের জলে স্নান করানো হয়। সাম্প্রতিক কালে বামাখ্যাপার মহাপ্রস্থানের দিন ৩ শ্রাবণ তাঁকে স্মরণ করেও বিরাট মেলা বসে তারাপীঠে।

তারাপীঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ৮ কিমি দূরেই বৈষ্ণবতীর্থ বীরচন্দ্রপুর। নিত্যানন্দ এবং তাঁর ছেলে বীরচন্দ্রের জন্মস্থান। এখানে যমুনা নামের একটি ছোট নদীর পূর্বদিকে গর্ভবাস আর পশ্চিমে বীরচন্দ্রপুর। এই গর্ভবাসেই নিত্যানন্দের পিতা হারাই পণ্ডিতের আদি নিবাস ছিল। গর্ভবাসের আদি নাম খলৎপুর। বীরচন্দ্রপুরে বাঁকারায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র। তাঁর নামানুসারেই হয়তো গ্রামটির নাম হয়েছে। এই বাঁকারায়ের উদ্দেশে বীরচন্দ্রপুরে রথের মেলা এবং গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা বসে। মাঘ মাসে প্রভু নিত্যানন্দের জন্মতিথিকে স্মরণ করে অনুষ্ঠিত হয় আরাধনার মেলা। মেলাটি চলে প্রায় সাত দিন। এছাড়াও এলাকাটি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের জায়গা 'একচক্রা' হিসেবে চিহ্নিত। বীরচন্দ্রপুর থেকে কোটাসুর পর্যন্ত নাকি সেই 'একচক্রা'র সীমানা। এখানেই ভীম নাকি বকরাক্ষসকে বধ করে এলাকার মানুষের মনে স্বস্তি এনে দেন। বকরাক্ষসের হাঁটুর মালাইচাকি এবং কুন্তির মদনেশ্বরকে দেখানো প্রদীপ নামের দুটি বস্তুও এখনো দেখা যায় কোটাসুরের মদনতলায়।

খাসপুর বা শাসপুরের কাছেই, বীরচন্দ্রপুরেরও কাছে ডবাক বা ডাবুক। এখানের ডাবুকেশ্বর মন্দির বীরভূমের সব থেকে উঁচু মন্দির। কথিত আছে কৈলাসানন্দ বা কৈলাসপতি ব্রহ্মচারী চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনে গিয়ে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ পান। তারপর ডাবুকে এসে ১২৮৩ সালে ডাবুকেশ্বর শিবের মন্দির নির্মাণ শুরু

জয়দেব মেলায় — ছবি : লেখক

পাথর চাপুড়ি মেলা ছবি : অনির্বাণ সেন

বড় গ্রাম এবং বীরচন্দ্রপুরের কাছেই। গ্রামের গোঁসাইদাস একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে একটি পুকুরের পাড়ে ছায়াময় এলাকায় তাঁর নামেই মেলা বসে। দক্ষিণ গ্রামের পাশেই দক্ষিণে রাতমা গ্রাম, এ গ্রামেই জন্মেছিলেন ড. সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। রাতমার 'ধরমপুজো' এলাকায় বিখ্যাত। বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায় এই ধর্ম > ধরম বা ধর্মরাজের পুজো হয়। মেলাও বসে।

এখন থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তের গ্রাম ঢেকায় বাস করতেন রাজা রামজীবন রায়। কৃষি কাজের জন্য রামজীবন রায় ঢেকা এলাকায় বহু দিঘি খনন করিয়েছিলেন। ঢেকার 'রামসাগর' তার অন্যতম। এই রামসাগরের পাড়েই পয়লা মাঘ বসে ব্রহ্মদৈত্য মেলা। ঢেকার ব্রহ্মদৈত্য মেলা এলাকায় যথেষ্ট সমাদৃত। ঢেকার কাছেই কলেশ্বর। কলেশ্বর শিবমন্দির মনোরম এলাকায় সুন্দর কারুকাজে নয়নাভিরাম। শৈবতীর্থ কলেশ্বর ধামে কলেশনাথ বা কলেশ্বর অনাদিলিঙ্গ শিব বর্তমান। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে সাতদিনের মেলা বসে। এই শিব সম্পর্কে একটি প্রবাদ চালু আছে—

কুমারী, পাবি তুই মনের মতো বর,
হৃদে ভক্তি রেখে কলেশনাথের উপোষ কর।

ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণ তীরে ভালকুঠি গ্রাম। গ্রামের মাঝখানে

জয়দেবের মন্দির, পোড়ামাটির শিল্প ছবি : পাপান ঘোষ

করেন, নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১২৮৭ সালের ২ আষাঢ়। এখানে শিবরাত্রির সময় মেলা বসে। এখানে প্রতিদিন দ্বাদশ ব্রাহ্মণের সেবা হয়।

বীরচন্দ্রপুরের চার কিমি পূর্বেই ঘোষগ্রাম। বীরভূমের সীমান্ত। ঘোষ গ্রামে লক্ষ্মীপুজোর সময় সারা পৌষ মাস জুড়েই মেলা। তবে প্রতি বৃহস্পতিবারেই তার বাড়বাড়ন্ত বেশি। এখানে মা-লক্ষ্মীর পাশে দুটি মূর্তি আছে, পাণ্ডারা বলেন—'ওর একটি ধন অন্যটি কুবেরের'। এখানের লক্ষ্মীমাকে নিয়ে নানান গল্পকথা-ছড়িয়ে আছে এলাকায়। মূর্তিটি নাকি স্বপ্নাদিষ্ট এবং নিমকাঠের তৈরি। লক্ষ্মী কৃষি দেবী হলেও এখানের মেলায় কিন্তু মহিলাদেরই সমাগম সর্বাধিক। বলা যেতে পারে এটি মেয়েদের মেলা। ঘোষগ্রামের কাছেই 'উপ্লয়' গ্রাম। লোকে বলে—'ঘোষগ্রামে মা লক্ষ্মী / উপ্লয়ে রব'। আসলে এলাকায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বেশ ভালই। এবং তা নাকি এই লক্ষ্মীমায়ের আশীর্বাদেই।

ময়ূরেশ্বর থানা এলাকায় শিবগ্রামে পৌষ সংক্রান্তির মেলা হয়, বহু পটুয়া এ মেলায় আসে। এই থানাতেই দক্ষিণ গ্রাম একটি

চামুণ্ডার মন্দির। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক মেলা বসে। কাছের গ্রাম মাকুড়ায় শিবের মেলা, দোনোবাগে গঙ্গামেলা, নিমুনিয়ায় মনসা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ময়ূরাক্ষীর উত্তর পারে এক সন্ন্যাসীর তিরোধান উপলক্ষে বসে সন্ন্যাসী মেলা। এই মেলাগুলি বর্তমানে অবলুপ্তির পথে।

ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে সুগনপুর গ্রামে বটগাছের তলায় বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনদিন ধরে চলে মেলা। প্রচলিত আছে, এই মেলা থেকে পদ্মফুল কিনে পুজোয় অঞ্জলি দিলে তার শরীরের শ্বেত ধবল সেরে যায় বা কোনদিন হয় না, অন্যান্য চর্মরোগও নিরাময় হয়।

ডেউচা গ্রামে উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাশে ৩/৪ দিনের শ্যামচাঁদের মেলা বসে। প্যাটেলনগরের কাছে খড়িয়া গ্রামে কার্তিক মাসে বসে দু-দিনের গোষ্ঠ মেলা। মকদমনগরের আমবাগানেও একই সময়ে একই মেলা হয়। এই মেলায় এলাকার সাঁওতালেরা বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে বলে শোনা যায়। চৈত্র মাসে দ্বারকা নদীর তীরে উস্কাগ্রামে বসে বারুণীর মেলা, ওই সময় ডিম নিয়ে নদীর জলে ডুবতে পারলে নাকি খোস-পাঁচড়া ভাল হয়। ভাদ্র মাসে একদিনের মেলা বসে বগা পঞ্চমীকে কেন্দ্র করে রঘুনাথপুর, পুনুর এবং বন-বাণীপুর গ্রামে। কথিত আছে এক মুসলমান বাড়ির পুজো না এলে রঘুনাথপুরের পুজো শুরুই হয় না। পৌষ মাসের ২২/২৩ তারিখ তিলডাঙা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় মালাং জাকারিয়া পীরের উরস মেলা।

নানুর থানার জপেশ্বর শিব-চতুর্দশীর মেলা। জপেশ্বর অনাদিলিঙ্গ শিবের নিমিত্ত এই মেলা বসে। কিংবদন্তি আছে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে মেদিনী-উত্থিত জপেশ্বরের আবির্ভাব ঘটে। পরে আদি মন্দির ছাড়াও দক্ষিণমুখী তিনটি, পূর্বমুখী তিনটি এবং ভোগমন্দির একটি অনুষঙ্গী মন্দির হিসেবে বর্তমান। প্রচলিত আছে শিবের গা-ধোয়া জল ক্ষীরকুণ্ডে জমা হয়ে তা সুড়ঙ্গ পথে দু-মাইল দূরের হরানন্দনপুর গ্রামের পাশে বামুনদহে জমা হয়। গাজন উৎসবে বামুনদহের জলই গঙ্গাজলের মর্যাদায় ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমের শিবকুণ্ডের জলেই চলে ভোগ রান্না এবং পুজো-পার্বণ। শিব মন্দিরের কাছেই বড় পাকুড়গাছের নিকটস্থ রক্ষাকালীর বেদি। জুবুটিয়ার কালীপদ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষ গোরক্ষনাথ শিবের আদি পুরোহিত। গোরক্ষনাথের উত্তরপুরুষ মুরালীধর চক্রবর্তীই শিব-চতুর্দশীর উৎসব প্রবর্তন করেন। তখন মেলা হত বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত। মুরলীধরের মৃত্যুর পর প্রায় ৯০০ বছর আগে তাঁর দুই ছেলে সাহেবরাম ও খেলারামের হাতে শিবসেবার দায় এসে পড়ে। শিবের তখন ৭০০ বিঘে সম্পত্তি। মুর্শিদাবাদের 'এরোয়ালি' > এরোল গ্রামের মহারাজ-কর্মচারী রাজা রামজীবন রায়চৌধুরীর অধীনস্থ সেসব। তারও আগে শিবের সম্পত্তি ছিল মালবের রাজার। মালব রাজের দেওয়ান চক্রধর নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আদি মন্দির নির্মাণ করান এবং হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে নাকি বৌদ্ধপ্রভাব মুক্তও

জপেশ্বর মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ ছবি : পাপান ঘোষ

করেন। চক্রধর যেখানে বাস করতেন তা এখন 'চাকরবাগান', সেখানেই জপেশ্বর উচ্চ-বিদ্যালয়। অনুষঙ্গ মন্দিরের গায়ে ১১৩৫ সাল এবং সাহেবরামের নাম খোদিত আছে। দীর্ঘদিন শিবের সম্পত্তি রাজা রামজীবনের বংশধরদের হাতে থাকার পর ১৩২৭ বঙ্গাব্দে জমিদারি প্রথায় কলে কীর্ণাহারের শৈলেশচন্দ্র সরকারের হাতে আসে এবং শিবের মেলা ১ দিন থেকে ৪ দিনে উন্নীত হয়।

লোহাপুরের কাছে বারা গ্রাম প্রত্নসামগ্রীর জন্য বিখ্যাত। এই গ্রামে ২ মাঘ থেকে ২০ মাঘ পর্যন্ত লোহাজঙ্গ সাহেব পীরের স্মরণে মেলা বসে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বুড়োপীর তথা লোহাজঙ্গ পীরের আস্তানায় মানুষ আশ্রয় নেয় এই ক-দিন। তাছাড়াও দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জন এবং 'গোরুছোটা'কে কেন্দ্র করে এক বেলার মেলা বসে। বহু মানুষের সমাগমে ধানচালের দর নির্ধারণ এবং সূর্য প্রণামের পর গোরুর দৌড় আরম্ভ হয় ঢোল বাজিয়ে। ফাল্গুন মাসে লোহাপুরে শ্যামচাঁদাদি চার ভাইয়ের আগমন উপলক্ষে আগে বাথানডাঙায় মেলা বসত, এখন আর নিয়মিত বসে না। লোহাপুর থেকে নগরা মোড়, সেখান থেকে ভদ্রপুর। এই ভদ্রপুরের মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালিকা দেবী রয়েছেন ব্রাহ্মণী নদীর ধারে আকালিপুর মৌজায়। এই

আকালিপুরের কালীর উৎসব উপলক্ষে শারদ চতুর্দশী, পৌষ সংক্রান্তি এবং মাঘ রটন্তী তিথিতে মেলা বসে। পৌষে এখানে ব্রাহ্মণী নদীর চরভূমিতে পৌষালোর ধুম পড়ে যায়। গোরুর গাড়িতে চেপে অগণিত নরনারী এ মেলায় আসেন। স্থানীয় শিল্পীদের গড়া জিনিসপত্র এ মেলার আকর্ষণ। নলহাটিতে ফাল্গুন মাসে ৮/১০ দিনের মেলা বসত শ্যামসুন্দরাদি চারভাইয়ের আগমনকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া পঞ্চপীঠের এক পীঠ নলাটেশ্বরী চত্বরেও সোজা এবং উল্টো রথে প্রতি বছরই একবেলার মেলা বসে।

রামপুরহাটের পশ্চিমপ্রান্তে বুমকোতলায় শ্মশানকালীকে কেন্দ্র করে পৌষের প্রথম দিন সারা দিনের মেলা বসে এখানে। মেলাটি সাঁওতাল আদিবাসীদের নাচে-গানে জমজমাট থাকে। দেবী এখানে বুমকেশ্বরী নামে পূজিতা। পাশের কাঁদরে মিঠে জলের একটি প্রস্রবণ থাকায় এখানে জলের ধারা সতত প্রবাহিত।

বিকেল থেকে রাত্রি ১০/১১টা পর্যন্ত চৈত্র সংক্রান্তির মেলা ধামরী কালীর থানে। নলহাটি থানার এই জংলা জায়গায় কোনও বাড়িঘর নেই, পূর্বে বিলকান্দি এবং দক্ষিণে তৈলপাড়া গ্রাম, পশ্চিম এবং উত্তরে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী। শ্মশানকালী মাতার অঙ্গনে ১৫০/২০০ পাঁঠা বলি হয়। জমাট মেলা বসে। নলহাটি থানার আর একটি গ্রাম ধরমপুর, এখানে বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরী পুজো হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে। ধরমপুরে মনসা এবং চড়কের মেলা বসে। দুটি মেলাই একবেলার মেলা, তথাপি অফুরান আনন্দে আর দেয়াসীন ও গাজন ভক্তদের সমাগমে ভরপুর। ধরমপুরের পাশের গ্রাম বরলা, একদা রায়চৌধুরী জমিদারদের দাপটে ধরা। সুউচ্চ শিবমন্দির এবং রথ এখানের গৌরব। ২৫/২৬ ফুট উঁচু পিতলের রথটি সম্প্রতি চুরি হয়ে গেছে। ভাঙা অবস্থায় ৩০/৩৫ ফুট উঁচু কাঠের রথটি পড়ে আছে, তাকে আর টেনে বের করা যায় না। তবে মেলা বসে একবেলার, সোজা এবং উল্টোরথের দিন। দোলের দিন কালুহা গ্রামে সারাদিন শ্রীগোপালের মেলা বসে। কুরুমগ্রামে সরস্বতী পুজোর পরের দিন থেকে ৭ দিনের জন্য বসে বাণবন্তের মেলা। মূলত শিবের গাজনের উদ্দেশ্যেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

জোঘার গ্রামে চৈত্র-বারুণীতে জুগুদ্দামায়ের থান সংলগ্ন এলাকায় বিরাট মেলা বসে। তিন দিনের মেলা। গোরুগাড়িতে টপ্পর চাপিয়ে মানুষ আসে তাতে বসে। গাঁয়ের মা-বোনেদেরই ভিড় এ মেলায় সর্বাধিক। প্রচলিত আছে এখানের জুগুদ্দামা নাকি এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরেছিলেন বেলুন গ্রামের এক গৃহস্থের মেয়ে পরিচয় দিয়ে বাকিতে। পরে শাঁখারি সেই গৃহস্বামীর কাছে শাঁখার দাম চাইতে গেলে সে বলে 'আমার তো কোনও মেয়ে নেই, তুমি কাকে শাঁখা পরিয়েছ দেখাও'। পরে সেই শাঁখারি গৃহস্বামীকে জুগুদ্দা পুকুরের কাছে নিয়ে আসে এবং জুগুদ্দামা নাকি গভীর জল থেকে তাঁর শাঁখা পরা হাত দুটি তুলে দেখিয়েছিলেন। কথিত আছে, এই জুগুদ্দা পুকুরে স্নান করলে নাকি খোস-পাঁচড়া ভাল হয়ে যায়। জুগুদ্দামায়ের অঞ্জলি দিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারাই বেশি ভিড় করেন।

চাতরার কাছে রুদ্রনগর গ্রামে বাসন্তী পুজো উপলক্ষে পাঠানপাড়ায় পাথুরে পুকুরের ধারে প্রায় এক মাসের মেলা বসে। স্থানীয় শিল্পীদের গড়া জিনিসপত্রই এ মেলার মুখ্য আকর্ষণ। চাতরাতে কখনো কখনো শীতকালে ১০/১৫ দিনের কৃষিমেলা বসে। মুরারইতেও শ্যামচাঁদ চারভাইকে এনে মেলা বসানো হয়। মিত্রপুরে ব্রহ্মময়ী পুজো উপলক্ষে মেলা হয়। তবে জাজিগ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে কার্তিক মাসে যে মেলা বসে, তা প্রায় ১০/১৫ দিন চলে। এ মেলায় প্রচুর আখ বিক্রি হয়। ছাগ-মহিষ বলিও হয়। জাজিগ্রামের মেলা জেলায় সুবিখ্যাত। এ গ্রামে একসময় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের গোপন আস্তানা ছিল।

বীরভূমের কেঁদুলি গ্রাম, পৌষের শেষ দিনে মেলার পথে — ছবি : সৌজন্যে গণশক্তি

সাঁইথিয়া শহরের উপকণ্ঠে রক্ষাকালী মন্দির। এখানে মাঘ মাসের প্রথম দিন থেকে মেলা বসে। প্রায় দশ দিনের মেলা হয় সাঁইথিয়ায়— নেতাজী সুভাষ মেলা। তাছাড়াও সম্প্রতি রথের মেলা শুরু হয়েছে এ শহরে, সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয়েছে রথ। সারা বছর রথ রাখা থাকে নন্দেশ্বরী চত্বরেই নবনির্মিত রথঘরে।

রাইপুরের শিবদুর্গা মেলা খুব পুরনো নয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ২ বৈশাখ রাইপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন সাধু শঙ্করবাবা। প্রচুর বেলগাছ থাকায় জায়গাটির নাম দিলেন 'বেলবুনি', তারপর শিবরাত্রি তিথিতে প্রতিষ্ঠা করলেন শিবদুর্গা। ১৩৩৪ সালে সেখানে হল মহাযজ্ঞ। এলেন ভাবুকের কৈলাসপতি, রানীশ্বরের রুদ্রগিরি পরমহংস দেব, ইনি ছিলেন নেপালের মধ্যম রাজকুমার। ১৩৩৪ সালের ২৫ ফাল্গুন শঙ্করবাবা দেহ রাখলেন। সাতদিন পরেই শুরু হয় মেলা। ভক্তেরা নাকি তখন তাঁকে মেলায় ঘুরতে দেখেছেন। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে শঙ্করবাবা নাকি বাঘে চড়ে পাথরচাপুড়ির

শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় অস্থায়ী ছাউনি

ছবি : পাপাম ঘোষ

দাতাবাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এবং বামাখ্যাপার সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। বহু মেলাতেই এমন কিংবদন্তির গল্পগাথা ছড়ানো হয়েছে।

নানুরের কাছে চারকলগ্রামে রাধামাধবের মেলা বসে চৈত্রের ১৪ তারিখে। এক সপ্তাহের মেলা। ১৫৭০-৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে আকবর শাহের সেনাপতি মানসিংহ যশোর অধিকার করেন। যশোর থেকে এই রাধামাধবের বিগ্রহটি তিনিই নিয়ে যান অম্বরে। তারও কিছুকাল পরে সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দৌহিত্র প্রেমানন্দ গোস্বামী এই বিগ্রহকে উদ্ধারণপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার বহু পরে উত্তরাধিকার সূত্রে বিগ্রহটি নাকি চলে আসে চারকলগ্রামে এবং তখন থেকেই পুজো উপলক্ষে মেলার সূচনা।

দুবরাজপুরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত সাত দিনের অভেদানন্দ মেলা ধর্মের সঙ্গে মানব মনের এক অভিন্ন সংযোগ রক্ষা করে চলেছে আজও। মেলাটি হয় ডিসেম্বর মাসে। দুবরাজপুর স্টেশনের খানিকটা উত্তরেই 'ফকিরডাঙা', বিশাল বটের ঝুরি রেলপথের পাশেই। শাহ আলমের মাজার। কথিত আছে, তিনি নাকি ইরানের রাজকুমার ছিলেন। আষাঢ় মাসের শেষ শুক্রবারে সিন্নি চাপানো আর ধূপ জ্বালানো হয় মাজারে। মেলাও বসে। মেলাটি মুসলমান মহিলাদের, পুরুষদের সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত।

গ্রামের প্রাচীন নাম শিবপুর। গ্রামে অবস্থান করেন কোটেশ্বর ঠাকুর। তাঁর নামানুসারেই এখন গ্রামের নাম কোটা। এ গ্রামে বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের মেলা বসে। শীর্ষা গ্রামের বাবা ভৈরবনাথ ভুঁইফোড়। ১২৭০ বঙ্গাব্দে ভূদেব মজুমদার দেবকুণ্ড পুকুর থেকে বিগ্রহ তুলে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের তিনদিকে জল। দেবকুণ্ডের জলে স্নান করলে নাকি পেটের রোগ ভাল হয়। ২৮ জ্যৈষ্ঠ মাত্র একদিনের মেলা। প্রতি কার্তিক মাসে সুপ্রাচীন লোবা গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে শতাধিক ছাগ বলি হয়, একদিনের মেলা বসে। বাতাসা-কদমা বিক্রি এ মেলার বৈশিষ্ট্য। অজয় নদের ধারেই কেঁদুলি থেকে তিন কিমি দূরে ভুবনেশ্বর গ্রাম। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে একদিনের মেলা বসে। গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি হয়।

শাল নদী ঘেরা ছোট্ট গ্রাম খন্নিতে হজরত সৈয়দ শাহ্ তাজ বা সাদ আলি সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উরস মেলা বসে। শাল নদীর তীরে খয়রাশোলের কড়িধ্যা গ্রাম। গ্রামে রয়েছে ভালেশ্বরের মন্দির। চড়কপুজো উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তি এবং পয়লা বৈশাখ এখানে মেলা বসে। পাঁচড়া-পাইগড়া-পুরশুণ্ডা গ্রাম এলাকায় জনহীন প্রান্তরে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মাঘের প্রথম দিনে একটি জমজমাট মেলা হয়। খয়রাশোল থানার খড়বোনা গ্রামে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের মেলা বসে, এই খড়বোনা গ্রামের নামে কোনও মৌজা নেই।

সিউড়ির বড়বাগানের মেলা একসময় জেলায় সুবিখ্যাত ছিল। সম্ভবত ১৯৩৩/৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ এ মেলার উদ্‌বোধন করেন। নানান প্রদর্শনী ছিল এ মেলার মুখ্য আকর্ষণ। মেলাটি বন্ধ হয়ে গেলে ১৯৭২/৭৩ সালে কড়িধ্যার মাঠে শুরু হয় বিবেকানন্দ মেলা, সেও বন্ধ হয়ে গেছে এখন। একসময় সিউড়ি বিদ্যাপীঠের পরিচালনায় সারদা মায়ের জন্মতিথিতে বসতো সারদা মেলা সেও আজ বন্ধ। সিউড়ির বুকে এখন আর কোনও মেলা বসে না। বরং শারদ একাদশী এবং রথের দিন কলেজের পাশে পীরতলায় ঘণ্টা ২/৩-এর একটি ছোট্ট মেলা বসে। সিউড়ির পাশেই কড়িধ্যা গ্রাম, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে কড়িধ্যায় 'ভুঁইফোড় নাথে'র মন্দিরের সামনে ৪/৫ দিনের একটি মেলা বসে। সাঁইথিয়ার কাছে মালবেড়িয়া গ্রামে আষাঢ় মাসে প্রতি রবিবার ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে একটি ছোট মেলা বসে, এখানে বেলিয়ার মতো বাতের ওষুধও দেওয়া হয়। কাগাস-বেলে গ্রাম আমোদপুরের কাছেই। এই বেলে বা বেলিয়া গ্রামে কবি নজরুল ইসলাম একসময় তাঁর স্ত্রীর বাতের ওষুধ নিতে এসেছিলেন। এখানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন যম-যমীর পুজো হয়। ধর্মরাজ এখানে যমরাজ হিসেবে পরিচিত। এই বেলেতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের প্রথম রবিবার বড় মেলা হয়। রবিবার এখানে মাহাত্ম্যের দিন। গ্রামের তিলিকন্যা সরুবালা বাতগ্রস্ত হলে, তিনি নাকি স্বপ্নে বাবা রঙ্গলালকে পান এবং বাবা তাকে গদা পুকুরের ওষুধের নির্দেশ দেন। এক ডুবে গদা পুকুর থেকে পাঁক-শ্যাওলা-তেল তুলে বাতের জায়গায় মালিশ করে সরুবালার নাকি বাত ভাল হয়। তারপর থেকেই ধর্মরাজের মাহাত্ম্যকথা ছড়িয়ে পড়ে, শুরু হয় বাতের ওষুধ দেওয়াও। আমোদপুরের কাছেই ভ্রমরকোল গ্রাম। গ্রামে ব্রহ্মদৈত্য পুজো উপলক্ষে ১ মাঘ মেলা বসে। প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী মেলার প্রবেশ পথে একটি গাছে মাটির ঢেলা বাঁধার রীতিও রয়েছে ব্রহ্মদৈত্যের নামে। কাজ সিদ্ধ হলে নাকি ঢেলা খুলে পড়ে এবং মনস্কামনা পূর্ণান্তে পুজো ও মানসিক দেবার প্রথাও রয়েছে এখানে।

নানুর থানার অজয়-ছোঁয়া গ্রাম বাসাপাড়া। অজয়ের ওপারেই রাজা বিক্রমাদিত্যের মাহাল মঙ্গলকোট। বাসাপাড়াতেও বিক্রমাদিত্য গড়ে তুলেছিলেন প্রমোদনিকেতন—'বাসাবাড়ি', সেখান থেকেই নাকি 'বাসাপাড়া'র উৎপত্তি। কাছেই ব্রাহ্মণখণ্ড গ্রাম। এখানেই একদা বাস করতেন জমিদার আতাই মিঞা এবং তাঁর ছেলে আলাই মিঞা। আলাই মিঞাই বাবার নামানুসারে বাসাপাড়ার নাম বদলে 'আতাই নগর' করেন এবং একটি মেলার পত্তন করেন। ফাল্গুন মাসে ৫ দিনের জন্য এই মেলা বসে। নানুর থানার সেরপুর গ্রামে মাঘ মাসে বসে ৫/৬ দিনের পীরের মেলা। এই পীরের নাম শাহ্ মল্লিক। তিনি অন্যত্র বাস করতেন এবং নাকি হাওয়া খেতে আসতেন এই সেরপুরে। ছাতিন গ্রামের বাঁকা ডাঙাতেও বসত পীরের মেলা। মেলাটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাদশাহী সড়কের পাশে অনিয়মিতভাবে পীরের দরগায় মেলা বসে এবং সেখানে মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করা হয়। হাট সেরান্দির কাছেই খাজুটিতলা, সেখানে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে কালীমায়ের থানে। কাটোয়ার গঙ্গাদেবী জয়দেবের ডাকে কেঁদুলি যাওয়ার পথে ধূম্রক্ষেত্রতলায় নাকি অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন, সেই সূত্রে অজয় নদের বালিয়াড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে ধূম্রক্ষেত্রতলায়। খুজুটিপাড়ার 'উজান্তি'

শান্তিনিকেতনে ভুবনডাঙার মাঠ, পৌষমেলার প্রস্তুতি — ছবি : সৈনিক সেটসম্মান

কেঁদুলিতে মিষ্টির দোকান ছবি : পাপান ঘোষ

বা উজানি'র মাঠে ১ মাঘ একদিনের মেলা বসে। গঙ্গাদেবী উজানে কেঁদুলি যাওয়ার পথে নাকি নৌকো থেকে এখানেও একবার নেমেছিলেন। সেই সূত্রেই উজান্তিতলা বা উজানির মেলা। এখানে একটি বৈষ্ণব আশ্রম রয়েছে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং রজকিনী রামীর স্মৃতিরক্ষার্থে দোলপূর্ণিমায় মেলা বসে নানুরের দৈত্য-পুকুরের পাড়ে। পুকুরের পাড়ে মন্দিরের পাশে রামীর কাপড়কাচা পাটাটি আজও রক্ষিত আছে। আগে এই মেলাটি বসত বিশালাক্ষী তলায়। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ৪ বৈশাখ রাষ্ট্রমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ 'শ্রীশ্রী চণ্ডীদাস স্মৃতি তোরণ' উদ্‌বোধন করেন। তোরণটির নকশা করেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। 'চণ্ডীদাস মেলা' বর্তমানে ভুগছে পরিচর্যার অভাবে।

খয়রাশোল গ্রামে শ্যামাপুজোর আট দিন পর গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে গোষ্ঠমেলা বসে। বাঁধানো বেদিতে হলধারী বলরামের মূর্তি স্থাপিত হয়। আগে একদিনে মেলা শেষ হলেও এখন তা চলে ৩/৪ দিন ধরে। নাকড়াকোন্দায় দু-দিনের দোলমেলা বসে ফাল্গুন মাসে। বাঘাশোলা গ্রামের সর্বমঙ্গলা মেলা, হজরতপুরের দক্ষিণে ফাঁকা মাঠে জলাই বুড়ির মেলা, পর দিন বিকেলে হজরতপুরেই গোঁসাইতলার মেলা, সীমান্ত বীরভূমের গ্রাম গেড়ুয়াপাহাড়িতে সাঁওতালদের ছাতার মেলা, ভবানীগঞ্জে অজয় নদের তীরে শেওড়াবুড়ির মেলা—সবই একবেলার মেলা।

রসা গ্রামের উত্তরে হিংলো নদী। গ্রামের উত্তর সীমানাতেই বিখ্যাত কালীতলা, পাশেই শিবমন্দির এবং ভৈরবনাথের মন্দির। কালীমন্দির কখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা কেউই জানে না, তবে শিবমন্দিরের গায়ে স্থাপনের সময় লেখা আছে ১৫৭৬ শকাব্দ। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে বাৎসরিক গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় অনাদিনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে। পরদিন মন্দির চত্বরেই মেলা বসে—চৈত্রগাজনের মেলা। সর্বসাকুল্যে ঘণ্টা তিনেকের মেলা। তবে তাতেই পুতুল-ছবি-পাঁপড়ভাজা-জিলিপি সব শেষ।

পশ্চিম বীরভূমের ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন 'পারগুন্ডি' গ্রাম। গ্রামে প্রচণ্ডচণ্ডি তথা পায়রাচণ্ডি পুজো উপলক্ষে ৩-৭ মাঘ পর্যন্ত মেলা বসে। এলাকার জমিদার আগে মেলার খরচ বহন করতেন। শিমুলডিহি দত্তপুকুরে কালীপুজো উপলক্ষে পৌষমাসের অমাবস্যায় একবেলার মেলা বসে। এমন ছোট্ট মেলা মুন্দিরা গ্রামের গোঁসাই ঠাকুরের মেলা এবং কেষ্টপুরের 'আখ্যান পুজোর' জলাবুড়ি মেলাও।

ময়ূরাক্ষী নদীর কূলে বৈষ্ণবপীঠ নৌরঙ্গীধাম। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলি জেলার ভাণ্ডারহাটি গ্রামের বৈষ্ণব পরিব্রাজক গৌরমোহন ঠাকুর সিউড়ি হয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে বৃন্দাবন চলে যান। সিউড়ি থেকে ১৫ কিমি আসার পর বৃন্দাবন ফেরত জনৈক দ্বিজবরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তিনিই গৌরমোহনকে যুগল মূর্তি প্রদান করেন। পরে গৌরমোহন, মাধব দাসের কুটিরে যুগল মূর্তি স্থাপন করেন। সেই থেকেই নৌরঙ্গীধামে রাধামাধবের পুজো হয়ে আসছে। এখানে দোলপূর্ণিমার পাঁচদিন পর পঞ্চমী তিথিতে দু-দিন ধরে পঞ্চম দোলের মেলা হয়। মন্দিরের সামনে তমালতলায় সাধু-সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালায়। মেলার প্রথম দিন দোলমঞ্চে রাধামাধব জীউ অবস্থান করেন।

সিউড়ি থেকে ৮ কিমি পূর্বে পুরন্দরপুর গ্রাম। দেবতা পুরন্দরের নামানুসারেই নাকি গ্রামটির নাম হয়েছিল পুরন্দরপুর। এখন অবশ্য গঞ্জ। পুরন্দরনাথ এখানে ধর্মঠাকুর হিসেবেই পূজিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় পুরন্দরের পুজো এবং মেলা হত। সেই প্রাচীন মেলাটি উঠে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রহ্মদৈত্যের পুজো এবং সেই সুবাদে মেলাও হচ্ছে। জনশ্রুতি আছে গ্রামের ভক্তি সাহা এই মেলার প্রবর্তক। তিনিই দেবী কালী এবং ব্রহ্মদৈত্যকে পাশাপাশি রেখে পুজোর ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ৭-৮-৯ মাঘ, এই তিন দিনের মেলা।

বেহিরা গ্রাম পুরন্দরপুর হতে দু-কিমি দক্ষিণে। দুর্গাপুজোর পর একাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে গ্রামের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি ছোট্ট মেলা বসে। একাদশীর দিন শুধুমাত্র পুরুষ এবং ত্রয়োদশীর দিন শুধুমাত্র মহিলাদের মেলায় প্রবেশাধিকার থাকে। আট-নশো বছরের প্রাচীন নিমগাছের নিচে শীলাময়ী দেবীমূর্তি তাম্রফলকে ঢাকা থাকে। এই কারণে এই দেবীকে 'নিম্ববাসিনী কালী'ও বলা হয়। বক্রেশ্বর নদীর তীরে ছোট্ট বনভূমির মাঝখানে এই কালীমন্দির, বহু সাধকের লীলাভূমি। পঞ্চমুণ্ডির আসনও নাকি এখানে আছে এবং লোকপ্রবাদ, এটি নাকি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল।

ইন্দ্রগাছা গ্রাম পুরন্দরপুরের তিন কিমি পশ্চিমে। শোনা যায় ২৭০ বছর আগে মণিরাম নামে এক সাধক এখানে সিদ্ধি লাভ করেন এবং মা-কালীর মন্দির নির্মাণ করান। সেই থেকেই সাত হাত আট আঙুল উচ্চতাসম্পন্ন দেবী মূর্তি, চার হাতে খড়্গ-মুণ্ড-বর-

পাথরচাপুড়ির মেলায় হিন্দু সাধু—কেনাকাটা ছবি : অনির্বাণ সেন

জমিদারেরা কাঙ্কীশ্বর মন্দির তৈরি করে দেন, অতিথিশালাও নির্মাণ করান। চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে মহা সমারোহে পুজো হয় এবং মেলা বসে। প্রচুর বলিদান হয়। তবে মেলাটি সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রামীণ মেলা। এখন যেখানে মুনিকুণ্ডুর মেলা বসে সেখানে নাকি বহুকাল আগে মহামুনি বিভাণ্ডকের আশ্রম ছিল। বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ লোমপাদ আপন রাজধানীতে এনে আপন কন্যা সম্প্রদান করলে বিভাণ্ডক মুনি 'শিয়ান' ত্যাগ করে ময়ূরাক্ষীর তীরে ভাণ্ডীরবনে চলে যান। প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে শিয়ানের মুনিতলায় বসে মেলা। দু-দিনের মেলা। গ্রামে কালিনন্দীশ্বর শিবের গাজনও বিখ্যাত।

বোলপুর থানাতেই অজয় নদের গায়েই পরিত্যক্ত গ্রাম দেউলি। মকর সংক্রান্তিতে দেউলি গ্রামে মেলা বসে। পুণ্যার্থীরা অজয়ে স্নান করে গঙ্গা স্নানের পুণ্য অর্জন করতে চায়। জনশ্রুতি আছে, বৈষ্ণব কবি লোচনদাস এখানেই শিলাসনে বসে তাঁর চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। লোচনদাসের বংশধরেরা দেউলির পাশের গ্রাম কাঁকুটিয়ায় থাকেন এবং এখনো চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্তি পুজো করেন।

প্রবাদ আছে, সত্যযুগে সুরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন বোলপুরের কাছে অজয় তীরবর্তী অঞ্চলে। সুপুর গ্রামে রাজার রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুবিক্ষা মন্দির রয়েছে। কথিত আছে, এই সুবিক্ষা বা সুভিক্ষা মন্দির থেকেই রাজা সুরথ এক লক্ষ ছাগ বলিদান দিয়ে বোলপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। যার জন্য বোলপুর শহরের প্রাচীন নাম 'বলিপুর'। বলিপুরই পরবর্তীতে বোলপুর হয়েছে। এই সুপুরের সুরথেশ্বর শিবের পুজো উপলক্ষে মেলা বসে ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশীতে। নিত্য পুজো সহ এই মন্দিরের সেবা-পুজোর ব্যবস্থা করতেন রাইপুরের জমিদারেরা। জায়গাটি নির্জন এবং মনোরম, এক কিমির মধ্যে কোনও গ্রাম নেই। বোলপুর থেকে ইলামবাজারের রাস্তা চলে গেছে, বোলপুর থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে এখন একটি পাকা রাস্তা অজয় নদের দিকে চলে গেছে। এই দুটি রাস্তার সঙ্গমস্থলেই উঁচু টিবি, কয়েকটি মন্দির। এটিই সুরথেশ্বর শিবতলা নামে খ্যাত।

বক্রেশ্বর শৈবপীঠ এবং সতীপীঠও। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এখানে ৮ দিনের মেলা বসে। বক্রেশ্বর ধাম এবং মেলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাধক খাঁকিবাবার স্বপ্নাদিষ্ট শিষ্য ঋন্টু মহারাজের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। গোরুর গাড়ি, মুড়ির পুঁটুলি, গেঁয়ো মানুষের গন্ধে এখনো মেলাটি গ্রামীণ মেলা। এখানে দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে অষ্টাবক্র মুনির আশ্রম, বক্রনাথ মহাদেব, মহিষমর্দিনী, বটুক ভৈরব, পঞ্চ শিবলিঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পদচিহ্ন, মহাশ্মশান এবং গ্রামের আরও দেবদেবী। বক্রেশ্বর সম্প্রতি গড়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র

অভয়দানে প্রতিষ্ঠিত। দেবীর বাঁ পা শিবের বুকে চাপানো। কার্তিকি অমাবস্যা এবং প্রতিপদ তিথিতে গো-পুজো উপলক্ষে ইন্দ্রগাছায় দু-দিন ধরে মেলা বসে।

পতগুা গ্রামটি সিউড়ি শহর থেকে ছয় কিমি পূর্বে। গ্রামে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ শেষ প্রস্তর যুগের নানান নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। এখানে তেঁতুল গাছের গোড়ায় যে ব্রাহ্মণচণ্ডীর মূর্তি আছে তা নাকি হরগৌরীর মূর্তি। তবে পতগুায় ১ মাঘ যে মেলা হয় তা ব্রহ্মদৈত্যের মেলা নামে খ্যাত। সাঁওতালি নাচ-গান এ মেলার বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কোমা গ্রামে রামকানাই বিগ্রহের উপলক্ষে রাসমেলা হয়। পাঁরুইয়ের ব্রহ্মদত্যি মেলা, দমদমার বগা-পঞ্চমীর মেলা এবং নিরিশার শ্যামা পুজো উপলক্ষে মেলা সুপরিচিত। নিরিশার মেলা ৩-৪ দিন ধরেই চলে।

চৈতন্য প্রচারিত ধর্মমতে রাঢ়ের ৬৩ জায়গায় শ্রীপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। চৈতন্য পার্ষদ পণ্ডিত ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র কানুরাম জলন্দী (জলন্দারগড়) গ্রামে ১১০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর যৌবনে জলন্দী ত্যাগ করে তিনি পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তিনিই মুলুক গ্রামে গুপ্ত বৃন্দাবন আবিষ্কার করে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে কানুরামই রামকানাই ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হন এবং তিনিই মুলুকে গোষ্ঠমেলার প্রবর্তন করেন। মেলাটি রামকানাইয়ের মেলা নামেও পরিচিত। চলে চার দিন। মুলুকের 'ঠাকুরবাড়ি'র মধ্যভাগে রামেশ্বর শিবতলার পূর্বদিকের মাঠে মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। মেলার আকর্ষণ কীর্তন গান। তাছাড়া আউল-বাউল-কর্তাভজাদের গানও হয় মেলায়। কার্তিকের প্রথমে মেলা বসে।

বোলপুরের ৬ কিমি উত্তর-পূর্বে কোপাই নদীর তীরে সতীপীঠ কংকালীতলা এবং মহাশ্মশান। এখানে সতীর কাঁকাল পড়েছিল, সেই হিসেবে এটি সতীপীঠ। ১৩৬৮-৭০ সালে জগদীশবাবা (কংকালীবাবা) দেবীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তালতোড়ের

হিসেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বক্রেশ্বরের দিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছে।

বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির খ্যাতি আসার অনেক আগে থাকতেই রাজনগর বিখ্যাত ছিল। এই রাজনগর-বক্রেশ্বর যাওয়ার পথেই পাথরচাপুড়ি। সিউড়ি থেকে দূরত্ব ৬ কিমি। এখান থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে জঙ্গলাকীর্ণ পাথরচাপুড়িতে আসেন এক ফকির। তিনি অকাতরে দান করতেন বলে পরিচিত ছিলেন 'দাতাবাবা' নামে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯৮ ইং) ১০ চৈত্র তিনি দেহত্যাগ করেন। দাতাবাবার মৃত্যুতিথিতেই পাথরচাপুড়ির মেলা শুরু। সেকেন্ডার জমিদার খান বাহাদুরই এখানে প্রথম মেলার সূচনা করেন। তিনিই ছিলেন ১৯১৮ সালে জেলাশাসক জে সি দত্তের তত্ত্বাবধানে গঠিত মাজার রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রথম সভাপতি। ১০-১২ চৈত্র এই তিন দিনের মেলা। ১৯৩৩ সালে বর্ধমানের মহারাজ ভ্রাতাদ্বয় উদয়চাঁদ ও মহ্যতাবচাঁদ এই বিস্তৃত জায়গাটি দানপত্র করে দেন। মাজারে চাদর চাপানো, সিন্নি দেওয়া, মুরগি-ছাগ বলি দেওয়া এ মেলার বৈশিষ্ট্য। শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য বাংলাদেশ এবং আরব দুনিয়া থেকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ জাতি নির্বিশেষে এখানে আসেন। যদিও মুসলমানেরই সংখ্যাধিক্য। এখানে প্রচুর কুষ্ঠ রোগীর সমাবেশ ঘটে।

হেতমপুর বীরভূম জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম। রাজনগরের রাজার অধীনে রাঘব রায় ছিলেন এখানের জায়গিরদার। তখন এ জায়গার নাম ছিল 'রাঘবপুর'। বিদ্রোহী রাঘব রায়কে দমনের জন্য রাজনগররাজের অনুরোধে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে পাঠান। অবশেষে রাঘব রায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। তখন থেকেই হাতেম খাঁ এই জায়গার জায়গিরদার। তাঁর নামানুসারেই 'রাঘবপুর' হয় 'হাতেমপুর'। 'হাতেমপুর' ক্রমশ 'হেতমপুর' হয়ে ওঠে। এই হাতেম খাঁর আমলেই নাকি দিল্লির এক সম্রাট-কন্যার সঙ্গে প্রেমের কারণে হাফেজ খাঁ নামে এক সৈনিক পালিয়ে আসেন হেতমপুরে এবং হাতেম খাঁর আশ্রয় লাভ করেন। হাতেম খাঁর অবর্তমানে তিনিই হন হেতমপুরের জায়গিরদার। পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলাবাসী মুরলীধর চক্রবর্তীর বংশধরেরা হেতমপুরের জমিদার হন। এই বংশের বিপ্রচরণ চক্রবর্তী সরস্বতী পুজোর প্রচলন করেন হেতমপুরে। এই বংশেরই রামরঞ্জন ১২৮২ বঙ্গাব্দে 'রাজা' এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনিই হেতমপুরে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে তিন দিনের মেলার সূচনা করেন। হেতমপুর গ্রামে পুরনো রাজবাড়ি এলাকায় সেই মেলা আজও সমান গতিতে চলে আসছে। এক সময় ব্রতচারী নৃত্যের প্রতিষ্ঠাতা জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত এই মেলায় ব্রতচারী রায়বেঁশে নাচ পরিচালনা করেছেন। এই মেলার জন্য রাজবাড়ির আমন্ত্রণে হেতমপুরে এসেছেন কুঞ্জঘাটার রাজা, কৃষ্ণনগরের রাজা, উত্তরপাড়ার রাজা, রাজা রামমোহনের বংশধরেরা এবং নানান উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীবৃন্দ। 'হেতমপুর রয়েল থিয়েটার', 'রঞ্জন অপেরা'র পালা দেখানো শুরু হত এই মেলাতেই। এখন সে সব আর নেই। বন্ধ হয়ে গেছে মহারাজের অন্নপূর্ণা পুজোর মেলা ; ঝুলনের মেলা। টিমটিম্ করে চলছে একবেলার রথের মেলা।

অজয় নদের উত্তর তীরে কেঁদুলিতে বসে জয়দেবের স্মরণোৎসবে প্রায় ১৫ দিনের মেলা—জয়দেব মেলা বা জয়দেব-কেঁদুলি'র মেলা। শুরু পৌষ সংক্রান্তিতে, শেষ হয় নিয়মানুসারে ২ মাঘ। প্রচুর বাউল আসে বলে এটিকে 'বাউল মেলা'ও বলা হচ্ছে এখন। কীর্তনীয়ারাও এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে জয়দেবের মেলায়। ড. সুকুমার সেন বলেছেন—'জয়দেব মেলা পৌষ-সংক্রান্তির স্নানের মেলা'। জয়দেবের বহু আগে থাকতেই এই মেলার সূচনা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদের কোনও এক সময়ে কেঁদুলির পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন মুখোপাধ্যায় পরিবারের 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ মন্দির' এবং তার সংলগ্ন অতিথিশালা। সেই অতিথিশালায় এসে থাকতেন বৈষ্ণব-মহাজন-সাধু-আউল-বাউল সবাই। সেনপাহাড়ি পরগনায় অবস্থিত কেঁদুলি গ্রাম। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের এক ফরমানে সেনপাহাড়ির অধিকার লাভ করেন বর্ধমান মহারাজ কৃষ্ণরাম রায়। বর্ধমানের মহারানি ব্রজকিশোরী তখন পুরী-বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে চলেছিলেন। এই মহারাণী ব্রজকিশোরীর সভাপণ্ডিত ছিলেন কেঁদুলির যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়; তাঁরই অনুরোধে নাকি রানিমা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে কেঁদুলি তীর্থধামে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের টেরাকোটার কারুকার্য শোভিত সুউচ্চ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ১৮৬০-৭০ খ্রিস্টাব্দে নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধারমণ ব্রজবাসী কুলগুরু জয়দেবের জন্মগ্রাম কেঁদুলিতে স্থাপন করেন 'নিম্বার্ক আশ্রম'। একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় আরও আশ্রম। জমে ওঠে কেঁদুলি জয়দেব ধাম, জমে ওঠে বাউল মেলা। গ্রামীণ শিল্পীদের জিনিসপত্রই এ মেলায় বিক্রির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় বেশি। হাতা-খুন্তি-হাঁড়ি-জাল সবই মেলে।

পাথরচাপুড়ির মেলায় ভিড়ভিড়ি ছবি : অনির্বাণ সেন

একান্ন মহাপীঠের অন্যতম লাভপুরের মহাতীর্থ অট্টহাস, এখানে নাকি সতীর 'অধর-ওষ্ঠ' পড়েছিল। বহু বহু যুগ আগে কৃষ্ণানন্দ গিরি নামে এক তন্ত্রসাধক কাশীধাম থেকে এখানে এসে, জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটি পরিষ্কার করে দেবীতীর্থের মহিমা নাকি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। বছর তিরিশ আগেও নাকি পুরোহিতের ডাকে (রূপা, রূপী) অজস্র মানুষের সামনেই দুটি শিয়াল এসে ভোগ খেয়ে যেত। এক সময় এই 'শিবাভোগ' না হওয়া পর্যন্ত লাভপুরের মানুষেরা দুপুরের খাবার খেতেন না। শিবাভোগের পরই দেবীর ভোগ হত। দেবীর নিজস্ব জমি-জমা হাল-গরু বর্তমান। দেবী মন্দিরের কাছেই পঞ্চমুণ্ডির আসন রয়েছে, নিকটে আছে 'দেবীদহ'। এই 'দেবীদহ' থেকেই নাকি হনুমান, রামচন্দ্রের মাতৃ আরাধনার জন্য ১০৮ নীলপদ্ম নিয়ে গিয়েছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ এই মহাপীঠের জন্য সম্পত্তি দান করেছিলেন। স্থানীয় জমিদারেরাও অনেক কিছু দান করেছিলেন। মাঘি পূর্ণিমায় এখানে সমৃদ্ধ মেলার শুরু, চলে দশদিন ধরে। সম্ভবত ১৯০৫ সালে এই মেলা শুরু হয়।

ফুল্লরা মহাপীঠের কাছেই 'বাকুল' গ্রাম। সেখানে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মায়ের বাৎসরিক পুজো, ২৫০/৩০০ পাঁঠা বলি। সেই উপলক্ষেই মেলা বসে। বাকুল গ্রামের গ্রাম্যদেবী 'মা-বুড়ি কালী'। একসময় নাকি এখানে নরবলিও হয়েছে, রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসনও। একদিনের মেলা। পরদিন সন্ধ্যায় গ্রামের সধবারা পান-সুপারি-মিষ্টি-সিঁদুর নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে মায়ের আরতি করে এবং দেবীর চরণে উৎসর্গীকৃত সিঁদুর একে অপরের সিঁথিতে পরিয়ে দেয় স্বামীর কল্যাণার্থে। এই উৎসব-অনুষ্ঠানকে বাকুলের মানুষেরা বলেন 'ঠারোগুয়ো'।

লাভপুরের এক কিমি পূর্বে 'বাকুল', আর বাকুলের চার কিমি উত্তরে 'ধনডাঙা' গ্রাম। দক্ষিণ দিক দিয়ে গ্রামে ঢুকতেই নিঃসঙ্গ জঙ্গলাকীর্ণ মনসাতলা। চর্মপীড়ার জন্য দেবাংশীদের কাছে মনসার ওষুধ নিতে দূরদূরান্ত থেকে 'ফরেদি'রা আসে। এখানকার তেলপড়া আর মাটিতে নাকি কুষ্ঠ পর্যন্ত সেরে যায়। শ্রাবণ মাসের শেষ পঞ্চমী তিথিতে মনসাদেবীর বাৎসরিক পুজো উপলক্ষে ধনডাঙায় একবেলার জমকালো মেলা বসে।

শরৎ প্রকৃতির বন্দনায় শান্তিনিকেতনে মহালয়ার দিন গৌরপ্রাঙ্গণে বসে একদিনের 'আনন্দবাজার' মেলা। শান্তি-নিকেতনের-শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন ভবনের ছাত্রছাত্রীরা তাদের তৈরি বিভিন্ন খাবার, পুতুল, মালা প্রভৃতি এ মেলায় বিক্রী করে। সঙ্গে সঙ্গে ছবি এবং তার ভেতর এক কলি ছড়া সঙ্গে সঙ্গে লিখেও এ মেলায় বিক্রি হয়। খুব মজার মেলা এটি। এমন অভিনব প্রকৃতির মেলা বীরভূমে আর নেই।

শান্তিনিকেতনে ৭-৮-৯ পৌষে অনুষ্ঠিত 'পৌষমেলা'র খ্যাতি সারা ভারত জুড়ে এমন-কি বিদেশেও ছড়ানো। ১৮৮৭ সালের ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নিরাকার একেশ্বর-বাদীদের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিবসটিকে স্মরণে রেখেই মেলা বসে শান্তিনিকেতনে। ৭ পৌষ বৈতালিক, সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপাসনা এবং মেলার উদ্বোধন। ৮ পৌষ সমাবর্তন, আশ্রম সম্মিলনী এবং প্রাক্তনীদের সভা। ৯ পৌষ পরলোকগত আশ্রমবন্ধুদের স্মৃতিবাসর, আদিবাসী সাঁওতালদের খেলা-ধূলা, নাচ-গান, বাউল-ফকির সম্মেলন, দরবেশ-লেটো-সাপুড়ে-ভাদু-কবি-রামায়ণ প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উৎসব : অনুষ্ঠান এবং রাত্রে বাজি পোড়ানো। আগে মেলা বসত উত্তরায়ণের পাশের মাঠে, এখনকার জায়গায় নয়। মাঘ মাসে শ্রীনিকেতনে শুরু হয় তিন দিনের কৃষিশিল্পকেন্দ্রিক মাঘমেলা। স্থানীয় শিল্পীদের গড়া নানান জিনিসপত্র এ মেলায় বিক্রি হয়।

মেলায় মেলায় গড়া বীরভূম। কত ছোট-বড় মেলার মাধ্যমে এ জেলার মানুষ নিয়মিত মিলিত হয়ে থাকেন, ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন তার সব হিসেব-হদিস কি মেলে ?

কিন্তু এটি বেশ স্পষ্ট যে, বীরভূমের মেলাগুলি পরিকল্পিত-ধর্মীয় বা জাতীয় আন্দোলনের উৎসে অবস্থান করেও সম্পূর্ণভাবেই কৃষি ও কুটিরশিল্পকেন্দ্রিক। এইসব মেলার আঙন থেকেই জেলার লোকশিল্প এবং লোকশিল্পীরা বৃহত্তর গণমাধ্যমে পৌঁছে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। ইংরেজ আমলে এইসব মেলা থেকেই ইংরেজরা কাঁচামাল সংগ্রহের সূত্রটি খুঁজে পেতেন। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেশীয় কামার-কুমোর-তন্তুবায়-কৃষক-সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা উৎসাহ পেয়েছেন মেলার মাধ্যমেই। বাউল-ফকির-কীর্তনীয়া-রায়বেঁশে-রণপা-পটুয়া প্রভৃতি লোকায়ত শিল্পীরা নজরে এসেছেন। জেলায় রামপুরহাট, হাটকালুহা, শিমুলিয়াহাট, এমন বহু গ্রামনাম খুঁজে পাওয়া যায়, অতীতে যা শুধু বাজারের জন্যই বিখ্যাত ছিল। 'মার্কেট' বা বাজার থেকেই মেলার সৃষ্টি। যদিও কৃষি-কুটিরশিল্প আজ এ জেলার মেলায় অনেকটাই কোণঠাসা, শহর এসে সদর্পে হাজির হয়েছে এ জেলার প্রায় সব মেলাতেই। আসলে ভুবনায়নের বাজারে আলোরপাখির ডানায় রোদ্দুরের গুঁড়ো থেকে গ্রামকে গ্রামীণ-সংস্কৃতিকে সরিয়ে রাখতে চাওয়া আজ তো নিরর্থকই। জেলার মেলাও তো তার ব্যতিক্রম নয়।

তথ্য সহায়তা

১। বীরভূমের মেলায় মেলায়, প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য-১৩৮৮।
২। অরুণ চৌধুরীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা।
৩। ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল—ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় / শরৎ পাবলিশিং-১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।
৪। লোকায়ত বীরভূম—ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় / কাগজকুচি-১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
৫। রণনৃত্য—ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় / তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

লেখক : বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ও গ্রন্থকার

পৌষমেলা শান্তিনিকেতন দাসরাজ বাউল ও দুলাল দাস বাউল ছবি . মানস ঘোষ

বীরভূমের বাউল : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে

চন্দন কুণ্ডু

কথায় বলে আউল-বাউলের দেশ এই বাংলা। বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যের এ এক বিশেষ সম্পদ। কিন্তু এই আউল-বাউল এখন আর কোনো একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে ও ধর্ম সাধনার গূঢ়তত্ত্বকে বহন করে না। অন্তত বাউল তো নয়ই। মিডিয়ার যুগে বাংলার আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে তা এখন পৌঁছে গেছে পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রান্তে।

বাউল শব্দটিকে 'উন্মত্ত' 'ভাবোন্মত্ত' 'প্রেমোন্মত্ত' প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করা চলে। সম্ভবত 'বাতুল' (উন্মাদ) থেকে বাউল শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থে প্রথম বাউল শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-এর যে কটি পুঁথি মিলিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্পাদনা করেছিল তার একটি পুঁথির অতিরিক্ত অংশে এই শব্দটির ব্যবহার আছে—

"মুকুল (ত) মাথার চুল নাংটা যেন বাউল,
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রণে।
বিকটান কাড়ি রায় বলে মাংস কাড়ি খায়
রক্ত পড়ে গলিয়া বদনে॥"

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ-৫২৯)

বাংলাসাহিত্যে বিশেষভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' এই বাউল শব্দটি সাত-আটবার ব্যবহৃত হতে দেখি—

(i) "গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইহাঁ আজি হোতে।
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত, আদি খণ্ড ১২ পরিচ্ছেদ)

(ii) "স্থির হএল ঘরে যাও না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥"

(ঐ, মধ্যখণ্ড ১৬ পরিচ্ছেদ)

(iii) "তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ॥"

(ঐ, অন্তখণ্ড ১৯ পরিচ্ছেদ)

(iv) "বাউল কে কহিও লোক হইল আউল।"— ইত্যাদি

(ঐ, অন্তখণ্ড ১৯ পরিচ্ছেদ)

চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত বৈষ্ণব সহজিয়া ও সাধন প্রণালী সমন্বিত 'রাগাত্মিকা' পদেও বাউল শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—

"শুন মাতা ধর্মমতি বাউল হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী ?"

(মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত রাগাত্মিকা পদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ৬১)

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', 'চৈতন্য চরিতামৃত', 'রাগাত্মিকা পদ' প্রভৃতিতে বাউল শব্দটিকে এইভাবেই পাওয়া যায়। পরবর্তীতে মহাজ্ঞান শূন্য ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, আচার-ব্যবহার বেশ-বাসে প্রচলিত, সামাজিক বন্ধন মুক্ত, লোকাচার পরিত্যাগী, উদাসীন ধর্ম সাধনায় নিমগ্ন ব্যক্তিবর্গ বাউল নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবীণা'য় বাউল সম্পর্কে মত প্রকাশ করে বলেছেন—

"একটি বিশেষ ধর্মের লোকদিগকে বাউল বলে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সহিত 'আছে' এই অর্থদ্যোতক 'ল' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন এবং এই বায়ু শব্দের অর্থে যোগ শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার বুঝায়। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারসাধন করিবার সাধনা করেন, তাঁহারা বাউল। কেহ বলেন, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবনধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার সাধনা করেন যাঁহারা, তাঁহারা বাউল। আবার কেহ বলেন, সংস্কৃত বাতুল শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাঁহারা বাতাধিক তাঁহারা পাগল, যাঁহাদের আচরণ সাধারণের তুল্য নহে, লোকে তাঁহাদিগকে পাগল বা বাতুল বলে, এরূপ সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহারসম্পন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাউল।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতকে পুরোপুরি সমর্থন করেননি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন—"শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত যোগসাধনা যাহাদের ধর্ম, তাহাদিগের সকলকেই যদি বাউল বলা হইত, তবে যোগ-মার্গাবলম্বী সকল সাধকই বাউল নামে অভিহিত হইত। কিন্তু হিন্দু তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ তন্ত্রসাধক, হঠযোগী নাথপন্থীদিগকে কেহ বাউল বলে না। সুতরাং লেখকের শেষোক্ত মতটি সমর্থনযোগ্য অর্থাৎ সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ হইতেই 'বাউল' শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে।"

(বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ ৪৭)

বাউলরা আত্মমগ্ন, উদাসীন এবং ভাবের ঘোরে জীবন কাটায়। সমাজ-সংস্কারকে উপেক্ষা করে 'মনের মধ্যে মনের মানুষ'-এর সাধনা করেন। চর্যায় সহজিয়া সাধনার মতোই এঁদের সাধনা। এঁরা কিভাবে সাধনা করেন, সাধনায় ক্রিয়াকর্ম, এঁদের মতবাদ এ সমস্ত ঘুণাক্ষরেও অন্যের কাছে প্রকাশ করেন না। এঁদের সাধুগুরুর নির্দেশও তাই—

"আপন ভজন-কথা
না কহিবে যথা তথা,
আপনাতে আপনি হইবে সাবধান।"

এঁরা নিজেদের ধর্মকথা গোপন রাখেন। ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের কথা এঁরা গানে দ্বৈতরূপে ব্যক্ত করেন। বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো সন্দর্ভ নেই, সাধন পদ্ধতিরও স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ কোনো বিবরণ নেই। গানেই এঁদের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যক্ত হয়েছে। গানই এঁদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। চর্যার সাধকদের মতোই এঁরাও গুরুমুখী সাধনায় অভ্যস্ত। তাই একজন বাউলের মধ্যেই দুটি মানুষ বিরাজ করে—একজন বাইরের অন্যজন ভেতরের ; একটি ব্যবহারিক জীবন, অন্যটি সাধক-জীবন।

এই বাউল শব্দেরই সমার্থক শব্দ হল 'আউল'। বর্তমানে একশ্রেণির মুসলমান বাউল সাধককে আউল বলা হয়। 'আকুল' (সং) শব্দ থেকেই বাংলা 'আউল' শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। 'আকুল' অর্থে 'বে-সামাল' বলা যেতে পারে। বৈষ্ণব কবির রচনায় যখন পড়ি—"আকুল শরীর মোর বে-আকুল মন" তখন বে-আকুল বলতে বে-সামালই বোঝায়। অক্ষয়কুমার দত্ত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে 'আউল' সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধন সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে।" অবশ্য আউলদের এমন অবাধ ইন্দ্রিয়াশক্তি

অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের চোখে পড়েনি। বর্তমানে নামের ভিন্নতা ছাড়া আউল-বাউলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'বাউল' ও 'আউল' বলতে সামাজিক রীতিনীতির ঊর্ধ্বে আত্মভোলা ব্যক্তিকে মনে পড়ে। সুফি সাহিত্যে এরই নাম 'দেওয়ানা'। বাউলদের গানে মহেশ্বরকেও বাউল বলা হয়েছে—

"কোঠা বাড়ি ত্যাজ্য করি শ্মশানে যার বৈঠকখানা
এমন একজন বাউল পেলাম না।"

সারা বাংলায় এমন ধর্মউপাসকমাত্রকেই বাউল বলা হয় না। বাউল ধর্মমতের যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই শ্রেণির মানুষই আছেন। সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাউলদের 'ফকির' বলা হয়। আবার সাধারণ ফকিরদের সঙ্গে বাউল ধর্মমতের ফকিরদের পার্থক্য বোঝানোর জন্য মুসলমান বাউল সাধকদের 'নেড়ার ফকির'ও বলা হয়। কোথাও কোথাও এদের 'বে-শরা' ফকির বা 'মারফতি' অথবা 'বেদাতী' ফকিরও বলা হয়ে থাকে।

হিন্দু জাতির এইসব সাধকেরা বাউল নামে পরিচিত হয়ে থাকেন। তবে কোথাও কোথাও এঁরা 'রসিক বৈষ্ণব', 'রসিকপন্থী', 'রাগানুগাপন্থী' বৈষ্ণব নামেও পরিচিত। এঁরা নিজেদের ওইসব নামে অভিহিত করতে ভালবাসেন। 'রসিক' শব্দটি বিশেষভাবে সহজিয়া বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। সহজিয়া বৈষ্ণব পদে শব্দটি একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদে ও সহজিয়া সাহিত্যে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যিনি দুরূহ সহজিয়া সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন সেই সাধকই রসিক। রাগাত্মিকা পদে আছে :—

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গনিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অংকিত বাউলবেশে রবীন্দ্রনাথ

বাউলরা শ্রীচৈতন্যদেবকেই তাঁদের গুরু বলে মান্য করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে এই ধর্মতত্ত্ব প্রচার করে গেছেন বলে তাঁদের বিশ্বাস এবং তাঁকেই এঁরা এই তত্ত্বের জীবন্ত মূর্তি বলে মনে করেন। তাই হিন্দু বাউল সাধকদের মধ্যে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান ফকিরদের মধ্যেও এই রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব এবং চৈতন্য তত্ত্বই প্রভাব বিস্তার করেছে। চৈতন্যদেবকে তাঁরাও মহাপুরুষ বলে মানেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ফকির-দেরও প্রভাবিত করেছে সে প্রমাণ এঁদের অনেক গানে পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্ব বা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দ্বারাই বাউল সাধকরা প্রভাবিত হননি। সুফী ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব মুসলমান ফকিরদের মধ্যে দেখা যায়। সেখানে আল্লাই মূল তত্ত্ব। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লা। আদি মানব আদমের মধ্যে আল্লার সত্তা বর্তমান। সকল মানুষের মধ্যে তিনি বিরাজ করেন। আল্লা তার আকৃতি, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষেই তাঁর প্রকাশ। এই আল্লা মানুষের মধ্যেই বাস করেন। নবীর মধ্যে তাঁর শক্তির পূর্ণ প্রকাশ। তিনি এক প্রকার অবতার-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের মতো তিনিই মহাপুরুষ; আবার তিনি 'অধরকালা', 'অনাদির আদি কৃষ্ণনিধি', 'অধর মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ' প্রভৃতি। এই আল্লারূপী 'অধর কালা'কে উপলব্ধি করতে হবে। আর তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। প্রকৃতি পুরুষের মিথুন তত্ত্বের মধ্য দিয়েই বাউলদের সাধনা। এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা

প্রয়োজন যে, তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনার দিক দিয়ে বাউল ফকির উভয়েই একই পথের পথিক। এই বাউলদের সাধনা হল নির্দিষ্ট যোগমূলক সাধনা। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়ে আপন আনন্দস্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। মুসলমান ফকির এবং হিন্দু বাউল বা রসিক বৈষ্ণব সকলেই এক তত্ত্বের উপাসক। এঁদের সাধন পদ্ধতিও এক এবং সাধন সংক্রান্ত আচার-ব্যবহারও এক।

লালন, অঙ্কন : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাই সারা বাংলার এই শ্রেণির সমস্ত সাধককেই এক বাউল নামে অভিহিত করেছেন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' গ্রন্থে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'আউল', 'বাউল', 'নেড়া', 'সহজী', 'কর্তাভজা', 'সাঁই', দরবেশ' প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে 'আউল', 'বাউল' প্রভৃতি উপাসকদের নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। অক্ষয়বাবু 'নেড়া' বলে যে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন বর্তমানে তাদের পৃথক করে চেনার উপায় নেই। তাঁদের প্রতিষ্ঠা যেভাবেই হোক না কেন, তাঁদের সাধন-ভজন, বেশ-ভূষা সবই বাউলদেরই মতো। অক্ষয়বাবু যেভাবে তাঁর গ্রন্থে 'নেড়া'দের সম্পর্কে বলেছেন—"এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহু দেশে তাম্র অথবা লৌহের কড়া রাখে।" উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এমন কোথাও দেখেননি বলেই দাবি করেছেন।

অক্ষয়বাবুর উল্লিখিত 'সহজী' বলে কোনো পৃথক সম্প্রদায়ও বর্তমানে বাংলায় দেখা যায় না। আবার 'দরবেশ' এমন নামের কোনো সম্প্রদায়েরও খোঁজ মেলে না। তবে বাউলপন্থী মুসলমান ফকিরদের মধ্যে যাঁরা সাধনমার্গের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন এবং যাঁরা গুরুস্থানীয়, তাঁদের বলা হয় দরবেশ।—

"বস্তুজ্ঞান যার নাই,
নাম ব্রহ্মে কি পাই,
লালন কয় দরবেশে এ কি কথা কয়।"

কোনো কোনো গানে লালনকে দরবেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'কর্তাভজা' সম্প্রদায় এক সময় পশ্চিমবঙ্গের একটি শক্তিশালী বাউল গোষ্ঠী রূপে বর্তমান ছিল। যদিও বর্তমানে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অবশ্য এখনো প্রতিবছর দোল পূর্ণিমার সময় একটি মেলায় অনুষ্ঠানের মধ্যে অতীত স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় মাত্র। ২৪-পরগনার বারাকপুর মহকুমার ঘোষপাড়া গ্রামে কর্তাবাবা রামশরণ পালের বাড়ি—সেখানেই এই মেলার আয়োজন হয়। এই মেলায় বহু বাউল-ফকিরের সমাগম হয়। এই কর্তাভজা সম্প্রদায় সহজিয়া মতের উপাসনা করেন। এঁদেরও তত্ত্ব ও সাধনপদ্ধতি বাউল সম্প্রদায়েরই সমগোত্রীয়।

অক্ষয়বাবু 'সাঁই' সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে বলেছেন,—"সাঁই এরা কখনো কখনো নিতান্ত লোকবিরুদ্ধ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সুরা পান, গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি হিন্দু মত বিরুদ্ধ অশেষবিধ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলে।" এমন কোনো সম্প্রদায়েরও সন্ধান পাননি অধ্যাপক ভট্টাচার্য। তবে বাউল গানের মধ্যে 'সাঁই' কথাটির বহু প্রয়োগ দেখে অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছেন,—"সংগীত রচয়িতা ভগবানকে 'সাঁই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত বাউল সাধকদের 'চারিচন্দ্র ভেদ' (শুক্র-রজঃ-বিষ্ঠা-মূত্র) এর প্রক্রিয়ার দ্বারাই অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে বাউলদের পৃথক করতে চেয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে বলেছেন,—"সম্প্রদায়ভেদে ও গুরুভেদে ইহার পদ্ধতির তারতম্য হয়। প্রথম দুই 'চন্দ্রের' আর একটি ভেদ পদ্ধতি আছে, তাহাকে ব্যবহারিক ভাষায় 'রস-রতির মিলন' বলা হয়। লালনশাহী ফকিরগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই মিলনের অনুষ্ঠান করে, নবদ্বীপ ও রাঢ়ের বাউলগণ করে অন্য সময়ে। পদ্ধতিতেও বিভিন্নতা আছে। তবে প্রত্যেকেই এই 'রস-রতির মিলন সাধন' করে। ইহা তাহাদের সাধনায় একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সাধকের সাধনায় অগ্রগতি ও ফল বিবেচনা করিয়া গুরু ক্রমে উপদেশ দিয়া 'চন্দ্রভেদ শিক্ষা' দেন। ....রূপ হইতে স্বরূপে ভাব দেহে সাধক কতদূর উন্নীত হইতেছে, তাহারই পরীক্ষার জন্য 'চারিচন্দ্র ভেদ' প্রয়োজন।"

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাউলরা বেশ-ভূষা, আচার-আচরণে এখন আর পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী নন। হিন্দু মতের

নবনী দাস বাউল

সাধকরা মালা, তিলক, কৌপীন ও বহির্বাস-সহ হলুদ বা গেরুয়া বা সাদা আলখাল্লা পরছেন। চুল দাড়িতেও অনেকে সাজতে অভ্যস্ত। আবার সকলেই ধম্মিল্ল করে চুল বাঁধেন না, অনেকে বাবরি চুলও রাখেন। আবার অনেক বাউল হলুদ রঙের পরিবর্তে লাল রঙের আলখাল্লা পরেন ও দাড়ি গোঁফ কামান। মুসলমান বাউলরা সাধারণত সাদা রঙের লুঙ্গি পরেন ও সাদা বা বহু তাপ্পি দেওয়া আলখাল্লা জাতীয় পিরান পরেন। লাল-হলুদ পিরানের ব্যবহারও দেখা যায়। অনেকে স্ফটিক, প্রবাল, পদ্মবীজ এমন কি রুদ্রাক্ষের মালাও পরেন। লালন সম্প্রদায়ভুক্ত সব ফকির দাড়ি, গোঁফ ও লম্বা চুল রাখেন।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাই বাউলদের বিচরণ ক্ষেত্র নয়। তবে এঁদের আঞ্চলিক সীমাও খুব কম নয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বাউল পাওয়া দুর্লভ। দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলি, ২৪-পরগনাতেও বাউল সাধক প্রায় নেই। মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতেও বাউলের পরম্পরাগত শ্রেণী চোখে পড়ে না। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে বাউল-ফকিরদের সবচেয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্র। বাঁকুড়া জেলার বহু অঞ্চলে বাউল সাধকদের দেখা মেলে, যদিও সেখানে ফকির প্রায় নেই। আবার নদিয়া, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোরের ঐতিহ্যগত বাউল পরম্পরা চলে আসছে বহুদিন ধরে। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বাউল গানের শ্রোতা ও সাধক দুই-ই ছিল না, গত দু-দশকে সে চেহারা পাল্টেছে। সেখানকার গান বিচারমূলক ও তত্ত্বগত।

তবে বাউল বলতে 'বীরভূমের বাউল'। আর 'বীরভূমের বাউল' বর্তমানে ভিন্ন অঞ্চলের বাউল সাধক ও বাউল শ্রোতার কাছে কিংবদন্তির মতো প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল এর স্থান-মাহাত্ম্য এবং আর একটি কারণ ব্যক্তি-মাহাত্ম্য। একদিকে জয়দেবের কেঁদুলির মেলা, অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা। অন্য ক্ষেত্রে রয়েছেন নবনী দাস আর তাঁর খ্যাতিমান পুত্র পূর্ণ দাস।

পৌষ-সংক্রান্তিতে জয়দেবের মেলা, এমন এক বৃহৎ পরিসরের মেলা যেখানে বহুকাল ধরে বহু বাউল সাধক ও বাউল গায়ক আসেন। এ মেলা মধ্যবিত্ত বাঙালির আনন্দ বিনোদনের এক ঐতিহ্যময় ক্ষেত্র। দূর-দূরান্তের গ্রামবাংলার মানুষই যে এখানে ভিড় করে এমন নয়, কলকাতা ও অন্যান্য বড়ো শহর থেকে প্রচুর বাউলরসিক ও ছাত্র-ছাত্রী জয়দেবে যান। লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক এমন সব শ্রেণির মানুষেরই মনে আনন্দ দান করে এই মেলা। এক কথায় জয়দেব-কেঁদুলি বাউল সাধকদের পীঠস্থান। অনেক নকল বাউলের সমাবেশ ঘটলেও খাঁটি বাউল গানের এ এক নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র। এ মেলাতে মনোহর দাস, ত্রিভঙ্গ খ্যাপা, নিতাই খ্যাপা, রাধেশ্যামের মতো এমন বহু প্রসিদ্ধ সাধক বাউলের আগমন ঘটেছে। নবনীদাস বাউলও এ মেলায় আসতেন। কেঁদুলির মেলায় সারা ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বাউল গায়ক, সাধক ও শ্রোতা এসে ধন্য হন। বাংলার বাউল ও বাউল সাধকদের প্রতিষ্ঠায় এ এক সজীব কেন্দ্র। শান্তিনিকেতন থেকে এর দূরত্ব খুব বেশি না হওয়াই বাইরের মানুষের কাছে এর আকর্ষণ বেড়ে চলার আরো একটি বড় কারণ বলা যেতে পারে। প্রতি বছর বাউল, শ্রোতা ও ভক্তের যেভাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে বীরভূমের এই অজয় তীর ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাছেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

প্রখ্যাত বাউল গবেষক অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত জয়দেব-কেঁদুলি যাননি। তবে ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ ও শান্তিদেব ঘোষ যে বহুবারের যাত্রী ছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। তখন বাস ছিল না বলে এঁরা গরুর গাড়ি করে কেঁদুলিতে যেতেন। বীরভূমের বাউলের আজ যে দেশজোড়া নাম, শুধু দেশজোড়াই বা বলি কেন বিদেশের বহু মানুষের কাছেও আজ বীরভূমের বাউল এক আকর্ষণীয় বস্তু। এই প্রসিদ্ধির পিছনে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরিকরদের ভূমিকা অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাউলদের কদর হয়ে আসছে। নবনী দাস বাউলের সময় থেকেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে আশ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা উৎসাহ ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন বাউলরা।

কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বাউলদের নানা ভঙ্গিমার প্রচুর ছবি এঁকেছেন নানা সময়ে। বীরভূম তথা বাংলার বাউলদের দেশে-বিদেশে আজকের যে জনপ্রিয়তা তার অন্যতম একটি কারণ হল এই চিত্রকলা। নন্দলাল, রামকিঙ্কর, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পী থেকে শুরু করে কলাভবনের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রীরা বাউলদের প্রচুর ছবি আগেও এঁকেছেন, আজো এঁকে চলেছেন। এখনো শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব অথবা পয়লা বৈশাখ বা পঁচিশে বৈশাখের মতো উৎসবের দিনে আম্রকুঞ্জ, বকুলবীথি বা বাউল ও শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক বলা চলে। এখন শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় বাউলদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান বিবেচিত হয়েছে বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে। একই সঙ্গে জায়গা পেয়েছেন ফকিররাও। মেলার মূল মঞ্চে বাউল গান শোনার জন্য হাজার হাজার শ্রোতা এখন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। দিন দিন আগ্রহী শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতেই মেলার মধ্যে অস্থায়ী মঞ্চে বাউল গানের আসর চোখে পড়ে। এর ফলস্বরূপ দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমে সুযোগ পাচ্ছেন এই শিল্পীরা।

দেবদাস বাউল ও কালীদাস বাউল শ্রীনিকেতন মেলা — ছবি : আগমার জোন্‌স (জার্মান)

সুবর্ণরেখার পাশে বাউলদের মিলিত দোতারা, গাবগুবি ও বাঁশির সুর পথচলতি পথিককে উদাস করে দেয়। শান্তি নিকেতনের উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের পাশাপাশি বাউল গানও স্বতন্ত্র একটি জায়গা করে নিয়েছে। এইসব অনুষ্ঠানে পৃথক কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না, আহ্বান করেও আনতে হয় না এঁদের। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নিজেরাই আশ্রমিক, ছাত্র-ছাত্রী, পর্যটকদের মন জয় করেন এই বাউলরা।

বাউল আর শান্তিনিকেতন এক সুদীর্ঘ যুগলবন্দী। এই যুগলবন্দীর সূচনা করেছিলেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। বিখ্যাত বাউল পূর্ণ দাসের বাবা নবনী দাস প্রায়ই আসতেন গুরুদেবকে গান শোনাতে। গুরুদেবও ভালবাসতেন তাঁর গান। সেই সময় থেকেই

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই পৌষমেলাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শুরু থেকেই সেখানে বাউলদের যাতায়াত ছিল। এখন সেখানে গ্রামীণ ও নগর সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফলে বাউল অভিজাত মানুষজনেরও মন টানে। পৌষমেলায় মঞ্চে গাইতে পারাকেও অনেক বাউল জীবনের প্রতিষ্ঠা বলে মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন নবনী দাস। তাঁর ছেলে পূর্ণ দাস বাউলকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেন। আজ সারা দেশে পূর্ণ দাসের বাউল দারুণভাবে জনপ্রিয়। বিদেশের নানা প্রান্তেও আজ তাঁর বাউল সমাদৃত। বিদেশিদের কাছে বাউল গানের আকর্ষণ ও স্বীকৃতি বোধহয় পূর্ণ দাসের হাত ধরেই।

কিন্তু বীরভূমের বাউলের এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তির পরেও তাঁদের মধ্যে বড় মাপের বাউল তাত্ত্বিক খুঁজে পাননি সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়। অন্তত দু-দশকে তেমন কাউকে চোখে পড়েনি তাঁর। আগে তাত্ত্বিক বাউল নিতাই খ্যাপা ছিলেন—সেকথা তিনি জানিয়েছেন (*বাউল ফকির কথা, পৃ-১৪*) গ্রন্থে। বর্তমানে উচ্চমার্গের বাউল তাত্ত্বিকদের মধ্যে সনাতন দাসের আদি নিবাস খুলনা জেলায়, বলহরি দাসের জন্ম-কর্ম উত্তরবঙ্গের প্যাবনায়। আজহার খাঁ ফকিরের বাড়ি নদিয়ার গোবরডাঙায়, নবাসনের হরিপদ গোঁসাইও বরিশালের মানুষ। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে বীরভূম নিয়ে কেন এত হইচই? বীরভূমের বাউলদের এত কদরই বা কেন, এত নামই বা কী কারণে? শুধুই কী মিডিয়ার প্রচার!

বীরভূমের বাউল সম্পর্কে এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আর একটু অন্যভাবে বাউল সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন। সেজন্য বাউলদের জীবন-যাপন সম্পর্কে দু-এক কথা বললে এ উত্তর খোঁজা সহজ হবে। তার সঙ্গে বীরভূমের বাউল কোথায় স্বতন্ত্র তাও স্পষ্ট হবে।

বাউলরা সাধারণত তিন ধরনের জীবন-যাপনে বিশ্বাসী : (ক) ধর্মতাত্ত্বিক, যোগী বা সাধক বাউল, (খ) সংসারী বা গৃহবাসী বাউল এবং (গ) গায়ক বাউল। ধর্মতাত্ত্বিক, যোগী বা সাধক বাউলরা আশ্রমের জীবন-যাপন করেন। এরা গুরুবাদে বিশ্বাসী, নির্দিষ্ট স্থানে বেশিদিন থাকেন না, অদীক্ষিতের হাতের রান্না এঁরা খান না। যোগ-সাধনাই এঁদের জীবনের অঙ্গ। এঁরাই মূলত সাধন সঙ্গিনী বা সেবাদাসী গ্রহণ করেন। এঁরা দেখাতে চান যে, সাধক নিজে 'কৃষ্ণ' স্বরূপ এবং তাঁর সঙ্গিনী 'রাধা' স্বরূপিনী। যুগল মন্ত্রে এঁরা দীক্ষিত হন। দেহের বাইরে এদের কোনো সাধন ক্ষেত্র নেই। এঁদের সকলেই গান গাইতে পারেন না, তবে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বজ্ঞানে এঁরা বেশ জ্ঞানী। মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এঁদের দেখা যায়।

সংসারী বাউলরা ঘরেই থাকেন। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নিয়ে সংসার করেন। এঁরাও গুরুবাদে বিশ্বাসী। তবে এঁদের তত্ত্বজ্ঞান সেরকম থাকে না। চাষ বা অন্যান্য কাজকর্ম করেন, আবার গানও করেন। বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, রাজশাহী, যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানে এঁরা বসবাস করেন। অবশ্য রাঢ়-বঙ্গেও এঁদের দেখা যায়।

আর গায়ক-বাউলরা নির্দিষ্ট পোশাকে বাউল তত্ত্ব প্রচার ও গান করলেও যোগ সাধনা এবং বাউলের নিয়মনীতি সম্পর্কে এঁরা উদাসীন। গান গেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মধ্যবিত্ত এই বাউলদের উচ্চবিত্ত হওয়ার স্বপ্ন। এঁরা প্রত্যেকেই গান করেন, বাড়িতে বা আশ্রমে থাকেন। যোগ সাধনা না জানলেও বাউল তত্ত্ব সম্পর্কে এঁরা অজ্ঞ নন। গানের মধ্যে যে তত্ত্ব থাকে গানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে তার ব্যাখ্যাও করেন। গায়ক-বাউলেরাও অন্যান্যদের মতই মাধুকরীতে ও গুরুবাদে বিশ্বাসী। বীরভূমের বেশিরভাগ বাউল এই তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। তবে ধর্মতাত্ত্বিক বা সাধক বাউল যে এখানে একেবারেই নেই এমন কথা বলা যাবে না। তেমনি আবার সংসারী বাউলেরও খোঁজ মিলবে এখানে। তবে যে কারণে বীরভূমের বাউল জনপ্রিয় তা হল 'বাউল গান'। আমি আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরিকরেরা বাউল গানের প্রতি আগ্রহবশত শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাউল শুনতেন। নবনী দাসের মতো বাউলদের ডাক পড়ত আশ্রমে ও মেলায়। এঁরা যে বাউলের যোগ সাধনায় বা বাউল তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাউল সাধকদের স্বাগত জানাননি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ এর সুরকেই যে বিশেষভাবে ভালবেসেছিলেন, এ গানের সুর যে তাঁর মনকেও নাড়া দিয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর একাধিক গানেও পাওয়া যায়। আর তাছাড়াও শান্তিনিকেতন আশ্রমের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আজো বাউল গান সমানভাবে সমাদৃত; তার কারণও সুমিষ্ট সুর ও বাস্তব জীবন সম্পর্কে সচেতনতা। এর সঙ্গে অবশ্যই আছে শান্ত, উদাসীন, নির্লোভ এক তন্ময়তা। অন্তত আর যাই হোক সাধন-তত্ত্ব নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এর প্রকাশ ঘটলে ছাত্রছাত্রীরা এত আগ্রহী হতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথেই এ গানের প্রথম সার্থক স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথই ভদ্র সমাজে প্রথম এ গানকে তুলে ধরেন। আর তিনি যখন একই সুরে গান রচনা করতে শুরু করেন তখন থেকে সংগীতপ্রেমী মানুষের কাছে বাউল আরো বেশি করে জনপ্রিয় হতে থাকে। সেই ধারা আজও প্রবহমান বীরভূমের বাউলদের গানে।

বাউলের গূঢ় তত্ত্ব যোগসাধনা সাধারণ মানুষের কাছে আজো দূর অস্ত্। সহজ সাধনার এই তত্ত্ব জনসাধারণের কাছে পৌঁছালেও তা কতটা গ্রহণীয় হবে সে-সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়। তবুও সাধারণ মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে শীত রাত্রির কষ্ট সহ্য করে জয়দেব-কেঁদুলি বা শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বাউল গান শোনেন, বাউলের তত্ত্ব নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না। দেশে-বিদেশে বাউলের জনপ্রিয়তার মূলে এর গান। আর এ গানের এক নিজস্ব ঘরানা তৈরি করে ফেলেছেন বীরভূমের বাউলরা। পূর্ণ দাস বাউলের দেশে-বিদেশে বাউল গানের আসর বা আজ যখন তখন বোলপুর-শান্তিনিকেতন তথা বীরভূমের বাউলদের বিদেশ যাত্রা তাঁদের গানের কারণেই। বীরভূমের বাউল আজ তত্ত্ব ছেড়ে গানে মেতেছে; আর সেখানেই সে স্বতন্ত্র, সেকারণেই জনপ্রিয়।

বীরভূমের বাউল সাধকদের স্বাতন্ত্র্যের কারণ হিসাবে আর একটি বিশেষ দিকের কথা বলা যায়, সেটি হল সাধন-ভজনের গূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যতই গভীর জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা থাক না কেন বাউল সাধকরা বেশিরভাগই অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত হয়ে থাকেন। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, অল্পশিক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের

নিমাই দাস বাউল মার্কমিডোস হোটেল, বোলপুর   ছবি : চন্দন কুণ্ডু

"ছোটবেলায় দেখতাম সুপুর থেকে এক বাউল আসতেন আমাদের বাড়িতে। নাম মনে নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দোতারার সুর খুব ভাল লাগত, ওই সুর নাড়া দিত মনে। মা, মামীমাও ভালবাসতেন বাউলের গান। স্কুলে পড়ার সময় ওই বাউলের সঙ্গে আর দেখা হত না। বহুদিন পর বি এসসি পড়ার সময় সোনাঝুরিতে ফটো তুলতে গিয়ে দেবু দাস বাউলের সঙ্গে পরিচয়, তারপরে শুঁড়িপাড়ার (বোলপুর) বৈদ্যনাথ দাস বাউলের কাছে বাউল গান শেখা শুরু।" এই বৈদ্যনাথ দাসের দেওয়া বহু পুরনো দোতারা আজো বাজিয়ে গান করেন দাসরাজ। এরপর একে একে পরিচয় হয় বাসু দাস বাউল, লক্ষ্মণদাস বাউল, নিমাই দাস বাউলের সঙ্গে। এভাবেই ভালবাসা এবং আগ্রহ বাড়তে থাকে। বাউল-দর্শনও জানার আগ্রহও বাড়ে তার সঙ্গে, এরপরই গুরুর কাছে দীক্ষা। ধর্মগুরু কাটোয়ার ধর্মদাস আর শিক্ষাগুরু গৌরবাবা (তামাঘাটা, নদিয়া)। সোনামুখীর সনাতন দাসের সঙ্গেও যথেষ্ট যোগাযোগ আছে দাসরাজের। সনাতন দাসের আশীর্বাদ পেয়েছেন সেকথা গর্বের সঙ্গে বলেন। আবার মনসুর ফকিরের ভালবাসা ও সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাঁর গান মুখে মুখে ফেরে দাসরাজের। বিজ্ঞানমনস্ক বছর বত্রিশের এই উদাস বাউল মাঝে মাঝেই মনসুর ফকিরের গান গেয়ে চলেন আনমনে—

"ও ভাই মগ ফিরিঙ্গী ওলন্দাজ
হিন্দু মুসলমান,
এক বিধাতা গড়েছে বস্তু তাই আছে
সব দেহে সমান—
বল ভাই সবদেহে সমান।".....ইত্যাদি

পিতার কাছ থেকে পাওয়া এই দেহ, একে বিধাতা একই করে গড়েছেন। মগ, ফিরিঙ্গি, ওলন্দাজ, হিন্দু, মুসলমান পৃথক নন। একই বিধাতার সৃষ্টি, সবদেহে একই বস্তু বর্তমান। 'মলিক্যুলার বায়োলজি'তেও তিনি এর সমর্থন খুঁজে পান এটাই তাঁর বিশেষত্ব।

মনসুর ফকিরের গানে তিনি পেয়েছেন 'মনের মানুষ' খোঁজার পথ—

নিম্নশ্রেণি থেকে উঠে আসায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে এঁদের গানের কদর থাকলেও বাউলদের কদর ছিল না। কিন্তু বোলপুর-শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক বাউলরা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এই অঞ্চলের একাধিক বাউল এখন পূর্ণ শিক্ষিত। খোঁজ করলে উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান গবেষণায় রত বাউলের দেখাও মিলবে অনায়াসেই। সেইসঙ্গে আছে সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে আসা বাউল সাধকও। এর ফলে, অন্তত শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হওয়ার ফলে বাউলের গূঢ়তত্ত্বকে তাঁরা যেমন আয়ত্ত করতে পারেন সহজে, তেমনি তাঁদের গানের ব্যাখ্যায় প্রকৃত বক্তব্য সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন শ্রোতার কাছে। আমি এমন একজন বাউলের কথায় আসব যিনি তার গানের জন্য ও বাউল-দর্শনকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য বীরভূমেই নয় বিদেশিদের কাছেও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

উক্ত বাউল সাধকের প্রকৃত নাম রাজকুমার সিং। বাবার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সিং। গুরুপ্রদত্ত নাম দাসরাজ বাউল বা সংক্ষেপে রাজ বাউল। বাড়ি বোলপুরের হাটতলা। রাজ বাউল বি এসসি এবং এম এসসি পাশ করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে সি এস আই আর-এর ফেলোশিপ নিয়ে মাইক্রোবায়োলজি-তে গবেষণা করছেন। বিজ্ঞানের গবেষক ও বাউল সাধক দাসরাজের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কীভাবে বিজ্ঞান সাধক থেকে বাউল সাধক হয়ে উঠলেন তার কাহিনী। তিনি জানিয়েছেন—

"মানুষ থুইয়া খোদার ভজনা
এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে—
মানুষ পুজো, কোরান খোঁজো
পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।"

তাঁর এই মানুষ খোঁজা চলেছে এখনো।

২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ "A boul in the botany lab" হেডলাইন দিয়ে 'THE STATESMAN' পত্রিকা দাসরাজ সম্পর্কে লিখেছিল—"It is the story of a boul, who is also a scientist. And he has devoted himself to the welfare of mankind......"

২৪ ডিসেম্বর 'দৈনিক স্টেট্সম্যান' পত্রিকা দাসরাজ সম্পর্কে লিখেছিল—"একাধারে বিজ্ঞানী ও বাউল। খটকা লাগছে? লাগতেই পারে।

তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে আপনাকে আসতেই হবে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়। এখানেই দেখা পাবেন দাসরাজ বাউলের। আসল নাম রাজকুমার সিং। মাইক্রো বায়োলজির গবেষক। উজ্জ্বল কেরিয়ারকে একপাশে সরিয়ে রেখে গায়ে চড়িয়েছেন বাউলের আলখাল্লা। নাম ধারণ করেছেন দাসরাজ বাউল; মাইক্রোস্কোপের জায়গায় হাতে একতারা। গলায় গানের সুর। গান গেয়ে চলেছেন মানুষের হারিয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে দেওয়ার আর্তিতে।...."

দাসরাজ বাউল গানের শ্রুতি মাধুর্যে শ্রোতার মন জয় করে চললেও যোগ সাধনাতেই তাঁর আগ্রহ। বাউল ফিলোজফিকে আত্মস্থ করে তিনি বড়ো বাউল সাধক হতে চান।

অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষজন এই বাউল সাধনার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাননি, যা বোলপুর-শান্তিনিকেতন তথা বীরভূমের বাউলদের অনেকের মধ্যে পাই। স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বীরভূমের বাউল।

গৌরবাবার আর এক শিষ্য সুকুমার দাস বাউল। জন্ম নদিয়ায় হলেও দীর্ঘদিন বীরভূমের রামনগর আশ্রমে থাকেন। সেইসূত্রে বীরভূমের বাউল নামেই পরিচিত। ৩৮/৪০ বছর বয়সী সুকুমার দাসের স্ত্রী সুন্দরী দাসই তাঁর সাধন-সঙ্গিনী। সুকুমার দাস গান করেন না, যোগ সাধনা করেন। তিনি মনে করেন বীরভূমের বাউলের যে উদাসী ভাব তা নদিয়া বা মুর্শিদাবাদের বাউলদের মধ্যে নেই। বীরভূমের বাউল গানের যে শ্রুতিমাধুর্য তাও অন্যত্র নেই। গানের মধ্যে ভাবাগত অনেক পার্থক্যও চোখে পড়ে। তবে সবার মূল লক্ষ্য একই; সাধন-ভজনও এক।

বীরভূমের বাউলদের কথা বলতে গেলে আর একটি কথা সহজেই মনে আসে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান বা বাঁকুড়ার বাউলরা যেখানে এখনো মাধুকরী করেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। এই মাধুকরীকে বাউল সাধনার অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেন। অন্তত সাধক বাউল ও গৃহবাসী বাউলেরা এ ব্যাপারে একই পথের পথিক। কিন্তু বীরভূমের বাউলদের এখন ডাক আসে ক্যামেলিয়া বা মার্কমিডোস্-এর মতো হোটেলগুলি থেকে। ফলে শহরে বাবুদের নির্ভেজাল আনন্দ দান করে তাঁদের হাতেও এখন টাকা-পয়সা আসে। গাড়ি, বাড়ি, বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি বীরভূমের অনেক বাউলের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। এমন আশা করেন এখন অনেকেই। এত উচ্চাশা বোধহয় অন্য অঞ্চলের বাউলদের স্বপ্নাতীত।

বহুদিন ধরে বাউলদের সঙ্গে থেকে ও বাউলদের সঙ্গে ঘুরে আদিত্য মুখোপাধ্যায়ের ধারণা বীরভূমের বেশ কিছু গায়ক-বাউল বিদেশি-বিদেশিনির পাল্লায় পড়ে নষ্ট ও ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের গানের ভাব ও কণ্ঠ ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা শ্বেতাঙ্গিনীদের দেহ কামনায় ও অর্থলালসায় মত্ত হয়ে পড়ছেন। বিদেশযাত্রার মোহে পড়ে এঁরা নিজেদের স্ত্রীদেরও ত্যাগ করছেন। আদিত্যবাবুর বক্তব্য—"বর্তমানের বাউলরা অবশ্য পূর্ণ দাসের সম্মান ও প্রচার প্রতিপত্তির দৌলতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্রমশই বিকিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশের বাজারে। সাহেব-মেম এবং এদেশীয় শিক্ষিত দালালরা চিবিয়ে যেমন খাচ্ছেন বাউলের মাথাটা, তেমনি এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ছেন বিদেশের চোখে। গরিব বাউলদের বা গায়কদের দোষ দেব না ততখানি। কারণ ক্ষুধার্তের কাছে ভাতের থালা অনেক মূল্যবান।" *(বাউল ফকির কথা, পৃ-৫)*

আদিত্যবাবুর মতের বিরুদ্ধাচারণ করে গবেষক শক্তিনাথ ঝা বলেছেন—"বাউলদের জীবনযাপন প্রণালী, মানুষকে আপন করার পদ্ধতি, বাদ্যযন্ত্রগুলি, গানের তাল ও পরিবেশন-রীতি বিশিষ্ট। এগুলি একশ্রেণির বিদেশি শিল্পী ও গবেষকদের আকর্ষণ করে। দরিদ্র বিদেশি পর্যটকরা রাঢ়ের বাউলদের ঘরে অল্প টাকায় থাকে এবং প্রতিদানে নিজেদের দেশে বাউলদের আশ্রয় ও সামান্য উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেয়। বাউলদের গান বাজনা শেখেন অনেকে। এগুলি আত্তীকরণ করেন অনেকে।" *(বাউল ফকির কথা, পৃ-৫)*

গবেষক শক্তিনাথ ঝা-এর মতকেই অনেক বেশি সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। আদিত্যবাবুর কথামত—"বর্তমানের বাউলরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্রমশই বিকিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশের বাজারে।"—এ মত সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা বাউলরা ভারতীয় সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক নন। সাহেব-মেম প্রমুখেরা বাউলের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন, ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেউলিয়া করে ছাড়ছেন এমন কথাও মানা যায় না। বিশেষ করে কয়েকজন বিদেশিকে যখন অন্যভাবে দেখি তখন এমন কথা মানতে পারি না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অ্যালাকসিয়ার (ইতালি) কথা। যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি আগ্রহবশত এদেশে এসেছিলেন অ্যালাকসিয়া।

শ্রীনিকেতন মেলা, ছবি : ডাগমার জোনস্
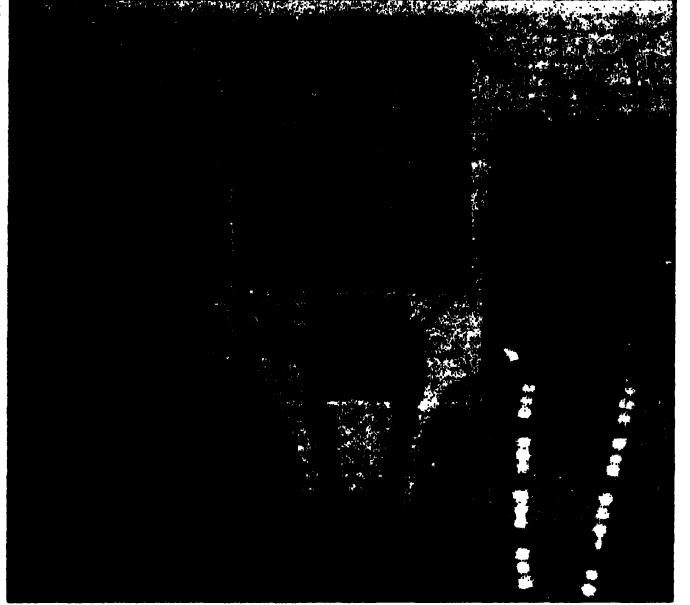
পূর্ণদাস বাউল ও লক্ষ্মণ দাস বাউল

বাউলগান শুনে তাঁর ভাল লেগে যায়। তারপর বাউলদের সঙ্গে থেকে যান কিছুদিন, বাউল গান শুনে আনন্দিত হন। পরে দেশে ফিরে যান। আবার ক্রিস-কলরাডোর কথা বলা যায়। যিনি এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। ইনিও মাইক্রোবায়োলজিস্ট। এই বিজ্ঞানী কবি রবীন্দ্রনাথের টানে এসেছিলেন। বীরভূমের বাউল তাঁকেও আকৃষ্ট করে। বাউল গানে আকৃষ্ট হয়ে এবং দাসরাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইনি তাঁর দুই মেয়েকে বাউলগান শেখাতে আগ্রহী হন। ব্রেট ও ক্যাসিয়া—এই মেয়ে দুটি বাউল-দর্শন ও গানে উদ্‌বুদ্ধ হন। এছাড়াও জার্মান সেতারবাদিকা ডাগ্‌মার জোন্‌স-এর কথা বলা যায়, ইনি বীরভূমে এসে বাউলের ভক্ত হয়ে ওঠেন। বাউল-দর্শন জানতে আগ্রহী হন। এঁরা কেউই বাউলের মাথা চিবিয়ে খাননি।

তবে শ্বেতাঙ্গিনীদের দেহ-সম্ভোগ কামনা ও অর্থলালসা বীরভূমের বাউলকে কলুষিত করছে না এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। এই কামনা ও অর্থলালসা শুধু বিদেশিদের কাছে নয়, শান্তিনিকেতনে ঘুরতে আসা কিছু বাবুর অবাধ মনোরঞ্জনের জন্যও অনেক বাউল টাকা নিয়ে গান গাইতে যান। তবে তাঁদের আদৌ বাউল বলা যাবে কিনা তাতে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকেই যায়। তাছাড়াও আজকের পৃথিবীতে কলুষমুক্ত কোনো কিছুকে চাওয়া বোধ হয় বোকামি হবে।

কিন্তু যে বীরভূমের বাউল নিয়ে এত হইচই সেই বীরভূমের মানুষজন ভুলতে বসেছেন তাঁদের এই সংস্কৃতিকে। জয়দেব-কেঁদুলিতে বাউলরা এখন অনেকটাই কোণঠাসা। কীর্তন গান বাউলদের স্থান অধিকার করেছে। মেলার উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে শ্রোতা পর্যন্ত সকলেরই এখন অনেক বেশি আগ্রহ কীর্তন গানের দিকে। পৌষমেলাতেও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলিকে জায়গা দিতে গিয়ে বাউলের স্থান হয়ে পড়েছে সীমিত। এমনকি রবীন্দ্র ঐতিহ্যের অপর এক নিদর্শন শ্রীনিকেতনের মাঘমেলাতেও পর্যাপ্ত স্থান ও সময় পাচ্ছেন না বাউলরা। বীরভূমের মাটিতেই তাঁদের এহেন অবস্থা পৌষমেলার বিভিন্ন স্টলে বা মেলার মাঝে অস্থায়ী মঞ্চে বাউলের আসরই তা প্রমাণ করে। তবে আশার কথা হল, বাউল গান, বাউল সংস্কৃতি আজকের গ্লোবালাইজেশনের যুগে বীরভূম ছাড়িয়ে দেশের নানা প্রান্তে তো বটেই বিদেশের মানুষেরও মন টেনেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমাদৃত হচ্ছে বীরভূমের বাউল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বাউল (শরৎ পাবলিশিং হাউস)—আদিত্য মুখোপাধ্যায়

২। বাংলার বাউল ও বাউল গান (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি)—অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

৩। বাউল খোঁজে মনের মানুষ (অর্পিতা প্রকাশনী)—সুনীতিকুমার পাঠক

৪। বাউল ফকির কথা (লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)—সুধীর চক্রবর্তী

৫। ব্রাত্য লোকায়ত লালন (পুস্তক বিপণি)—সুধীর চক্রবর্তী

লেখক : গবেষক (বাংলা বিভাগ) বিশ্বভারতী

চিরন্তন থিয়েটার প্রযোজিত 'লোহার ভীম'

নাটক ও নাট্যচর্চায় বীরভূম—একটি অনুসন্ধান

স্বপন রায়

বীরভূমের রুক্ষ-ধূসর আর লাল কাঁকুরে মাটিতেও বোনা হয় জীবনের ফসল। বাঁচার আকুতিই সে মাটিকে করে তোলে রসঘন। একেবারেই কৃষিনির্ভর জেলা। জীবন, সংগ্রাম সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু তাই কৃষিই। এখানে সাঁওতাল পরগনার কোল থেকে অজয়ের অববাহিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতি লোকনাট্যের মণিমুক্তো। জয়দেব-চণ্ডীদাসের মিলন সাধনা যুগ বিবর্তনে উত্তীর্ণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাধনায় এই বীরভূমের মাটিতেই। মেলার দেশ বীরভূমে বাউল-ফকিরের গানের সুরে তাই জাতধর্মের বেড়া ভেঙে কত সহজেই না মিলতে পারে প্রাণের মানুষ। আবার সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহ্য বীরভূমের কৃষক-ক্ষেতমজুরদের রক্তে, চেতনায় সে বিদ্রোহ বিপ্লবী চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে শ্রেণিসংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায়। তারাশংকর, শৈলজানন্দের চরিত্রগুলি জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় এখন অনেক ঋজু, অনেক বেশি সংঘবদ্ধ—শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া নিত্যদিনের। অভাব-দারিদ্র্য-বঞ্চনাকে তুচ্ছ করে অফুরন্ত সাংস্কৃতিক

সম্পদকে বুকে আঁকড়ে ধরে দুর্মদ প্রত্যাশায় রুক্ষদেশের মানুষগুলো তার নিজস্ব সংস্কৃতি-যাত্রা-নাটককে রক্ষা করে চলেছে যুগযুগান্ত ধরে। বীরভূমের নাট্যচর্চা শুধু সাড়া জাগাতেই সক্ষম নয়, মানুষকে নতুন চেতনায় উজ্জীবিতও করেছে বঞ্চনার প্রতিবাদী হয়ে মনের পুঞ্জীভূত দুঃখ-বেদনা, ক্ষোভ-অভিমানকে সৃজনের কাজে লাগাতে।

বীরভূমের সুপ্রাচীন নাট্যচর্চার অনুসন্ধানে আমাদের মুদ্রিত তথ্যের থেকে শ্রুতিনির্ভর তথ্যের উপর অনেক বেশি আশ্রয় করতে হয়। ওই সময়ের নাট্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকার কারণে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক নাট্যচর্চার সঠিক তথ্য লিখে যাওয়ায় সম্ভব নয়। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকাতে যৎসামান্য নাট্য-চর্চার কথা মুদ্রিত হলেও, তা যত্ন এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। সেই 'সৌখিন নাট্যচর্চা'র ধারা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব চেতনার উন্মেষে নিজের গতিপথ খুঁজে নিয়েছে সমাজ সচেতনতার আধারে জনঘনিষ্ঠ নাট্যসৃজনে। বীরভূমের আনুপূর্বিক নাট্য আলোচনায় অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্যও অনুল্লেখিত থেকে যাবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না যথাযথ তথ্যপ্রাপ্তির অভাবে।

'লয়েল থিয়েটার'-এর উদ্যোগ-আয়োজনে সে আমলের কলকাতার স্বনামধন্য অভিনেতাদের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীরা সম্মিলিত নাট্যাভিনয়ে অংশ নেন। 'শর্মিষ্ঠা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান' নাটকগুলি অভিনীত হয়। কলকাতার 'রঙমহল' নাট্যমঞ্চকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে রূপান্তরিত করার আধুনিক ভাবনা হেতমপুর গ্রামেও পড়ে। সতু সেনের তত্ত্বাবধানে হেতমপুরে তৈরি হয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। 'এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব' নামে একটি নাট্যদলও গড়ে ওঠে এখানে।

ডঃ সুকুমার সেনের মতো বিদগ্ধ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন—"এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়—বীরভূম জেলার অজয় নদ তীরবর্তী কেন্দুলীর শিশুরাম অধিকারীই (ষোড়শ শতক) বাংলার সর্বপ্রাচীন নাট্য পরিচালক।" সেই হিসাবে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বীরভূমের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সহজ অনুমেয়। শিশুরাম অধিকারী কোন নাট্যধারার পরিচালক ছিলেন তার সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও 'সাংস্কৃতিক যুগচৈতন্যের ধারা থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিনি ছিলেন কৃষ্ণ-শিব ও দেবীকাহিনীর উপস্থাপক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব।' দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের মাঝেও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ লোকনাট্যের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁর প্রাণের নাট্যচর্চার ধারাকে এই বীরভূমের বুকে। অতীতকালে বীরভূমে গ্রামে-গঞ্জে যাত্রার প্রচলনই ছিল বেশি। উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাত্রাই ছিল বীরভূমি মানুষের বিনোদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। গণমানসে ওইসব যাত্রা সমাদৃতও ছিল। সন্ধানী দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যাবে বীরভূমের যে সমস্ত বর্ধিষ্ণু গ্রামে সে সময় শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেছিল, সেইসব গ্রামের যুবকেরা নাট্যচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাই, নাট্যচর্চার সূচনালগ্নে বীরভূমের বনেদি জমিদার পরিবারগুলির নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহায়তা লক্ষ্য করা যায়।

বীরভূমের নাট্যচর্চার পরিমন্ডলে ইতিহাস চারণার সারণি বেয়ে যে নামটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় সেটি হেতমপুর। এ ব্যাপারে হেতমপুর রাজবাড়ির মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর উৎসাহ-উদ্যোগ সর্বজন স্বীকৃত। এই রাজপরিবারের বদান্যতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় হেতমপুর গ্রামে নাটকের পরিমন্ডল গড়ে ওঠে। জানা যায় ১৮৮০ সাল বা তার দু-এক বছরের মধ্যেই মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী 'লয়েল থিয়েটার' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। 'লয়েল থিয়েটার'-এর উদ্যোগ-আয়োজনে সে আমলের কলকাতার স্বনামধন্য অভিনেতা-দের সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীরা সম্মিলিত নাট্যাভিনয়ে অংশ নেন। 'শর্মিষ্ঠা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান' নাটকগুলি অভিনীত হয়। কলকাতার 'রঙমহল' নাট্যমঞ্চকে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে রূপান্তরিত করার আধুনিক ভাবনা হেতমপুর গ্রামেও পড়ে। সতু সেনের তত্ত্বাবধানে হেতমপুরে তৈরি হয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। 'এ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব' নামে একটি নাট্যদলও গড়ে ওঠে এখানে। হেতমপুর রাজ চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগেই কলকাতায় প্রখ্যাত 'রঞ্জন অপেরা' যাত্রা দলটি গড়ে ওঠে।

জেলার নাট্যচর্চার শৈশব যদি হয় হেতমপুর তাহলে নাট্যচর্চার উৎকর্ষজনিত লালনের মহৎকর্মটি সচেতনভাবে পালন করে তাকে শক্ত পায়ে দাঁড় করিয়েছেন লাভপুরের নাট্যশিল্পীবৃন্দ। যার পুরোধা ব্যক্তিত্ব নাট্যপ্রাণ নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের নাট্যচর্চার ইতিহাসে অবশ্য উচ্চারিত একটি নাম। জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র নাট্যপ্রেমিক অতুলশিব ও নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের আদলে লাভপুরে গড়ে তোলেন 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার'। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতার প্রখ্যাত নট ও নাট্যনির্দেশক নরেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লাভপুরে সে আমলের আধুনিক উন্নতমানের স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হয়। অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর যা 'অতুলশিব মঞ্চ' নামে খ্যাতিলাভ করে।

চিরন্তন থিয়েটার-এর 'পরিক্রমা' (১৯৯৬), বাংলা নাটকের ২০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা

আজও যার সগৌরব অবস্থান সবার্থে নাট্যকে গ্রাম লাভপুরে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্বগণ লাভপুরের সামাজিক পরিমণ্ডলকে নাট্যভাবনায় উন্নীত ও উন্মোথিত করতে সহায়তা করেন লাভপুর মঞ্চে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে।

হেতমপুরের মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী নাট্যকারও ছিলেন। তিনি একটি নাটক লেখেন। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যার নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গেবর্গী'। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়—"এই বিষয়বস্তু লইয়া বীরভূমের খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায়বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক লিখলেন। ইহার পূর্বেই তাঁহার লিখিত নাটক 'বীররাজা' কলকাতার থিয়েটারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত প্রহসন 'রাতকানা'র খ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে নির্মলশিবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদাপ্রসাদও নির্মলশিবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, লাভপুরেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। অপরেশচন্দ্র কয়েক বারই লাভপুরে আসিয়াছেন। নির্মলশিব একসময় তাঁহাদের কয়লাকুঠির কাজ দেখিবার জন্য কিছুদিন রানিগঞ্জে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপরেশচন্দ্র বার দুই রানীগঞ্জের বাসাতেও গিয়াছিলেন। নির্মলশিবের থিয়েটারের শখ ছিল, তাঁহারও থিয়েটারের দল ছিল। নিজে নাট্যকার ও ভাল অভিনেতা, সুদক্ষ শিক্ষক। লাভপুরেও থিয়েটারের জন্য বাঁধা স্টেজ ছিল। কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের হাতেখড়ি হয় লাভপুরে নির্মলশিবের হাতে। কিশোর তারাশংকর নির্মলশিবের থিয়েটার অভিনয় করিতেন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেতমপুর ও লাভপুরের আদর্শেই বীরভূমের শখের থিয়েটারের প্রসার বাড়ে।"

বীরভূমের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের নাট্যচর্চাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগ আয়োজনে তাঁর রচিত নাটক অভিনীত হত। নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি নিজে সব চরিত্র অভিনয় করে দেখাতেন। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন—তিনি কখনো কোনও পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে এ কাজে নামেননি। যেসব ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মী শান্তিনিকেতনে এসে সমবেত হয়েছেন, যাঁরা কখনও অভিনয় করবার কল্পনাও করেননি, তাঁদের নিয়েই তিনি অভিনয়

থিয়েটার অভিযান প্রযোজিত 'মুখোশ'

সার্থক করে তুলেছেন। নাটকের আধুনিক ভাবনা, মঞ্চসজ্জা, আঙ্গিকের নব নব নির্মাণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান তো সর্বজনবিদিত। তবু বলতেই হয় শান্তিনিকেতনের নাট্যচর্চার সঙ্গে বীরভূমের অন্যান্য স্থানের নাট্যচর্চার যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। বীরভূমের নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য শান্তিনিকেতনের নাট্যচর্চা বীরভূমের অহংকার। এখনও শারদোৎসবের প্রাক্কালে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নাটক মঞ্চস্থ করেন প্রথা মেনেই।

দেখা যাচ্ছে জেলার প্রথম সফল নাট্যকার ও নির্দেশক, নাট্যপ্রবাহের অগ্রগণ্য পথিক স্বনামখ্যাত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে স্থাপিত হয়েছিল 'গুরুসদয় মঞ্চ' ১৯২৬ সালে। সিউড়ি শহরের নাট্যচর্চার মূল প্রবক্তা তিনিই। ১৯১৬ সালে 'নির্মলশিব নাট্যসমাজ' নামে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন তিনি। সহযোগী হিসাবে পান ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি সাহা, ডাঙ্গালপাড়ার ননীবাবু প্রমুখকে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় নারী চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। বীররাজা, নবাবী আমল, রাতকানা, চোর, ভুলের খেলা, মুখের মতো নির্মলশিবের এইসব নাটক তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এদিকে ১৯২১ সালে ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। জানা যায় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাকি সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে গুরুসদয় দত্ত বীরভূমের জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্বভার নেন। জানা যায় ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনাকে অন্যপথে প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন। তখনও নাট্যচর্চায় কিন্তু ভাটা পড়েনি। সে সময় জেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'সিউড়ি বড়বাগানের মেলা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছেন এই মেলার উদ্বোধনে। কলকাতা থেকে স্টার, মিনার্ভার নাটকগুলি মেলায় অভিনয়ের জন্য আনা হত। ১৯২৬ সালে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে এবং হেতমপুর রাজপরিবারের বদান্যতায় 'গুরুসদয় মঞ্চের' পত্তন হয়। স্থায়ী নাট্যমঞ্চ পেয়ে নাট্যকর্মীদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু মাত্র একবছরের মধ্যেই ১৯২৭ সালে এই সাধারণ মঞ্চটি রহস্যজনক কারণে আমলাতন্ত্রের কুক্ষীগত হয়ে অভিজাত লীজ ক্লাবের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ১৯৩৯ সালে খুজুটিপাড়ার কমল দাস গুরুসদয় মঞ্চের সংলগ্ন জমিতে একটি 'পাবলিক হল' তৈরি করেন। যা 'দীননাথ দাস মেমোরিয়াল হল' নামে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে যা 'চৈতালী সিনেমা হল'। এদিকে নাট্যচর্চাও তখন অনেকটা সুসংহত। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বীররাজা, কর্ণার্জুন, মিশরকুমারী, সিরাজদ্দৌলা, তটিনীর বিচার, পণের দাবী অভিনীত হয়ে নাট্যমোদী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। বলা যায় বীরভূমের নাট্যচর্চাকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করাতে সমর্থ হয় সিউড়ির এই নাট্যচর্চা।

হেতমপুর, লাভপুর, সিউড়ির এই নাট্যচর্চার ঢেউ বীরভূমের বর্ধিষ্ণু কিছু গ্রামেও প্রভাব ফেলে। ১৯৩৩ সালে সিউড়ি সন্নিহিত নগরী গ্রামে সুধীন্দ্রকুমার রায়, জ্যোতির্ময় রায়, উমাশংকর রায়,

ইয়ংপার্লামেন্ট'র পথনাটিক 'ঝকমকায় যা'

গণনাট্য—রুদ্রবীণা, সিউড়ি, সঞ্জয় দাস নির্দেশিত 'ওয়ার্নিং মেশিন'

উমাপদ রায়, সিতাংশুভূষণ রায় প্রমুখ তরুণ নাট্যচর্চার জন্য গড়ে তোলেন 'নগরী বাণী মন্দির'। সমসময়ের কিছু আগে পরে গড়ে ওঠে রামপুরহাট মহকুমার করুমগ্রামে 'করুমগ্রাম সম্মিলনী', সিউড়ির উপকণ্ঠে কড়িধ্যা গ্রামে মিলনী সঙ্ঘ ও কড়িধ্যা সরস্বতী সমিতি। একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় নগরী বাণী মন্দির ও করুমগ্রাম সম্মিলনীর ক্ষেত্রে। উভয়স্থানেই প্রথমে নাট্যচর্চা, তারপর ক্লাব গঠন এবং পরে প্রতিষ্ঠানের নামেই গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। করুমগ্রাম সম্মিলনীর নিজস্ব নাট্যমঞ্চও আছে। কড়িধ্যা মিলনী সঙ্ঘ ও সরস্বতী সমিতি মূলত যাত্রার প্রতি অনুরাগী হলেও নাট্যচর্চার দিকেও মনোনিবেশ করেন।

১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ সিউড়ির সৌখিন নাট্যচর্চায় একটা নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটে। দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুধীর মুখোপাধ্যায়, অভয়কুমার দাস, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, দ্বারকেশ মিত্র, হরিনারায়ণ সিংহ, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সাহা, সুনীল মিত্র, দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, ললিতকুমার সিংহ, পার্বতীশংকর সরকার, অসিত দাস, অম্বিকা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ অভিনেতারা সিউড়ির নাট্যচর্চাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। তাঁদের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্যোগে কলকাতা এবং বর্ধমান থেকে মহিলা শিল্পী এনে অভিনয় করা শুরু হয়। গীতা দে, মলিনাদেবী, সরযূদেবীর মতো অভিনেত্রীরাও এই সূত্রে সিউড়িতে এসে অভিনয় করেন। ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিউড়িতে বহুবার অভিনয় করতে এসেছেন।

চারের দশকে জেলার রামপুরহাট, বোলপুর, হেতমপুর, দুবরাজপুর, নলহাটি, নগরী করুমগ্রাম, বাতিকার, নারায়ণপুর, অবিনাশপুর, মহঃবাজার, কড়িধ্যা, সাঁইথিয়া, কুন্ডলা প্রভৃতি গ্রামে সখের নাট্যচর্চার প্রসার ঘটে। এ সময় মূলত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হতো। 'সামাজিক নাট্যপালা'-ও অভিনীত হতো। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে স্বদেশপ্রেমের নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথাও জানা যায়।

চারের দশকে রাজ্যে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ নাট্যচর্চায় এক অন্য ধারার প্রবর্তন করেন। তবে এই সময়কালে বীরভূমে কোথাও গণনাট্যের কোন নাট্যশাখার সংগঠন গড়ে উঠেছিল কিনা জানা যায় না। তবে গণনাট্যের সংগীতের টিম ছিল এবং কলিম শরাফীর মতো ব্যক্তিত্বরা তাতে যুক্ত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠা, কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশেষত কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন জেলার যেসব স্থানে প্রভাব ফেলেছিল সেখানে গণনাট্যের পতাকাতলে কোনও নাট্য প্রযোজনা না হলেও প্রগতি ভাবনায় উদ্বুদ্ধ তরুণেরা যে সমস্ত গ্রামে ছিলেন সেখানে প্রগতিশীল ভাবনার নাটক মঞ্চস্থ করার ঘটনাও জানা যায়। এই পর্বে নগরী বাণীমন্দির দুধীর ইমান, নীলদর্পণ, মহেশ, কালিন্দীর মতো নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে। অন্যান্য স্থানেও এধরনের নাট্য
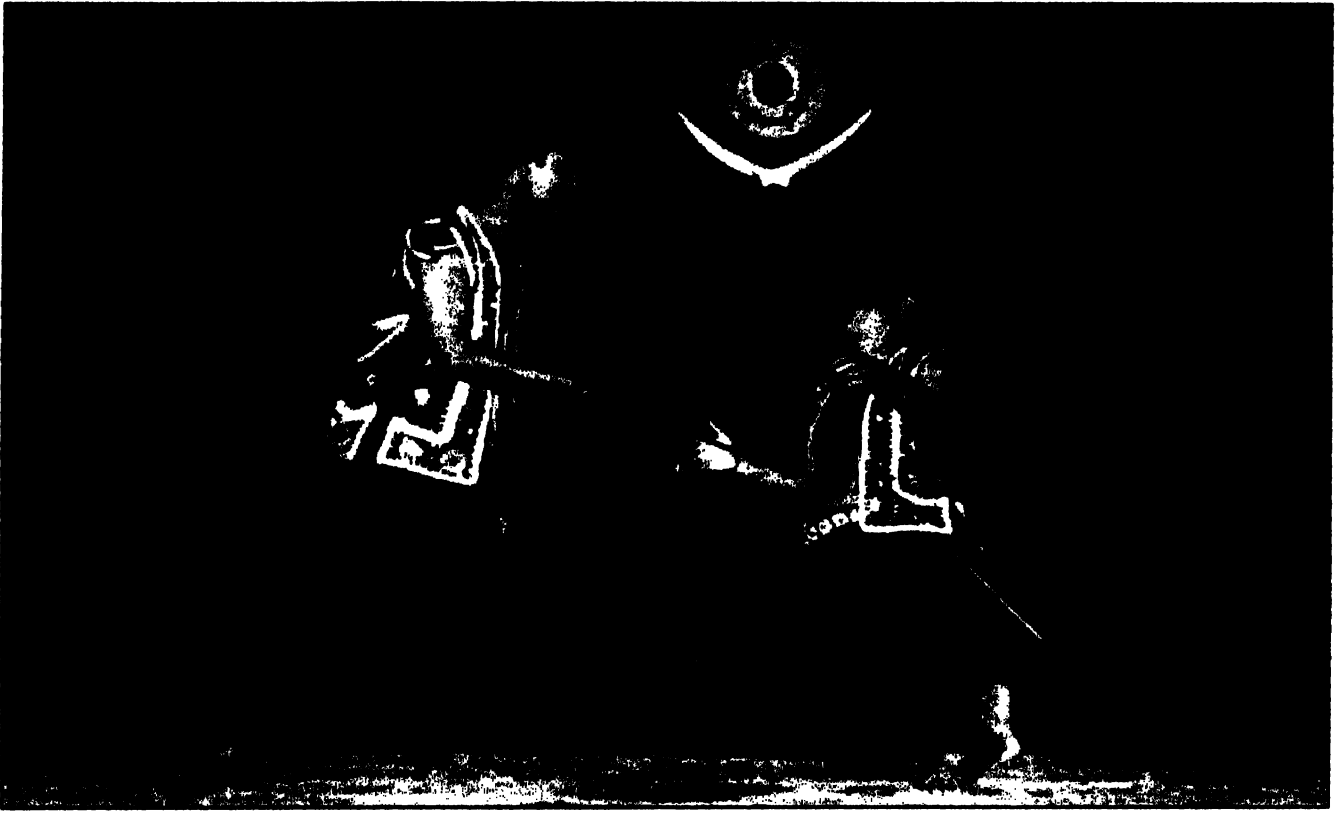
গণনাট্য—রুদ্রবীণা, সিউড়ি, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি নির্দেশিত 'পাকেচক্রে'

প্রযোজনা হলেও তার তথ্য সংরক্ষিত নেই। বিশেষভাবে বোলপুর, রামপুরহাট এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের তিন/চারের দশকের নাট্যচর্চার তথ্য সম্বলিত লেখাও সংগ্রহ করা যায়নি।

সিউড়ি নাট্যচর্চার আরেক অধ্যায়ের সূচনা ১৯৪৮ সালে সিউড়ি বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনের 'প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন'কে কেন্দ্র করে। এরা দীননাথ মেমোরিয়াল হলে ছত্রপতি শিবাজী (১৯৪৯), স্বর্গ হতে বড় (১৯৫০), কর্ণার্জুন (১৯৫১), মিশরকুমারী (১৯৫২), সাজাহান (১৯৫৩), মেবারপতন (১৯৫৪), নরনারায়ণ (১৯৫৫), উল্কা (১৯৫৭), ভ্রূকুটি (১৯৫৮)—প্রায় একযুগ ধরে এরা নাটক মঞ্চস্থ করেন। যা সিউড়ির উৎসাহী অভিনেতাদের প্রাণিত করে।

১৯৫৬ সালে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দক্ষ শিল্পীদের একত্রিত করে তৈরি হয় 'মঞ্চকেন্দ্রম' নাট্যসংস্থা। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভয় দাস, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মঙ্গল চৌধুরী, ললিতকুমার সিংহ, শিশির মুখোপাধ্যায়, তপন মুখোপাধ্যায়, গোপা চৌধুরী, কার্তিক ঘোষাল, আশানন্দন চট্টরাজ প্রমুখ শিল্পীর সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন আঙ্গিকে নবতর ভাবনায় বীরভূম জেলা জুড়ে অভিনয় শুরু হয়। রামপুরহাট, বোলপুর, বর্ধমানসহ বিভিন্নস্থানে অর্থের বিনিময়ে অভিনয় শুরুর পথপ্রদর্শক এই 'মঞ্চকেন্দ্রম'-ই। মঞ্চকেন্দ্রম-এর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা পথিক, ফেরারী ফৌজ, বিসর্জন, পরিহাস বিজল্পিতম, দুই পুরুষ, কালিন্দী প্রভৃতি। মঞ্চ-আলো-আবহ-অভিনয়-নির্দেশনা সর্বক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নাটককে আরও বেগবান করার লক্ষে 'মঞ্চকেন্দ্রম' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে কলকাতায় বহুরূপীর প্রতিষ্ঠা এবং শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর প্রযোজনাগুলি এবং উৎপল দত্তের নাট্য প্রযোজনাও জেলার তরুণ নাট্যামোদীদের মাঝে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা গড়ে তোলে। ব্রেখট, গলসওয়ার্দি প্রমুখ বিদেশি নাট্যকারদের নাটক অনুবাদ করে প্রযোজনার চেষ্টা করা হয়। অভয় দাস গলসওয়ার্দির 'জাস্টিস'-এর বঙ্গানুবাদ করেন 'বিচার' নাম দিয়ে। এই পর্বে বীরভূম পায় দুই তরুণ পরিচালক অভয় দাস এবং মঙ্গল চৌধুরীকে। বীরভূমের নাট্যচর্চার ইতিহাসে এ দুটি নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অভয় দাসের পরিচালনায় 'পথিক' এবং মঙ্গল চৌধুরীর পরিচালনায় বিসর্জন ও ফেরারী ফৌজ নতুন মাত্রার সংযোজন করে। সমাজসেবী চিকিৎসক কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধীর মুখোপাধ্যায় উৎসাহ ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে মঞ্চকেন্দ্রম-কে প্রেরণা জোগান।

পাঁচের দশকের গোড়ায় সিউড়িতে গড়ে ওঠে 'নয়া সংস্কৃতি কেন্দ্র'। সমাজসচেতন যে সব তরুণদের উদ্যোগে এই সংস্থা কাজ

শুরু করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ গুপ্ত, ডাঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কিনুবাবু), প্রণবেশ আচার্য, নারায়ণ ভৌমিক (ভোলা), বিমল দাস, অধ্যাপক দাম প্রমুখ। এঁরা কয়েকটি নাটক সিউড়িসহ জেলার অন্যান্য স্থানে মঞ্চস্থ করেন। এই সময়ে জ্যোতিপ্রসাদ গুপ্তের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী-র অংশবিশেষ অভিনীত হয়। বিমল দাস, বিজন সিনহা, নারায়ণ ভৌমিক, ইলা গুপ্ত প্রমুখ তাতে অভিনয় করেন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে সিউড়ি শিল্পীবৃন্দ সিউড়িতে মঙ্গল চৌধুরীর পরিচালনায় এবং নগরী বাণী মন্দিরের শিল্পীরা সুধীন্দ্রকুমার রায়, জ্যোতির্ময় রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' মঞ্চস্থ করেন। অভয় দাসের নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় 'জাগরণী সঙ্ঘ' উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেন। কেদার রায়, টিপু সুলতান, সাজাহান এদের জনপ্রিয় প্রযোজনা। অভিনেতা হিসাবে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঔরঙ্গজীব এবং টিপুর চরিত্রে সর্বাধিক রজনী অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পাঁচের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ আয়োজিত বীরভূম-বাঁকুড়া-মুর্শিদাবাদ নিয়ে নাট্য প্রতিযোগিতায় জাগরণের 'টিপু সুলতান' বীরভূম জোনে প্রথম স্থান অধিকার করে। সিউড়িতে ১৯৫২ সালে 'পথিক' নাটকে অভিনয়ের সূত্রে মেয়েরা প্রথম পুরুষদের সঙ্গে অভিনয়ে অবতীর্ণ হন। লক্ষ্মী রায়, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমিলা দাস, সুস্মিতা চৌধুরী প্রমুখ এই পর্বের শিল্পী। 'কেদার রায়' নাট্য প্রযোজনা অর্থাভাবে বন্ধ হবার উপক্রম হলে অভয় দাস তাঁর স্ত্রীর সোনার হার এবং মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সোনার আংটি বিক্রি করে (তিন ভরি) সংগৃহীত তিনশ টাকা দিয়ে সেট, মেকআপ, সাজপোশাকের খরচ সংগ্রহ করেন। বিজয় সরকার, বিমান সরকার, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভেলা বাবু, সুধীর মুখোপাধ্যায়, পার্বতীশংকর সরকার, চৌধুরী আলি আকবর, তেজারত হোসেন ছিলেন এদের সঙ্গে। স্বনামধন্যা গীতা দে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা চৌধুরী প্রমুখ অভিনেত্রীরা এদের সঙ্গে অভিনয় করেন। এদের শেষ অভিনয় হয় ডাঙ্গালপাড়ায় গোপাল বাবুর বাগানে 'সাজাহান' নাটক দিয়ে। অভয় দাস সিউড়ি নাট্যচর্চায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সর্বশেষ তিনি লাভপুরের নাট্যপ্রাণ উদ্যমী পুরুষ মহাদেব দত্তকে নিয়ে নিবেদন নাট্য সমাজ গড়ে তুলে তাঁরই লেখা 'বিবেকানন্দ' মঞ্চস্থ করেন আমোদপুর, লাভপুর, সিউড়ি প্রভৃতি

একনাই প্রযোজিত 'মুক্তধারা'

আনন্দ প্রযোজিত 'রাজদর্শন' (১৯৮৫)

স্থানে। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী অপরাজিতা মুখোপাধ্যায় ছিলেন এদের সঙ্গে।

১৯৬০-৬১ সালে পিনাকী রায়, মদন দে, নরেন দে-র উদ্যোগে 'আর্ট অ্যান্ড কালচার' গড়ে ওঠে। ১৯৬১-তে পার্থসারথি এবং পরবর্তীতে আজকাল, কেরানির জীবন, অপরাজিত, দুই মহল, চোর অভিনীত হয়। সুকুমার রায়, সরিৎ চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৪-তে এই সংস্থা ভেঙে গেলে 'মিতালী নাট্য সংঘ' তৈরি করেন এদেরই কয়েকজন। ১৯৭৮-এ পিনাকী রায়, মদন দে, অপূর্ব দাস, সুকুমার দত্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'তৃতীয় কণ্ঠ' অভিনয়ের পর দলটি অবলুপ্ত হয়ে যায়। ইরিগেশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়ও দর্শকদের আকৃষ্ট করতো। কানাই চক্রবর্তী, সুদাম ঘোষ, রামেন্দু সরকার, মধুসূদন দত্ত, ভবরূপ ভট্টাচার্য, কনকেন্দু রায়, চারুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখেরা ইরিগেশন মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ নিতেন। জানা যায় বঙ্কিম ঘোষ, সবিতাব্রত দত্তের মতো অভিনেতারাও এদের সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। লীজ ক্লাবের সদস্যরাও দীননাথ মেমোরিয়াল হলে নাটক মঞ্চস্থ করতেন। সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির পৈততী, ললিতকুমার সিংহ প্রমুখেরা ফাঁস, বঙ্গনারী প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯৬১-তে সিউড়িতে বিদ্যুৎ চৌধুরী, স্বামী সুরেশ্বরানন্দ, ডাঃ অজিত দাশগুপ্ত, সুকুমার রায়, সরিৎ চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রসরাজ সরকার, বরেন সেন, ললিতকুমার সিংহ প্রমুখ গড়ে তোলেন কলাকেন্দ্রম। ১৯৬১-৬৭ পর্বে এরা মঞ্চস্থ করেন কাঞ্চনরঙ্গ, ডাউনট্রেন, আলোয় ফেরা, জওয়ান প্রভৃতি নাটক। ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি দীননাথ মেমোরিয়াল হলে 'সৈনিক' এদের সর্বশেষ প্রযোজনা। মঞ্জুশ্রী জানা, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহিলা শিল্পী হিসাবে। ১৯৬৩-তে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর মজুমদার, সুবাস দাস মিলে গড়ে তোলেন 'থ্রি স্টার'। ছেঁড়াকাগজের বস্তা, অন্তরালে, সত্য মারা গেছে, আলো চাই, ঝর্ণা-এদের প্রযোজনা। মুলা সরকার, অঞ্জলী সরকার, অর্চনা মহান্ত এই পর্বের অভিনেত্রী। ১৯৬৮তে সন্ধানী আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতাতে সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যদিও নাটক' পুরস্কৃত হয়।

১৯৬১-৬৭ পর্বে নগরী বাণীমন্দিরের তরুণ প্রজন্ম নাট্যচর্চায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। আলোক রায়, নীহারেশ্বর রায়, স্বপন রায় প্রমুখ কলকাতাতে পড়াশুনার সুবাদে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়দের নাট্য প্রযোজনা দেখে উদ্বুদ্ধ হন। বঙ্কিম রায়, হিমাদ্রি রায়, দীপ্তিপ্রকাশ রায়, তরুণ রায়, আলোক রায়, তপন রায় প্রমুখরা এই সময়ের শিল্পী। দুই মহল, চোর, তাইতো, ক্ষুধা, কাঞ্চনরঙ্গ, ডাউন ট্রেন, বিশ পঞ্চাশ, সম্রাটের মৃত্যু, কালের যাত্রা এরা মঞ্চস্থ করেন। একই সময়ে অজয় রায় গ্রামের শিশু-কিশোরদের নিয়ে রামের সুমতি, নিষ্কৃতি, সুখী রাজপুত্র, বিসর্জন, পরিবর্তন, চক্র, পাগলা দাশু প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেন। নগরী বাণীমন্দিরে ১৯৬০ সাল থেকে মহিলা শিল্পীরা অভিনয় শুরু করেন। পার্বতী রায়, পদ্ম রায়, সন্ধ্যা সরকার, পুরবী রায়, কবিতা রায়, চন্দ্রা রায়, লাবণ্য রায়, রাণী রায় প্রমুখ অভিনেত্রীরা উঠে আসেন।

১৯৬০-৬৫-তে দুবরাজপুর সন্নিহিত নিরাময় টি বি স্যানাটোরিয়ামের নাট্যচর্চাও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায় কালিন্দী, চক্র, ভাড়াটে চাই, বারভূতে এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ডাঃ এন কে সাহা, জয়ন্তী ভট্টাচার্য, আশানন্দন চট্টরাজ, বিপদভঞ্জন মন্ডল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ অভিনেতারা যুক্ত ছিলেন। কালিন্দী নাটকে মানিক কাহারের আলোকসম্পাত এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে দর্শকদের স্মৃতিতে।

সাঁইথিয়ায় 'রূপরঙ্গ' গড়ে তোলেন কুমারকিশোর মুখোপাধ্যায়, শিশির মুখোপাধ্যায়, তপন মুখোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ রায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা দুই মহল, ফেরারী ফৌজ, পাহাড়ী ফুল। প্রথিতযশা নাট্যনির্দেশক মঙ্গল চৌধুরীও এই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর গড়ে ওঠে 'মেঘদূত গোষ্ঠী', তারা মঞ্চস্থ করে লৌহপ্রাচীর। দর্শনী দিয়ে নাটক দেখা শুরু হয় সাঁইথিয়াতে এ সময় থেকেই। পরবর্তীতে গড়ে ওঠে 'মঙ্গলদূত নাট্যগোষ্ঠী' এরা উজ্জ্বল তরঙ্গ, আগন্তুক মঞ্চস্থ করে। দুবরাজপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতিতেও নাট্যানুষ্ঠান

হত। প্রহ্লাদ দত্ত, হরি পাল, বিনয় বসু, তারাপদ চট্টরাজ, প্রফুল্ল রায়, আশানন্দন চট্টরাজ, কার্তিক বসুরা এখানে অভিনয় করতেন। ১৯৫২ সালে স্থাপিত হয় হেতমপুর রাইজিং ক্লাব। প্রফুল্ল চট্টরাজ, কালীপদ দাস, সৈয়দ দাজিদ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে 'রাইজিং ক্লাব' উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ করেন। দুবরাজপুর কাছারি পাড়াতে নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা হলেন অনিল মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মুখার্জী প্রমুখ। গড়গড়াতে অশ্বিনী দত্তের নেতৃত্বে নাট্যচর্চা চলত। স্বরাজ করের নেতৃত্বে জনুবাজারে ছিল নাট্যদল। বাতিকার গ্রামে হরিনারায়ণ সিংহের উদ্যোগ ও নির্দেশনায় নাটক মঞ্চস্থ হত। তীরগ্রামে অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষ পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হত। পাইকরে সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র মালাকার প্রমুখ শিল্পীরা বিল্বমঙ্গল নাটক দিয়ে নাট্যচর্চা শুরু করেন। বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি মহাশয় তাঁর স্ত্রী ছায়া গাঙ্গুলিকে অভিনয়ে আনেন। পরবর্তীতে দুর্গাদাস ঘোষের সুদক্ষ নেতৃত্বে সবল নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে পাইকরে। দুর্গাদাস ঘোষ দীর্ঘদিন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বীরভূম জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন। লাভপুরে এই সময়কালে নাট্যচর্চার হাল ধরেন সুদক্ষ অভিনেতা মহাদেব দত্ত। নলহাটিতে নাট্যচর্চায় উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা নেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, অজয় সিংহ। মঞ্চকেন্দ্রম-এর নাট্যচর্চা রামপুরহাটে প্রভাব ফেলেছিল। কার্তিক ঘোষাল, কিংকর চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল চৌধুরী প্রমুখ রামপুরহাটের নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাঁচের দশকের সূচনায় বোলপুরে নাট্যচর্চার কথা জানা যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে শ্রীনাট্যম গড়ে ওঠে। মঙ্গল চৌধুরী, কুশল চৌধুরী, ক্ষুদিরাম সেন, জগদীশ মন্ডল, অমিয় ভট্টাচার্য, রেণুপদ দে, বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় শ্রীনাট্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে শ্রীনাট্যম বেশিদিন চলেনি। বদরে আলম (মুকুল)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ভার্ডেন্ট থিয়েটার গ্রুপ' এদের মহেশ নাটকটি বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কারলাভ করে।

ছয়ের দশকে জেলার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন নাট্য প্রযোজনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। সিউড়ি জোনাকী, মৌমাছি, রেডরোজ, উদয়ন, অভিযান অগ্রগণ্য। ১৯৬৬-তে স্থাপিত 'জোনাকী' নাট্যোৎসব সহ নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে বর্তমান নাট্যচর্চার দিশারীর ভূমিকা নেন। রতন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকারদের নিয়ে আসেন। তপনলারায়ণ রায়চৌধুরী, ব্রজ দাস, রজ সাহা, পীযুষ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাস গঙ্গোপাধ্যায়, পীযূষ দে, করুণাময় ঘোষ, শান্তিগোপাল দত্ত প্রমুখ শিল্পী সংগঠকেরা জোনাকীর নাট্যচর্চাকে বেগবান করে তোলে। সিউড়ি শেহারাপাড়া উত্তরপল্লীর নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুনীতি চট্টরাজ, সিরাজুল হক (কচি), বাবুল চক্রবর্তী, তপন পাল, আলোক দাস, শ্রীকান্ত কাহার, মানস চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৯৬৮তে গড়ে ওঠে 'অভিযান'। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় দাস, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন দে, তড়িৎ ভাদুড়ি, সুমিত ভাদুড়ি, তপন বসু, গৌতম বসু, দেবানন্দ, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আরও তরতাজা যুবকেরা 'অর্ঘ' নাটক দিয়ে অভিযানের নাট্য অভিযান শুরু করে। হেঁড়া তমসুক, নয়ন কবীরের পালা, আজকের আলাদীন, দানসাগর, গুলশান, বিষ, মারীচ সংবাদ প্রভৃতি প্রযোজনার উৎকর্ষে শহর-জেলা ছাড়িয়ে 'অভিযান'-এর গতি ছড়িয়ে পড়ে জেলান্তরে। উল্লেখ্য, অভিযান-ই আজকের 'থিয়েটার অভিযান' রাজ্যের একটি সুপরিচিত নাট্যদল।

রামপুরহাটের নাট্যচর্চায় যে নামটি প্রথম উঠে আসে সেই 'সাগ্নিক'-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৬৯-এ। যার সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ক্ষেত্রমোহন মন্ডল এবং ডঃ দেবব্রত ভট্টাচার্য (তপন) ১৯৬৯-১৯৭৯ সময়কালের মধ্যে সাগ্নিক ৭টি উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেন। ১৯৭০ সালের ১০ জানুয়ারি 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' দিয়ে তার যাত্রা শুরু। ক্রমান্বয়ে তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন মারীচ সংবাদ, ছুটির ফাঁদে, টিনের তলোয়ার, চাকভাঙা মধু, দানসাগর এবং সর্বশেষ 'সাজানো বাগান'। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি নাট্যপ্রযোজনার সে সময়ে কলকাতার নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয় বলিষ্ঠ প্রযোজনা।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ-এ সারা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭তে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন তা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন, ১৯৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন তাও ভেঙে যাওয়া, অন্যদিকে তরাই অঞ্চল থেকে

স্পষ্টভাবে বলতে গেলে সাতের দশকের সূচনাপর্ব থেকেই বীরভূমের নাট্যচর্চা যুগসন্ধিক্ষণের বুকে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সৌখিন বিনোদনের জন্য নয় নাটককে সমাজ অগ্রগতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। নাট্যচর্চায় এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে সাতের দশকেই। ফলে নাট্যচর্চাও হয়ে উঠেছে অনেক সুসংগঠিত, সংঘবদ্ধ। তারই ফলশ্রুতিতে বীরভূমের নাট্যচর্চা রাজ্যের বিদগ্ধজনের সমাদর লাভ করেছে।

আনন প্রযোজিত 'বিনু কাহারের থেটার'

নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ, আন্দোলন দমনের নামে সন্ত্রাস, দমন, পীড়ন সবই রাজ্যের যুব সমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। বীরভূমও তার বাইরে ছিল না। রাজনৈতিক এই টালমাটাল অবস্থাতেও বীরভূমের নাট্যচর্চা স্তিমিত হয়নি বরং 'ঝড়ের গর্জন মাঝে' সংগঠিত ভাবনায় দিশা খোঁজার চেষ্টা করেছে। ক্লাব সংগঠনের নাট্যচর্চা থেকে বেরিয়ে এসে শুধুমাত্র নাট্যচর্চার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে সাতের দশকের সূচনাপর্ব থেকেই বীরভূমের নাট্যচর্চা যুগসন্ধিক্ষণের বুকে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সৌখিন বিনোদনের জন্য নয় নাটককে সমাজ অগ্রগতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শিখেছে। নাট্যচর্চায় এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে সাতের দশকেই। ফলে নাট্যচর্চাও হয়ে উঠেছে অনেক সুসংগঠিত, সংঘবদ্ধ। তারই ফলশ্রুতিতে বীরভূমের নাট্যচর্চা রাজ্যের বিদগ্ধজনের সমাদর লাভ করেছে।

১৯৭১-এর ৭ ডিসেম্বর বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে রতন ঘোষের 'শেষ বিচার' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'আনন'। রঞ্জকুমার সাহা, বিভাস গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত নন্দন, অলোক দাস, শ্রীকান্ত কাহার, বাবুন চক্রবর্তী, পীযূষ দে প্রমুখ তরুণ বীরভূমের নাট্যঅঙ্গনে এক উজ্জ্বলতম নাট্যমুহূর্তের সূচনা করলেন যে 'আনন'-এর তা আজ রাজ্যের নাট্যঅঙ্গনে অবশ্য উচ্চারিত একটি নাম। ১৯৭২-এ পার্থসারথী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সুবোধ নায়েক, ব্রজগোপাল সাধু, অসিতারঞ্জন চৌধুরী, অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কবিরাজ মিলে গড়ে তুললেন 'নাট্যসারথী'। বীরভূমের নাট্যচর্চায় 'নাট্যসারথী' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে একসময়। ১৯৭২ বাংলায় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মহালয়ার দিন আত্মপ্রকাশ করলো রামপুরহাট 'রঙ্গম' নাট্যসংস্থা। সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সিদ্ধান্ত (হারুদা), অমিয়প্রকাশ মুখোপাধ্যায়, মলয় চট্টোপাধ্যায় ছিল রঙ্গমের শক্তির মূল উৎস। সাতের দশকে জেলা ও রাজ্যস্তরের নাট্য উৎসব ও নাট্য প্রতিযোগিতা মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছে রঙ্গম। ১৯৭৪-এ কুমার ব্যানার্জী (নাবিক), বিজয়কুমার দাস প্রমুখ সাঁইথিয়ার নাট্যচর্চার অতীত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে তারুণ্যের প্রাণোচ্ছলতায় গড়ে তুললেন 'রঙ্গতীর্থ' নাট্যসংস্থা। ১৯৭৬-এ শক্তিমান নির্দেশক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠল রামপুরহাটের বীরভূম নাট্যকেন্দ্রম (বী না কে) যার প্রতিটি প্রযোজনায় দক্ষতার ছাপ অনুভূত হত। ১৯৭৭-এ পূর্বতন কিশোর নাট্যসংস্থা নাম পরিবর্তন করে রামপুরহাটে 'প্রবাহ নাট্যম' নামে আত্মপ্রকাশ করলো। এই সংস্থাগুলির সঙ্গে সিউড়ির অভিযান এবং হেতমপুরের রাইজিং ক্লাব, আশিস মান্নার নেতৃত্বে লাভপুর শিল্পীসংসদ সাতের দশকের পুরোসময় জুড়ে বীরভূমের নাট্যচর্চাকে বেগবান রেখেছে।

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে 'যুব উৎসব' নতুন দিগন্তের সূচনা করে। আশির দশকেই সব থেকে বেশি নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে বীরভূমে। যুব উৎসব মঞ্চে মহানগরীর

বিশিষ্ট নাট্যদলগুলি প্রযোজনা দেখার সুযোগসাপেক্ষে প্রযোজনার গুণগত মানোন্নয়নে নাট্যদলগুলি সচেষ্ট হয়। নতুন নতুন নাট্যদলও গড়ে উঠতে থাকে। সিউড়িতে ১৯৮০ সালে সুজিত ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম দে, অশোক বসু প্রমুখ গড়ে তুললেন তরঙ্গ নাট্যসংস্থা। কাল বিহঙ্গ, মেঘ রাক্ষস, হয়ত নয়তো এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ১৯৮৩-তে মালতী রুদ্রের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পরিচয়। জ্যান্তমড়া, জয় মা কালী বোর্ডিং এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। বিদ্যুৎ দাস, বেণীমাধব হাজরা, শুভেন্দু মন্ডলরা ১৯৮৪-র ১৫ মে গড়ে তুললেন থিয়েটার সেন্টার। ১৯৮৪-র ২৬ আগস্ট সঞ্জয় সিংহ, গৌতম গোস্বামীরা ইন্টারভিউ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। আশির দশকের সূচনায় দিলীপ দত্তগুপ্ত, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম চক্রবর্তী, গৌতম বিশ্বাস, চন্দ্রমোহন চক্রবর্তীসহ একঝাঁক তরুণ-তরুণী মিলে গড়ে তুললেন 'মুক্তমন' সংস্থা। মূলত দৃশ্যায়ন সংগীতের সংস্থা হলেও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'মুক্তমন' দক্ষতার ছাপ রাখে। বায়েন, ধর্মযোদ্ধা, গণশত্রু, গাব্বুখেলা এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। দৃশ্যায়ন-এর ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরেও মুক্তমন-এর সুনাম ছড়িয়ে যায়। অমিত ঘোষদস্তিদার প্রমুখ গড়ে তোলেন ইস্পাত নাট্যসংস্থা। পল্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা গড়ে তোলেন প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা (প্রগাম)। রামাগোপালদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'প্রসাম'। ১৯৮৪-র প্রথম দিকে বিমান সরকারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'অচেনা'। ব্রজ সাহা, সুবিনয় দাস, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিশালী শিল্পী সমন্বয়ে মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু' মঞ্চস্থ হয়। সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখা বীরাঙ্গনা, শঙ্খচূড়-এর মতো উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেন। সুশান্ত রায়, অন্নদাশংকর মন্ডল, আশিস সরকারের নেতৃত্বে 'কৃষ্টিদীপ' নাট্যসংস্থা কয়েকজন আমির গল্প, ঘাম, বিসর্জন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মর্জিনা আবদাল্লা মঞ্চস্থ করেন। নির্মল মন্ডলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'পথিকৃৎ' নাট্যসংস্থা। নিজস্ব পাণ্ডুলিপির কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে পথিকৃৎ। উদয়ন ও রেড রোজ ক্লাব কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেন। এছাড়া গন্ধরাজ, অর্ঘ প্রভৃতি নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। বর্তমানে এদের আর অস্তিত্ব নেই। তবু শহর সিউড়ির নাট্যচর্চায় এঁরা অবশ্য উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সময়কালে জেলায় বোলপুরে সারক, নেতাজী নাট্যগোষ্ঠী, কিশলয়, রামপুরহাটের রঙ্গরূপা, সাঁইথিয়ার রূপতাপস, নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাব, আমোদপুর সাহিত্য সংসদ, আমোদপুর স্টুডেন্টস কর্ন্যার, রেনবো, চতুরঙ্গ, পাঁচড়াপুর নাট্যভারতী, দুবরাজপুর উজ্জ্বল সঙ্ঘ, হেতমপুর রাইজিং ক্লাব, বালিজুড়ি মৌনী তরুণ সঙ্ঘ, পাইকর কস্তুরী নাট্যগোষ্ঠী, নলহাটি অবিকৃত নাট্যগোষ্ঠী, নগরী অনির্বাণ, চোঙ্গুরা ভ্রাতৃসঙ্ঘ, লম্বোদপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি, কোটা তরুণ সঙ্ঘ, ঘুলুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি, লাউবেরিয়া মেঘদূত, নারায়ণপুর বারোয়ারিতলা ক্লাব, ভূড়িগ্রাম নেতাজী নাট্যসংস্থা, নানুর তরুণ সঙ্ঘ, হেতমপুর লায়ন্স ক্লাব, নলহাটি অংকুর নাট্যসংস্থা, খটঙ্গা যুব নাট্য সংস্থা, বোলপুর অনামিকা নিত্য মন্দির, লাভপুর দিশারী, আমোদপুর

আনন প্রযোজিত 'মহাজনী' ১৯৯৬

গণনাট্য-রুদ্রবীণা, সিউড়ি, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি নির্দেশিত 'জীবনযাপন'

সাহিত্য সংসদ প্রভৃতি সংস্থা গড়ে ওঠে। এদের অনেকেরই আজ আর অস্তিত্ব নেই। আবার কারো কারো নাট্যচর্চার গতি ক্ষীণধারায় প্রবাহিত।

বীরভূমের নাট্যচর্চায় গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা সংগঠনগুলি গড়ে উঠতে থাকে ১৯৮১ সাল থেকে। অনেক শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর সমন্বয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা সংগঠনগুলি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা উপস্থাপন করেছেন। ১৯৮১তে বোলপুর উত্তরণ শাখা অনুমোদন লাভ করে। বীরভূমে গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা সংগঠন হল দুবরাজপুর ভিক্টরজারা, সিউড়ি রুদ্রবীণা, বোলপুর উত্তরণ, খুজুটিপাড়া মাদল, বক্রেশ্বর রাঙামাটি, পাঁড়ুই ঐক্যতান, হেতমপুর নবান্ন, রামপুরহাট কেতন, নলহাটি অনির্বান, মুরারই কস্তুরী এছাড়া রাজনগর, মহম্মদবাজার, কাপিষ্ঠা, তেজহাটি, ইলামবাজারেও গণনাট্যের শাখা সংগঠনগুলি সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা, সামাজিক অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার এবং জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির প্রচারে এইসব শাখা সংগঠন পথনাটক পরিবেশনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। বর্তমানে জেলা সংগঠনের সভাপতি দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক মধুসূদন কুন্ডুর নেতৃত্বে সংগঠন সংগঠিত চেহারা নিয়েছে। জেলার গ্রাম শহরগঞ্জের নাট্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে আরও বিকশিত আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে যার পৃষ্ঠপোষণার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, বীরভূম জেলা কমিটি। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে দুবরাজপুর ভিক্টরজারা শাখা এবং সিউড়ি রুদ্রবীণা শাখা বীরভূমের নাট্যঅঙ্গনে উল্লেখযোগ্য সাক্ষর রেখেছেন। দুটি শাখায় কলকাতায় নাট্যমেলায় তাদের প্রযোজনা মঞ্চায়নের মাধ্যমে নাট্য ব্যক্তিত্বদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছেন। মধুসূদন কুন্ডুর পরিচালনায় ভিক্টরজারার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল চাচিমা, রাজার খেলা, দ্বাদশভক্তা চাড়ুম, আসছে রাঙা দিন, অথ কৃষ্ণকথা, রায় আগামীকাল। সিউড়ি রুদ্রবীণা শাখার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'একবচন বহুবচন', 'একুশের রোদ্দুর', 'রোশেনারার বন্দুক', 'এ পরবাসে', 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', 'জীবনযাপন', 'এখনও মানুষ', 'ওয়াশিং মেশিন', 'পাকেচকে', 'আস্থা', 'ঠাঁই নাই', শিশুনাটক 'ববি' প্রভৃতি। উজ্জ্বল হক, সঞ্জয় দাস, দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় (মানস), প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় এদের বিভিন্ন নাটক পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে ভিক্টরজারা ও রুদ্রবীণার টিমওয়ার্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। কস্তুরী শাখার 'মড়া', 'ওটা হাতিয়ার', 'অরাজনৈতিক', অনির্বাণ শাখার 'লড়াই', 'ওঝা', উত্তরণ শাখার 'কারা মোর ঘর ভেঙেছে', কেতন শাখার 'সংক্রান্তি', 'ধাক্কা' বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

১৯৭২-এ প্রতিষ্ঠিত রামপুরহাট রঙ্গম দুর্দান্ত টিমওয়ার্ক নিয়ে জেলার নাট্যচর্চায় আলোড়ন তুলেছিল। 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে', 'স্বরবর্ণ', 'চোর', সেরা ছবি' 'সদাজমিন' এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। রাজ্য এবং বহিঃরাজ্যে বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে। সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। স্বপন সিদ্ধান্ত (হারুদা)র মৃত্যুর পর অমলেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রঙ্গম সক্রিয় রয়েছে। সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বীরভূম নাট্যকেন্দ্রম 'হারাধনের দশটি ছেলে', 'সোনালী স্বপ্ন ছুঁয়ে', 'শকুনির পাশা'-র মতো উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেছেন। ২০০৩-এর ডিসেম্বরে সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছে সাফল্যের সঙ্গে। রঙ্গমও বিভিন্ন সময়ে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে রামপুরের নাট্যচর্চায় গতি আনার চেষ্টা করেছে। প্রবাহ নাট্যমের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'খেলাঘর ভাঙলো', 'স্বর্গের সিঁড়ি', 'যাদুর তুলি', 'ভীমবধ' প্রভৃতি। শিশুদের নিয়ে নাট্যচর্চাতেও প্রবাহ নাট্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এদের একাঙ্ক প্রযোজনা 'চক্রব্যূহ', 'জুতা আবিষ্কার', 'পথে বিপথে' প্রভৃতি। ১৯৯০ সালে রামপুরহাটে গণনাট্য কেতন শাখা কাজ শুরু করে। অমিতাভ হালদারের নির্দেশনায় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা', 'ডাকহরকরা' মঞ্চস্থ হয়। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে আছে, 'হত্যারে', 'অপহরণ ভাই চারেকা', 'সিরাজ নেমেছে পথ অভিযানে', 'ধাক্কা' প্রভৃতি। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত অনামী নাট্যসংস্থার সম্পাদক ও

পরিচালক ছিলেন গৌতম দত্ত। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'নরক গুলজার', 'তেঁতুল গাছ', 'রাজদর্শন', 'সুবর্ণ গোলক', 'গাব্বু খেলা', 'আগামী', 'ভজ গৌরাঙ্গ কথা', 'পুতুলনাচের কাব্য', 'অগ্রদানী', 'বাবুদের ডাল কুকুরে'। 'গাব্বু খেলা' থেকে প্রতিটি নাটকের পরিচালক সৈয়দ টুলু। বর্তমানে তিনিই এ দলের কর্ণধার। বিনয় গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থার প্রযোজনা 'ডাইনি', 'দুই বন্ধু'। ১৯৯৫-এ প্রতিষ্ঠিত ছায়ানট-এর প্রযোজনা 'তারা মায়ের খ্যাপা ছেলে', 'যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি। অশোক দত্ত এই সংস্থার পরিচালক, গৌতম দত্তের পরিচালনায় বীরভূম নাট্যসংস্থার প্রযোজনা 'বিশ্বকর্মার ফাঁসি', 'শাস্তি', 'তেঁতুলগাছ', 'বন্দীশালার ডাক' প্রভৃতি। বাবলু দত্তের পরিচালনায় রঙ্গলী-র উল্লেখযোগ্য প্রযোজন' 'প্রদীপের শিখা', 'ভূতের রাজা' প্রভৃতি। অঙ্গন-এর শিশু নাটক 'গেছোবাবা', 'তোতাকাহিনী', 'খরগোশ ও সিংহ', 'হালুম হালুম মলুম গেলুম'। ১৯৯৮ সালে ৬ ডিসেম্বর দুরন্ত প্রত্যয় নিয়ে তরুণ নাট্যপরিচালক অমিতাভ হালদারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয় নাইয়া নাট্যসংস্থার। ১৯৯৯-এর ২২ মার্চ প্রথম প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চস্থ হয় মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা'। ব্যাপক সাড়া ফেলে এই নাটকটি। এদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'জীবন', 'ভালোমানুষ', 'মরা কাওয়া', ড্রাগ বিরোধী নাটক 'আর না', 'দেখিতে চাহিনা আর', 'সোপান', 'ডানপিটে পুরাণ', 'প্লাস্টিকের আস্তাকুঁড়', 'ভাব-অভাব', 'জন্মশতবর্ষ' প্রভৃতি। নাইয়ার শিল্পীরা সংস্থাগতভাবে শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'বোস দ্য ফরগটেড হিরো', টেলিফিল্ম আশ্রয় ও দূরদর্শনে ধারাবাহিক 'বেঙ্গলস্ মোস্ট ওয়ানটেড'-এ অভিনয় করেছেন।

বেলদার নেকুড়সেনী বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত মুণ্ডাভাষায় সাঁওতালী নাটক 'উলগুলান' সৌজন্যে গণশক্তি পত্রিকা

রামপুরহাট মহকুমার পাইকরে দুর্গাদাস ঘোষের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নেতৃত্বে নাট্যচর্চা নতুন গতি পায়। উন্নয়নী ক্লাব, কস্তুরী নাট্য সংস্থা, নবারুণ স্বামীজি ক্লাব পাইকরের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। করমগ্রাম সম্মিলনী সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই নতুন প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে। মাড়গ্রামে কাজী মিন্নার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'মাড়গ্রাম থিয়েটার'। এশিয়ার বৃহত্তম এই গ্রামটিতে কিশোর-তরুণ-বৃদ্ধদের অদম্য উৎসাহে মাড়গ্রাম থিয়েটার বর্ষব্যাপী নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। যার প্রশিক্ষক হিসাবে রয়েছেন বীরভূমের তরুণ নাট্য নির্দেশক উজ্জ্বল হক।

বোলপুরের নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য নাম নাট্যসারথি। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'পাগল পৃথিবী পাগল', 'দুরন্ত দুর্যোগ', 'হরিপদর শীতবস্ত্র', 'তাহার নামটি রঞ্জনা', 'যাটযন্ত্র'। পার্থসারথি ভট্টাচার্য, প্রদীপ কবিরাজের পরবর্তী সময়ে অমিয় চট্টরাজ বোলপুর নাট্য সারথির হাল ধরেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাও মঞ্চস্থ হয়। প্রদীপ কবিরাজের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পাঞ্চজন্য নাট্যসংস্থা। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সায়ক, আমরা কজন, নেতাজি নাট্যগোষ্ঠী, আদ্যাশক্তি, অন্নপূর্ণা নাট্যগোষ্ঠী, মৈনাক, শ্রীরূপা, ইয়ং টাউন ক্লাব, অর্ঘ, কিনাংক, রূপায়ণ, কিশলয়, ছন্দক, অনামিকা প্রভৃতি নাট্যসংস্থাও বোলপুরের নাট্য চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

শান্তিনিকেতনে অসীম চট্টরাজের সুযোগ্য পরিচালনায় সাহিত্যিকা তাদের সুপ্রযোজনার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই নাট্যমোদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধ্যাপক অসীম চট্টরাজ বিশিষ্ট নাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নাটক 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চে এনেছেন। 'সাহিত্যিকা'র উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'নিমকেতু', 'বিশ্বনাথের আজব কল', 'সংক্রান্তি', 'চণ্ডালিকা', 'বসন্ত', 'রথের রশি', 'প্রথম পার্থ', 'অন্দরমহল', 'তিন বিধাতা', 'সত্যি সত্যি খেলা', 'অথ কৃষ্ণকথা', 'আহ্নিত' প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৮-এ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সংস্থার নামকরণ করেন। প্রতীক চিহ্ন তৈরি করেন নন্দলাল বসু। অমিতাভ চৌধুরী, শান্তিদেব ঘোষ, অমর্ত্য সেন প্রমুখ যুক্ত ছিলেন একসময়। ১৯৮৫ সালের পর থেকে সাহিত্যিকার নাট্যবিভাগ ১৫টির বেশি নাট্য প্রযোজনা করেছেন। সাহিত্যিকার সাম্প্রতিক প্রযোজনা অসীম চট্টরাজ রচিত ও নির্দেশিত 'ধ্বংসস্তূপে বৃষ্টি' রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়ে সমাদর লাভ করেছে।

ইলামবাজারের সন্নিহিত ঘুড়িষার নয়নজুলি নাট্যসংস্থা জুলফিকার জিন্নার নেতৃত্বে মূলত গ্রামে-গঞ্জে খোলা আকাশের নীচে মুক্ত মানুষের সামনে পথনাটকের মাধ্যমে সময়ের বার্তাটি পৌঁছে দিতে চান। এদের প্রযোজনা 'নগররক্ত বিফলতা' কলকাতার নাট্যমেলায় বিশিষ্ট নাট্যজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরা প্রায় নিয়মিত পথনাটক উৎসবের আয়োজন করে।

সাঁইথিয়ার নাট্যচর্চায় রঙ্গতীর্থ (১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে। কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নাবিক),

বিজয়কুমার দাসের নেতৃত্বে রঙ্গতীর্থ 'ডাকঘর', 'পিতামহদের উদ্দেশে', 'অর্জুনের যুদ্ধ', 'সকালের জন্য', 'শেষ বিচার', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'শতাব্দীর পদাবলী', 'কৈলাশ বদ্ধ উন্মাদ', 'নরক গুলজার', 'মিছিল', 'শ্রীমতী ভয়ংকরী', 'প্রেম নয় তরবারী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেছেন। নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ নাট্যদর্শক তৈরিতে বাণিজ্য শহর সাঁইথিয়ার বুকে এদের অবদান যথেষ্ট। রূপতাপস মঞ্চরীতি, আঙ্গিক ও উপস্থাপনায় দক্ষতার সাক্ষর রেখেছেন 'সমুদ্র সন্ধানে', 'চাক ভাঙ্গা মধু', 'হোমোস্যাপিয়েন্স', 'তক্ষক', 'সূর্য আছে স্বপ্ন নেই' প্রভৃতি নাটকে। নিউ ফ্রেন্ডস ক্লাবের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'প্রতিবন্ধীর ব্রত কথা', 'চারমূর্তি', 'ভোমা', 'বৃত্ত' প্রভৃতি। এছাড়া 'সার্বভৌম', 'আনন্দম', 'নবচেতনা', ইয়ুথ কালচারাল ফোরামও কিছু নাটক প্রযোজনা করেছেন। বর্তমানে বিজয়কুমার দাসের পরিচালনায় 'আসর নাট্যম' সাঁইথিয়ার নাট্যচর্চাকে সচল রেখেছে। শ্রুতিনাটকসহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেছে আসর নাট্যম।

আমোদপুরের নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য নাম হল নাট্যতীর্থ। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'অনিকেত সন্ধ্যা', 'বায়েন', 'সুখী পরিবার', 'না', 'খেলাঘর', 'গুপীগাইন বাঘা বাইন', 'হারানো সুর' প্রভৃতি। বর্তমানে কুশল সেন, অশোক দাস প্রমুখ এর নেতৃত্বে আছেন। চতুরঙ্গ, স্টুডেন্টস কয়্যার, জয়দুর্গা টাউন ক্লাব, সজল নাট্যতীর্থ, অগ্রদূত প্রভৃতি নাট্যসংস্থাও আমোদপুরের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। মহাদেব দত্ত, সত্যেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমোদপুর সাহিত্য সংসদ তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। আমোদপুর সন্নিহিত কুচুইঘাটা যুগবাণী 'মহেশ', 'সাজানো বাগান', 'ফুলমনি', 'সদর দরজা' প্রভৃতি নাটক সাক্ষীগোপাল সাহার পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে। নাট্যোৎসবের আয়োজনসহ বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতাতে অংশ নিয়েও যুগবাণী কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছে। পার্থ সিনহার নেতৃত্বে লাভপুর দিশারীও উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নির্মাণের দাবিদার, তাদের 'অন্ধের নগরী', 'চৌপট রাজা' উল্লেখ করার মতো প্রযোজনা। লাভপুর অতুলশিব ক্লাব মহাদেব দত্তের নির্দেশনায় তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে 'কবি', 'ধাত্রী দেবতা', 'পংখে' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। মহঃবাজার থানার ফুলগড়িয়া আদিবাসী ক্লাব বসাই মুর্মুর পরিচালনায় এবং নগরী অঞ্চলের তালডিহি আদিবাসী নাট্যসংস্থা বিপদতারণ সোরেনের পরিচালনায় সাঁওতালি নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে যা জেলার নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য।

মহঃবাজার থানার ফুলগড়িয়া আদিবাসী ক্লাব বসাই মুর্মুর পরিচালনায় এবং নগরী অঞ্চলের তালডিহি আদিবাসী নাট্যসংস্থা বিপদতারণ সোরেনের পরিচালনায় সাঁওতালি নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে যা জেলার নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য।

হেতমপুরের রাইজিং ক্লাব, নজরুল সাহিত্য সংসদ, শক্তি সংঘ, ইয়ং লায়ন্স ক্লাব নাট্যচর্চার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে। পাহাড়পুরের নাট্যভারতী ঘুড়িবার সুকান্ত স্মৃতি সমিতি, প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা, নলহাটির অঙ্কুর নাট্যসংস্থা বিভিন্ন সময়ে বীরভূমের নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

১৯৬৯-১৯৭৫ সময়কালে নগরী বাণী মন্দির বঙ্কিম রায়ের পরিচালনায় 'যাত্রা বদল', 'পালা বদল', 'হারানের নাতজামাই', 'অমর ভিয়েতনাম', 'অগ্নিগর্ভ লেনা', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করে।

জেলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বর্তমানে সিউড়ি নাট্যচর্চা অনেক সুসংহত ও সংগঠিত। জেলা এবং রাজ্য স্তরে সিউড়ি নাট্যদলগুলির প্রযোজনা বারে বারে সমাদৃত হয়েছে।

১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অভিযান' বহুমুখী প্রতিষ্ঠান হয়েও নাট্যচর্চাকে প্রাধান্য দিয়েছিল সব থেকে বেশি। ফলত প্রথম থেকেই 'থিয়েটারের দল' হিসাবেই অভিযানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অভিযানের 'নয়ন কবিরের পালা', 'আজকের আলাদিন', 'দানসাগর', 'গুলশন', 'মারীচ সংবাদ', 'উদ্বাস্তু', 'ঢোলিয়া' প্রভৃতি প্রযোজনা স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। অভিযানের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে নাট্যামোদী তরুণেরা। বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতা ও আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার পরিচিতিও বাড়তে থাকে। আটের দশকের শেষভাগে সরকারি নিবন্ধিকরণের ফলে 'অভিযান' থিয়েটার অভিযান হয়ে ওঠে। এসময় থেকেই থিয়েটার অভিযান নিজস্ব পাণ্ডুলিপির নাট্যপ্রযোজনার উপর গুরুত্ব দেয়। নির্দেশক সুবিনয় দাস নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। নাট্যকার হিসাবে রাজ্যে এখন সুবিনয় দাস পরিচিত নাম। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের দল তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করছে। গ্রুপ থিয়েটার, গণনাট্য, অসময়ের নাট্যভাবনা, অভিনয় প্রভৃতি নাট্য পত্রিকাতে তাঁর নাটক প্রকাশিত হয় নিয়মিত। 'ঢোলিয়া' নাটকের জন্য কালিপদ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন তিনি। থিয়েটার অভিযান-এ তাঁর রচিত ও নির্দেশিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'মোড়ল তোমার ভোট নাই', 'কুড়োরাম কথা রেখেছে', 'ক্ষেতজননী', 'ঢোলিয়া', 'সতীনাথ সৎ হলেন', 'সত্যদাস দেওতা দুশমন', 'বারগেনিং', 'আমি নিরক্ষর নই', 'কালাচাঁদের মেলা' প্রভৃতি। ১৯৮৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'লোকশিক্ষে' নামে নাট্য সংবাদপত্র প্রকাশ করে থিয়েটার অভিযান। দেবদাস দে,

ইয়াসিন আখতার, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৯৯৪ সালের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে 'দেওতা দুশমন'কে পুরস্কৃত করেন। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত নাট্যমেলা এবং বিভিন্ন নাট্যোৎসব এবং আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে সুপ্রযোজনার মাধ্যমে থিয়েটার অভিযান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তরুণ নাট্যকর্মী সুজিত ঠাকুর বর্তমানে সম্পাদকের দায়িত্বে।

"বীরভূম জেলায় নাট্যচর্চায় 'আনন' একটি অহংকার করার মতো নাট্যদল। তাদের বিভিন্ন প্রযোজনা জেলা, ভিন্ন জেলা, কলকাতার মঞ্চে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। গর্ব করার মতো প্রযোজনার সংখ্যা তাদের অনেক।" "ক্রমাগত অন্তরোৎসারিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে 'এই' অঞ্চলের মরুময় সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে যে সুস্থ যুগনিষ্ঠ জীবনধর্মী সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ঘটিয়ে চলেছে 'আনন' তার জন্য সংস্কৃতিবান ব্যক্তি মাত্রেই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন না।" "এদের সব থেকে বড় সাফল্য রুচিশীল দর্শক তৈরি করতে পারা। শহরে দর্শনী দিয়ে অভিনয় দেখার অভ্যাস তৈরি করার কৃতিত্ব আননেরই প্রাপ্য। আনন প্রমাণ করেছে যে সুস্থ সুন্দর আর সার্থক প্রযোজনা করতে পারলে রুচিশীল দর্শকের অভাব হয় না কোনওদিন। এটাই সব থেকে বড় সাফল্য।" ১৯৭২-এর প্রযোজনা 'ঝুমুর' আননকে যশের মুকুট পরিয়ে দেয়। ১৯৮১-র প্রযোজনা 'মিছিল' নাট্যচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৯০-এর প্রযোজনা 'সুদিনের লেগে' রাজ্যের নাট্যমহল ও নাট্য ব্যক্তিত্বদের প্রশংসাধন্য হয়, 'ধনুকের ছিলার মতো টানটান অব্যর্থ লক্ষ্য সন্ধানী প্রযোজনা' হিসাবে। ১৯৯৫-এর প্রযোজনা 'অন্ধের নগরী' 'চৌপট রাজা' পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক প্রযোজনা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৯৬-এর প্রযোজনা 'মহাজ্ঞানী' উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বহুরূপী নাট্যোৎসব, নান্দীকারের ছোট নাটকের উৎসব সহ রাজ্যের ৩৭টি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যোৎসবে অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছে। ২০০০-এর প্রচার নাটক 'বদনচাঁদ লগনচাঁদ' আননের সর্বাধিক অভিনীত নাটক। আনন-এর এ পর্যন্ত প্রযোজনার সংখ্যা ১১৯টি, যা রাজ্যের গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে একটি নজির। সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ

থিয়েটার অভিযান প্রযোজিত 'কেষ্ট জননী'

ইয়ং পার্লামেন্ট প্রযোজিত 'মহালয়া না মহাযাত্রা'

প্রযোজনা 'খরস্রোতা' প্রথম অভিনয়েই সাড়া জাগিয়েছে। নাট্য প্রযোজনা ছাড়াও নাট্য- আলোচনা সভা, নাট্যপ্রশিক্ষণ শিবির, নাট্যপত্র প্রকাশ, নাট্যোৎসবেরও আয়োজক আনন। ১৯৯৫-৯৬-এ বর্ষব্যাপী উদ্ভাসিত পঁচিশ বছরের উৎসব আয়োজন জেলার নাট্যজগতের স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৮২-র ১৬ অক্টোবর 'আনন' নামে ত্রৈমাসিক নাট্যসংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। আননের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বাবুন চক্রবর্তী পরিচালিত 'মা', 'মুক্তিদীক্ষা', 'ডাকঘর', 'রাজদর্শন', 'কবয়ঃ', 'সীতাকাহিনী', 'পাখী', 'কিনুকাহারের থেটার', 'বিছন', 'ফুলমোতিয়া', 'চন্ডালিনী', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক', 'সুদিনের লেগে', 'ভার্ত্যুফ', 'যদি আমরা সবাই', 'সদাগরের নৌকা', 'মহাজ্ঞানী', 'ব্যতিক্রম', 'গুলশন', 'বদনচাঁদ লগনচাঁদ', শিশুনাটক 'পান্তাবুড়ি', 'who is the greatest' প্রভৃতি। উজ্জ্বল হক নির্দেশিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাট্য প্রযোজনা পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অন্ধের নগরী', 'চৌপট রাজা', 'বেড়াতে বেরিয়ে', 'বুদ্ধিগুলা', 'খেলাঘর', 'ঘুমের মানুষ', 'খরস্রোতা' পীযূষ দে নির্দেশিত 'কবর', 'লাঠি', 'হারুন অল রশিদ', 'নীলাম', 'নীলনেশা' প্রভৃতি। এছাড়াও 'সুখী পরিবার', 'ভূমিকা', 'কালের যাত্রা', 'শান্তিসেনা' সুপ্রযোজনা হিসাবে দর্শক সমাদৃত। 'আননে'র সাফল্যের মূল চাবিকাঠি তার দুরন্ত টিমওয়ার্ক এবং শক্তপোক্ত সাংগঠনিক শক্তি।" সুদক্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠক তরুণ সেনগুপ্ত আননের বর্তমান সম্পাদক।

১৯৮৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে চিরন্তন নাট্যসংস্থা। দেবাশিস দত্ত, স্বপন সেনগুপ্ত, শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ মিত্র, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণেরা প্রথম প্রযোজনা করলেন 'লাসকাটা ঘর'। চিরন্তন থিয়েটারের তরুণ নাট্যকর্মীরা প্রতিনিয়ত নাট্যচর্চায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় চিরন্তনের প্রযোজনায়। পাণ্ডুলিপির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। দেবাশিস দত্ত, শশাংক চট্টোপাধ্যায় দলের প্রয়োজনে নাটক লেখেন। দেবাশিস দত্ত রচিত ও নির্দেশিত 'পরিক্রমা' নাটকটি বাংলা থিয়েটারের দুশ বছর উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতাতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চিরন্তন থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি হল : 'পরিক্রমা',

'চিত্তবিভ্রাট', 'আখরাইনের দিঘি', 'সাগিনা মাহাতো', 'লোহার ভীম', 'গগনরাম ছুটছে', 'বাজারের লড়াই', 'ব্রেক', 'সুন্দর', 'চেতনকথা' প্রভৃতি। প্রচার প্রকল্পের নাটক চেতনকথা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করেন। ২০০৩-এ সংস্থার ২০ বছর পূর্তিতে নাট্যোৎসবসহ নাট্যআলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। দক্ষ অভিনেতা শশাংক চট্টোপাধ্যায় দলের সম্পাদক।

১৯৮৪-র ২৩ সেপ্টেম্বর রজকুমার সাহা, যামিনীভূষণ সিংহ, নির্মাল্য মল্লিক, মুকুল সিদ্দিকী, চন্দন চট্টোপাধ্যায়, বাবুল সাহা, কৃষ্ণকমল রায় প্রমুখ নাট্যজনদের সম্মিলিত প্রয়াসে আত্মপ্রকাশ করে 'এখনই' নাট্যসংস্থা। এখনই-র প্রথম প্রযোজনা 'কিংবদন্তী বুলবুলি'। প্রথম থেকেই নিজস্ব পাণ্ডুলিপির উপর গুরুত্ব দিয়েছে এখনই। পাশাপাশি শ্রুতিনাটক, লোকজ সংস্কৃতির আধারে সৃজনকর্মে লিপ্ত থেকেছে। আয়োজন করেছে নাটক-নৃত্য-আবৃত্তির প্রশিক্ষণ শিবিরের। রজকুমার নির্দেশনায় এখনই-র উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'চাপাপড়া মানুষ', 'এখন মর্জিনা', 'ম্যাকবেথ মন্ত্রী ও টেলিফোন', 'খরগোশ', 'করালী ধনুকার কিসসা', 'জলপরি', 'নতুন হাওয়া', 'কানামাছির খেলা' প্রভৃতি। সংস্থার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা রাত 'নাটকের জন্য', 'নাটকের দুই রাত', 'সতীনাথের মুখোমুখি' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। রাজ্যের বিভিন্নস্থানে নাটক মঞ্চস্থ করে খ্যাতি অর্জন করেছে এখনই। অভিনেতা মুকুল সিদ্দিকী এখনই-র সম্পাদক।

আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতীয় গণনাট্যের রুদ্রবীণা শাখা কাজ শুরু করে। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'একবচন বহুবচন', 'রোশেনারার বন্দুক', 'এ পরবাসে', 'এখনও মানুষ', 'ওয়াশিং মেসিন', 'জীবনযাপন', 'আস্থা', 'পাকেচক্রে', শিশুনাটক 'ববি'। বিভিন্ন নাটকের পরিচালনা করেছেন উজ্জ্বল হক, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী (মানস), সঞ্জয় দাস, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সুপ্রযোজনাকার হিসাবে রুদ্রবীণা শাখা নাট্যমোদী দর্শকদের আস্থা লাভ করেছে। পথনাটকের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কলকাতা নাট্যমেলাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিনয়ের সূত্রে বিদগ্ধ নাট্যজনের প্রশংসাধন্য রুদ্রবীণা। অভিনেতা পাবক গুহ এই শাখা সংগঠনের সম্পাদক।

নয়ের দশকের শেষভাগে সদ্য স্কুলছাড়া সৌগত ঘোষ, সুমন্ত মণ্ডল, শ্রীজিৎ সরকার, দিগন্ত মণ্ডল প্রমুখ কিশোরেরা গড়ে তোলেন 'অন্বেষা'। ২০০৪-এ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী মঞ্চস্থ করে তারা শহরবাসীকে অবাক করেছে। পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি এর পরিচালক। এদের অন্যান্য প্রযোজনা 'খাদ্য বিরতি দিবস', 'ঢোবাটেক সিংহ', 'অরুণোদয়ের পথে', 'পণ্ডিত বিদায়' প্রভৃতি। কৌশিক গোস্বামী বর্তমানে অন্বেষার সম্পাদক।

২০০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, নির্মল মণ্ডল, নির্মল হাজরা, সত্যজিৎ দাস, বিনয় চন্দ্র প্রমুখ তরুণেরা গড়ে তোলেন ইয়ং পার্লামেন্ট নাট্য সংস্থা। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নাট্যোৎসব ছাড়াও ২০০৪ সাল থেকে বর্ষব্যাপী নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছেন তাঁরা। তরুণ নির্দেশক উজ্জ্বল হক প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'হুকুম', 'খাঁচা বাক', 'যখনকার যা', 'বুদ্ধ', 'আলোয় ফেরা', 'নব সংস্করণ', 'পিঠে', শিশুনাটক 'ঘুড়ি' প্রভৃতি। পরিশ্রমী নাট্যকর্মী নির্মল মণ্ডল এই সংস্থার সম্পাদক। পরিচালনার দায়িত্বে সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, নির্মল হাজরা, সত্যজিৎ দাস প্রমুখ।

পান্না বেগমের নেতৃত্বে চেতনা নাট্য সংস্থাও কাজ করে চলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত বিভিন্ন নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছেন জেলার অধিকাংশ নাট্যদলের নাট্যকর্মীরা। এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল হক, দেবাশিস দত্ত নাট্য পরিচালনায় ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়াও নাট্য পরিচালনায় রয়েছেন অমিতাভ হালদার, শশাংক চ্যাটার্জী, প্রদীপ রুজ, সাক্ষীগোপাল সাহা, সঞ্জয় দাস, জয়দেব সাহা প্রমুখ। আলোকসম্পাতে সৌমিত্র মুখোপাধ্যায় ও দেবাশিস দত্ত এবং নাট্য প্রশিক্ষক হিসাবে উজ্জ্বল হক প্রশংসনীয় কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অনুদান পেয়েছেন জেলার বেশ কয়েকটি নাট্যদল। সিউড়ি শহরের বিভিন্ন নাট্যদলের নাট্য প্রযোজনায় সুরের প্রয়োগের ক্ষেত্রে রজকুমার সাহা, সমীর দাস, বাবুন চক্রবর্তী, আসিনুর রশিদি, শশাংক চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় কাজ করছেন।

নাট্যচর্চার পাশাপাশি নাট্যপত্র ও নাট্য সংবাদপত্র প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে বীরভূম জেলার নাট্যকর্মীরা। ১৯৮০ সালে অমিত ঘোষদস্তিদার প্রকাশ করেন 'নাটকে', ১৯৮২ সালে ১৬ অক্টোবর 'আনন' ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে 'আনন',

১৯৮০ সালে অমিত ঘোষদস্তিদার প্রকাশ করেন 'নাটকে', ১৯৮২ সালে ১৬ অক্টোবর 'আনন' ত্রৈমাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে 'আনন', ১৯৮৩-তে তরঙ্গ নামে নাট্য সংবাদপত্র প্রকাশ করে তরঙ্গ নাট্যসংস্থা, ১৯৮৫-র ১০ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করে মাসিক নাট্য সংবাদপত্র আননায়ুধ—যা বর্তমানে পাক্ষিক নাট্য সংবাদপত্র হিসাবে রাজ্যের নাট্যামোদী মহলে সমাদৃত।

১৯৮৩-তে তরঙ্গ নামে নাট্য সংবাদপত্র প্রকাশ করে তরঙ্গ নাট্যসংস্থা, ১৯৮৫-র ১০ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করে মাসিক নাট্য সংবাদপত্র আননায়ুধ—যা বর্তমানে পাক্ষিক নাট্য সংবাদপত্র হিসাবে রাজ্যের নাট্যামোদী মহলে সমাদৃত। আননায়ুধ নিরবচ্ছিন্নভাবে ২০ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ১৯৮৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর থিয়েটার অভিযান প্রকাশ করেন 'লোকশিল্পে' নাট্য সংবাদপত্র। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময়ে সাঁইথিয়া থেকে বিজয়কুমার দাস সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সংস্কৃতি নাট্য সংবাদপত্র এবং ১৯৯৬-এ 'এখনই'র পরিচালনায় এখনই দ্বিমাসিক নাট্য সংবাদ প্রকাশ শুরু করে।

১৯৮৯-এ নাট্যকর্মী সফদার হাসমির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ওই বছর ১২ এপ্রিল সফদারের জন্মদিনে জাতীয় পথনাটক দিবসের আহ্বান জানানো হয়। ১৯৮৯ সালের ১২ এপ্রিল থেকে প্রতিবছর ১২ এপ্রিল পথনাটক দিবস উদ্যাপন করা হয়। শহরের প্রতিটি নাট্যসংস্থা নতুন 'পথনাটক' পরিবেশন করেন দিনটিতে। গণতান্ত্রিক লোকশিল্পী সঙ্ঘ ও গণনাট্য সঙ্ঘের এই উদ্যোগে সামিল হন শহরের সবকটি নাট্যসংস্থা। পথনাটকের ক্ষেত্রে সিউড়ি শহরের নাট্যদলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। পথনাটকের বিষয় ভাবনা তাঁদের সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গিকেই উদ্ভাসিত করে।

বীরভূমে নাটক আছে চলমান স্রোতের মধ্যে। পাশাপাশি উপযুক্ত নাট্যমঞ্চের সমস্যাও চিরকালীন। সদর শহর সিউড়িতে রবীন্দ্রসদন। দীর্ঘ দাবী-দাওয়ার পর সাংসদ তহবিলের অর্থানুকূল্যে অনেকটা নাটক মঞ্চায়নের উপযোগী করে তোলা হয়েছে ২০০৩ সালে। আছে সিধুকানু মুক্তমঞ্চ। বোলপুরের গীতাঞ্জলি সর্বাধুনিক মঞ্চ। রামপুরহাট রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মঞ্চ, সাঁইথিয়া রবীন্দ্রভবন মঞ্চ, লাভপুর অতুল শিব মঞ্চ—সবই হয় নির্মাণত্রুটিতে নয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ। সরকারি উদ্যোগে প্রায় প্রতিটি ব্লকেই নির্মিত কমিউনিটি হলগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়েই নির্মিত হওয়ার ফলে সর্বক্ষেত্রে শব্দ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এদের মধ্যে দুবরাজপুর 'নেপাল মজুমদার মঞ্চটি' কিছুটা উন্নত। ফলে নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের নাট্যদলগুলি স্কুল অথবা কোনও ক্লাবের মুক্তমঞ্চকে ব্যবহার করতে বাধ্য হন।

জেলার নাট্যচর্চায় সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'প্রতিমাসের থিয়েটার'। ২০০২ সালে 'আনন' প্রথম উদ্যোগ নেন নিজস্ব প্রযোজনা নিয়ে প্রতিমাসের থিয়েটারের। ২০০২-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর প্রতিমাসের দ্বিতীয় রবিবার সিউড়ি ডি আর ডি সি হলে কোনও নাটকের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে 'আনন' ১৬টি নাটক মঞ্চস্থ করে, যার মধ্যে ৫টি ছিল নতুন প্রযোজনা। প্রতি মাসের দর্শকাসন থাকত পরিপূর্ণ। এই সাফল্যকে প্রসারিত করতে 'আনন' আহ্বান জানায় শহরের সমস্ত নাট্যদলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে যূথবদ্ধভাবে প্রতিমাসের থিয়েটার-এ সামিল হতে। পর পর কয়েকটি আলোচনার পর বাঁধি সেতু মিলনের অঙ্গীকারে গড়ে ওঠে প্রতিমাসের থিয়েটার। ২০০৩-এর ১৯ জানুয়ারি সিউড়ি রবীন্দ্রসদন মঞ্চে শুরু সিউড়ি 'প্রতিমাসের থিয়েটার' অভিযান। কর্মসূচিতে সামিল 'আনন', 'থিয়েটার অভিযান', 'চিরন্তন থিয়েটার', 'এখনই', 'গণনাট্য রুদ্রবীণা', 'অন্বেষা', 'ইয়ং পার্লামেন্ট'। সহযোগিতায় 'ভারতীয় গণনাট্য, বীরভূম জেলা কমিটি', 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ', 'নয়াপ্রজন্ম', 'আননায়ুধ' ও 'চেতনা'। ২০০৩ সালে মঞ্চ ভাড়ার ব্যয়ভার বহন করে নয়া প্রজন্ম। ২০০৪, ২০০৫-এ দায়িত্ব বহন করছে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বীরভূম জেলা কমিটি। প্রতি মাসের থিয়েটার প্রতিটি নাট্যদলের সঙ্গে একে অপরের বন্ধুত্ব আরও নিবিড় করেছে। আজ তাই যে কোনও নাট্যদলের জন্মদিন যেন প্রতি নাট্যদলের জন্মদিনে রূপ নিয়েছে। এক বছরের মধ্যেই সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতি নাট্যদলের শিল্পী সমন্বয়ে সুবিনয় দাসের 'ঢোলিয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। পরবর্তী সম্মিলিত প্রযোজনার প্রস্তুতি চলছে। সিউড়ি 'প্রতিমাসের থিয়েটার' এখন তৃতীয় বর্ষে। দর্শক উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ জেলা কমিটির উদ্যোগে ১০টি নাট্যদল নিয়ে (ভিক্টর জারা, অগ্রদূত, হেতমপুর নবান্ন, হেতমপুর রাইজিং ক্লাব, পাঁচড়া মৃদঙ্গ, চিনপাই একতারা শাখা, গণনাট্য রাঙামাটি, মাদৃক সংঘ, দেশবন্ধু নাট্যগোষ্ঠী, ইয়ুথ কর্নার) দুবরাজপুর নেপাল মজুমদার মঞ্চে শুরু হচ্ছে দুবরাজপুর প্রতিমাসের নাটক। এছাড়াও গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিমাসে শতফুল বিকশিত হোক শিরোনামে প্রতিমাসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে।

সময়টা আর একা চলার নয়। সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধের অঙ্গীকারে নাট্যকর্মীদের এই যূথবদ্ধ অভিযান বীরভূমের নাট্যচর্চাকে যেমন বেগবান করবে তেমনই নতুন পথের দিশা দেবে। বীরভূম নাট্যঅঙ্গনে এই বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো একটা সুবিধাজনক বাতাবরণ তৈরি করছে তিন বছর ধরে। আমাদের প্রত্যাশা বীরভূমের নাট্যকর্মীদের সম্মিলিত শব্দ-সুর-সংলাপ-আবহ বহন করুক সভ্যতার জরুরি পুণ্যবাণী।

● **তথ্য সহায়তা**

আনন্দবাজার শারদসংখ্যা ১৩৬৬, আননায়ুধ নাট্য সংবাদপত্র, আনন ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, সংস্কৃতি, বীরভূম বীরভূমী ৩ পর্ব।

● **ঋণস্বীকার**

হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন, অর্ণব মজুমদার, আশানন্দন চট্টরাজ, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কুমার দাস, ইলা গুপ্ত।

লেখক : মঞ্চ অভিনেতা বিশিষ্ট নাট্য গবেষক

রামকিংকর বেজ-এর ভাস্কর্য

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথ : অন্যতর পরিচয়

অনাথনাথ দাস

বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের জমিদারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের হৃদ্যতাসূত্রে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা, এ তথ্য আমাদের সবারই জানা। ওই সময় (১৮৬২-৬৩) কলকাতা থেকে দূরে ধর্মচর্চা ও নির্জনবাসের জন্যে দেবেন্দ্রনাথ একটি জায়গার সন্ধান করেছিলেন। শান্তিনিকেতনকে কীভাবে দেবেন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছিলেন তার একাধিক মত আছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ বিশী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি যেসব সম্ভাবনার কথা লিখেছেন সেগুলি অপেক্ষা জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি অনেক সঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, দেবেন্দ্রনাথ গুসকরার কাছে তাঁবুতে থেকে আশপাশের অঞ্চল পাল্‌কি করে দেখে বেড়াচ্ছিলেন। বোলপুরের নিকটবর্তী জনমানবশূন্য ও প্রায় তরুলতাহীন এই রুক্ষ প্রান্তরের বিরাটত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।

পথ ভুল করে পাল্‌কিবাহকেরা বোলপুর থেকে রায়পুর না গিয়ে এই প্রান্তরে পৌঁছেছিল, এ অনুমান মেনে নেওয়া কঠিন। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এই অঞ্চলের ভূগোল না জানারই কথা, কিন্তু স্থানীয় পাল্‌কিবাহকরা রায়পুর না গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে এসে এই প্রান্তরে পৌঁছে যায়—এরকম হওয়া সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে, রায়পুরের জমিদারের নির্দেশেই এই প্রান্তরটি দেবেন্দ্রনাথকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন।

দেবেন্দ্রনাথ একটি বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন'। এই জায়গাতেই জমিদারের তৈরি একতলা একটি বাড়ি ছিল। পরবর্তীকালে সেটি সংস্কার করে দোতলা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় কবি-সাহিত্যিক হিসাবে, অন্যতর পরিচয় শিক্ষা সংস্কারক ও পল্লী সংস্কারক। দ্বিতীয় দিকটির সূচনা শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলে অবশ্যই। কিন্তু শান্তিনিকেতনে পিতৃদেবের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়টি লাভ করে শিক্ষা ও পল্লী সংস্কারের যে প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, অনেকের মতে, এ দুটি তাঁর জীবনের মহত্তম কাজ। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের পত্তন করলেন তখন এটির নাম ছিল বোলপুর / শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ তখন রবীন্দ্রনাথের মনকে অধিকার করেছিল। অনুমান করা যেতে পারে, রামায়ণ, মহাভারত অপেক্ষা কালিদাসের সাহিত্য থেকেই তিনি তপোবন সম্পর্কে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। আধুনিক যুগে বসে সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ কার্যত রূপায়ণ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তা বুঝে নিয়েই এগিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একটি চিঠিতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহবাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না—ধনী-দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনোমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না।......'

এই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা সেকালের মুষ্টিমেয় কিছু রবীন্দ্র-অনুরাগীকে আকর্ষণ করেছিল। লক্ষণীয় বিষয়, তাঁদের ঠাকুর-পরিবারের ছাত্রই এখানে আসেনি। বিদেশি শিক্ষাধারায় আকৃষ্ট সে সময়ের শিক্ষিত সমাজ দেশ-প্রচলিত শিক্ষাধারা থেকে ভিন্নমুখী এই শিক্ষাকে কতকটা কৌতূহলমিশ্রিত অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। তাঁদের এই উদাসীনতায় রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবেই দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু স্বধর্মভ্রষ্ট হননি। ওই সময়টিকে কতকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালই বলা যায়।

তপোবন, গুরুগৃহবাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি প্রথম পর্বে তাঁর মনকে যতখানি অধিকার করেছিল সেগুলি থেকে ক্রমশ তিনি একটি

সামঞ্জস্যের পথে এগিয়ে এসেছিলেন ; যদিও মূল শিক্ষাদর্শটি অটুটই ছিল। সূচনা থেকে বিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্রটি বহুকাল ধরে অব্যাহত থাকলেও, বস্তুত তাঁর জীবনাবসানের পর থেকে বিশ্বভারতীর আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্যারও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বর্তমানে 'পাঠভবনে' অনাবাসিক চরিত্রটিই এখন প্রধান। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ-ঈপ্সিত শিক্ষা-চিন্তা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। পাঠ্যপুস্তক নিয়মিত পড়ানো, ক্লাসে উপস্থিতি, নিয়মিত পরীক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের মান নির্ণয়ই এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য নয়। সহ-পাঠ্যানুক্রমিক শিক্ষাধারা, 'আশ্রম সম্মিলনী' নামক ছাত্রছাত্রীদের স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগ সাধনের মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীর বিপুলতা, সেই সঙ্গে সহ-পাঠ্যানুক্রমিক শিক্ষার প্রতি অনীহা, পরীক্ষা-কেন্দ্রিকতা—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তাকে ব্যাহত করতে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য সৃষ্টি নিয়েই থাকতে পারতেন। কিন্তু একই সঙ্গে সমাজের, শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়নের বহুবিধ কাজের

শান্তিনিকেতনে উপাসনাগৃহে অনুষ্ঠান ছবি : পাপান ঘোষ

সরল গ্রামবাসীদের ভালোবেসেছিলেন। 'ছিন্নপত্রে'র অনেক চিঠির মধ্যে তাঁর এই আন্তরিকতার প্রমাণ আছে। অসহায়, শীর্ণ-স্বাস্থ্য, নিঃস্ব প্রজা-সাধারণের মুখে দুবেলা অন্নের ব্যবস্থা করাই শুধু নয়, তাঁদের ভগ্ন মনোবল ফিরিয়ে আনা এবং আত্মনির্ভর করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ওই সময়ের কর্মসূচি কী ছিল তা অনেকাংশে প্রকাশিত 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে। শিলাইদহ, পতিসর অঞ্চলে ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পল্লী সংস্কারের পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয়নি, যা হয়েছে সেটিকে আংশিক ইতিহাস সংকলনই বলা যায়। তবুও বর্তমানকালে পল্লী উন্নয়নের ধারাটি অনুসরণ করলে আশা জাগে, রবীন্দ্রনাথ যা চেয়েছিলেন তা অনেকখানি রূপায়িত হতে চলেছে, এখানেই তাঁর সার্থকতা। গ্রামোন্নয়নে সমবায়, কৃষিঋণ, সালিশি ব্যবস্থা তো তাঁরই পরিকল্পনা। শ্রীনিকেতন পরিকল্পনায় পরবর্তীকালে তো এই সব পরিকল্পনায় আরো পূর্ণতর ক্ষেত্রে মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। তাঁর সমাজসংস্কারকমূলক কাজগুলির ব্যাপকতা এবং গভীরতা ক্রমশ দেশবাসী উপলব্ধি করছেন। অতীত বা বর্তমানের এমন একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না, যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বহুমুখী চিন্তা ও কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর যৌবনকাল থেকে মৃত্যুর পরও কাজের দিকটির প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা বর্ষিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন নিয়ে তথাকথিত বুদ্ধি-জীবীগণের উৎসুকতার অভাব ও ব্যঙ্গোক্তি এটাই প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য তাঁদের অনধিগম্য ছিল। এই অভিমত অবশ্য সমাজের এক শ্রেণির মানুষের সম্পর্কেই।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে জমিদারি তত্ত্বাবধানের কাজে কলকাতা থেকে দূরে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিটি দেবেন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছিলেন। জানতেন, কবি-স্বভাবের এই পুত্রটি সংসার থেকে দূরে গিয়ে কতকগুলি অসুবিধার মধ্যে পড়বে। কিন্তু তার সঙ্গেও তিনি অনুধাবন করেছিলেন, নিরীহ, দুর্বল প্রজাদের কাছে রবীন্দ্রনাথই বেশি গ্রহণীয় হবে। এই দূরে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারত। পদ্মা আত্রাই-বক্ষে বা কুঠিবাড়িতে গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য আশা করা যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, জমিদারি হিসেব-নিকেশ, খাজনা আদায় ও মকুব ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সময় হরণ করে নিতে পারত। রবীন্দ্রনাথ এই দিকগুলি ভেবে পিছিয়ে যাননি। তাঁর লেখায়, চিঠিপত্র বা কথাবার্তায় কোথাও অসাচ্ছন্দ্যের এই প্রসঙ্গ দেখি না। দায়িত্ব গ্রহণ করে অচিরাৎ তিনি গ্রামবাংলার নিসর্গ ও

রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য সৃষ্টি নিয়েই থাকতে পারতেন। কিন্তু একই সঙ্গে সমাজের, শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়নের বহুবিধ কাজের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন। তাঁর সমাজসংস্কারকমূলক কাজগুলির ব্যাপকতা এবং গভীরতা ক্রমশ দেশবাসী উপলব্ধি করছেন। অতীত বা বর্তমানের এমন একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না, যিনি রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বহুমুখী চিন্তা ও কর্মে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর যৌবনকাল থেকে মৃত্যুর পরও কাজের দিকটির প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা বর্ষিত হয়েছে।

প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। স্বনির্ভরতা—এই শব্দটির উপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ গুরুত্ব নানা ভাবে নানা ক্ষেত্রে দেখতে পাই। ছাত্রদের স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতার জন্য স্বদেশবাসীর মনে স্বনির্ভরতা অথবা দেশের দরিদ্র সমাজের মধ্যে স্বনির্ভরতাবোধ জাগ্রত করার উপায় রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন ধরেই ভাবতে হয়েছে।

আত্মনির্ভরতাই একমাত্র উপায়, যা অর্জন করতে পারলে আগ্রাসী বিদেশি শোষক দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে—বিদেশের পার্লামেন্টে বা রাজন্যবর্গের কাছে আবেদন-নিবেদন করে স্বাধীনতা পাওয়া পরাধীনতার আর এক রূপ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতির ব্যক্তিবর্গ একমত হননি ; অথবা বলা চলে গ্রাহ্য করেননি।

হলেও আশপাশের গ্রামীণ সমাজ রক্ষা করছেন। ধরা যাক বয়ন শিল্পের ধারাটিকে। শ্রীনিকেতনের মধ্যস্থতায় যা হতে পারত, আশপাশের বয়নশিল্পীরা সেটিকে প্রায় ধরে নিয়েছেন এবং 'শ্রীনিকেতনী' কাজ হিসাবে কতকটা মেনে নিয়ে আমরা কিনেও আনছি। গুণগতভাবে অতীত শ্রীনিকেতনের শিল্পকর্মের কাছাকাছি না হলেও এই শিল্পীরা একটা সমন্বয় করেছেন। আর এভাবেও দেখছি—রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা তো অনেকখানি পূরণ করে এঁরা স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন। শ্রীনিকেতনের নিখুঁত শিল্পকর্ম যে তাঁরা পারবেন না তা ঠিক নয়, কিন্তু এই দুর্মূল্যের দিনে সাধারণ মানুষ সেই মহার্ঘ্য বস্তু ঘরে আনতে পারবেন না। সমাজের মুষ্টিমেয় ধনীদের তৃপ্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রচেষ্টা ছিল বলে জানি না।

ছাতিমতলা, শান্তিনিকেতন — ছবি : পাপান ঘোষ
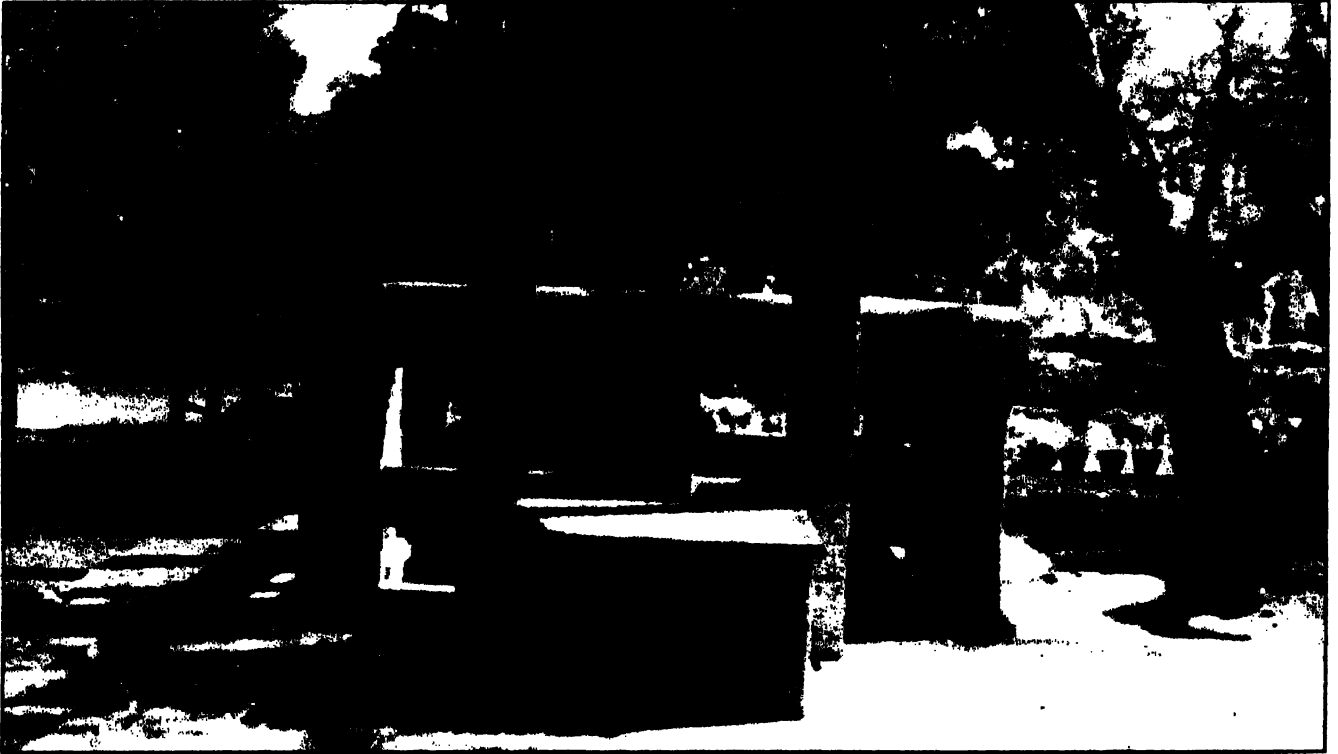
শিশুদের শিক্ষারম্ভের প্রথম স্তরেই এই স্বনির্ভরতা বা আত্মকর্তৃত্বের চেতনা রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত করতে চেয়েছিলেন। এর আগে জমিদারি তত্ত্বাবধান-কালে সাধারণ মানুষের মনে এই আস্থা ফেরাতে চেয়েছিলেন। 'সাহসবিস্তৃত বক্ষপট' রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ এরই বিস্তার আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রদীপ জ্বালালেও তা পরবর্তীকালে ক্ষীণতর হতে হতে প্রায় নির্বাপিতই হতে চলেছে। কিন্তু শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়ে-ছিলেন তার অন্তত অংশবিশেষ

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে আর একবার আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের আশা ইচ্ছা যাই থাক তা অগ্রাহ্য করে তাঁর জীবনকালেই একাধিক সমস্যার উদ্ভব হয়। দূরত্বের প্রলেপে সেকালের সব শিক্ষকই রবীন্দ্র-স্নেহধন্য বা তাঁর আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচর্চার মাঝেই ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছেন, ছাত্রদের সঙ্গদান করেছেন। তখনকার কালে এই নির্জন অঞ্চলে প্রতি
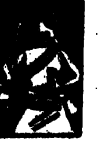
ছাত্রাবাসে সন্ধ্যায় ঘুরে তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিয়েছেন, মুখে মুখে গল্প রচনা ও সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছেন। অভিনয় ও গীতচর্চা তো ছিলই। আশপাশের গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা বিষয়ে ছাত্ররা যাতে উৎসাহী হয়, শিক্ষকদের তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন, অথর্ব বেদের একটি মন্ত্র (অভয়মন্ত্র) উচ্চারণ করে অন্ধকার রাত্রে ছাত্ররা যাতে একাকী দূরে যাওয়ার অভ্যাস করে তার নির্দেশ দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ

প্রখর গ্রীষ্মে পথপার্শ্বে জলসত্রের ব্যবস্থা ছাত্রদের সাহায্যে হয়েছে। এ সবই শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু অসহযোগিতা ও ঔদাসীন্য ছিল সে সময়েই। বিদ্যালয়ে সব শিক্ষকই তাঁর মনোমত ছিলেন তা কখনই নয়। সতীশচন্দ্র ও অজিতকুমারের মতো শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ আর পাননি। অনতিকাল পূর্বে পাঠভবনে এক হেডমাস্টার এসেছিলেন, চাতুর্যে চঞ্চলতায় মিথ্যাচারিতায় এবং দুনীর্তিতে যার দোসর মেলা কঠিন। এই ধরনের হেডমাস্টার রবীন্দ্রনাথের সময়ে আসেননি ; তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কয়েকজনকে বিদায় জানিয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ যখনই শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত থেকেছেন তখন শিক্ষকদের অন্তর্কলহ জটিল রূপ নিয়েছে। অব্রাহ্মণ শিক্ষককে প্রণাম করতে বাধা, রান্নাঘরে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বিভাজন, আশ্রম-বিদ্যালয়ে আগত মুসলমান ছাত্রকে স্বতন্ত্রভাবে শালবীথিতে খাওয়ানোর ব্যবস্থা—এগুলি কতখানি রবীন্দ্র-আদর্শ বিরোধী তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অথচ প্রথম দিকে হিন্দুধর্ম বিরোধী কোনো কাজ তপোবনীয় আদর্শে চালিত বিদ্যালয়ে যাতে না হয়, রবীন্দ্রনাথকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়েছে।

ব্রাহ্মধর্মের আবহে লালিত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ধরনের কাজের সমর্থন প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রথম দু-তিন বৎসর তপোবনের ভূত রবীন্দ্রনাথকে তাড়া করেছিল, সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে তথাকথিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-শিক্ষক ও ছাত্রদের কথাও তাঁকে স্মরণে রাখতে হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা, কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত উপসর্গ দূর হয়ে যায়। একটি বিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতীর অঙ্কুর দেখা দিতে থাকে। শিলাইদহ অঞ্চলে পল্লীসংস্কারের যে কাজ রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের মধ্যেই বীজাকারে হলেও তা নিহিত ছিল, যেমন ছিল কলাভবন, সংগীতভবনের সম্ভাবনা। শান্তিনিকেতন পরিচালনার সমকালে মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথ জমিদারি তত্ত্বাবধান এবং সংস্কারের কাজও করে চলেছিলেন। কিন্তু নানা ধরনের বাধা সর্বত্রই ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে এই দিকটি সম্পর্কে লিখেছেন—

'আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে— হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখে হিন্দুসমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে idealize করে কোনো আত্ম-ঘাতী শ্রুতিমধুর মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে আর আমার ইচ্ছাই হয় না।

যাই হোক একদিকে বোলপুর বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে অভদ্র এবং অভদ্রলোকের ছেলেদের কিছু পরিমাণে ভদ্র করে উভয় শ্রেণীর বিচ্ছেদ দূর করবার চেষ্টা করছি।'

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত উদ্যমের ফল পেতে আমাদের অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাঁর পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও শিক্ষণ পদ্ধতি কাগজে-কলমে সুখ্যাত হলেও অনুসরণ করার বিশেষ উৎসাহ তখন দেখা যায়নি। কিন্তু বর্তমানে প্রায় নিঃশব্দে যখন এগুলি ক্রমশ রূপায়িত হতে দেখি, তখন মনে হয় এমন একটা সময় অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো দেখা যাবে, যখন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক পরিচয়ের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক রবীন্দ্রনাথও সমান গুরুত্ব অর্জন করবে। মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃত বাহন—এই বিশ্বাসবাণী কতকটা দোলাচলতার মধ্যে এগোলেও শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতি সর্বাংশে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর প্রবর্তিত উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি একসময় লঘু দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় ছিল, সেগুলি কবি-কল্পিত সাময়িক বিনোদন নয়—ভারতীয় ঐতিহ্য, প্রকৃতি সচেতনতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গভীর চেতনার প্রকাশ এগুলির মধ্যে, এই উপলব্ধি ক্রমশ দেশজুড়েই স্বীকৃত হতে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে একটি নামমাত্র নয়, একটি অভিধায় তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, ঐতিহ্যের এক বিপুল বিস্তার নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। আবহমানকাল শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী হিসাবে তাঁকে আমাদের অনুসরণ করতেই হবে।

লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব— সেকাল ও একাল

১৯৩৫ সালের বসন্তোৎসবে 'খোল দ্বার খোল' নৃত্যের প্রস্তুতিপর্বে মেয়েদের সারিতে ডানদিক থেকে চতুর্থজন ইন্দিরা গান্ধী

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব, ১৯৯৫ ছবি : পাপান ঘোষ
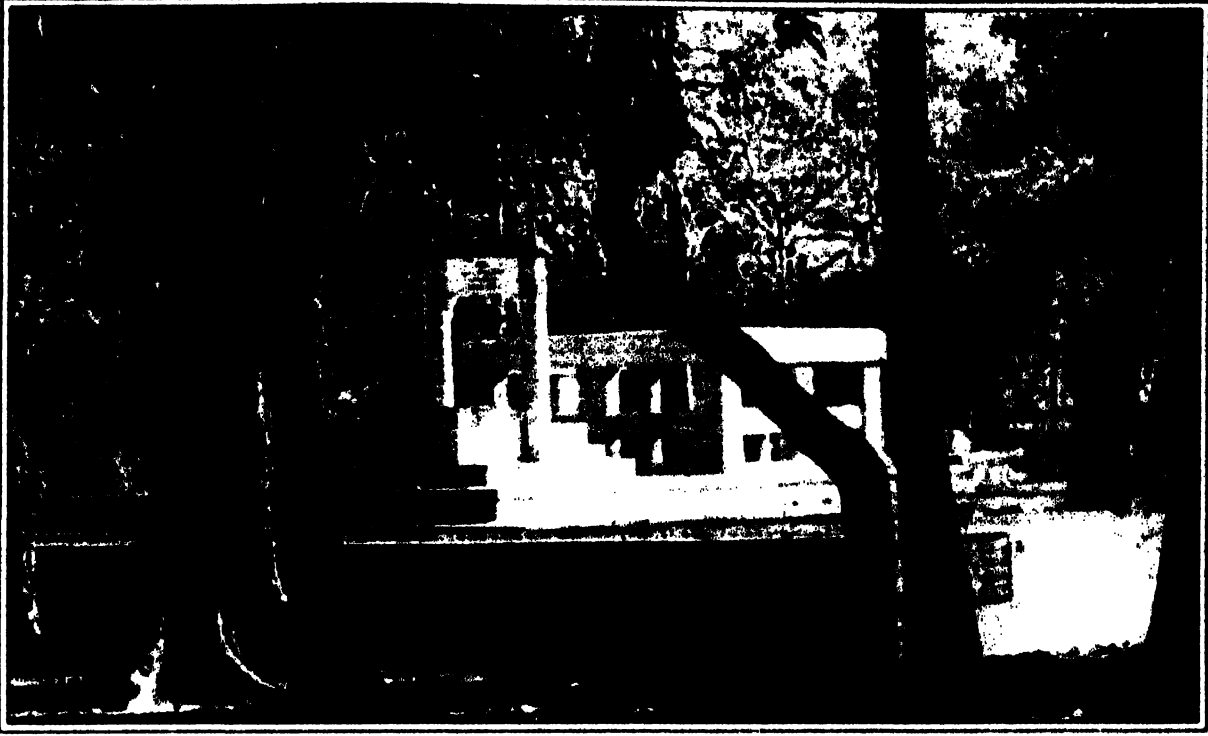
ছাতিমতলা

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী : বীরভূমের শ্রেষ্ঠ তীর্থ

স্বপনকুমার ঘোষ

শান্তিনিকেতন—বীরভূম তথা সমগ্র বাংলাদেশের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য স্থান। আমাদের রুচি সংস্কৃতি জীবনচর্যা সব কিছুতে বিপ্লব ঘটিয়েছে এই স্থান ও প্রতিষ্ঠাতার মাহাত্ম্য।

শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে ১২৬৮ সনে তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ভুবনমোহন সিংহ-র আমন্ত্রণে বোলপুরের কাছে রাইপুর গ্রাম ভ্রমণকালে প্রথম এই স্থানটির সন্ধান পেয়েছিলেন। রাইপুর গ্রাম যাবার পথে এখানকার উদার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের নির্জন সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট ও অভিভূত হন। সীমাহীন আকাশের নিচে সপ্তপর্ণী গাছের ছায়ায় ঘেরা এই স্থানটিকে মহর্ষিদেব ব্রহ্ম উপাসনার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেন।

পরের বছর ১২৬৯ সনের ১৮ ফাল্গুন বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভুবনডাঙ্গা গ্রামের কুড়ি বিঘা জমির মৌরসি পাট্টা গ্রহণ করেন রাইপুরের ভুবনমোহন সিংহ-র কাছ থেকে।
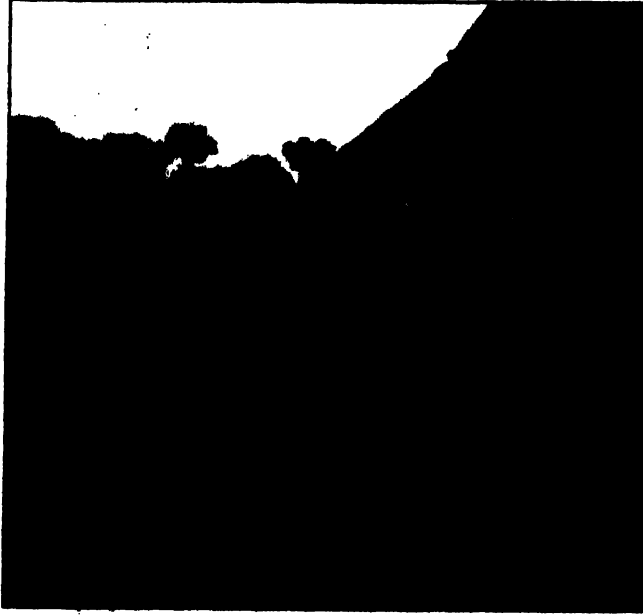
শান্তিনিকেতন গৃহ

সেই বছরেই একটি অতিথিশালার ভিত্তি স্থাপিত হয়, মহর্ষিদেব এর নাম রাখেন 'শান্তিনিকেতন' বা 'Abode of Peace'। বিশাল জনশূন্য প্রান্তরের মধ্যে বহু টাকা খরচ করে বসবাস করার জন্য প্রথমে একতলা বাড়ি তৈরি হয়, পরে দোতালা নির্মিত হয়, যা এখন, আমাদের সবার কাছে 'শান্তিনিকেতন বাড়ি' হিসেবে পরিচিত।

১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ মহর্ষিদেব তাঁর 'শান্তিনিকেতন-আশ্রম' আবিষ্কার করেন। তিনি ছাতিমতলায় সন্ধান পান—'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।'

শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য জমি বন্দোবস্তের কাজ শেষ হলে ১৮৬৩ সালের পয়লা মার্চ সূচনা হয়েছিল আশ্রম প্রতিষ্ঠার। এর পঁচিশ বছর বাদে ১৮৮৮ সালের, ৮ মার্চ মহর্ষিদেব 'ট্রাস্ট-ডীড' বা 'ন্যাসপত্র' করে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' সকলের জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি জমিদারির ১৮ হাজার ৪৫২ টাকার সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে রাখেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের খরচপত্র চালাবার জন্য। আশ্রমধারী (পরিচালক) নিযুক্ত হন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে তখন পর্যন্ত ব্রহ্মোপাসনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গা ছিল না। সে সময় এই কাজ সম্পন্ন হত ছাতিমতলায়, আবার কখনো বা 'শান্তিনিকেতন' গৃহের কোনো একটা ঘরে। সে কারণে ট্রাস্টীর সদস্যরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে ১২৯৭ সনে (১৮৯০) শান্তিনিকেতনে 'মন্দির' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজে মহর্ষি পনের হাজার টাকা বরাদ্দ করেন। ১২৯৭ সনের ২২ অগ্রহায়ণ মন্দিরের শিলান্যাস হয়। ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর (১২৯৮ সনের সাতই পৌষ) শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পৌষ উৎসবের সূচনা ঘটেছিল। সেবার শুধু 'উৎসব'-ই উদ্‌যাপিত হয়েছিল, 'মেলা' অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৮৯৪ সালের সাতই পৌষ (১৩০১ সন) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে মন্দিরের মাঠের সামনে প্রথম পৌষমেলা বসেছিল। আমরা সকলেই একথা জানি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ পৌষমেলা ও উৎসবের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন।

আজ থেকে একশো এগার বছর আগে মন্দিরের সামনের যে ছোট অথচ ঘরোয়া মেলাটি শুরু হয়েছিল—সেই পৌষমেলা এখন তামাম পশ্চিমবাংলার পল্লী ও নগরের মধ্যে একটি মিলন-মেলার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌষমেলা এখন কেবল শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী তথা বীরভূম জেলার কোনো স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠান নয়—এখন এই মেলা জাতীয় জীবনের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেছে।

এই পৌষমেলাকে কেন্দ্র করে শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে বোলপুর, সুরুল, বিনুড়িয়া, বল্লভপুর, শেয়ালা, গোয়ালাপাড়া, তালতোড়, আদিত্যপুর, কংকালীতলা, শিয়ান, রায়পুর, মহিদাপুর, বনভিলা ইলামবাজার, পাঁরুই, সিউড়ি তথা বীরভূম জেলার বিভিন্ন ধরনের মানুষজন, নানান প্রতিষ্ঠান এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে।

সবার সঙ্গে বীরভূম জেলার বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকানপসারীরা ও গ্রামের শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম মেলে ধরেন। লোকসংস্কৃতি শিল্পীরা ও বাউলের দল মেলায় যোগ দেন। আর সাঁওতালরা মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে মাদল বাজাতে বাজাতে প্রাণোচ্ছল সহযাত্রিণীদের সঙ্গে দল বেঁধে পৌষমেলায় আসেন।

সপ্তপর্ণ তলতলে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন
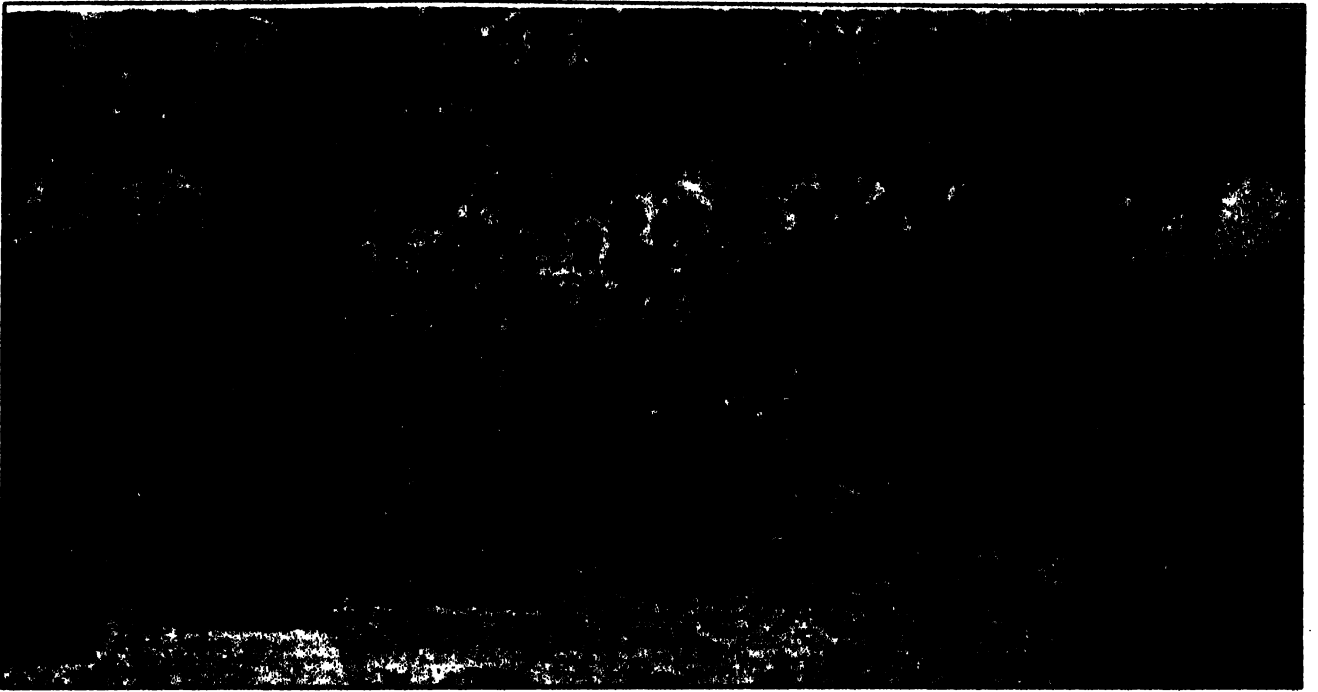
শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, ৮ই পৌষ ১৩২৮ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২১)

পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে শিলাইদহের পাঁতিসরে গিয়েছিলেন পল্লি অঞ্চলের জমিদারি দেখাশোনার কাজে। কবি সেখানে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নানান কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যান্ত্রিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত রেখে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পাঁচটি সন্তানকে শিলাইদহের 'গৃহবিদ্যালয়ে' সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শিলাইদহেই প্রথম শিক্ষা বিষয়ে সরাসরি কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ। জগদানন্দ রায়, শিবধন বিদ্যার্ণব ও পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক লরেন্সকে ছেলেমেয়েদের মাস্টারমশাই হিসেবে নিযুক্ত করেন তিনি। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে শিলাইদহে গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষাদানের চেষ্টা হলেও এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠতে পারবে না। সে কারণে কবি তাঁর চিন্তা ও আদর্শ অনুযায়ী একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবার কথা মনে মনে ভাবছিলেন।

শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়কে সমাজের আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ভাবনা চিন্তা করতে থাকেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের নির্জন নিভৃত পরিবেশে প্রকৃতির স্পর্শে আনন্দের স্রোতে শিক্ষার সঙ্গে যাতে উদার মনোভাব গঠনের পথ সহজ হয় তার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা কবির মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সময়টা স্বদেশির যুগ। ইংরেজি স্কুলের পরিবর্তে একটি স্বদেশি ধাঁচের স্কুল বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার প্রয়োজন বা ইচ্ছে হয়তো বা তাঁর মনে একটা বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথ আকাশ ভরা কোলে 'পূর্ণ মানুষ' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চাইতেন ছেলেমেয়েরা যেন বিদ্যার ভারে নুব্জ না হয়ে পড়ে। অথচ শিক্ষায় আনন্দে সে সবসময় সতেজ, খাঁটি মানুষ হয়ে উঠবে।

১৯০১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবার কথা রবীন্দ্রনাথ খুব মন দিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু-কে কবি এক চিঠিতে লিখেছেন—"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মতো সমস্ত নিয়ম, বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না। ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নব-আদর্শে এই স্বদেশি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়াসকে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন।

চিঠিপত্রর ষষ্ঠ খণ্ডে কবি একটি চিঠিতে লিখেছেন—"জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে, আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষমাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।"

শান্তিনিকেতনে এন্ড্রুজ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী

মাঝে একটা বছর কেটে গেল। ১৯০১ সালের বাইশে ডিসেম্বর অর্থাৎ ১৩০৮ সনের সাতই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরের সাংবৎসরিক উপাসনা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয়-কে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করলেন।

কবির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদর্শকে সফল করে তোলবার জন্য দূর থেকে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সুহৃদবর্গ রবীন্দ্রনাথ-কে নিয়ত উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে কয়েকজন আদর্শবাদী শিক্ষককে নিকটসঙ্গী ও সহকারী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন ও সতীশচন্দ্র রায়-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ের আদিপর্বে যে ছ'জন শিক্ষক কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন লরেন্স তাঁদের অন্যতম। শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম বিদেশি শিক্ষক, পড়াতেন ইংরেজি ভাষা। জাপানের প্রাচীন পুরোহিত বংশের নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হোরিসান সংস্কৃত ও পালিভাষা অধ্যয়নের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন, তিনিই প্রথম বিদেশি ছাত্র।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন রেবাচাঁদ (ব্রহ্মচারী অনিমানন্দ), শিবধন বিদ্যার্ণব, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ রায় চৌধুরী, সুবোধ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় গড়ে তোলবার পেছনে কবি-পত্নী মৃণালিনী দেবীর অবদানও কম ছিল না। তিনি সবসময় সাহায্য করেছেন পরোক্ষে থেকে।

কবি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কুঞ্জলাল ঘোষকে বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালের ওপর বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হল। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে শিক্ষক ও অর্থসচিব। এছাড়াও ডাঃ কানাইলাল বসু, বিধুশেখর শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ আইচ যোগ দেন শিক্ষকরূপে। নতুন নিয়মে বারো বছরের ওপর ছাত্র নেওয়া বন্ধ হল, সে নিয়ম এখন অবশ্য আর নেই।

বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের কথা ভেবেই ছাত্রদের শেখাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও ইংরেজির নতুন প্রণালীর পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। কেবল তাই নয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার বছর পাঁচেক আগে নতুন পদ্ধতিতে, ছাত্রদের সংস্কৃত শেখানোর জন্য 'সংস্কৃত শিক্ষা'-র দুটি ভাগ রচনা করেছিলেন। কবি যখন আশ্রমে থাকতেন তখন তিনি নিয়মিতভাবে ক্লাশ নিয়েছেন। আর পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদের জন্য নতুন নতুন মজার খেলা আবিষ্কার করতেন, ইন্দ্রিয়বোধ চর্চাও করাতেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ব্রহ্মবিদ্যালয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র আসছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনকে যুক্ত করবার কথা প্রতি পদক্ষেপে কবির মনে হয়েছে। কবি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শান্তিনিকেতনকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবেন।

এখানে কোনোরকম প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। জেগে উঠবে জাতীয় সংহতি বোধ। শিশুকাল থেকে সবাই একসঙ্গে থাকবার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া সহজ হবে। সব মিলিয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনকে যুক্ত করবার চিন্তা কবির মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পরামর্শ করেছিলেন চার্লস ফ্রিয়ার এন্ডরুজের সঙ্গে। এন্ডরুজ প্রথম শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, তখন তিনি ছিলেন দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক এবং একজন দীক্ষিত পাদরি। পিয়ার্সনের পর এন্ডরুজ ১৯১৪ সালের ১৫ এপ্রিল শান্তিনিকেতনে যোগ দেন।

১৯১২ সালে বিলেত ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উইলিয়ম উইনস্ট্যান্লি পিয়ার্সন পরিচিত হবার পর, কবির ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গলাভের জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। পিয়ার্সন স্থায়ী শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য আসেন

শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্ট ১৯২১

১৯১৪ সালের ৩১ মার্চ। এই দিন বোলপুর স্টেশনে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পিয়ার্সনকে স্বাগত জানান।

১৯১৬ সালের ১১ অক্টোবর শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথ-কে লিখেছেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসচে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্চে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে। ঐ জায়গাটিকে সমস্ত জাতিগত ভূগোলের বৃত্তান্তের অতীত করে তুলব এই আমার মনে আছে—সর্ব মানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।"

শান্তিনিকেতনে 'সার্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র' স্থাপন করবার চিন্তা-ভাবনা ১৯১৬ সালেই কবির মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। ১৯১৮ সালের এগার নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। তার এক মাস পরে শান্তিনিকেতনে শান্তি সংহতি ও বিশ্ব মৈত্রীর প্রতীক হিসেবে ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর, ১৩২৫-এর আটই পৌষ বিশ্বভারতীর ভিত্তি স্থাপিত হল।

এর মধ্যে অ্যানি বেসান্ট মাদ্রাজে এক নতুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ-কে এই প্রতিষ্ঠানের চ্যান্সেলর করলেন। মহীশূর বাঙ্গালুর নাট্যনিকেতন থেকে, সেখানে যাবার জন্য কবির কাছে আমন্ত্রণ এল। ১৯১৯-এর জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েছিলেন, বিশিষ্ট শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর তাঁর সফরসঙ্গী।

আডিয়ারে অ্যানি বেসান্টের পরিকল্পনায় নবগঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে ১৯১৯ সালের ১০ থেকে ১২ মার্চ এই তিনদিনে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে : The Centre of Indian Culture' প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

১৩২৬-এর বৈশাখ মাসে (১৯১৯) 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাঁর বিশ্বভারতী সম্পর্কে মনের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরবার জন্য লিখলেন।

এরপরে বিশ্বভারতী সোসাইটি গঠিত হল। বিশ্বভারতীর আইনানুগ কর্মপ্রবর্তনের ইতিহাস। বিধুশেখর শাস্ত্রী বেদ অনুসারে 'অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্' বাণী উচ্চারণ করলেন। এই সেই বিশ্বভারতী যেখানে সমস্ত পৃথিবী একটি নীড়ে এসে মিলিত হবে। ১৯১৯ সাল থেকেই শান্তিনিকেতনে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কলাবিদ্যা ও সংগীতের শিক্ষা। বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের পর শুরু হল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাজ। কলাভবনের নেতৃত্বে ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। পরবর্তীকালে কলাভবনের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রামকিংকর বেইজ, দিনকর কৌশিক, সোমনাথ হোর, কে. জি. সুব্রহ্মানিয়ান, শর্বরী রায়চৌধুরী, সনৎ কর, যোগেন চৌধুরী প্রমুখ। সংগীত ভবনে ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, ধ্রুবতারা যোশী, নিমাইচাঁদ বড়াল, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথের আবার পশ্চিমযাত্রা। ইউরোপ কবিকে অভ্যর্থনা জানাল বিপুলভাবে। ওখানকার বিভিন্ন সভায় কবি ভারতের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বমানবীয় ভাবধারার সঙ্গে বিশ্বভারতীর মেলবন্ধনের কথা বলেন। ইউরোপ সফর থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন আশ্রমে ফিরে এলেন তখন তাঁর মনে গভীরভাবে জাগছে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার মূলত তিনটি কার্যসূচি।

প্রথম কথা, শান্তিনিকেতনে প্রাচ্যের সর্ববিধ ভাবধারা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র গঠন। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পল্লির উন্নতি, পল্লিপুনর্গঠন, গ্রামসেবা, স্বাস্থ্যসমবায় আর গ্রামবাসীদের আর্থ-সামাজিক এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করা। আর তৃতীয়ত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং সমগ্র মানব জাতির ঐক্য সংহতি ও মৈত্রী স্থাপন।

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে কবি বিশ্বভারতীকে সাধারণের হাতে উৎসর্গ করবার জন্য এক সভা আহ্বান করলেন। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বমৈত্রীর সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত হল—বিশ্বভারতী।

আম্রকুঞ্জে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করে বলেছিলেন—'আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন।.....বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, আর সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে

সিলভাঁ লেভীকে বাংলা শেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ

আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেইভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।'

বিশ্বভারতীর কার্যধারায় আচার্য, ছাত্র, অধ্যাপক ও বান্ধব এই চার ধরনের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন। আশ্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কলা, সংগীত, নৃত্য ও ভাষাচর্চার আয়োজন করেন। সার্বিক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাসূচির কার্যধারা অব্যাহত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রেরণায় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানী, রবীন্দ্রজীবনীকার, দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গড়ে তুললেন—বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। পরে গড়ে উঠল রবীন্দ্রচর্চার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান—রবীন্দ্রভবন।

যে সব বিদেশি অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সিলভাঁ লেভি, মরিটস উইনটার নিটজ, ভিনসেন্ট লেসনি, স্টেন কোনো, কার্লো ফরমিকি, তুচ্চি, বগদানফ প্রমুখ।

বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বে বিভিন্ন ভাষাচর্চার আয়োজন হয়েছিল। বিদেশি ভাষাচর্চার মধ্যে ফরাসি ভাষাই প্রথম শেখানো হয়েছিল। বোম্বের এইচ পি মরিস, ফ্রান্সের চিন্তাবিদ পল রিশার প্রথম পর্বে ভাষা শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর ১৯২১ সালে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে এসে যোগ দেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর ভাষা চর্চার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা। প্রাচ্য বিষয়ের অধ্যাপক উইন্টারনিটজ্ ১৯২২ সালের শেষদিকে বিশ্বভারতীতে অতিথি অধ্যাপক' হিসেবে যোগ দেন।

কলাভবনের শিক্ষিকারূপে ফ্রান্সের আঁদ্রে কার্পেলে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২২ সালে। এর পরের বছর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে আসেন। কলাভবনে অধ্যাপনা ছাড়াও ক্রামরিশ জার্মান ভাষা পড়াতেন। রুশদেশিয় পণ্ডিত বগ্‌দানফ-এর আগমনকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত। চেকোশ্লোভাকিয়া-র প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেসনি ছাত্রদের জার্মান ভাষা শেখাতেন, শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আয়ারল্যান্ডের বহু ভাষাবিদ ড. মার্ক কলিন্স পড়াতেন ভাষাতত্ত্ব। খ্রিস্টিয় ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন আমেরিকার খ্রিস্টান পণ্ডিত স্ট্যানলি জোনস। ভো-চেঙ-লিমই বিশ্বভারতীতে প্রথম চীনা অধ্যাপক, তিনি পড়াতেন প্রাচীন ও আধুনিক চীনা ভাষা। নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাচীন লিপি-বিশারদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ স্টেন কোনো সস্ত্রীক এসেছিলেন ১৯২৪ সালের শেষদিকে।

বিভাগীয় অধ্যক্ষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। ছবিতে নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শৈলজারঞ্জন, তানওয়েন, অনিলকুমার চন্দ প্রমুখ

ইতালির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কার্লোফর্মিকি এবং ইতালীয় ও চীনা ভাষার অধ্যাপক জুসেপ্পে তুচ্চি বিশ্বভারতীতে যোগ দেন ১৯২৪ সাল নাগাদ। এন্ডরুজ ও পিয়ার্সনের কথা তো আগেই বলেছি। এছাড়া পঠন-পাঠনের দায়িত্বে ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, ভীমরাও শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নকুলেশ্বর গোস্বামী, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ। বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, উর্দু ভাষা চর্চার সঙ্গে চীনাভাষা ও সাহিত্য চর্চাও শুরু হয়েছে। আশ্রমের আর্থিক সংকটের মধ্যেও কবি জাপান থেকে দুজন জুজুৎসুবিদ সোনো ও তাকাগাকিকে এনেছিলেন। তাঁরা শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শেখাতেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও ধ্যানের সমন্বয় সাধনা কবির মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পল্লি ও শহরের সমন্বয় চিন্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি চাইতেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সমস্ত ধরনের কাজ ও সৃষ্টির যোগাযোগ গড়ে উঠুক।

শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি এই আয়োজনের এক বিশাল ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীনিকেতনে পল্লি উন্নয়ন ও পুনর্গঠন এবং পল্লি সংগঠনের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

কবির এই পল্লি সংগঠনের কর্মযজ্ঞে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট। তাঁর স্ত্রী ডরোথি শ্রীনিকেতন-কে গড়ে তোলবার কাজে অসামান্য সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে যোগ দেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, খ্যাতকীর্তি পল্লি সংগঠক কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরানন্দ রায়, হেমন্তকুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ বসু, মনি রায়, মনি সেন প্রমুখ। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল কৃষি-বিজ্ঞান কলেজ খুব সম্প্রতি রথীন্দ্র কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন সংস্থা, বার্ষিক উৎসব ও হলকর্ষণ উৎসবের

মধ্য দিয়ে শ্রীনিকেতন ছাড়িয়ে বীরভূমের মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক আরো অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

চীনা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাও শুরু হয়েছে। আজ থেকে ৬৮ বছর আগে ১৯৩৭ সালের ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতীর মধ্যমণি' চীনভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। রবীন্দ্র-জীবনকালে প্রতিষ্ঠিত চীনভবন-ই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতন্ত্র প্রাচ্যবিদ্যা কেন্দ্র। এই কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহযোগী হিসেবে অধ্যাপক তান য়ুন শান-এর নাম আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। হিন্দি ভবনের প্রতিষ্ঠা হল। আর সব মিলিয়ে সমগ্র বিশ্বভারতী পরিচালনার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ছাত্র-ছাত্রী আসছেন। বিশ্বভারতী যখন ক্রমে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এমন সময় ১৯৪১ সালের বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। সেই সময় বিশ্বভারতীর ভার গান্ধীজী সানন্দে গ্রহণ করলেন। এরপর বিশ্বভারতী সোসাইটির অনুমোদনক্রমে বিশ্বভারতীর ভার অর্পিত হল ভারত সরকারের ওপর। স্বাধীন ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৫১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেল। সূচনা বিশ্বভারতীর আর এক পর্বের।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ওতপ্রোত হয়ে আছে এশিয় নিবিড়তায়। রবীন্দ্রনাথ এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল। জাপানের যোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট মণীষী তেনসিন ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯০২ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। জাপান ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে এই যে সংযোগ সূত্র রচিত হল তা পরে নানা মুখে নানান ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

বহু জাপানি ছাত্র এসেছেন শান্তিনিকেতনে, গুরুদেবের শিক্ষাদর্শে প্রাণিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে, জাপানের সঙ্গে শান্তিনিকেতন তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠুক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩৩ সালে জাপানি ছাত্র ৎসুউশো ব্যোদো সংস্কৃত অলংকার শিক্ষার পাঠ নেবার জন্য এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। পাঠ সমাপ্ত করে জাপানে ফিরে যাবার আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ব্যোদো-সান-এর কাছে শান্তিনিকেতনে একটি 'জাপান-ভবন' গড়ে তোলবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কবির এই আন্তরিক ভাবনা ও ইচ্ছার কথা ব্যোদো কখনওই ভুলতে পারেননি। এই প্রয়াসকে সার্থক ভাবে রূপ
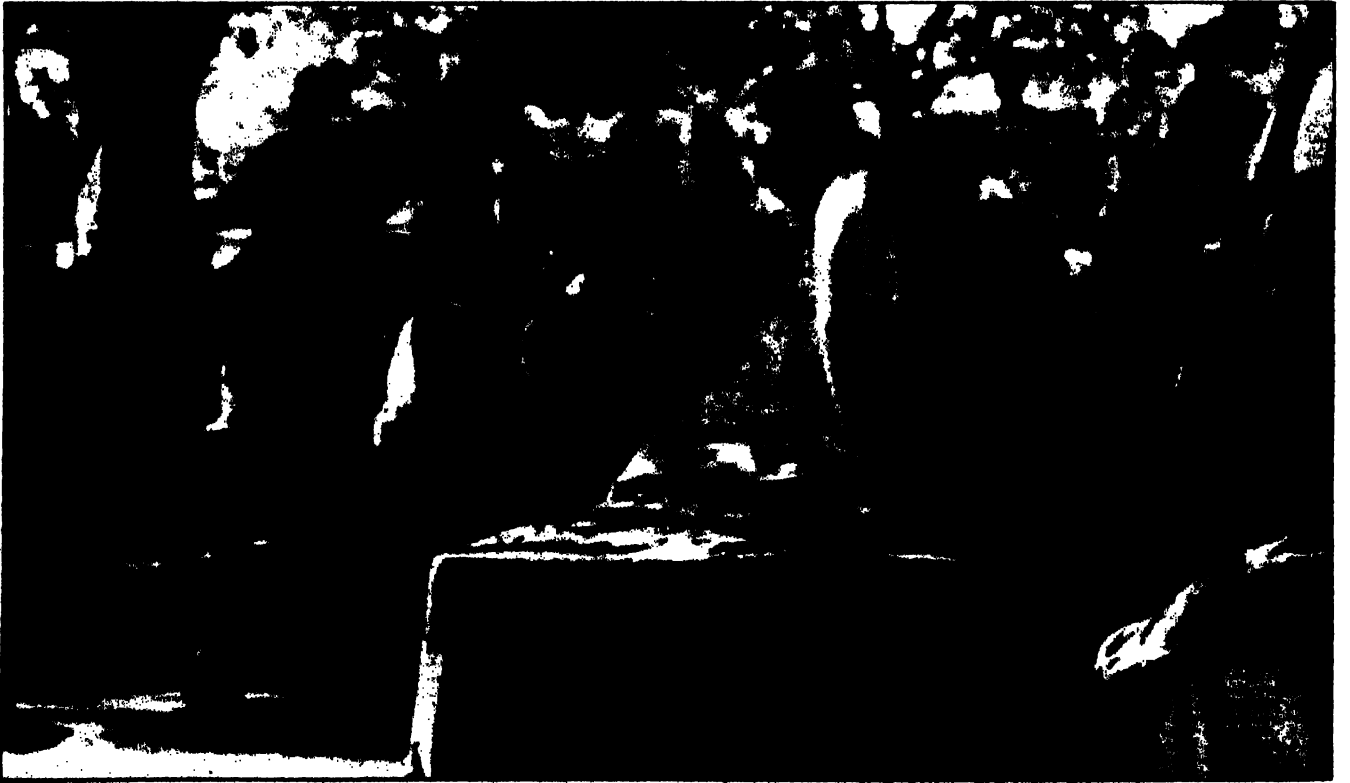
উন্মুক্ত পরিবেশে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি

শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিক্ষকরূপে জিয়োৎসু (মাঝখানে বসে)

দেবার জন্য জাপানে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ১৯৭২ সালে জাপান-ভারত রবীন্দ্রসংস্থার সূচনা। এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন ব্যোদো, সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলেন বিশ্বভারতীর জাপানি ভাষা সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও জাপানের বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক কাজুও আজুমা।

১৯৮৮ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রয়াত ড. নিমাইসাধন বসু। তাঁর এই জাপান ভ্রমণকালে নিমাইবাবু আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ব্যোদো সান-এর কাছে 'নিপ্পন ভবন' প্রতিষ্ঠার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, নিমাইবাবু জাপানের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রবীন্দ্রানুরাগী, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপক ও নানান মানুষজনের কাছে বিশ্বভারতীতে 'নিপ্পন ভবন' নির্মাণ প্রকল্পে আর্থিক সাহায্যদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালের ৩ জুলাই বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তনে প্রাক্তন আচার্য ও প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর উপস্থিতিতে তৎকালীন উপাচার্য ড. নিমাইসাধন বসু শান্তিনিকেতনে 'নিপ্পন ভবন' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এর বছর দুয়েকের মধ্যেই 'নিপ্পন ভবন প্রতিষ্ঠা সমিতি'-র উদ্যোগে প্রায় সাতাশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।

১৯৯৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন নিপ্পন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। নিপ্পন ভবনের প্রাণপুরুষ কাজুও আজুমা, বিশ্বভারতীর খ্যাতকীর্তি অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রবীন্দ্র চিত্রকলা বিশেষজ্ঞ ড. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই প্রাক্তন উপাচার্য ড. সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও ড. দিলীপকুমার সিংহ, বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য ড. সুজিতকুমার বসু-র সহযোগিতায় ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের নানান কাজ এগিয়েছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন—শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, বীরভূম তথা ভারতবর্ষের অনন্য গৌরব ও অহংকার।

খুব স্বাভাবিক কারণেই যুগ পালটেছে। তাই শান্তিনিকেতন আশ্রমের সেই প্রাচীন অবয়ব আজ হয়তো খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আগেরকার সেই মুক্ত প্রান্তর, প্রাচীরবিহীন অবাধ যাতায়াত আজ বিরল। বহু অট্টালিকা গ্রামীণ আবহকে বিদায় জানিয়েছে। মুক্ত শিক্ষা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। যানবাহনে ও পোষাক-আশাকে আধুনিকতা এসেছে কালের অনিবার্য নিয়মে।

শিক্ষাভবনে বিজ্ঞান শিক্ষায় নানা শাখা-প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে। অনেক নতুন নতুন পাঠক্রম আসছে। তবুও যদি আমরা শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর দিকে তাকাই তাহলে বীরভূমের মৃত্তিকাস্পর্শী প্রাণস্পন্দন আজও অনুভব করতে পারি। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন, লালমাটি আর বাউলদের দেশ বীরভূমকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। আর এই বিশিষ্টতা বীরভূম জেলা ছাড়িয়ে বঙ্গভূমির আদ্যন্তকে বিশ্বসভায় বরণীয় স্থানটি রক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্র পরিকল্পনার ভাবনা আজও নিঃশেষ হয়নি, যে ভাবনা শান্তিনিকেতনের—বীরভূমের তথা সমগ্র বাংলা ও বাঙালির।

লেখক : রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারের কর্মী, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

চীনাভবন উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ

দামোদর মন্দির (সিউড়ি)
— সৌজন্যে : ধ্রুব মুখোপাধ্যায়

রাজনগর রাজবাড়ীর একাংশ
— সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে তারাশঙ্কর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার গ্রহণ করছেন

তারাশঙ্করের বীরভূম

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
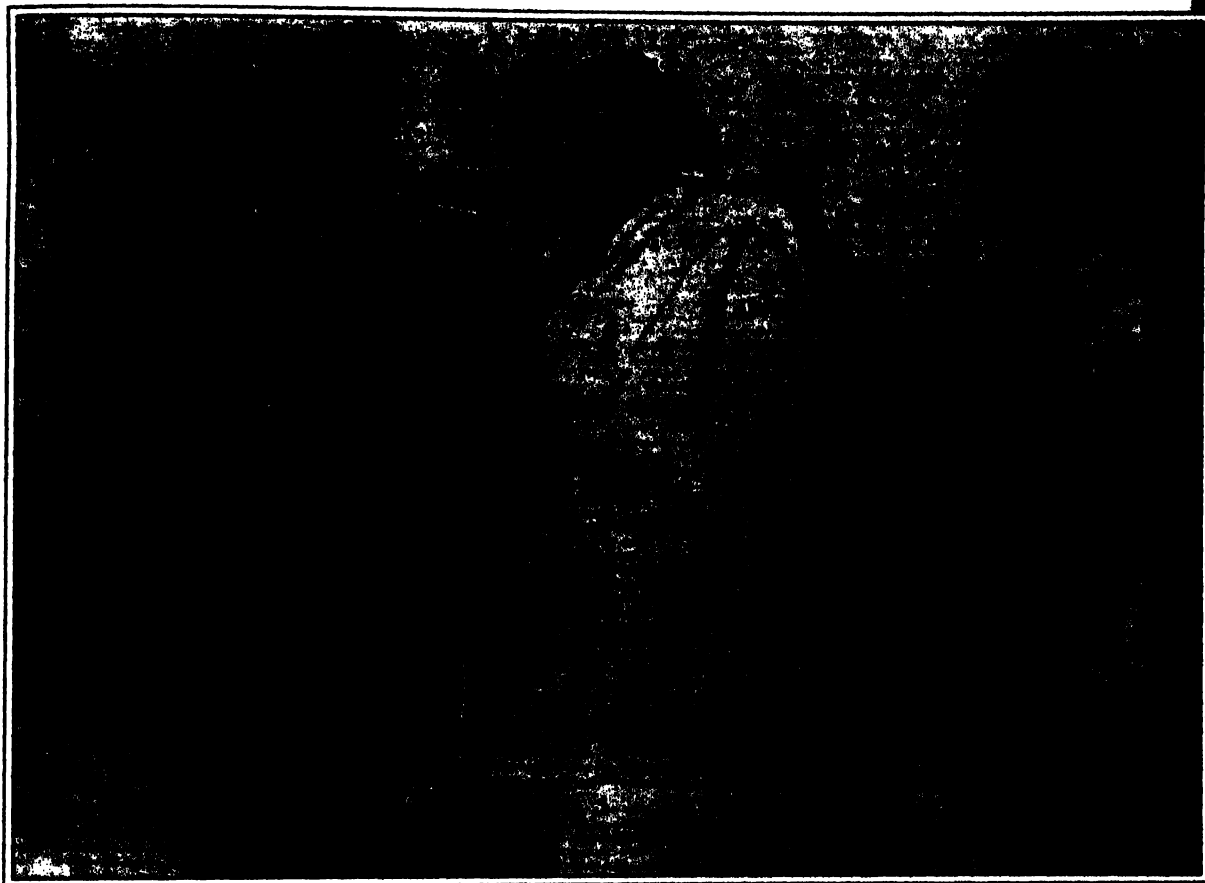
'কয়লাকুঠি'র লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের রচনা পড়ে মুগ্ধ তারাশঙ্করের মনে হয়েছিল, 'অদ্ভুত ! বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়।' শৈলজানন্দ বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পুরোধা লেখক। আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের Locale স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার Topography, ভাষা-সংস্কৃতি সমেত। শৈলজানন্দের যেমন কয়লাখনি অঞ্চল, তারাশঙ্করের তেমনি ত্রিকোণাকার বীরভূম। যদিও এমন বলা চলে না যে তারাশঙ্করের বীরভূমকেন্দ্রিক উপন্যাস মাত্রেই 'আঞ্চলিক'। বীরভূম সেখানে অন্যতর উপাদান। তবু শৈলজানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল-জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ তৈরি করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন—পুরনো জমিদার ঘর হইতে মালোবেদে পাড়া পর্যন্ত।"

কীভাবে তার ভূগোল, মানুষ, ভাষা, লোকসংস্কৃতিতে তারাশঙ্করের বীরভূম রূপ পেয়েছে, এই অবকাশে সে দিকটি পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে।

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে বীরভূমের ভূ-প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে এইভাবে :

'বাংলাদেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিক বর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম ;.... বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই—দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।'

এই সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমের মাটি যে স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত তা ওই উপন্যাসের শুরুতেই ধরতাই দেওয়া হয়েছে।

বীরভূম বীরের ভূম না কি মুণ্ডারি শব্দ 'বির' বা জঙ্গলের ভূম তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। এ নিয়ে একটি কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে। ওই কিংবদন্তিতেও বীরভূমের মাটির স্বাতন্ত্র্যের কথাই আভাসিত হয়। বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে গল্পটি আছে এইভাবে : 'Once upon a time the Raja of Bishnupur went out hawking in this part of his Kingdom. He threw off one of the birds in pursuit of a heron, which turned upon its pursuer with great fury and came off victorious. This universal occurrence excited the surprise of the king, who imagined that it must have been due to some mysterious quality of the soil: that the soil was, in fact virmati (i.e., vigorous soil), and that whatever might be brought forth by that soil would be endowed with heroic energy and power. There upon he named it Virbhumi.'

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিকভাবে এই তথ্য ঠিক হোক বা না-হোক, এই কিংবদন্তির যে দিকটি আমরা লক্ষ্যে রাখছি, তা হল বীরভূমের মাটির স্বতন্ত্রতা জনমানসে বিশেষভাবেই স্বীকৃত ছিল। প্রাচীনও বটে এই ভূখণ্ড। আর্কিয়ান যুগের শিলায় নির্মিত এই ভূখণ্ডটির বয়স নাকি সাড়ে তিনশো' কোটি বছর। হয়তো সব ধরনের সভ্যতারই নিদর্শন মিলতে পারে এখানে। হয়তো বয়সের ভারেই এর ভূ-প্রকৃতি এমন কড়া।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর লিখেছেন : "হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়া ধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি। 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ-ধূ করে বালি—একপাশে মাত্র একহাঁটু গভীর জল কোনমতে বয়ে যায়— ... মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ। ঘাস যায় শুকিয়ে, মাটি গরম হয়ে ওঠে আগুনে পোড়া লোহার মত ; কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল টামনারই ধার বেঁকে যায় ; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে। খাল বিল পুকুর দীঘি চৌচির হয়ে ফেটে যায়।" বীরভূমের এই মাটির পরিচয় তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় পরবর্তী কালেও। 'আমার কালের কথা'-য় নিজের সূতিকাগৃহ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর লিখেছেন, "মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙামাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে।... ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে,
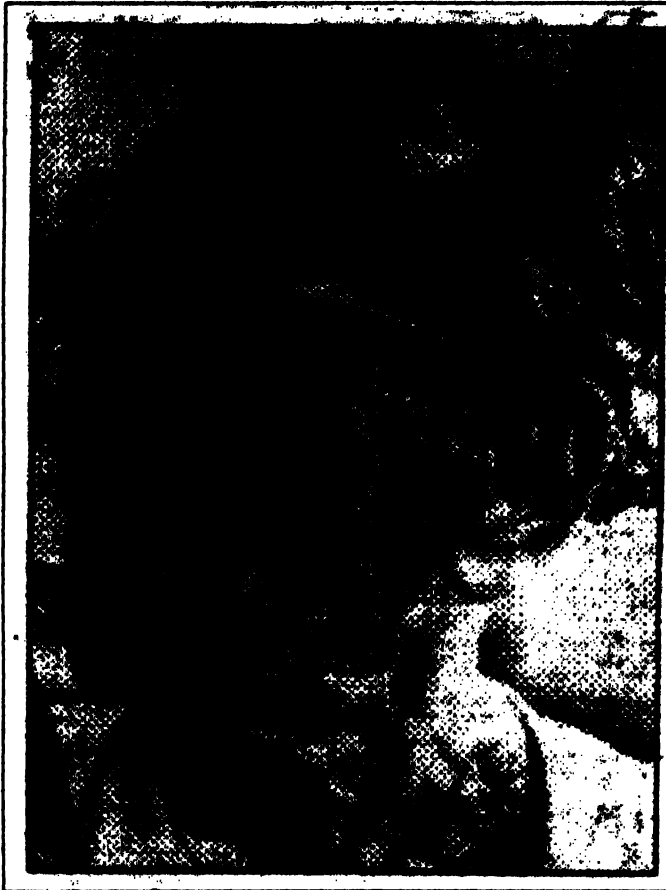
এই সেই বিখ্যাত হাঁসুলি বাঁক

শেষে গাঁইতি আনা হ'ল : দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে, তা আজও আমার চোখে ভাসছে।"

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সূচনায় বীরভূমের প্রকৃতির ওই বর্ণনা আসলে পূববাংলার নদীবিধৌত সজলশ্যামল প্রকৃতির প্রতিতুলনা। বীরভূমের প্রবল খরায় নদীই একটু-আধটু জলের উৎস। নদীর ধারে বাস সেখানে 'ভাবনা বারোমাস' নয়।

এ তো গেল রুখাসুখা বীরভূমের শাক্তরূপ। কিন্তু বীরভূম শুধুই শাক্ত ঐতিহ্যে পুষ্ট নয়। এখানে শাক্ত তান্ত্রিকদের যেমন সিদ্ধির আসন পাতা আছে তেমনি আবার জয়দেব-চণ্ডীদাসের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর সুরনির্ঝরও এখানে বয়ে যাচ্ছে। অন্য একটি প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, 'আমি নানুরের চণ্ডীদাসের, শান্তিনিকেতনের ঠাকুরের পথের পথিক।' কঠিনে-কোমলে মেশা বীরভূমের বৈপরীত্য তারাশঙ্করের সাহিত্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে হয়। ছাতিফাটার মাঠের নিঃসীম রিক্ততা, রসকলি-রাইকমল-রাধা-র কমনীয়তা আর 'কবি'-র 'ভালবেসে মিটল না সাধ'-এর বাউলিয়া আকৃতি একঠাঁই হয়ে রয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্যে, শাক্ত বৈষ্ণব আর বাউলিয়া তিনটি ভাবের সহাবস্থানভূমি বীরভূমের ভাবজগতের মতো।

যে-বীরভূম শুরুতে বলা হচ্ছিল সে এক প্রাকৃতিক বীরভূম। ২৩°৩৩' থেকে ২৪°৩৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°১০' থেকে ৮৮°২' পূর্ব দ্রাঘিমায় তার ভূগোল বন্দী। কিন্তু, সেই প্রাকৃতিক বীরভূমেরও পরে থাকে এই ভাব-বীরভূম : সংস্কৃতির মিলন-বিগ্রহের মতো। তারাশঙ্করের সাহিত্যে চাইলে প্রাকৃতিক বীরভূম থেকে ভাব-বীরভূমে চলে আসা যায়। অবশ্য ভৌগোলিকভাবেও তারাশঙ্করের বীরভূম কিছুটা বা স্বতন্ত্র। বীরভূমের দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ নিয়েই মূলত তারাশঙ্করের বীরভূম। লাভপুর তার কেন্দ্রে। আর তাতে মিশে আছে সন্নিহিত বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ। পাঁচুন্দির হাটের উল্লেখ আছে 'কালাপাহাড়' গল্পে, কিন্তু পাঁচুন্দি বীরভূমে নয়। আবার 'ভুবনপুরের হাট' উপন্যাসের পটভূমিতে যে সালার গ্রামের প্রসঙ্গ আছে তাও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত। সেদিক থেকে তারাশঙ্করের বীরভূমের চতুঃসীমায় পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ কিছুটা প্রসারিত। যে সীমানায় পূর্বে হিজলবিল এবং দক্ষিণ-পূর্বে উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট হয়তো ছুঁয়ে আছে। এই মানচিত্রে 'আখড়াইয়ের দীঘি' বা 'বরমলাগের মাঠ'-

এর পাশে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম এলাকার বুক চিরে যাওয়া বাদশাহী সড়ককেও যোগ করে নিতে হবে। মুর্শিদাবাদের কান্দি তাঁর কাছে ছিল 'আরেক লাভপুর' ;—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের স্মৃতিচারণা থেকে তা জানা যায়।

তারাশঙ্করের বীরভূমের বুক দিয়ে বয়ে গেছে অনেকগুলো নদী। নদীগুলো আবার ফিরে এসেছে উপন্যাসে। মনে হয়, ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে বেরিয়ে আসা শাখায়-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়া নদীগুলির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে তারাশঙ্করের বীরভূমের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'কালিন্দী' উপন্যাসে আছে, 'রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী—ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী ; এই কালী নদীর ওপারে চর জাগিয়াছে।' অন্যত্র 'সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন ; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারিদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথে ময়ূরাক্ষী নদী।...' 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেও ময়ূরাক্ষী নদীর প্রসঙ্গ এসেছে বারবার।

(ক) 'কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানি গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ তিনদিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত।'

(খ) 'দেবু জংশন স্টেশনে নামিল। চৈত্র মাসের শীর্ণ ময়ূরাক্ষী পার হইয়া শিবকালীপুরের ঘাটে উঠিয়া সে একবার দাঁড়াইল। ... ওই তাহার গ্রাম শিবকালীপুর, তাহার পরই মহাগ্রাম। পশ্চিমে শেখপাড়া, কুসুমপুর, তাহার পশ্চিমে ওই দালান-কোঠায় ভরা কঙ্কণা, একেবারে পূর্বে ওই দেখুড়িয়া। আর দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন।... দেখুড়িয়ার খানিকটা পূর্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ফিরিয়াছে।'

(গ) 'শিবকালীপুরের দেবু ঘোষ ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ ধরিয়া মহাগ্রামের দিকে চলিয়াছিল।'

এই ময়ূরাক্ষী নদীকে অন্য এক ভীষণতায় পাওয়া যাবে 'তারিণীমাঝি' গল্পে।

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানসহ যে গ্রামগুলির নামের উল্লেখ পাওয়া গেল তার সঙ্গে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার যোগ রয়েছে। আক্ষরিকভাবে এ গ্রামগুলি আছে কি না সে খোঁজ করে খুব লাভ নেই। সাহিত্যিক প্রয়োজনে নামের হেরফের হতেই পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি 'তারাশঙ্করের বীরভূমে'-র গ্রাম। বাল্যবন্ধু হেলারাম চৌধুরী তারাশঙ্করের উদ্দেশে একটি গান বাঁধেন। ১৯৭০ সালে লেখা গানের কথাগুলি এইরকম :

"(তোমার) 'কঙ্কণা' আজ শহরের সাজে সেজেছে দালানময়
ঐশ্বর্যের জৌলুষ আছে ভিতরে আঁধার রয়।"

এই গানে 'কঙ্কণা'-র উদ্দিষ্ট অর্থ লাভপুর। আবার 'পদচিহ্ন'

বীরভূমের তালবীথি, বিষয়পুর

ছবি : অনির্বাণ সেন

উপন্যাসে লাভপুর হয়েছে নবগ্রাম। 'আমার কালের কথা'-য় লাভপুর প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি—আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।'

তারাশঙ্করের সাহিত্যে যে কালের নানা পর্যায়ের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করা যায়, সেও লাভপুরের অভিজ্ঞতাজাতই বলা যায়। ওই স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর আরও লিখেছেন : 'দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।'

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে বীরভূম অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। অন্যত্র হয়তো তাতে কথাবস্তুর আড়ালে পরোক্ষে রাখা হয়েছে বীরভূমকে। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের দেবীপুর কি আসলে লাভপুর ? কিংবা আরোগ্য নিকেতনের পটভূমিতে কোথাও কি লাভপুর বা বীরভূমের কোনও ছায়াসম্পাত ঘটেছে ? হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরঙ্গ পিতামহ' স্মৃতিচারণা থেকে তাই অন্তত মনে হয়।

তারাশঙ্করের সাহিত্যে যে কালের নানা পর্যায়ের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করা যায়, সেও লাভপুরের অভিজ্ঞতাজাতই বলা যায়। ওই স্মৃতিকথায় তারাশঙ্কর আরও লিখেছেন : 'দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।'

"লাভপুরে অল্প কয়েকদিন ছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে হঠাৎ একদিন বিকেলে আমাকে নিয়ে গ্রাম দেখাতে বেরুলেন। ...অবশেষে লাভপুর আর মহাগ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। ...তারপর কিছুটা গভীর স্বরে বললেন, 'এই যে বকুল গাছটা দেখছ, আর দূরে যে ভাঙা বাড়িটার অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, ওরা দুজনেই 'আরোগ্য নিকেতন'-এর বিষয়বস্তু। দূরে ভাঙা ভিটেটা অতীতে ছিল জীবনমশায়ের বাড়ি আর এই বকুল গাছটা হল সেই বকুলগাছ, যার গোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃত্যু যেন খানিকটা জিরিয়ে নিয়েছিল বলে মনে মনে কল্পনা করেছিলাম।' তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, 'আমি-তুমি যেমন হাতের তালুকে জানি-চিনি, সেইরকম আমি আমার অঞ্চলকে চিনতাম।"

আমরা তারাশঙ্করের আধুনিকতার পরিচয় পাই এই নিবিড়ভাবে গ্রামকে চেনার দক্ষতার মধ্যে। গ্রামের মধ্য দিয়ে শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন তিনি সেই 'কল্লোল'-এর শিকড়-উপড়ানোর যুগে। তাঁর ধাত্রীচেতনার প্রথম পাঠ ওই বীরভূমে, লাভপুরে। ক্রমে সে দেশ প্রসারিত হয়ে গেছে। সে আলোচনা ভিন্ন। আপাতত আমরা দেখব তাঁর সাহিত্যের চরিত্রে, ভাষাবয়নে, সংস্কৃতিতে তাঁর বীরভূম অনুস্যূত হয়ে আছে।

২

'কালিন্দী' উপন্যাসের অহীন্দ্র একবার কালিন্দীর চরে ভ্রমণরত অবস্থায় দেহাতি মানুষগুলোর কথা ভাবছিল।

'সত্য সত্যই উহারা মাটির কীট ! মাটিতেই উহাদের জন্ম, মাটি লইয়াই কারবার, মাটিই উহাদের সব ! ...মাটির কীটদের মাটির গড়া বাসস্থান ! সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি, বৃদ্ধা মাঝিন, কালো পাথরের গড়া প্রায়-উলঙ্গ মানুষের দল।' 'কালো পাথরে গড়া' এই উপমান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বীরভূমের আদিম প্রকৃতি দিয়েই যেন বীরভূমের প্রাকৃত-মানুষের চরিত্র নির্মিত হয়েছে। ভূ-প্রকৃতিটাই তাদের চরিত্রের উপমান হয়ে উঠেছে। এসব চরিত্রও বীরভূমে তারাশঙ্করের চোখে দেখা মানুষ। 'কবি'-র নিতাই কবিয়াল লাভপুরের সতীশ ডোম। বণিক মাতুলের দোকানে তারাশঙ্কর যে চা খেতেন তা নিজেই একজায়গায় উল্লেখ করেছেন। ঠাকুরঝি দোনাইপুরের, তার নাম কেউ বলে ভানুমতী, কেউ বলে যমুনা। বসন মল্লারপুরের। জীবনমশায় রঙলাল ডাক্তার আসলে সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথের দাদা, তিনি লাভপুরে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতেন। লশো বাউরিই হাঁসুলী বাঁকের নসুবালা। স্বনামে রয়ে গেছে 'তমসা'-র পাখী। সেও লাভপুরের পাখি বসনের মেয়ে ময়না। পৌত্র সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মৃতিচারণায় এই 'চরিত্র-চিত্রশালা' প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'দূর থেকে দেখতে পেলাম আমাদের বাড়ির সামনেটা লোকে লোকারণ্য। দেখা যাচ্ছে ওপাশে বসে আছে 'কবি'-র নিতাই কবিয়াল, তার বন্ধু রাজন।... ওপাশে বসে হাঁসুলী বাঁকের করালী মণ্ডল, নসুবালা। আমার ঠিক আগেই মাথায় দুধের ঘটি নিয়ে ঢুকল হাঁসুলী বাঁকের পাখি। ঐ দূরে বসে আছে 'গণদেবতা'-র দ্বারিক চৌধুরীর বংশধর, অনিরুদ্ধ অর্থাৎ ভূষণ কামারের ছেলে পরেশ। এপাশে পাচু বায়েনের পুত্র জগা বায়েন। শিউলোলে দাঁড়িয়ে আছে শশী ডোমের পুত্রবধূ, হাবলোর স্ত্রী, অর্থাৎ তারাশঙ্কর-সাহিত্যের চরিত্রগুলির আদিরূপের এক জীবন্ত মেলা।'

তারাশঙ্কর লাভপুরে এলে এই 'চরিত্রগুলি' তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত। তারাশঙ্করের স্বপ্নের মধ্যে তাঁর চরিত্রেরা কথা কইত। পত্নী উমাদেবী তেমন সাক্ষ্যই দিয়েছেন। বাংলাদেশের আর কোনও সাহিত্যিককে জানি না, যাঁর এতগুলি চরিত্র সরাসরি চেনাজানা মানুষ থেকে নেওয়া। ব্যোমকেশ মজুমদারকে লেখা একটি দীর্ঘ পত্রে আরোগ্য নিকেতনের জীবনমশায়ের রক্তমাংসে উপস্থিতি সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তরে তারাশঙ্কর লিখেছেন, ' জীবনমশায় ছিলেন। তাঁকে দেখেছি, তাঁর ওষুধ খেয়েছি। কৃষ্ণদাস বাবুর যে ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল যাতে রংলাল ডাক্তার এসেছিলেন— কিশোর যার নাম—তার বাল্য বয়সটায় আমিই কিশোর। পরের অংশ কল্পনা।...তাঁর Indian Herbs বা ঐ জাতীয় নামের মূল্যবান পুস্তক আছে।' তারাশঙ্করের চরিত্র চিত্রশালায় তিনি নিজেও এক চরিত্র। 'ধাত্রীদেবতা'-র শিবনাথ তো তিনি নিজেই। কৃষ্ণদাস আবার ফিরে এসেছেন 'ধাত্রীদেবতা'-য়, যা আসলে তারাশঙ্করের পিতা হরিদাসের নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পিসিমা স্বনামে এবং মা প্রভাবতী দেবী জ্যোতির্ময়ী নামে আছেন 'ধাত্রীদেবতা'-য়। 'কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ লেখকের আবাল্য বন্ধু দ্বিজপদরই 'অক্ষম রুগ্ন অবস্থার চিত্র।' তারাশঙ্করের চরিত্র- চিত্রণের প্রধান উপাদান তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চরিত্র নির্মাণ কখনো-সখনো সুখের হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন তারাশঙ্কর। 'প্রথম যেদিন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়, যেদিন তিনি স্বর্ণ ডাইনীর গল্প নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই দিনেরই কথা। ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা, কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত বিচিত্র মানুষ, ...তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখিনি।' আসলে প্রশ্নটা উঠেছিল তারাশঙ্করের 'ডাইনীর বাঁশি' গল্প নিয়ে। বুদ্ধিমান সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, এ নিশ্চয় বিদেশি উইচক্র্যাফ্টের গল্প। রবীন্দ্রনাথের মুখে সমালোচকদের এহেন মন্তব্য শুনে তারাশঙ্কর কীভাবে প্রতিক্রিয়া করেছিলেন তা তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক :

'আমি তাঁর কথার মধ্যেই বলে উঠলাম—না। ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরেজি ভাল জানি না, আমার গ্রামে ইংরেজি বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনি আমাদের বাড়ির পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। আমি—' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে সমালোচকপ্রবরদের একটি অভিযোগ ছিল তাঁর ভাষা নাকি নিতান্ত আটপৌরে এবং 'দুর্বল।' এর উত্তরে স্বয়ং তারাশঙ্করই বলেছেন, 'আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মতো নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হইনি। .....সে চর্চা করবার ঝোঁকও আমার জাগেনি।

এই স্বর্ণডাইনির 'শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। ...মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে সিউরে উঠত।'

'ধাত্রীদেবতা'-র রামনীসাধুও তারাশঙ্করের চেনা গোঁসাইবাবা। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের হিজলবিলের পটভূমিকায় যে বেদে সমাজের কথা বলা হয়েছে, 'আমার কালের কথা'-য় হুবহু সেই বাগভঙ্গি সমেত বেদে সমাজের অভিজ্ঞতার কথা আছে। বস্তুত, তারাশঙ্করের গভীর আগ্রহের বিষয় ছিল বেদেরা। নানা ধরনের বেদে। নানা তাদের পেশা। এদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন তারাশঙ্কর। ধর্মে ও পেশায় বিচিত্র স্বভাবের হওয়ার জন্য তাদের চলিষ্ণু জীবন সম্ভবত তারাশঙ্করের এত আগ্রহের বিষয় হয়েছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। ...নাকের নথ দুলিয়ে, ভুরু টেনে, হেলেদুলে, সুর করে কথা ব'লে গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়—ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী, স্বামী সোহাগী, চাঁদ বদনী, রাজার রাণী।' এইরকম বুলিই বলে নাগিনী কন্যার কাহিনীর বেদে মেয়েরা। হিজলবিলের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটিকে উপস্থাপিত করা হলেও তাঁর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী এই বেদেদের তিনি দেখেছিলেন লাভপুরের বিলে। উপন্যাসের অবশ্য অনেকটা অংশই কল্পনা।

'আমার কথা' বইতে তারাশঙ্কর লিখেছেন, ১৯২৯ সালে 'রসকলি' গল্পের মঞ্জরী, 'রাইকমল'-এর রাইকমল যে কমলিনী নামের বৈষ্ণবীকে নিয়ে লেখা সেই কমলিনী ১৯৫১ সালে ২২ বছর বাদে লেখকের মুখোমুখি হয়ে তার এক পালিত পুত্রের দুঃখের কাহিনি শোনায়। সেই কাহিনি থেকে তারাশঙ্কর আর একটি নতুন কাহিনি রচনার আগ্রহ বোধ করেন।

দৃষ্টান্ত আর না বাড়ালেও চলে। তারাশঙ্করের দেখা মানুষগুলো যে 'চরিত্র' হয়ে যেতে পেরেছে, তার কারণ শুধুই নির্বিকল্প অভিজ্ঞতা নয়। মানুষগুলিকে তারাশঙ্কর গভীর মর্মের মধ্যে অনুধাবন করেছিলেন বলেই চরিত্র চিত্রণ এমন মর্মস্পর্শী হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
লাভপুর, বীরভূম

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার বইখানি পড়ে খুসি হয়েছি। আমার পরিচরবর্গ অনুপস্থিত থাকাতে বইখানি আমার হাতে এসে পড়েছিল তাতে পরিতাপের কারণ ঘটেনি। রাইকমল গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে—তাছাড়া এটি ষোলো আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়। তোমার অন্য বইটি সময় পেলে পরে পড়ব। ইতি ২৮ মাঘ, ১৩৪৩ [১০ ফেবরুআরি, ১৯৩৭]

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

লাভপুর, বীরভূম

শ্রীচরণেষু

আপনার পত্রখানি আশীর্ব্বাদস্বরূপ মাথায় নিয়েছি। "রাইকমল" আপনার ভালো লেগেছে, সেহেতু নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।

পত্রখানি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পুনরায় প্রণাম নিবেদন করবার প্রবল বাসনা আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় নিমন্ত্রণে আপনি কলকাতায় যাবেন। তারপর দেখলাম, চন্দননগরে আপনার উপস্থিতির সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। তারপর আবার দেখলাম, ধর্ম্মমহাসম্মেলনে আপনার উপস্থিতির বার্তা। তাই পত্র লিখি নাই, আপনার কর্ম্মমুখর সময়ের মধ্যে আপনাকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ধৃষ্টতা আমার কাছেই অমার্জ্জনীয় বলে মনে হয়েছিল।

গল্প সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানবার বাসনা করি। আজকাল বাংলা-সাহিত্যে গল্পের ফুলবনে নানা ফুল ফুটছে। কিন্তু অধিকাংশেরই দেখি গল্পের মধ্যে কাঠামোর চেয়ে বর্ণবৈচিত্র্যের ওপরেই ঝোঁক বেশি। গল্পের মধ্যে কি আখ্যানভাগ থাকবে না?—মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু মানুষের মনের একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস, অথবা পুলকিত দৃষ্টির একটি পলক? আকাশবিহারী নারদের বীণাবিচ্যুত পারিজাতের আঘাতে ইন্দুমতীর জীবনান্ত হয়েছিল, কিন্তু তার শোকে অজরাজার বিলাপ, বেদনা কি কম মর্ম্মস্পর্শী না, সাহিত্যের আসরে ফুল বলে তার আদর কম হবে? আমার গল্পের বই ছলনাময়ীর মধ্যে আপনার দৃষ্টি পড়েছে কিনা জানি না। আমার কলম এবং মন স্থূল বলেই নাকি, আমি আখ্যান বৈচিত্র্য এবং মানুষের রূপের পক্ষপাতী। এ বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার কাছে জানবার বাসনা আছে এবং উত্তর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার নীরোগ প্রসন্ন স্বাস্থ্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি। ইতি—২৪ শে ফাল্গুন ১৩৪৩ [৮ মার্চ, ১৯৩৭]

ভক্তিপ্রণত:

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

তারাশঙ্করের বিরুদ্ধে সমালোচকপ্রবরদের একটি অভিযোগ ছিল তাঁর ভাষা নাকি নিতান্ত আটপৌরে এবং 'দুর্বল।' এর উত্তরে স্বয়ং তারাশঙ্করই বলেছেন, 'আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মতো নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হইনি। .....সে চর্চা করবার ঝোঁকও আমার জাগেনি। ...আমি আমার দেশের মানুষকে যতদূর জানি এবং আমি নিজেও সেই মানুষদেরই একজন বলে বেশ একটু খুঁতখুঁতে চিত্ত। সেই কারণেই বর্ণসাংকর্যকে পছন্দ করি না।' বীরভূমবাসী নিরক্ষর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ দাসও তারাশঙ্করের গল্প শুনে বুঝতে পারতেন বলে তারাশঙ্করের তৃপ্তি ছিল। এইসব সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্যির প্রতিও তাঁর ছিল বিশেষ আস্থা। কারণ এরা রামায়ণ-মহাভারতের মতো কাব্যও বুঝতে পারে। 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, 'দেশের ভাষায় লেখা বিষয় যদি দেশের মানুষই বুঝতে না পারে, তবে সে কেমন লেখা ?' একথা তিনিই বলতে পারেন, কারণ তিনিই সদর্পে বলতে পেরেছিলেন, 'আমার জোর, আমি তো জানি এদেশের মানুষকে, এই জোরেই এই জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি।' এই জোরটা সত্য ছিল বলেই ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মতো মানুষও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস থেকে বাউড়ীদের বিভাষা-উপাদান সংগ্রহযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। ১৯.১০.১৯৪৭-এর একটি চিঠিতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তারাশঙ্করকে লেখেন, "আপনার বইয়ে একটি জিনিস পাইলাম যাহা অন্যত্র পাইবার নয়, আপনি বাংলাদেশের আদিম যুগের মানুষের মনের একখানি নিখুঁত ছবি দিয়াছেন। ....ভাষানুসন্ধানীর কৃতজ্ঞতা—বাউড়ীদের ভাষার টুকিটাকি অনেক জিনিস পাইলাম যা কাজে লাগিবে—"

'ঘেঁষড়ে'-র মতো প্রাকৃত শব্দ আছে। আবার 'বাপু', 'বুয়েছ কিনা', 'কি বলে যেয়ে', 'বল্ দিকিনি' ইত্যাদি একান্ত রাঢ়ী এবং বীরভূমি বাগভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। বাগভঙ্গি চরিত্রকে তার ভাষিক বিশেষত্বসহ মূর্ত করে তোলে। তারাশঙ্করও তাই করেছেন তাঁর সাহিত্যে। খাঁটি বীরভূমকে পেতে গেলে তার মাটির কাছের মানুষের পরিচয় জানতে হবে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের ভাষা নিয়ে তারাশঙ্করের সচেতন শিল্পপ্রয়াস ছিল। উৎসর্গপত্রে কবিশেখর কালিদাস রায়ের উদ্দেশে লিখেছেন, 'সেখানকার মাটি, মানুষ তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত।' বস্তুত রাঢ়ী উপভাষা বলয়ের বীরভূমি বিভাষা এ উপন্যাসের কায়া নির্মিতিতে অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। বীরভূমি বিভাষার মধ্যে আবার কাহার জনগোষ্ঠীর বাস বাঁশবাদির ছোট্ট পৃথিবীতে। চন্নপুরও যাদের কাছে বাইরের পৃথিবী। গোষ্ঠীর মধ্যেই নবীন প্রজন্মের একাংশ ক্রমে সেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। তাতে বদলাচ্ছে ভাষাভঙ্গিও। বাইরের পৃথিবীর অভিজ্ঞতা যার সবচেয়ে বেশি সেই করালী ইংরেজি Time শব্দটিকে বিকৃত করে 'টায়েম' বলে, বনওয়ারিরা আরও সীমাবদ্ধ। তাদের বিকৃতি আরও বেশি। তারা বলে 'টায়েন।' ভাষাকে এখানে সামাজিক অবস্থানের সূচক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কথকের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। তাই উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রাখা হয় বীরভূমি বিভাষাগুলিকে। কখনও আবার কথক টীকাভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দেন কাহারদের ভাষিক স্বতন্ত্র্য।

(ক) "এ দেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালবাসাকে বলে 'রঙ।' রঙ নয় বলে 'অঙ।' ওরা রামকে বলে 'আম', রজনীকে বলে 'অজুনী', রীতকরণকে বলে 'ইতকরণ'...অর্থাৎ শব্দের প্রথমের র-থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ করে দেয়। ...শব্দের মধ্যস্থলে দিব্যি উচ্চারণ করে।"

(খ) "ওরা অ্যামোনিয়াকে বলে 'আলুমিনি', অ্যালুমিনিয়মকে বলে—'এনামিলি।' কাহাররা রসিকও বটে। কোনও মনিব বেশি জট পাকালে তাকে ওরা Code নাম দেয় 'পাকু মণ্ডল।' মোটা হলে 'হেদো মণ্ডল।' কাহাররা প্রশংসা করতে হলে বলে 'বাহা বাহা।' তেমনি আছে তাদের কান্না প্রকাশের বিশেষ ধরণ। উপন্যাসে তারও পরিচয় আছে। আছে প্রবাদ প্রবচন বাগধারার সমৃদ্ধ সম্ভার। 'কবি' উপন্যাসের গানের মধ্যেও বীরভূমি লোকভাষা ঢুকে আছে : 'হায় ! জীবন এত ছোট কেনে !' তারাশঙ্করের উপন্যাসে বীরভূমের ভাষার অযুত প্রয়োগ ঘটেছে, দৃষ্টান্ত দিয়ে ফুরোবে না। তার চেয়ে বরং দেখা যাক কীভাবে পাত্র-পাত্রীদের বাগভঙ্গিমার মাধ্যমে বীরভূমের ভাষাটি তাঁর সাহিত্যে রূপ পায়। হাঁসুলী বাঁকের নিমতেলের পানুর জবানি একটু উদ্ধার করা যাক :

'জান মুরুব্বি, কথাটা আমি বাপু, ভয়ে বলি নাই এতদিন। তা কথা যখন উঠল, বুয়েছ কিনা, আর কি বলে যেয়ে—কাণ্ড যখন খারাপ হতেই চলেছে, এখন আর......কি বল ? ...বনওয়ারি... ঘেঁষড়ে খানিকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছেন বল্ দিকিনি ?' এই অংশে 'ঘেঁষড়ে'-র মতো প্রাকৃত শব্দ আছে। আবার 'বাপু', 'বুয়েছ কিনা', 'কি বলে যেয়ে', 'বল্ দিকিনি' ইত্যাদি একান্ত রাঢ়ী এবং বীরভূমি বাগভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। বাগভঙ্গি চরিত্রকে তার ভাষিক বিশেষত্বসহ মূর্ত করে

তোলে। তারাশঙ্করও তাই করেছেন তাঁর সাহিত্যে। খাঁটি বীরভূমকে পেতে গেলে তার মাটির কাছের মানুষের পরিচয় জানতে হবে। বীরভূমের ভাষার পরিচয় পেতে গেলেও তার লোক-মানুষের কাছেই কান পাততে হবে। এটা অবশ্য সার্বজনীন-ভাবেই সত্য।

৪

বীরভূমের পরিচয় তারাশঙ্কর যেমন লোকভাষায় কান পেতে জেনেছেন তেমনি তাদের সংস্কৃতিরও পরিচয় নিয়েছেন সর্ব হৃদয় দিয়ে। তারাশঙ্করের বীরভূমে লোক ও গ্রাম্য সংস্কৃতির ব্যাপক রূপায়ণ ঘটেছে।

তারাশঙ্কর থেকেই আমরা বাংলা উপন্যাসে পেয়েছি নতুন দেশজ রীতি। এর আগের বাংলা উপন্যাস মূলত ইউরোপীয় মডেলে লেখা। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের অন্তর্বয়নে যুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন দেশজ এবং লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক, এ উপন্যাস যেন মনসামঙ্গলের পাতা থেকে তুলে আনা। সর্পসঙ্কুল বীরভূমে মনসামঙ্গল উল্লেখযোগ্য কাব্য। শবলা-পিঙ্গলারা যেন তার চরিত্র। ওই উপন্যাসে আগাগোড়া একটি ব্রতকথার উল্লেখ আছে—বেনেবেটির আখ্যান। বস্তুত, ওই ব্রতকথার বুননেই নাগিনী কন্যাদের জীবনের বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। খুব জানতে ইচ্ছা করে ওই ব্রতকথা প্রচলিত ছিল, না কি উপন্যাসটির মিথে যেমন তারাশঙ্কর লোকসম্ভব ভাঙচুর ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, এক্ষেত্রেও তাই করেছেন? লোকসমাজের নিজস্ব লোকপুরাণ থাকতেই পারে, তারাশঙ্কর সেখানে সম্ভাব্য লোকপুরাণ রচনাও করেছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', উপন্যাসের কালারুদ্দুর আসলে লোকায়ত শিবেরই আরেক রূপ। বীরভূমের ধর্ম নিরঞ্জনের সঙ্গে কালারুদ্র একাকার হয়ে গিয়েছেন। অমলেন্দু মিত্রের গ্রন্থে কালারুদ্র নামে কোনও ধর্ম দেবতার উল্লেখ পাইনি। তবে উপন্যাস থেকে মনে হয় মহাকাল, যিনি রুদ্র—তার যৌথ পরিচয় ওই মিথে লুকিয়ে আছে। অন্ত্যজ মানুষের কাছে এই মিথ সম্ভবপর।

ঘেঁটুগান, লোকগান, কবিগান, খনার বচন এইসব উপাদানগুলি বিভিন্ন উপন্যাসে সরাসরি এসেছে। ওয়াল্টার বেনজামিনের মতো দার্শনিক মনে করেন লোকজীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে সময়ের যে-চেতনা কাজ করে তা হল স্পৃশ্য সময়/ঋতুচক্র আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকমানুষ সেই সময়কালকে স্পর্শ করে সর্ব অনুভূতি দিয়ে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা জানতে পারে

'আষাঢ়ে রোপণ নামকে
শাওনে রোপণ ধানকে
ভাদুরে রোপণ শিষকে,
আশ্বিনে রোপণ কিসকে (পঞ্চগ্রাম)।

পৌষমাস লক্ষ্মীমাস। তারা ছড়া কাটে :

পৌষ-পৌষ—সোনার পৌষ।
এস পৌষ যেয়োনা—জন্ম জন্ম ছেড়োনা।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে,
স্বামীপুত্র ভাত খাবে কটোরা ভরিয়ে।.....(গণদেবতা)।

রুশ তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিনের কার্নিভাল তত্ত্বে আছে লোকজীবনের লোক উৎসব (Carnival) হচ্ছে আসলে অফিসিয়াল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একরকমের প্রতিবাদী করণ-কৌশল। সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গও তাতে চলে আসে। 'গণদেবতা'-য় জরিপ কর্মীদের অভব্য আচরণের প্রতিবাদে দেবু ঘোষের ভূমিকা এবং গ্রেপ্তার বরণ ঘেঁটুগানে এসে গেছে :

'দেবু ঘোষ বাঁধলে এসে পুলিশ দারোগা
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোড় কর গা
দেবু ঘোষ হেসে বলে না।'

দেবু ঘোষ মদ্যপান নিষেধ করলে তাও ঘেঁটুগানের বিষয় হয়ে ওঠে। আবার 'সাহেব রাস্তা বাঁধাইলে
ছ-মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে'

এইরকম সমসাময়িক সামাজিক রূপান্তরের ছবিও পাওয়া যায়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নিয়ে অন্য অধ্যায়ে অনেক কথা বলেছি। এই উপন্যাসেও ঘেঁটুগানের একটা বড়ো জায়গা আছে। করালীর সাপ মারা, কোঠাবাড়ি তোলা, কালো বৌয়ের মৃত্যু, এমনকী বনওয়ারির মনে 'রঙ' লাগা বিষয়ও ঘেঁটুগানের Folk Journalism থেকে বাদ যায় না। একজন তাত্ত্বিক লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'Folklore is the echo of the past, but it is the vigorous noise of the present.' বর্তমান কালের এই 'vigorous noise'-এর বহুস্বর তারাশঙ্করের উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। যে কলতানে মিশে থাকে 'তারাশঙ্করের বীরভূম'।

তারাশঙ্করের রচনাবলী ছাড়াও গ্রন্থঋণ স্বীকার করি—

১। তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য—
— সম্পাদনা : প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সাহিত্য আকাদেমি
২। Bengal District Gazetteers—Birbhum—
—L.S.S. O' Malley-1st Reprint : 1996
৩। তারাশঙ্কর শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি
—তারাশঙ্কর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি, লাভপুর
৪। তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ—তারাশঙ্কর স্মারক সমিতি
৫। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
৬। পশ্চিমবঙ্গ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা-১৪০৪
৭। ভাষা পরিচ্ছেদ—নির্মল দাশ
৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-৪র্থ খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন

লেখক : কান্দি রাজ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগের গবেষক।

বীরভূমকেন্দ্রিক কথাসাহিত্য

রবিন পাল

জঙ্গল-ভূমি বা বীর-ভূমি বা বীরজাতি ভূমি বা বীর রাজন্যভূমি হল বীরভূম। এর কথাসাহিত্য নিয়ে কিছু কথা বলতে হলে একটা সমস্যায় পড়তে হয়। কোন্ কোন্ কথা সাহিত্যিককে আমরা আলোচ্য করব। যাঁরা বীরভূমে জন্ম নিয়েছেন, বীরভূমেই কাটিয়েছেন, বীরভূম প্রসঙ্গ যাঁদের গল্প উপন্যাসে বেশি মাত্রায় শুধু কি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত করব। কিন্তু যাঁরা জন্মকর্ম সব কিছুতেই বীরভূমি অথচ লেখায় বীরভূম নেই তাঁদের কি হবে ? যাঁরা শুধু বীরভূমে জাত, কিন্তু শিক্ষা ও কর্মসূত্রে অন্যত্র কাটিয়েছেন, তাঁদের লেখা কি হবে ? যাঁরা বীরভূমে কোনো কালেই ছিলেন না। অথচ কাহিনি/প্রসঙ্গ সূত্রে বীরভূম এসেছে তাঁদের লেখায় সেগুলো কি করা হবে ? যাঁরা বিদেশি অথচ বীরভূমকে কাহিনির বিষয় করেছেন সেগুলো কি বীরভূমের সাহিত্য নয় ? এ সমস্যার নিরসন এক অর্থে সম্ভব—বীরভূমস্পর্শী লেখাই হবে আলোচ্য। তাহলে অসন্তোষ আসবে না। অন্যদিকে সুবিন্যস্ত তালিকা ও গ্রন্থাদি হাতে না পাওয়ায় প্রবীণ নবীন সব কথা সাহিত্যিকদের উল্লেখও অসম্ভব। এ ব্যাপারে অগ্রিম মার্জনা চেয়ে রাখি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ished product...'(An Acre of green Grass, P.93) রবীন্দ্রনাথের কিন্তু সোনা চিনতে ভুল হয়নি। তিনি বলেছিলেন—গ্রামীণ মানুষ নিয়ে তুমি যেমন লিখেছ সে রকম গল্প আমি আর পড়িনি। বলেছিলেন, 'তোমার 'রাইকমল' আমার মনোহরণ করেছে।' মন্তব্য করেছিলেন, যাঁরা তারাশঙ্করের কলমের স্থূলতা নিয়ে অপবাদ দেয়, তারা গল্প লেখার ভান করে। তারাশঙ্কর তাদের দলে নাম লেখায়নি দেখে তিনি খুশি হয়েছেন।

তারাশঙ্করের লেখায় বীরভূমের ভূপ্রকৃতি অমেয় বিচিত্রতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' শুরু হয় বীরভূমের বর্ণনায়। 'কালিন্দী'তে আছে রায়হাট 'গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা, অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে শালজঙ্গল, শালজঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে।' 'রাধা' উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই আছে অজয়ের দক্ষিণে বীরভূম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ শালবনের দীর্ঘ বর্ণনা। ধাত্রীদেবতার ২৫ এবং ২৭ অধ্যায়ে আছে তৃষ্ণার্ত এবং তৃষ্ণাতৃপ্ত বীরভূমি মৃত্তিকার কথা। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র গ্রাম প্রান্তের নদীটি ময়ূরাক্ষী (বক্রেশ্বর ও কোপাই মিলে কুয়ে, যা ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশছে) কালিন্দীতে যেমন ব্রহ্মাণী বা কালিন্দী যা সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। 'তামস তপস্যা'য় ঘটনা ঘটছে বীরভূম, তার পাশের শহরতলী, পল্লী, জনবিরল অঞ্চলে, বর্ণনা থেকে অনুমান গ্রামটি লাভপুর। হাঁসুলি বাঁকের উপকথার বাঁশবাদি গ্রাম, কোপাই নদীর খেয়ালি বন্যা, কাছে বাঁশবনের অন্ধকার, বনের জ্যোৎস্না, কোপাইয়ের দহ, প্যাঁচা ও তক্ষকের ডাক আজও কল্পনায় অনুভব করা যাবে। রাঢ় এলাকার নিচু জলা জমি হল হিজল, লেখক শুনেছেন হিজল বিলের কথা, যা বড় ভূমিকা নেয় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে। 'রাধা'র পটভূমি—অজয়ের তীরস্থ ইলামবাজার থেকে জনুবাজার গঞ্জ, এর পাশে কেঁদুলি ও বর্ধমানের শ্যামরূপার গড়, ইছাই ঘোষের দেউল—তবে ১৭২৬/২৭ থেকে ১৭৫৭ সময়কার। 'গ্রাম হইতে বাহির হইলেই বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ : দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল—প্রস্থে চার মাইল ; কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি...' (গণদেবতা) এরপর ময়ূরাক্ষী, 'অমর কুন্ডার মাঠ' প্রভৃতির কথা। ময়ূরাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এ উপন্যাসে, ঘটনা ও চরিত্র বিবর্তনে হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ।' 'ভূতপুরাণ' গল্পে লেখক বলছেন লাভপুর, ভূতপ্রেতের কথা, 'কবি'তে যেমন বোলপুর, কোপাই স্টেশনের সঙ্গে কবি গানের চঞ্চল জীবনযাত্রার অনন্য সম্পর্ক। তারাশঙ্করের রচনায় ভূগোল শুধু পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক উপাদান নয়, তা ঘটনা ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকেও স্পষ্ট করে তোলে।[২]

তারাশঙ্কর বলেছেন—'এদেশের মানুষকে জানার একটা অহঙ্কার ছিল !...এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল !...তাই আমি এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।' (আমার সাহিত্য জীবন) ছোট ছেলে সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলতেন—'বাবা যা দেখেননি, বাবা তা লেখেননি।' অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা থাকলেই বড় লেখক হওয়া যায় না। তার জন্য দরকার শিল্পজ্ঞান, যা তাঁর যথেষ্ট মাত্রায় ছিল। অনেক সময় তিনি দেখা চরিত্রকে নাম সমেত, কখনও বা পরিবর্তিত নামে ব্যবহার করেছেন। যেমন—স্বর্ণ (ডাইনি), শম্ভু বাউরি (ধাত্রীদেবতা), মাধু (তামস তপস্যা), বিপ্রপদ (দ্বিজপদ), নিতাই (সতীশ ডোম), রাজা (রাজা মিঞা), বণিক মাতুল (শ্রীপতি সিং) (কবি), ফটিক বৈরাগী (ললিন দাস) (শুকসারী কথা), জীবনমশাই (মাখন দত্ত) (আরোগ্য নিকেতন), নসুবালা (ভাদুর মা), পক্ষী (তমসা), ঠাকুরঝি (ভানুমতী) (কবি) পিসিমা (শৈলজা), মা (প্রভাবতী) (ধাত্রীদেবতা) ইত্যাদি একই চরিত্র ভিন্ন নামে অন্য গল্প উপন্যাসেও এসেছে। কখনও একই ধাঁচের মানুষ (যেমন—'শুকসারী কথা'র ভ্রুব ডাক্তার, 'গণদেবতা'র জগন ডাক্তার) অথবা একই ধাঁচের তান্ত্রিক ('ধাত্রীদেবতা'র রামজী, 'অরণ্যবহ্নি'র ত্রিভুবন)।

তারাশঙ্কর তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন তাতে গ্রামীণ ধর্মীয় ও সংস্কৃতিময় জীবন বড় জায়গা করে নিয়েছে। বৈষ্ণব জীবনের নানা প্রকার (রাইকমল,

রাধা), বাউল (ডাকহরকরা, রাইকমল), অসংখ্য কালীতলা (ভাঙা কালী, জয়ন্তীমঙ্গলা কালী, বুড়ী কালী, শ্মশানেশ্বরী, বাকুলের মা শ্মশানকালী) ও অনুষঙ্গ (ধাত্রীদেবতা, আরোগ্য নিকেতন), তান্ত্রিক চর্যা (অরণ্য বহ্নি, স্বর্গমর্ত্য, ছলনাময়ী), কর্তা ঠাকুর (ধর্ম ঠাকুর ও শিবের মিশ্রণ) (হাঁসুলি বাঁকের উপকথা), কালরুদ্র (ঐ) , ফুল্লরা বা অট্টহাস (কবি, কালান্তর), ধর্মরাজের জন্য মাটির ঘোড়া (গণদেবতা), গাজন, চড়ক (গণদেবতা, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা), চাঁপাডাঙার বৌ), ঘেঁটু (গণদেবতা), মনসা (নাগিনী কন্যার কাহিনী, হাঁসুলি বাকের উপকথা), গন্ধেশ্বরী (ভুবনপুরের হাট) বাণ গোঁসাই (গণদেবতা, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা), জলশয়ন (গণদেবতা), ইঁদ পূজা (চাঁপাডাঙার বৌ, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা), ভাঁজো (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা), সেঁজুতি (নীলকণ্ঠ, কালান্তর), ইতুলক্ষ্মী (গণদেবতা), পৌষ আগলানো (গণদেবতা) বাউনি বাঁধা (পৌষ লক্ষ্মী), নীলপূজা (গণদেবতা) ইত্যাদি। ধর্মীয় কৃত্য, দেব-মাহাত্ম্য, তার যে ডিটেল্স তা বীরভূমি সংস্কৃতিকেই প্রত্যক্ষ করে তোলে। এত নির্ভরযোগ্য ডিটেল, এত ব্যাপকতা আর কোনো কথা-সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায় না। ধর্মীয়তার পাশে আসছে শিল্প-সংস্কৃতির কথা—ঝুমুর (কবি) কবিগান (ঐ), আলকাপ (পঞ্চগ্রাম, চাঁপাডাঙার বৌ), বোলান, ভাসান, মেরাচিন (পঞ্চগ্রাম), রায়বেঁশে (পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, আরোগ্য নিকেতন, কালান্তর)। আর আছে নানা মেলার কথা। বীরভূমের মানুষের মধ্যে যে স্থান মাহাত্ম্যে বিশ্বাস তার পরিচয়ও ধৃত হয়েছে। যেমন—কদম খণ্ডীর ঘাটের মহিমা, ভুবনপুরের মাহাত্ম্য, লাভপুরের অলৌকিক অর্জুন গাছ, সায়েবডুবির দহ, শ্রীলাইকার দীঘি, সাওগ্রামের শিবনাথতলা, শেরিনা বিবির কবর, গুল মহম্মদ ঠাকুরের কবর, এক পা বাবা, মহানাগের মাঠ ও অশ্বত্থ, ময়ূরাক্ষীর শিকারী পাথর, আমূর্তির লড়াই, ব্যাঙের বিয়ে ও গান, বিজয়া দশমীতে গরুর দৌড় ইত্যাদি। কত্তার দহ, আইড্যা দীঘি, পাচুন্দির হাট, উদাসীর মাঠ, লা-ঘাটা, বাঁশবাদি, এই সূত্রে স্মরণ করা যায়। রাঢ়ের প্রবাদ প্রবচন, লৌকিক ছড়া ব্যবহৃত হয়েছে মানুষগুলির বিশ্বাস, আচার ফোটাতে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, গণদেবতা ভুবনপুরের হাট, কবি, পৌষ লক্ষ্মী প্রভৃতিতে

তারাশঙ্করের লেখায় বীরভূমের ভূপ্রকৃতি অমেয় বিচিত্রতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' শুরু হয় বীরভূমের বর্ণনায়। 'কালিন্দী'তে আছে রায়হাট 'গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা, অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে শালজঙ্গল, শালজঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে।' 'রাধা' উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই আছে অজয়ের দক্ষিণে বীরভূম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ শালবনের দীর্ঘ বর্ণনা।

এর পরিচয় আছে। বীরভূমি ভাষা ভঙ্গিমা তারাশঙ্কর যোগ্য দক্ষতায় চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন। অনেক স্থানিক ঘটনাকে প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে নিয়ে বিন্যস্ত করেছেন উপন্যাসে। যেমন কীর্ণাহারের বাবুদের বাড়ির ঘটনা (না), লাভপুরের কলেরা (গণদেবতা), সতীশ ডোমের জীবন (কবি), লাভপুরের মোদক পরিবারের ঘটনা (তামস তপস্যা), নিজ পরিবার জীবনের নানা ঘটনা (ধাত্রীদেবতা)।

এ তো গেল বহিরাঙ্গিক উপকরণ অধ্যয়ন, শুধু এটুকু কাহিনি বিন্যস্ত হলেই ঔপন্যাসিক মহৎ প্রতিপন্ন হন না। এই উপকরণসমূহকে লেখক কিভাবে অন্তর্গত সমস্যার সঙ্গে অন্বিত করতে পারেন, কিভাবে এই উপকরণ ও সমস্যা এক শিল্প-ন্যায়ে বিন্যস্ত হয় সেখানেই মহৎ ঔপন্যাসিকের সিদ্ধির ক্ষেত্র। তারাশঙ্কর সবক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের মিশ্রণে সফল। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেন—'তারাশঙ্করের আঞ্চলিকতা যেমন তাঁর উপন্যাসে প্যাটার্নকে গঠন করতে সাহায্য করেছে, তেমনি তারাশঙ্করের নৈতিক সিদ্ধান্ত এবং প্রশ্নাবলীও সেই প্যাটার্নের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পেয়েছে।' এবং 'শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করের পটজ্ঞান অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, অনেক বেশি ইতিহাস চেতনায় সমৃদ্ধ।' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ. ৩০০, ৩০৭) তাঁর সমাজবোধ এবং ইতিহাসের ছন্দজ্ঞানের সচেতন সামর্থ্যের ছোট্ট করে পরিচয় দেওয়া যাক।

প্রচলিত উপন্যাস কাঠামো আশ্রয় করে দেশজ উপাদানে এক দেশজ নাটকীয়তা গড়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসে। পুরাতন কাল ও নতুন কালের সংঘাতে তিনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আশ্চর্য সমগ্রতাবোধের পরিচয় দেন।" ১৯৪০ সালের জমিদারতন্ত্র, কৃষি, সংস্কৃতি বিনষ্টির চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দী নদীর প্রতীক পটভূমিতে। অহীন্দ্রর ভাবনায়, চর কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব, কলকারখানা গড়ে ওঠা, নতুন ইতিহাস রচনা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সবেরই পাশে থাকে নদী কালিন্দী। তিনি সোসিওলজিস্ট হিসেবে অনুশীলন করেননি, কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্বী অধ্যয়ন তাঁর গণদেবতা, পঞ্চগ্রামে ধরা পড়ে।

'ধাত্রীদেবতা' স্পষ্টত আত্মজৈবনিক, যাতে লেখকের শৈশব থেকে ১৯২০ পর্যন্ত জীবন উপলব্ধির কথা আছে। পিতা হরিদাস (এখানে কৃষ্ণদাস) মাতা প্রভাবতী (জ্যোতির্ময়ী), পিসিমা শৈলজা, গোঁসাই বাবা, রামতারণ মাস্টার, রামকিঙ্করবাবু, কমলেশ, কেষ্ট সিং, শম্ভু—এদের কেউ কেউ ভিন্ন নামে এলেও চরিত্র বদলায়নি। পঞ্চগ্রামের হিন্দু-মুসলমান সংঘাত সত্য ঘটনা, কৃষি অর্থনীতির ক্রম দুর্গতি, বঞ্চনার ক্রমবর্ধমানতা, জাতপাতের সংকট, জমি ও গোষ্ঠী বন্ধন থেকে পেটের দায়ে ছিটকে যাওয়া প্রভৃতি যা তাঁর প্রধান উপন্যাসে আছে তা সমাজ-ইতিহাস সমর্থিত। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে দেখব লেখক গ্রাম সমাজের তিনটি পরস্পর যুক্ত সম্প্রদায় দেখাচ্ছেন—গ্রামীণ ভদ্রলোক, কৃষক ও কারিগর, ভূমিহীন অস্পৃশ্য। সে তুলনায় হাঁসুলীবাঁকের সমাজ সম্পর্ক কম জটিল। কাহারদের নিজেদের দ্বন্দ্ব, সমাজ অর্থনীতির অভিঘাতে পুরোনো বিশ্বাস ও সংস্কারে আস্থা থাকা না থাকার দ্বন্দ্ব। কঙ্কনার ভদ্র গৃহস্থরা আত্মসম্মানে ডগমগ কিন্তু হাড়ি ডোমের মেয়েদের সঙ্গে রাত কাটাতে অনিচ্ছুক নয়, আর শ্রীহরির মতো পয়সা করতে থাকা লম্পটরা ভদ্রলোক হয়ে গ্রামের মাথা হতে চায়। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী স্বাভাবিক জীবন প্রবাহে ধাক্কা দেয়। ভদ্রশ্রেণীর চেতনার প্রথম বড় ধাক্কা বঙ্গভঙ্গে (১৯০৫) যা 'ধাত্রীদেবতা'য় বলা আছে। তারপর অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ, অল্পভাবে সাম্যবাদ। এই রাজনৈতিকতায় জীবনবোধ বদলায়, নেতৃত্ববোধ বদলায়। দেবু ঘোষ, বিশু তার বড় উদাহরণ। নিচুতলার মানুষের জীবনে শিক্ষা, শিক্ষা প্রভাবে রুচি বদল এসব কথা আছে অনেক উপন্যাসে, সবচেয়ে বেশি করে স্বর্ণ ও সীতারাম চরিত্রে তার পরিচয় মেলে। আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে স্বদেশবোধ, শিবনাথ চরিত্রের বিবর্তনে তা স্পষ্ট। কৃষি অর্থনীতির পরম্পরা নানাভাবে আসছে উপন্যাসে। দ্বারকা চৌধুরি ডেটিনিউ যতীনকে বলছে আগে বাছুর হলে লোকে দুধ বিলোত, পথের ধারে ফলগাছ বসাত, বিল খুঁড়ত। এখন আর সেদিন নেই। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ কামার পয়সা ছাড়া দা কুড়াল বিক্রিতে অরাজি হয়ে ময়ূরাক্ষীর ধারে গিয়ে দোকান দেয়। একদা চণ্ডীমণ্ডপ ছিল গ্রাম সমাজের সংহতি কেন্দ্র, নানা বাইরের চাপে সে কেন্দ্র ভেঙে যায়। দেবু ঘোষ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বসিয়ে এর বিকল্প করতে চেয়েছিল। আর একটা দিক—নিম্নবর্ণীয়দের যৌনতার আবেগ ও হিংস্রতা ও অনন্য উপায়ত্ব—নানাভাবে তুলে ধরেন তিনি। বিনয় ঘোষ একদা যথার্থই বলেছিলেন—'তাঁর গল্প উপন্যাস থেকে বাংলার গ্রাম্য সমাজ (বিশেষ করে রাঢ়ের) ও লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিখেছি ও জেনেছি, যা বহু পেশাদার ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদের বিবরণ থেকে শিখতে বা জানতে পারিনি।' (তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ, শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৭১) একেবারে হাল আমলের ঐতিহাসিকও একই কথা বলছেন Tarasankar Banerjee's fiction is rich mining for historians who wish to delve deep into the foundations of rural society in Bengal.',—(পূর্বোক্ত পৃ. ২৯৪)[৫]

☐ ত্রিশের দশকের বীরভূমি মহিলা সাহিত্যিক হিসাবে আশালতা সিংহের (১৯১১-৮৩) নাম মনে আসবে। তবে তাঁর জন্ম ও যৌবন কেটেছে ভাগলপুরে। বীরভূমের বাতিকার গ্রাম তাঁর শ্বশুরবাড়ি। পরবতীকালে সন্ন্যাসিনী আশাপুরী। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনায় রুচি প্রসারে তিনি একান্তই ব্যতিক্রমী। তাঁর 'অমিতার প্রেম' উপন্যাসটি মাত্র ষোল বছর বয়সে লেখা যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ জানান—'আশা খুব ছেলেমানুষ। লেখা এখনও দানা বাঁধেনি, তবে Seat is there.', বুদ্ধদেব বসুর চেষ্টায় তাঁর প্রথম দুখানা বই ছাপা হয়। লোকে বলতো বুদ্ধদেবই এই মেয়েলি নামে লিখছে। তাঁর সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক দিলীপকুমার রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অপ্রত্যক্ষত কল্লোলপন্থী লেখকরা। যদিও তুলকালাম বাধিয়েছিল শনিবারের চিঠি। 'অমিতার প্রেম' ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি বড় গল্পের সম্প্রসারিত রূপ যাতে রোমান্টিক মন নিয়ে প্রেমে পড়া, ভালো লাগা, প্রথম প্রেম, মন দেওয়া নেওয়ার স্পষ্ট নির্ভীক প্রকাশ। স্টাইল বুদ্ধদেবীয়—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও পরিমল গোস্বামী এমনই বলেন। বুদ্ধদেবের মতোই তিনি ঘটনার ঘনঘটার পরিবর্তে বিশ্লেষণের তীব্রতা, বর্ণনায় নব্য প্রতীক সন্ধানে আগ্রহী। দুজনেই আলডুস হাক্সলির ভক্ত। আশালতার গল্প-উপন্যাসে ওয়েলস, হাক্সলি, উলফ, রোলাঁ, প্রভৃতির প্রসঙ্গ উঠেছে, চরিত্রে তর্কপ্রবণ বুদ্ধিজীবিতার ঝোঁক লক্ষণীয়। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সহাবস্থান তাঁর লেখায়। পল্লীসমাজী বাতাবরণ থেকে পরিবর্তনের কথা 'পরিবর্তন' উপন্যাসে। নায়িকা উপনায়িকার বিদুষিতা, কর্মকুশলতা, মা পিসিমা ও আদর্শবাদী স্বামীর পারিবারিকতা, রোগ নিরাময়ে পল্লীর অসহায়তা ফোটে এই লেখায়। 'দুই নারী' উপন্যাসে সরোজ সুজাতার বিয়ে, মতবিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ, একই প্রেমপাত্র নিয়ে দুই সখীর বিরোধ, শিল্পী নীরেনের প্রেম ও একাকীত্ব আসে। চরিত্ররা রোলাঁ, ডস্টয়েভস্কি, টলস্টয় পড়ে, যুক্তি পাল্টা যুক্তি সাজায়। প্রেম ও বিবাহ দ্বারা প্রেমিক ও স্বামীকে এক করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে চরিত্রের মানসিকতায়। 'মুক্তি' উপন্যাসের পরিশীলিত নির্মলা এবং স্বামীর আত্মীয়বন্ধু পরিজন সমন্বিত পল্লী জীবনের সংস্কারবদ্ধ পরিস্থিতির মানসিক দূরত্ব আশালতার ব্যক্তিগত মনোবেদনার পরিচায়ক। লেখিকা দেখান অবোধ অবাধ পিতৃস্নেহ আদরিণী কন্যার মনোজীবন কিভাবে সঙ্কুচিত করে তোলে। তার অতি শীতল প্রেমহীনতায় স্বামী যামিনী গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হয়, দাম্পত্য সম্মিলনে যামিনীর বন্ধু মিখিল দৌত্য করে, শেষ পর্যন্ত পিতার

আশীর্বাদ পড়ে যামিনী ও নির্মলার ওপর কিন্তু তাদের কি হল বোঝা যায় না। 'অন্তর্যামী' বইয়ের সবকটি গল্পেই নারীর মনোবেদনা। নাম গল্পে স্বনির্বাচিত দাম্পত্যের মধ্যে স্বামী বন্ধুর তাকে কবিতার বই উৎসর্গ নিয়ে হাসি ঠাট্টা, ঘৃণা আছে। 'প্রেমে পড়া' গল্পের অলকানন্দা মনোবিলাসিনী নানামুখি চিন্তায় আগ্রহী। সে নরেশকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মবিভোর। 'অপমান' গল্পের দরিদ্র পুষ্প সংসার সৃজনে শিক্ষিত মনের পরিচয় দেয় ও তা দেখে বন্ধুর স্বামী অস্বস্তি ভোগ করে। আভা ও দীপেশের কলহ বাড়ে, প্রেমে যার শুরু, হিংসাত্মক রুচিহীন আক্রমণে তার বর্তমান। 'রমা' গল্পের দুঃসহ সেবাময়ী রমাকে খদ্যোৎ গান ও ছবি শেখায়, প্রেমের বিকাশ হয় আনুগত্য ও যত্নের স্পর্শে, কিন্তু রমার আত্ম উন্মোচন হয় না। এছাড়া ছিল আরও অনেক উপন্যাস ও গল্প। আশালতা বলেন—'আমার রচনার কাল ঠিক দশ বছর—ষোল থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স অবধি, তারপর আর লিখিনি।' রক্ষণশীল শ্বশুর পরিবার এসব পছন্দ করত না ('ক্রন্দসী' উপন্যাসের নায়িকা অভ্যাগত পুরুষের সামনে গান গেয়েছিল বলে স্বামীর কাছে ভর্ৎসিত হয়), রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলেনি। যা হোক লিখেছেন তখনকার অনেক বিশিষ্ট পত্রিকায়, পত্রালাপ ছিল রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, অতুল গুপ্ত, শৈলজা, বুদ্ধদেব প্রমুখের সঙ্গে। বুদ্ধদেবের 'যবনিকা পতন' এবং 'এরা ওরা ও আরও অনেকে' বই দুটি অশ্লীলতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন আশালতা। শ্রীকুমারবাবু আশালতার 'সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি প্রাধান্যে'র ও সুরুচিবোধের প্রশংসা করেছিলেন। আর লীলা রায় বলেন তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান ব্যাপার শিক্ষিত মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে অ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যা, শিক্ষিতা ও ফ্যাশনমগ্না নারীর সমস্যা। (A challenging Decade) আশালতা রিয়ালিজম বলতে বুঝতেন মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা—'রিয়ালিজম মানে যদি জীবনের ফটো তোলা হয়, হুবহু যাহা দেখিব তাহাই বলা এবং সব কথাকেই শেষ পর্যন্ত বলা তাহা হইলে বলিতেই হইবে, রিয়ালিজমের মাঝে কোথাও একটা বড় রকমের ভ্রান্তি আছেই।' (সাহিত্যে রিয়ালিজম / 'সমী ও দীপ্তি') এই বইটি 'পঞ্চভূত' শৈলীতে লেখা। সুরেশ মৈত্র বলেছিলেন মনোধর্মে আশা কল্লোল গোষ্ঠীর, বলার ভঙ্গি ওদের মতই লাউড ও হিস্টিরিকাল ও অলঙ্কারবহুল, তবে বিষয় আলাদা, তাঁর পদচারণা মেয়েদের ভুবনেই। তাঁর উপন্যাসে বিতর্ক আছে, তবে হুল নেই, আছে ফুলের সৌরভ। কিন্তু তখনকার রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে কি যৌবনের সবটুকু ধরা যায় ? অন্তত প্রধান কথা বলা যায় না। এই apolitical দৃষ্টি কল্লোল যুগের অভাবাত্মক দিক। (বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক)

আমার রচনার কাল ঠিক দশ বছর—ষোল থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স অবধি, তারপর আর লিখিনি।' রক্ষণশীল শ্বশুর পরিবার এসব পছন্দ করত না ('ক্রন্দসী' উপন্যাসের নায়িকা অভ্যাগত পুরুষের সামনে গান গেয়েছিল বলে স্বামীর কাছে ভর্ৎসিত হয়), রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মেলেনি। যা হোক লিখেছেন তখনকার অনেক বিশিষ্ট পত্রিকায়, পত্রালাপ ছিল রবীন্দ্রনাথ, বীরবল, অতুল গুপ্ত, শৈলজা, বুদ্ধদেব প্রমুখের সঙ্গে।

□ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (১৯০৪-৭৫) যিনি আসলে তারাদাস মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের নাকড়াকোন্দা গ্রামে যাঁর জন্ম ও মৃত্যু, যিনি এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় রচয়িতা কিন্তু আজ তাঁর কথা কোনো উল্লেখ্য আলোচনা গ্রন্থে নেই। আই এ পাশ, 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী, অনেক উপন্যাস লিখেছেন, চলচ্চিত্র হয়েছে তাঁর কাহিনী নিয়ে। শেষ বয়সে শ্মশানপ্রিয়, অধ্যাত্ম আদর্শে আগ্রহী। তাঁর উপন্যাসগুলি সাদামাঠা গল্পরসে ভরা, চরিত্রগুলি বাস্তব, কিন্তু সমাজ অর্থনীতির যে চলিষ্ণুতায় উপন্যাস হয়ে ওঠে জীবন জিজ্ঞাসার স্মারক, তা তাঁর অনুধ্যেয় নয়। 'ভাগীরথী বহে ধীরে' অজয় নদী ও ১৯৫০ সালে গ্রামীণ মানুষের খাদ্যাভাবের বর্ণনা দিয়ে শুরু। অজয়ের ওপারে হাউই জাহাজের ইস্টিশন, যেখানে দেহবিকিয়ে চাল আটা আনে বারুনী ও ময়না। পুণ্যি নয়, সতিত্ব নয়, বাঁচাটাই প্রধান। পাণ্ডবেশ্বর মন্দির, ঝুলনের মেলা, রূপসা গ্রাম এসব আছে, ভাবারীতির আঞ্চলিকতাও আছে, গান আছে। একদিকে সায়েব ও ঠিকাদারদের দেহভোগ, বাড়ি নিয়ে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি অন্যদিকে লাইনের ওপাশে জোলভাঙা কলিয়ারিতে শ্রমিক ধর্মঘট—কিন্তু এসব সুসামঞ্জস্য হয়নি। রাজু ঘরামি, এখন বেকার, বোন ময়নাকে বাবার মতই ভালোবাসে। খবরের কাগজের চাকুরে তারণ কলকাতায় আর তার বৌ গ্রামে খাদ্যাভাবে বিপন্ন। রাজু তারণ ঠাকুরের লেখা 'কদম ফুল' বইটি পড়ে বিভোর, যেখানে আছে জ্যান্ত মানুষকে কুকুর শেয়ালে ছেঁড়ে, স্বামী পালায়, শরীর দেখিয়ে যুবতী পয়সা, খাবার চায়। ঈশানকে গোভূতে ধরেছে, তার বৌ তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। গুপীর রক্ষিতা কুন্তী রাজুর কাছ থেকে চাল কেড়ে নেয়। জীর্ণ, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিহীন মাখন সক্ষম ছেলের মৃত্যুতে বিহ্বল। এদিকে ময়না

গর্ভবতী, বারুণীর প্রতি দোকানি নাটুর লালসা, রিলিফের কাপড় নিতে তারণ ঠাকুরের বৌয়ের অস্বীকৃতি—এই তিন ব্যাপার চাঞ্চল্য আনে। ময়নার প্রসব হল, শিয়াল কুকুরে খেল ময়নাকে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া হল না রাজুর। শালনদী, সারসা এবং দুর্ভিক্ষ আঞ্চলিকতা ও দুর্ভিক্ষ বাতাবরণ নির্মাণে লেখকের সাফল্য এনেছে অতিনাটকীয়তার মধ্যেও। ভাগীরথী সব পাপ ধুয়ে দেবে একদিন এই হল অন্তিম প্রতিবাদ্য। 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' রোমান্টিক উপন্যাস, তবে কয়লাখনির পটভূমি। বেশ কিছু অংশ আছে যেখানে কয়লা খনির বর্ণনা—যদিও খনিজীবন, শ্রমিক জীবন নেই। কোলিয়ারির কর্মী অজিতের বোন চম্পা বেড়াতে এসে সুঅভিনেতা সুখেলোয়াড় নিমাই এর সঙ্গে খনি দেখতে যায়। নিমাই খাদে পড়ে অজ্ঞান হয়, চম্পাকে অন্য লোকে উদ্ধার করে, কিন্তু কুৎসা ছড়িয়ে যায়। অগত্যা নিমাই চাকরি নিয়ে অন্যত্র যায়। চম্পা বিয়েতে অনাগ্রহী, ঈশ্বর বিশ্বাসী কিন্তু বিগ্রহ পূজায় আস্থা হীন। কল্যাণেশ্বরী, পরেশনাথ, ডি ভি সি বাঁধ বেড়ানোর কথা আছে গল্পে। শেষ পর্যন্ত অজিত অরুণা সুধীর শৈলর বিয়ে হল। অনুতপ্ত চম্পা ও নিমাইয়ের বিয়েতে গল্প শেষ। ইচ্ছা পূরণের গল্প। 'প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে চরিত্রগুলির মাথামুণ্ডু নেই। রোচনা, ডোরা, আত্রেয়ী ও নায়ক—প্রেম নিয়ে খেলে, নাস্তিক্য ও আস্তিক্য, হঠাৎ হঠাৎ ভালোবাসা আসে যায়। সে তুলনায় 'সন্ধ্যারাগ' (চলচ্চিত্রে 'শাপমোচন) খানিকটা সহনীয়। বীরভূম বা কলকাতা নামত থাকলেও উপন্যাসে তার কোনো গুরুত্ব নেই। হেতমপুরের ছাত্র মহীন বাবার বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে চাকরির খোঁজে আসে। তার ভাইপো প্রীতির আতিশয্য এবং বড়লোকের আদুরে মেয়ের 'হঠাৎ প্রেম' দুটোই আমাদের স্থিতাবস্থা ও প্রেমলিপ্সার সন্ধি স্থাপন করে। মহীন হঠাৎ করে সেতার বাজানো, গল্প রচনা, আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতায় তুখোড় হয়ে ওঠে কিভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু প্রেম বিয়েতে পর্যবসিত হয় না, দূরত্ব ও সেবাধর্মে গল্প শেষ হয়। যুদ্ধের বাজারে বাংলা বইয়ের কাটতি বেড়ে যাওয়া, গল্প লিখে টাকা, ইনফ্লেশন, চৈত্রসংক্রান্তি এইসব উপকরণের সদ্ব্যবহার হয়নি। ভূমাতত্ত্ব এবং মেয়েরা দু'জাতের ইত্যাদি রবীন্দ্র-তত্ত্ব উপন্যাসের গৌরব বাড়ায়নি মোটেই।

☐ সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২)-এর জন্ম বোলপুরের খুব কাছে রায়পুর গ্রামে। তাঁর পিতৃকুল ঘোরতর শাক্ত, মাতৃকুল ঘোরতর বৈষ্ণব, যদিও তাঁর শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মীয়তা আদৌ কোনো নিয়ন্তা রূপ পায়নি। সজনীকান্ত শনিবারের চিঠির সম্পাদক, গবেষণা, গ্রন্থ সম্পাদন এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস / বড় গল্প চার পরিচ্ছেদের 'জয় পরাজয়' যার নায়ক মোহনলাল শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাস লাভ করে যে দেবত্বের কাছে পশুত্ব পরাজিত হবেই। লেখক 'আত্মস্মৃতি' (১ম) তে বলেছেন, এর বাঁধন অতি চমৎকার, বাঙালি ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনায় কৌতূহল জাগ্রত থাকে। স্কুল পত্রিকায় গল্প লিখেছিলেন স্বপ্নদর্শনমূলক—'স্বপ্নভঙ্গ।' 'অজয়' (১৯২৭-২৮) উপন্যাসটি লেখার সময় এই স্বপ্নবিভোরতা, যৌন ও সাহিত্যজীবন তফাৎ না করার ব্যাপারটা, আদিরস শিল্পী জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সৃজনে কিভাবে অনিবার্য তা মাথায় আসে। এভাবেই 'জীবনের খরস্রোতে' নামে লেখা শুরু, যার প্রথম কিস্তি—'ডলি'—অচিন্ত্য'র 'বেদে' মনে করিয়ে দেয়। 'অজয়'-এর নায়ক 'সে' (অরুদা) যার তীব্র অনুভব, কাব্য প্রয়াস, পাঠ্যপৃহার পরিপার্শ্বে আসে ডেজি ও ডলি। এদের স্পর্শে কবিত্ব ও যৌনতার স্ফুরণ। ডেজির অকালমৃত্যু নায়কের মনে চিরশ্মশানবোধ জাগায়, বারে বারে ফিরে আসে শ্মশানের প্রসঙ্গ। ডলি, রেণুর সঙ্গে প্রেম, প্রেমের অগ্রসরমানতায় দ্বিধা, তাদের বিয়ে করে সংসারে প্রবেশ—এসবের ফাঁকে আছে নায়কের কবিতা ও প্রেম অনুভবের বিকাশ। সে প্রেম পরিবেশকে অনুভব করতে চায়, স্বপ্ন জগতে ভেসে যায়, কিন্তু কোনো এক নারীর প্রতি সমর্পিত হয় না। একটা মৃত্যুবোধ সদাই কাজ করে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে না করেই অরু বিমলাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। অনেক কটু কথা শুনতে হয় দুজনকেই। বিমলা অন্তঃসত্ত্বা হলে ডলি, রেণু, বিমলা সকলেই ভাবে এ তাদের যৌথ সন্তান। অরু এ ছেলের নাম রাখে অজয়। সজনী আধুনিকদের রচনা ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন কিন্তু খানিকটা লেখার পরেই নিজ প্যাঁচে নিজে ধরা পড়ে যান। এ তাঁরই কথা। অতীব রোমান্টিক এবং কবিতায় পূর্ণ বলেই প্লটের ঐক্য মেলে না, মাঝে মাঝে অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ উপন্যাসটির ন্যারেশনের ভাষা অভিনব, সেকালের বিচারে যথেষ্ট আধুনিক, প্লটের ধাঁচ খানিকটা বুদ্ধদেবকে স্মরণ করায়, যদিও উন্মোচনের ভঙ্গি স্পষ্টত ভিন্নধর্মী। ছোট ছোট অনুচ্ছেদ। মাঝে এক কিংবা তিন চার

অনেক উপন্যাস লিখেছেন, চলচ্চিত্র হয়েছে তাঁর কাহিনী নিয়ে। শেষ বয়সে শ্মশানপ্রিয়, অধ্যাত্ম আদর্শে আগ্রহী। তাঁর উপন্যাসগুলি সাদামাঠা গল্পরসে ভরা, চরিত্রগুলি বাস্তব, কিন্তু সমাজ অর্থনীতির যে চলিষ্ণুতায় উপন্যাস হয়ে ওঠে জীবন জিজ্ঞাসার স্মারক, তা তাঁর অনুধ্যেয় নয়।

শব্দের ক্রিয়াহীন এক বাক্য—অশ্রুত গতি সৃষ্টি করে। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্র প্রভাব এড়ানো যায়নি। শ্রীকুমারবাবু এটিকে আত্মজৈবনিক বলেছেন, সেটা জীবনতথ্যে প্রমাণ হয় না। (অবশ্য লেখক বলেছেন—'এ আমার নিজেরই কবি জীবনের কাহিনী') এর সাংকেতিকতা ঠিকই ধরেছেন তিনি, কিন্তু এ বই পথের পাঁচালি ও অপরাজিত উপন্যাসের স্টাইলে লেখা বললে ভুল হবে। সজনীকান্ত আর উপন্যাস লিখলেন না। ব্যঙ্গ তাঁর স্বপ্নালু চরিত্র সৃজনকে শেষ করে ফেলে। এক সময় তিনি অনুভব করতে পারেন—'ব্যঙ্গে বা স্যাটায়ারে আমি মর্মান্তিক হইতে পারি' তবে এ ব্যঙ্গ ঈর্ষা প্রণোদিত নয়। সাহিত্য সংস্কারে আঘাত লাগলে প্রত্যাঘাত। নানা ছদ্মনামে সজনী বহু ব্যঙ্গ গল্প / রচনা লিখেছেন যার কিছু আছে 'মধু ও হুল' বইটিতে। তিনি দুটি বারোয়ারি উপন্যাসের (কো-এডুকেশন, ১ম অধ্যায়, পঞ্চদশী, ১৩শ অধ্যায়) অধ্যায় লেখেন। আর একটি বারোয়ারি উপন্যাস 'অতিক্রম'-এর ৩য় অধ্যায় তাঁর লেখা। শেষেরটিতে লেখক লেখিকারা সবাই 'ভূত' নাম নিয়েছিলেন, সজনী হন—মেঠোভূত। ব্যঙ্গ কবিতা ও ব্যঙ্গ কাহিনী অনেক সময়ই সময়ের অর্থনৈতিক, ভাবনৈতিক, পারিবারিক সঙ্কটের সঙ্গে সম্পর্কিত, কখনও ব্যক্তি বিশেষের কথা, কখনও গোষ্ঠীর রচনা বৈশিষ্ট্য যেমন—পরশুরামের তেজো হরণ (রাজমহিষী গল্প নিয়ে), Orion বা কালপুরুষ (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্য), নরেশ নিকষ (উক্ত লেখকের ভাষা ও শৈলী), উটরাম সাহেবের টুপি (নিষ্ক্রিয় পরাধীনতা বোধ এবং সাময়িকপত্রের গালভরা কথা), পরকীয়া সঙ্ঘ (কল্লোলীয় প্রেম উপাখ্যান) রামদাদার হাসি (বিপ্লবী বারীন্দ্রের পণ্ডিচেরীতে ভাবান্তর), রক্তজবা (রক্ত জবা চাষে পরাধীন মাতৃকা বন্দনা) ইত্যাদি। এ লেখাগুলির বৈশিষ্ট্য হল—এতে গল্প রস বেশ খানিকটা বজায় রেখে, পরিবেশ পরিস্থিতি সৃজন করে তিনি আক্রমণ উদ্যত হয়েছেন। রচনান্তে একটা আকস্মিক ধাক্কা আছে। গদ্যপদ্যে মেশানো লেখায় আক্রান্ত লেখকের স্টাইল তিনি চমৎকার ধরেন, ব্যক্তি ছাপিয়ে সমাজ আসে বলে রচনাগুলির পাঠযোগ্যতা পরবর্তীকালেও হারায় না।

☐ ননী ভৌমিক ছিলেন সিউড়ির মানুষ, যদিও রাজনীতি ও অন্যান্য কর্মে বহুদেশের। একটাই তাঁর উপন্যাস (পরিচয়-এ তিন চার বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত), গল্পগ্রন্থ চারটি—ধানকানা, আগন্তুক, পূর্বক্ষণ, চৈত্রদিন। চার ভাগে বিভক্ত উপন্যাসটির পটভূমি বীরভূমের এক মফস্বল শহর, যেখানে গান্ধীজীর ৩২-র আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভগৎ সিং সূর্য সেন প্রাণিত সশস্ত্র আন্দোলন জন্ম নেয়। সময় ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯৪০-৪১, একটা বিশেষ সময়কে নায়ক করে তোলার চেষ্টা, আর ঘটনাবর্তগত চরিত্রগুলি যেন তার উপমান। ধুলো ভরা মফস্বলে নতুন সংসার রামচন্দ্র চৌধুরির, যিনি বীরুর ঠাকুর্দা। বীরুর দাদা শিবু স্কুলের উঁচু ক্লাসে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে যায়, ম্যাট্রিকে ফেল করে, জেলে যায়, বাইরে এসে আবার জেলে। ছোট ছেলে বীরু পরিবারের এই ভাঙনের মধ্যে স্কুল করে, ম্যাট্রিক পাশ করে, পয়সার অভাবে কলকাতার কলেজে পড়তে যেতে পারে না, শেষে ইয়াসিন জাহাজির সঙ্গে কাউকে জানান না দিয়ে পাড়ি দেয়। এ উপন্যাসে দেখানো হয় অর্থনীতি ও সমাজে ফাটল, চাষীর নিঃস্বতা, জোতজমির নীলাম, ধানের দর পড়া, খাজনা দেবার অক্ষমতা, জেলখানায় বন্দীদের ওপর অত্যাচার। সরল সত্যাগ্রহী সত্যবাবু, প্রায়-বৃদ্ধ রমেশ দা, স্বপ্নভ্রষ্ট জ্যোতি, রবীন্দ্রভক্ত মোহিনী, এরা বোঝে লড়াই শুরুর অনিবার্যতা। রিনি সুজিত রায়বাহাদুরের ভিখিরি বনে যাওয়া, জগা বাউড়ির দিদির বেশ্যা বনে যাওয়া, অন্যদিকে স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েকে নার্সিং শিখিয়ে মোহিনীর উদ্বুদ্ধ করা—অস্ত্যর্থক নঞর্থক দিক পাশাপাশি। শিবু স্বদেশী হওয়ার অপরাধে স্বামী পূর্ণচন্দ্রের চাকরি যায়, মোহিনী সেলাই ফোঁড়া নিয়ে লড়াই এ ঝাঁপায়। এ সবেরই দ্রষ্টা বীরু, যে উন্মুক্ত সংগ্রামের মুখোমুখি। একটি পরিবারের তাণ্ডবে দেশ এবং মোহিনীর কর্মিষ্ঠতার সূত্রে মেয়ে জীবনের নানা মাত্রা, সত্যবাবু মারফত পুরোনো রাজনীতি ফুটিয়ে তোলেন নতুন এক ভাষায়। স্বদেশ জিজ্ঞাসার বিশিষ্টতায় জন্য দেবেশ রায় এ উপন্যাসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

'ধানকানা' গল্পগ্রন্থের পটভূমি পঞ্চাশের মন্বন্তর, গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ 'হটাবাহার' গল্পে চা বাগানের শ্রমিকদের শোষিত জীবনে আকালের দুর্বিপাক। প্রসঙ্গত আসে চোরাবাজার। একটি দিন ১৯৪৪'-এ মন্বন্তর পরবর্তী অবস্থা, কয়েকটি ঘটনা সমন্বয়, তবুও সংবাদধর্মী বলা যায় না। এতে আছে ওষুধে ভেজাল, মড়ক চিত্র, অসহায় মানুষের কষ্ট ও কুসংস্কার। 'খুনীর ছেলে' পরাজিত দরিদ্র শোষিত মানুষের গল্প। ছোট ভাগচাষীদের গল্প 'কেলে পাথারী'। ভাষার মধ্যে আঞ্চলিকতাকে ধরার চেষ্টা আছে। রুশ সাহিত্যের অনুবাদকসত্তা তাঁর কথাসাহিত্যসত্তাকে শেষ করে দেয়।

☐ প্রগতি শিবিরের লেখক তপোবিজয় ঘোষের ছাত্র জীবনের একাংশ কাটে সিউড়িতে। এখানেই মার্কসবাদের পাঠগ্রহণ, সংগ্রামী জীবনের দীক্ষা ডাঃ শরদীশ রায়ের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে দুটো বছর কাটিয়ে আবার সিউড়ি, এটা ওটা সেটা করতে করতে সিউড়ি কলেজে অধ্যাপনা, ৬২'র ডিসেম্বরে রাজনৈতিক কারণে ছাঁটাই, তারপর কাটোয়া কলেজ ও শেষে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ। তাঁর গল্প উপন্যাসে বহু স্থানে সিউড়িকেন্দ্রিক গ্রাম মফস্বলের জীবন চিত্রায়ন, পাশাপাশি কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক অভিজ্ঞতা। কথাসাহিত্য ছাড়া তার একটি গবেষণাধর্মী পরিচয়ও সুধীজনের কাছে স্বীকৃতি

পেয়েছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—সামনে লড়াই (যা বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত), রাত জাগার পালা। উল্লেখযোগ্য গল্পের অনেকগুলিই আছে 'কাল চেতনার গল্প' দুটি খণ্ডে ও উল্লেখযোগ্য গল্পের অনেকগুলিই আছে 'কালচেতনার গল্প' দুটি খণ্ডে ও 'ইতিহাসের মানুষ'-এ। তাঁর গল্প উপন্যাসে আছে একটা কালের তরঙ্গক্ষুব্ধ সমাজ রাজনীতির পরিবেশ, খাদ্য আন্দোলন যুক্তফ্রন্ট, নকশালবাড়ি, বাহাত্তরের সরকারি সন্ত্রাস, জরুরী অবস্থা ইত্যাদি। 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা' গল্পে তিনি বলেন—'নিজের হাতে বোমা হয়তো কোনদিন বানাতে পারব না। কিন্তু মানুষের গল্পের মধ্যে বোমার আগুন এখন থেকে আমি ভরে দেব।' চরিত্রের এই উক্তি থেকে প্রচ্ছন্ন লেখকের সংগ্রামী দায়বদ্ধ মানুষটিকে ধরা যায়। এ গল্পের অধ্যাপক, খোয়াড় গল্পের তরুণ রাজনৈতিক সংগঠক, সামনে লড়াই, রাত জাগার পালা, চালচিত্র, দহন দাহন প্রভৃতির আদর্শবান সংগ্রামী তরুণ, 'ইতিহাস' গল্পে বিবেক ও প্রলোভনের দ্বন্দ্বে জর্জর অধ্যাপক এ সবই লেখক চরিত্রের প্রতিবিম্ব। অন্যদিকে 'এখন প্রেম', ভালবাসার চালচিত্র, রক্ত বিষয়ক প্রভৃতি গল্পে প্রেম আপাতভাবে প্রধান মনে হলেও সংগ্রাম সে প্রেমকে দেয় জঙ্গমতা ও বিশিষ্টতা, প্রেমিক প্রেমিকা সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় থাকে। শিল্পী ও বামপন্থী কর্মী জীবনের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু মৃত্যু তার পূর্ণতায় বাদ সাধে।

□ মার্টিন কেম্পশ্যোন গত ৩২ বছর ভারতবর্ষে এবং গত ১৯ বছর শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। শান্তিনিকেতনের কয়েক মাইল দূরে সাঁওতাল পল্লী ঘোষালডাঙা গ্রামে মানুষ-জনের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, চরিত্র শোধন ইত্যাদি কাজে তিনি যুক্ত হয়ে আছেন এই দীর্ঘ সময়। কেম্পশ্যোন একজন প্রখ্যাত অনুবাদক, উপন্যাস ও গল্প রচয়িতা। তাঁর কথা সাহিত্যের বিষয় বীরভূম ও বীরভূমি জীবন, তাই তাঁর রচনার কথাও বলতে চাই। ১৯৯৯ সালে জার্মান ভাষায় তাঁর যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে তাঁর নাম 'বাঁশি বাজিয়ের রহস্য গান।' এর স্থানিক ভূমি ঘোষালডাঙা ও বোলপুর। দুটি চরিত্র প্রধান—সোনা মুর্মু এবং বিমল। বিমল দিনমজুর, বোলপুরে কাজ, গ্রামে আসে, ভালো বাঁশি বাজায়। সোনা সিরিয়াস ছেলে, কলেজে ঢুকতে, গ্রামের জন্য কিছু করতে চায়। বিমল হাল্কা চলে, ইচ্ছানুযায়ী চলে আর বাঁশি বাজায়। চরিত্রগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব। উপন্যাসে একের পর এক পরিস্থিতি সৃজিত হয়। যেমন—সোনা কলেজে ঢুকতে চায়, বোলপুর কলেজে অধ্যক্ষের কাছে যায়, যিনি রাজনৈতিক নেতা। শিক্ষিত অশিক্ষিতের কথা বলার সমস্যা ওঠে। আবার মিলন নামে একটি ছেলে অসুস্থ হলে গ্রামের লোক ওঝা ডাকে কিন্তু সোনা ওকে নিয়ে চলে শিয়ান হাসপাতালে। এই হাসপাতাল, এর পরিস্থিতি বর্ণিত হয়। মিলনের মৃত্যু, গ্রামে সৎকার, অনুষ্ঠান। বিমল বিয়ে করবে, মেয়ে দেখতে চলে, বিয়ের অনুষ্ঠান বর্ণিত হয়। স্বাধীনতা প্রিয় বিমল সংসারে মন নেই, ফলে সংসারে ঝঞ্ঝাট আসে। হিন্দুগ্রাম শ্রীচন্দ্রপুরের কয়েকটি ছেলে সাঁওতাল গ্রাম ঘোষালডাঙায় দিনমজুরি করতে আসে। গ্রামের মেয়েদের দিকে কুদৃষ্টির অভিযোগে একটি ছেলে অভিযুক্ত। এ নিয়ে পঞ্চায়েত, বোলপুর থানা ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়। সোনার নেতৃত্বে ছেলেরা থানায় এসে জানায় ভুল বোঝানো হয়েছে, ছেলেটা দোষী নয়। বিমল থানায় এসে বাঁশি বাজাতে শুরু করে, সবায়ের মন বদলাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওসি অভিযোগ তুলে নেয়। শেষে বিমলের দাম্পত্য জীবন শুরু, কিন্তু সোনার যক্ষ্মা রোগ হয়। উপন্যাসটি সরল বিন্যস্ত, এর গুণ সাম্প্রতিক জীবনের বস্তুসম্মত পর্যবেক্ষণ। এখানে বিশেষ জ্ঞাত না হলেও জার্মানীতে উপন্যাসটির ২য় সংস্করণ হয়েছে, ৪।৫টি সংকলনে এর অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর ছোট গল্পের বই—'মধু বিক্রেতা' (১৯৮৬), 'গরীবদের সঙ্গে বসবাস' (১৯৯১), সাপের কামড় (১৯৯৮)। প্রথমটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন উইলিয়ম রাদিচে। গল্পগুলি অধিকাংশত লেখকের ঘোষালডাঙা অভিজ্ঞতাভিত্তিক, যদিও প্রথম বইটির মধ্যে কল্পনার আধিক্য যেখানে বীরভূমের গ্রামীণ মানুষের শ্রীকৃষ্ণ, কালি প্রভৃতি দেব-দেবীতে, পুরাণ কাহিনীতে, কুসংস্কার ও ভক্তিভাবে বিশ্বাসের কথা আছে। একটি গল্প পুরীর জগন্নাথ নিয়ে, বাকি সবই বীরভূমের গল্প। সরল সহজ বিন্যাস, চরিত্র প্রধান, গল্প, লেখক সমাজ-আবহ তুলে ধরতে চান জার্মান, ভারতপ্রীত মানুষজনের কাছে।

□ বীরভূমের গৌণ কথাসাহিত্যিকদের মূল্যায়ন বর্তমান লেখকের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও অসম্ভব। কারণ—সংকলন ও গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ না পাওয়া। মানিক চট্টরাজের দুটি বই হাতে এসেছিল। এর মধ্যে 'অভিমানী' উপন্যাসটি 'বারো মাস' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৮১-৮২), বা লাভপুর সন্নিকটে একটি গ্রামের দুর্গত অন্ত্যজ মানুষের গল্প। অভিমানী এক অবিবাহিত, দরিদ্র যুবতী, ডাইনি সন্দেহে নিগৃহীত, বারবণিতা হিসেবে ব্যবহৃত। এর পাশে হাঁসা ও তার দাম্পত্য ট্রাজেডির কথা। যৌনতা নিয়ে একটুও বাড়াবাড়ি নেই, ক্ষুধার কাছে তা পরাভূত। সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, দীনতা, কচিৎ ফুঁসে ওঠার মুহূর্তে বোঝা যায় লেখক সমসাময়িক আর্থসামাজিকতা বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। দু' একটি স্থানিক উল্লেখ, দু' একটি আঞ্চলিক গান, মেলা, সংস্কার, ভয় প্রভৃতি অঞ্চল সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রমাণবহ। উপন্যাসে লেখকের জবানী অংশ কিঞ্চিৎ ভাবা বিষয়ে গতানুগতিক, কিন্তু অভিমানী ও হাঁসা তাদের জীবনের কথা বলে বীরভূমি উপভাষায় আর গ্রামীণ প্রজা ধৃত

হয় প্রবাদ ধরনের বাক্যাংশে। এক্ষেত্রে শ্রীচট্টরাজের দক্ষতা ও দাপট বিস্ময়কর। 'সুখময়ের স্বপ্ন' গল্পগ্রন্থের সবকটি গল্পেই এক চরিত্র প্রাধান্য। 'হারাঠাকুরের বিয়ে', বৃদ্ধের তরুণী বিবাহের লালসা নিয়ে আর 'কিংকরের ফলার' দরিদ্র খাদ্যলোভী কানা কিংকরের রবাহূত ফলার খেতে গিয়ে বিপর্যয় নিয়ে। তার মৃত্যু হলে বৌ সোনামুখী লুচি পায়েস করে পারলৌকিক অনুষ্ঠান করে, কুকুরকে মৃত স্বামী পুনর্জীবিত ভেবে সমাদরে খাওয়ায়। 'সুখময়ের স্বপ্ন' গল্পের সুখময় ধানভানা মায়ের ছেলে, নকশালদের সঙ্গী, পুলিশের গুলিতে মৃত্যুতে গল্প শেষ। মধ্যে আছে কর্মীদের অন্তর্কলহ, পুলিশকর্তাদের নিয়ে মস্করা। 'পুরন্দরপুরের ডায়ার সাহেব' গল্পেও নকশাল পটভূমি। পুরন্দরপুরের সম্পন্ন চাষী গুণধরকে প্রোটেকশন দিতে গিয়ে কনস্টেবল অর্জুন ও শ্যামাচরণ মদ খেয়ে মাতাল হয়। ডাকাত লুটপাট করে এদের মারধোর করে যায়। এরপর ফাঁকা আওয়াজ করিয়ে তীর মেরে আহত করিয়ে বড়বাবু এদের শাস্তির পরিবর্তে শৌর্যচক্র পাবার ব্যবস্থা করেন। এম এল এ, পার্টি ও সরকারের একত্র গঠন, থানার বড়বাবু চরিত্রের ভোগী ও চতুর জীবন—এসব নিয়ে শ্লেষ আছে।

বীরভূমী কথাসাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এর বেশির ভাগ লেখাই গ্রামকেন্দ্রিক, গ্রামীণ পরিস্থিতিকেন্দ্রিক। গ্রাম আর শহর তাদের ঐতিহাসিক বাস্তব বদলাচ্ছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বদলাচ্ছে। ফলে লেখার ফর্ম, কাঠামোর চিত্রকল্প, প্রতীক সেসবও বদলাচ্ছে।

এই কথাসাহিত্যিক কুলের মধ্যে উল্লেখ্য—কমলাকান্ত পাঠক (মোনাচিতুরি গ্রামের বাসিন্দা, 'উপসংহার'), রাধাদামোদর মিত্র (বড়রা গ্রাম, বীরভূমের স্থানীয় প্রবাদ নিয়ে লেখা উপন্যাস—'ময়না ডালের ময়না', 'কদমখণ্ডির কল্পনা', 'লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সর্বহারা ঝুমুর'), আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ('মধুর দিনের গল্প'), সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাশঙ্কর পুত্র, সেই প্রেম), সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ), এছাড়া গল্প উপন্যাস লিখে রসজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—ভোলানাথ সেনগুপ্ত (বোলপুর), রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় (কীর্নাহার), মনোমোহন দাশ (পো-পাড়া সাহাপুর), কালিদাস পালধি (পাইকোর), রমানাথ সিংহ (সিউড়ি), দেবী সিংহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত (গড়গড়া), সুধীর করণ (সিউড়ি), বিজয় রায় (সিউড়ি), আদিত্য মুখোপাধ্যায় (সরুলিয়া), ভক্তি ঠাকুর (খয়রাসোল), অনুপম দত্ত (দুবরাজপুর), মনুজেশ মিত্র (সিউড়ি), অমিয় চৌধুরী (সিউড়ি), কিশোরীরঞ্জন দাশ (সিউড়ি), দুর্গাদাস ঘোষ (পাইকোর), শিশিরকুমার পৈতণ্ডী, বসন্ত কবিরাজ (ধনডাঙা), অসিত দত্ত, রঞ্জিত ঘোষ (বোলপুর), কাননবিহারী ঘোষ (ভুরকুনা), শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়শাল), তরুণতপন বসু (সিউড়ি), অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি), এ মান্নাফ, আদ্যাপ্রসন্ন রায় (শান্তিনিকেতন), বিনয় হাজরা (সিউড়ি), কৃষ্ণকমল রায় (সিউড়ি), বাদল ঘোষ (সিউড়ি), বাদল সাহা, রামকৃষ্ণ মণ্ডল (সিউড়ি), মীর মহম্মদ জাফর (সিউড়ি), প্রদীপ ভাদুড়ি (সিউড়ি), শুকদেব মিত্র (কলেশ্বর), অরবিন্দ নন্দী (বোলপুর), সুনীল পাত্র (শান্তিনিকেতন), সব্যসাচী রায়চৌধুরি (সিউড়ি), অজয় আচার্য (সাঁইথিয়া), দীনবন্ধু দাস (পাইকোর), অমর দে (সিউড়ি) করুণা দত্ত (সিউড়ি), আনন্দ মণ্ডল (সুন্দিপুর), ফজলুল হক (দুবরাজপুর), পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় (সিউড়ি), আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (রামপুরহাট), সমরেশ মণ্ডল (কেন্দ্রগড়িয়া), অসিকার রহমান (খুজুটি পাড়া), চারুচন্দ্র রায় (বোলপুর), গোপাল রায় (সিউড়ি), বিজয় দাস (সাঁইথিয়া), কল্যাণী রাণো (ভালাস), দীপক মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল (বাজিতপুর), গৌরীশঙ্কর ভুঁই (বিষ্ণুখণ্ডা), তীর্থকুমার পৈতণ্ডী (বৈদ্যনাথপুর) প্রভৃতি। এই লেখকদের রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই বলে দুঃখিত। এদের নিভৃত শ্রমের সার্থক মূল্যায়ন নির্ভর করবে বিশিষ্ট কোনো সংকলন গ্রন্থ মারফৎ। এঁরা অনেকেই গল্প উপন্যাস ছাড়া কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায় পারদর্শী। আর একটি কথা, লেখকদের মধ্যে সিউড়ির বাসিন্দাই বেশি।

বীরভূমী কথাসাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এর বেশির ভাগ লেখাই গ্রামকেন্দ্রিক, গ্রামীণ পরিস্থিতিকেন্দ্রিক। গ্রাম আর শহর তাদের ঐতিহাসিক বাস্তব বদলাচ্ছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বদলাচ্ছে। ফলে লেখার ফর্ম, কাঠামোর চিত্রকল্প, প্রতীক সেসবও বদলাচ্ছে। রেমন্ড উইলিয়ামস ইংল্যান্ডের গ্রাম শহর পরিপ্রেক্ষিত আলোচনায় দেখিয়েছিলেন—গ্রামে অঞ্চলবদ্ধ সম্প্রদায় ধ্বংসে হচ্ছে, দুর্বল বিতাড়িত হচ্ছে, আর আসছে সপক্ষ নগরায়ন। আমাদের এখানেও তাই। আর্থিক পুঁজি এবং রাজনৈতিক শক্তির গাঁটছড়া বদলে দিচ্ছে গ্রাম। ফলে ইংল্যান্ডের মতো এখানেও গ্রাম সম্পর্কে শিশুতোষ ধারণা আজ সুদূর অতীতের। গ্রাম চাইত পুরোনো রীতকানুন,

ঐতিহ্যমান্য মানসিকতা, শহর চায় প্রগতি, আধুনিকায়ন, উন্নয়ন। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব যেমন চেতনার পরিবর্তনও লক্ষ্য করার মতো। শহরের গল্প উপন্যাসে যে বিচ্ছিন্নতা, পৃথকত্ব, বহির্মুখিতা, বিমূর্তন তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বীরভূমের গল্প কবিতাতেও থাবা বসিয়েছে। ফলে গ্রাম হয়ে উঠতে চাইছে অন্তত অনগ্রসর শহর, শহরের বিষ গ্রামীণ জীবনেও চাপ ফেলছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে, ব্যতিক্রমী প্রাণান্ত প্রয়াস সত্ত্বেও, বীরভূমী স্বতন্ত্রতা গল্প উপন্যাস থেকে হয়ত হারিয়ে যাবে।

টীকা :

১। বুদ্ধদেব বসু শৈলজানন্দকে most detached writer ever to be born in Bengal and tells his stories with minimum description and comment বললে ও কয়েকটি গল্প বাদ দিলে এ মন্তব্য অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। বরং একথা জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য। An Acre of green grass, P. 84.

২। কচিৎ লেখকরা তাঁদের গল্প উপন্যাসের ন্যারেটিভ স্পেস এর চিত্র রচনা করেন, যেমন করেছিলেন উইলিয়াম ফকনার। The Portable Faulkner বইতে ফকনার কর্তৃক অঙ্কিত এই বিন্যাস চিত্রটি আছে। এতে ফকনার তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি (The town Jefferson in yoknapa-towpha county, his fictional name for Lafayette County, Mississippi, U. S. A) চিত্রিত করেছেন। (Narrative in Fiction and Film, Jakob Lothe, Pg. 51) তারাশঙ্কর ছবি আঁকতেন, এমন এক ছবি তিনি করতেই পারতেন, অন্যেরাও করতে পারত।

৩। রেমন্ড উইলিয়ামস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ট্রটস্কি বলেছিলেন পুঁজিবাদের ইতিহাস হল গ্রামের ওপর শহরের বিজয়ের ইতিহাস। এঙ্গেলসও অনুরূপ কথা বলেন তারও আগে। (P. 302-03) আর এক জায়গায় নগুগি, আমাদি, হ্যারিস, নারায়ণ ও আনন্দের কয়েকটি উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেন, এর অনেকগুলির মধ্যে আভ্যন্তর এক মিল আছে। তা হল—জমিদারদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, শস্য বিপর্যয় ও ঋণ, চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে পুঁজির প্রবেশ ইত্যাদি। (P. 285) তারাশঙ্কর-এর উপন্যাসেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ্য করা যায়। (The Country and the City)

৪. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বহুবিধ উপাদানের সমন্বয় থাকায় হুমায়ুন কবির 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'কে anthropological novels আখ্যা দিয়েছিলেন। (The Bengali Novel, Pg. 10).

৫. The Country and the City, Raymond Williams, Pg. 292-97.

লেখক : অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার
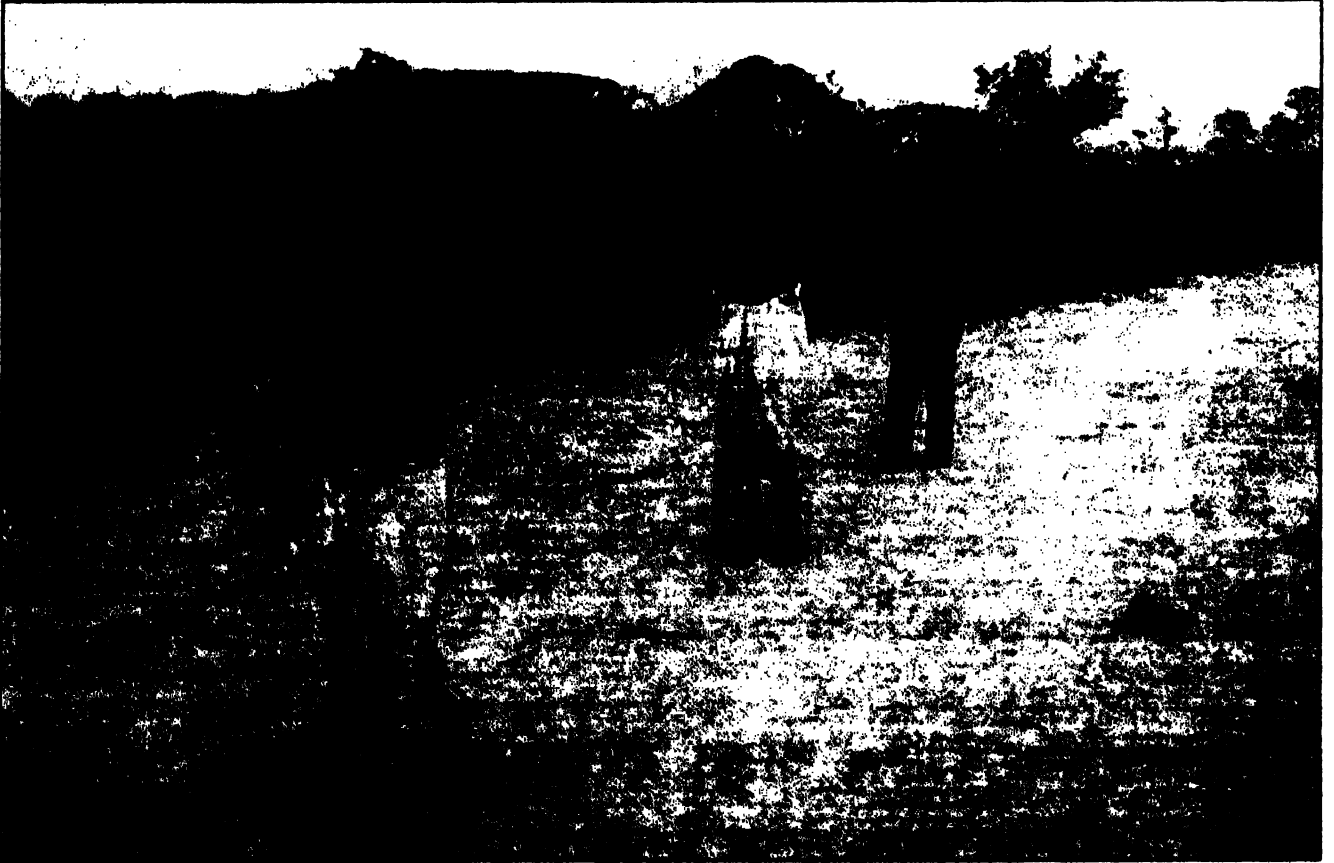
প্রাচীন রীতি মেনে নবান্নের জন্য ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের চাষীরা, সৌজন্যে : বর্তমান

শিল্পী : যোগেন চৌধুরী

বীরভূমের বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও মনীষী

অমর্ত্য ঘোষাল

লালমাটির দেশ রাঢ়ভূমি বীরভূম। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হয়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিপুল অংশ শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করে সাহিত্য শিল্প শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের কর্মধারায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনে দেশ-বিদেশের সারস্বত প্রতিভার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। আপাতদৃষ্টিতে বীরভূম রবীন্দ্র-আলোকে আলোকিত হলেও জেলার মাটির সন্তান বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব— সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিবিদদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। এছাড়া অসংখ্য হিন্দু সাধক, মুসলমান পীর, আউল-বাউল-ফকিরের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্র বীরভূম। স্বাধীনতা আন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসেও বীরভূম জেলার স্থান সর্বোচ্চ সারিতে। বীরভূমে জন্মেছেন এমন মনীষীর সংখ্যা কম নয়। স্বল্প পরিসরে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হল।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ : (জন্ম—২৪ মার্চ ১৮৬৩, মৃত্যু—৪ মার্চ ১৯২৮) বীরভূমের রায়পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহ। জমিদার বংশে জন্ম। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ এ পাশ করেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলাতে গিয়ে Lincoln's Inn নামক আইন বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে ওই বছরে কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিশ এবং সিটি কলেজে আইন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ওই পদে স্থায়ী হন। ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম বড়লাটের Executive Council-এর ব্যবস্থা সচিবের পদ পান। একবছর পর এই পদ ত্যাগ করে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পুনর্বার অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। ১৯১৪-১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সময় War Conference-এর সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিলাত যান। স্বদেশে ফিরে সরকারের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্যরূপে কাজ করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে Peace Conference-এ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপে যান। এইসময় লর্ড উপাধি ভূষিত হয়ে সহকারী ভারতসচিব রূপে পার্লামেন্টে মহাসভায় আসন লাভ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বিহার ও ওড়িশার প্রথম ভারতীয় গভর্নর হন। ১ জানুযারি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নাইট উপাধি পান। ডিসেম্বর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : (জন্ম—১৫ অক্টোবর ১৮৯২, মৃত্যু—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) বীরভূম জেলার কুশমোর গ্রামে জন্ম। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে হেতমপুর কলেজ থেকে এফ এ পাশ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজিতে ঈশান স্কলার হয়ে বি. এ উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এম. এ পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৭-এ পি. এইচ. ডি। গবেষণার বিষয় ছিল—'রোম্যান্টিক থিওরি—ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ'। রিপন, প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অধ্যাপনা ও রাজশাহী কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করার পর আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে আসেন। এরপর সরকারি চাকরি ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে প্রভৃতি।

শ্রীশামসুদ্দিন হোসায়ন : (জন্ম—১৮৯২, মৃত্যু—১৯২৬) বীরভূম জেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি উন্নয়ন ও মজুর আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত লেবার স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠা, শ্রীশামসুদ্দিন হোসায়ন উনবিংশ শতকের শেষ দশকে বীরভূম জেলার নানুর থানার শরডাঙ্গা গ্রামে নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবুল হোসায়ন। চার পুত্র ও এক কন্যা। চার পুত্রের মধ্যে শামসুদ্দিন ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে নাবালক ভাইবোনদের শিক্ষাদীক্ষা ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এছাড়া সমাজসেবার কাজেও তার অক্লান্ত নিষ্ঠা ছিল। কলকাতার টাউন হলে প্রতিষ্ঠিত 'ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ' সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে পাড়ায় পাড়ায় বস্তিতে বস্তিতে ম্যালেরিয়া-বিরোধী প্রচার কাজ চালাতেন।

বীরভূম জেলার কো-অপারেটিভ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে জেলার কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্রতী হন। এই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার কাজে কবিকে প্রভূত সহায়তা করেন। এই সময় শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতাও করেন (১৯১৭-১৮)। ১৩২৬ সালে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের অষ্টম ও দ্বাদশ সংখ্যায় যথাক্রমে 'সহযোগিতা' ও 'কৃষিকার্যে সমবায়' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে কিছুকাল শিক্ষকতা করে বিশ্বকবির নিবিড় সাহচর্য লাভ করে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করার জন্য ১৯২১ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই সময় কবি নজরুল ইসলাম ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন।

দেশজুড়ে চৌকিদারি ট্যাক্স-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে বীরভূমের রামপুরহাট ও অন্যান্য দু-একটি অঞ্চলেও তার ঢেউ এসে লাগে। এইসময় কীর্ণাহার গ্রামে সরকারি রাজস্ব কর্মচারী ও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি কৃষক সমাবেশ হয়। সম্ভবত এটি বীরভূম জেলায় প্রথম কৃষক সমাবেশ। এই সমাবেশ আহ্বান করেন শ্রীশামসুদ্দিন হোসায়ন। এই সমাবেশে নজরুল ইসলামের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি টেলিগ্রাফ করে তাঁর না আসার অক্ষমতা জানান।

১৯২৫ সালের শেষদিকে (১ নভেম্বর) কলকাতায় একটি নতুন পার্টি গঠিত হয়। নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবুদ্দিন আহম্মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন এই পার্টি গড়ার উদ্যোগী হয়েছিলেন। পার্টির নাম প্রথমে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের) অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress.)

শ্রীশামসুদ্দিন হোসায়ন 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' পত্রিকার পরিচালকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। কৃষক ও মজুরের অকৃত্রিম বন্ধু ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রিয় ভাই কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক আবদুল হালিম এবং আরও দুভাই আবুল কাসেম ও আকতার হোসেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : (২৩ জুলাই ১৮৯৮—১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) প্রখ্যাত সাহিত্যিক, বীরভূম জেলার লাভপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই এ পড়াকালীন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অন্তরীণ হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এক

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বছর কারাবরণও করেন। ১৯৩১-এ জেল থেকে বেরিয়ে সাহিত্যের পথে দেশসেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে কিছুদিন কলকাতার কয়লার ব্যবসায় এবং পরে কিছুদিন কানপুরে চাকরি করেন। ১৩৩৩ বঃ ত্রিপত্র কবিতা সংকলন প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু। শেষদিন পর্যন্ত সাহিত্য সাধনায় রত থেকে আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বাংলাসাহিত্যে বীরভূমের লালমাটি আর তার মানুষকে হাজির করেছেন নিপুণতায়। জমিদার বাড়ির সন্তান হয়ে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নব্য ব্যবসায়ীদের প্রচন্ড বিরোধিতা তিনি দেখেছেন। এর ফলশ্রুতি কালিন্দী ও জলসাঘর। বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক হরকরা প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্র তাঁর সাহিত্য-সম্ভারের প্রধান অংশ জুড়ে আছে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, অর্থনৈতিক বৈষম্যের নির্লজ্জ বিস্তার, যুব সম্প্রদায়ের ক্রোধ, অস্থিরতা, বিদ্রোহ—এ সব বিষয়ও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর অনেক গল্প উপন্যাস নাটক এবং চলচ্চিত্ররূপে সাফল্যলাভ করেছে। দুই পুরুষ, কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সঠিক ছন্দোবদ্ধ পঙক্তির কবিতাও মাঝে মাঝে রচনা করেছেন। কাব্যরস ও ভাষা ব্যবহারে 'কবি' উপন্যাসের গানগুলি স্মরণীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস—'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'মন্বন্তর', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং ছোটগল্প রসকলি, বেদিনী, ডাক-হরকরা প্রভৃতি। শেষ বয়সে কিছু চিত্রও অঙ্কন করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার ও জগত্তারিণী স্মৃতি পদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পরে পদ্মভূষণ উপাধি এবং জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ সালে বিধান পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে চীন সফরে যান। ১৯৫৭ সালে তাসখন্দে এশীয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিও ছিলেন (১৯৭০)।

সজনীকান্ত দাস : (২৫ অগাস্ট ১৯০০—১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) সাহিত্য সমালোচক। ক্ষুরধার লেখনী, তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস। পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে। ১৯১৮ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে রাজনৈতিক কারণে পড়তে না পেরে তিনি বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই এস-সি ও ১৯২২ সালে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এস-সি পাশ করেন। এম এস-সি পড়ার সময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগ দেন এবং 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। 'কামস্কাটকীয় ছন্দ' কবিতাটি প্রকাশের ফলে ব্যঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 'শনিবারের চিঠি'-র ১১শ সংখ্যা থেকে তিনি পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক হন। এরপর প্রবাসী পত্রিকায় যোগ দেন। বঙ্গশ্রী ও দৈনিক বসুমতী পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীত রচয়িতা ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গবেষকরূপে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলাসাহিত্য আসরে তাঁর প্রথম আগমন নজরুলকে আক্রমণ করে। এরপর প্রায় প্রত্যেক খ্যাতিমান লেখকই তাঁর সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কেবল সাহিত্য নয় সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও বিভিন্ন বিষয়ে সমস্যা সম্পর্কে তাঁর লেখনি সক্রিয় ছিল সমালোচকের ভূমিকায়। চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যকার

ও সংলাপ রচয়িতা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি এবং নিখিলবঙ্গ সাময়িকপত্র সঙ্ঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, এ্যাডাল্ট এডুকেশন কমিটি, ফিল্ম সেন্সরবোর্ড প্রভৃতির সদস্য, সভাপতি বা সহসভাপতি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম—মনোদর্পণ, পথ চলতে ঘাসের ফুল, অজয়, ভাব ও ছন্দ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঁচিশে বৈশাখ, অঙ্গুষ্ঠ, বঙ্গরঙ্গভূমি, মধু ও ফুল, কেড্‌স্‌ ও স্যান্ডাল, উইলিয়াম কেরী, রবীন্দ্রনাথ, জীবন ও সাহিত্য প্রভৃতি। তিনি শনিরঞ্জন প্রেস ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস স্থাপন করেছিলেন।

আবদুল হালিম : ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও গণসংগঠন গড়ে তোলায় যাঁরা পথিকৃত-এর ভূমিকা পালন করেন আবদুল হালিম তাঁদের অন্যতম। (জন্ম—কীর্ণাহারের কাছে শবডাঙ্গা গ্রামে ৬ ডিসেম্বর ১৯০১, মৃত্যু—২৯ এপ্রিল ১৯৬৬) পিতা আবুল হোসায়ন। বাল্যকালেই বাবা-মা মারা যাওয়ায় বড়ভাই তিনকড়ি (শামসুদ্দিনের ডাক নাম) সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অভিভাবকত্বে আবদুল হালিম পড়াশুনো শুরু করেন। কীর্ণাহার শিবচন্দ্র হাই স্কুলের ৮ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার পর তার পড়াশুনোয় ইতি ঘটে। ১৮ বছর বয়সে এক জাহাজ কোম্পানির করণিকের কাজে যোগ দিতে কলকাতায় যান। চাকুরির কাল বেশিদিনের না হলেও তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রমিকের দুঃখ কষ্ট বঞ্চনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

আবদুল হালিম

দেশে তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১০ ডিসেম্বর সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন এবং ৬ মাসের কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করবেন এই আশায় বীরভূমে ফিরে যান। কিছুদিন জেলা কংগ্রেস অফিসে থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এইসময় ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরেক পথিকৃত মুজফফর আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পথ স্থির হয়ে গেল। মুজফফর আহমদের অন্যতম সহকর্মী হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আমৃত্যু দৃঢ় সংকল্প নিলেন।

১৯১৭ সালে সোভিয়েতে নভেম্বর বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় ভারতের অভ্যন্তরে ওই দেশের বিপ্লবের খবরাখবর যাতে না প্রবেশ করে, যাতে এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেজন্য বৃটিশ সরকার বলশেভিক ষড়যন্ত্রের তিনটি মামলা দায়ের করে মুজফফর আহমদকে দীর্ঘদিন কারান্তরালে রাখে। প্রধানত কানপুর (১৯২৪) ও মীরাট (১৯২৯) ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে বন্দী করা হয়। দীর্ঘদিন জেলে থাকার ফলে মুজফফর আহমদের অনুপস্থিতি পার্টির মধ্যে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন আবদুল হালিম। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শ প্রচারের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি যথার্থ সংগ্রামী কম্যুনিস্টের ত্যাগ ও প্রত্যয়কে হাতিয়ার করে পার্টি গড়ার কাজ করেছিলেন। এই সময় আবদুল হালিমের সঙ্গে কবি নজরুল ইসলামের সহৃদয় সম্পর্ক তৈরি হয়। বিদ্রোহী কবির অর্ধসাপ্তাহিক ধূমকেতু (১৯২২) . তখন দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছে। কবির কাছে ধূমকেতুর অফিসে আবদুল হালিম ঘন ঘন যাতায়াত করছেন। এই সময় শারদীয় উপলক্ষে নজরুল ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' লিখে ইংরেজ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়লেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর এক বছরের জেল হয়। রাজবন্দীদের উপর সাধারণ কয়েদীদের মত উৎপীড়ন ও দুর্ব্যবহার চললে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার কবির এই ধর্মঘটের কথা গোপন রেখেছিল। দেশের সংবাদপত্রের কাছে তা ছিল অজ্ঞাত। আবদুল হালিমই সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে সেই খবর প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন।
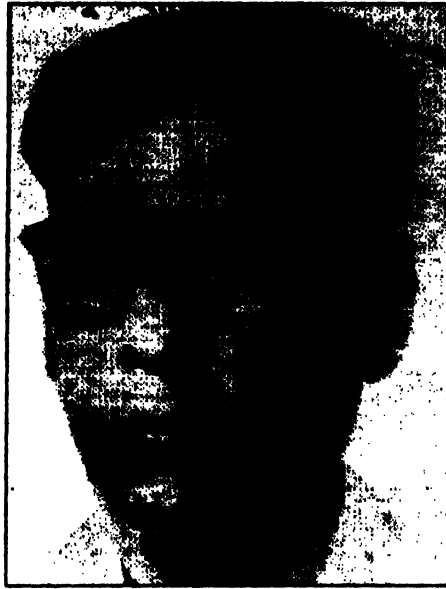
মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২৫ সালে লাঙল পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৩১-এ 'চাষী-মজুর', ১৯৩২ সালে 'দিনমজুর' ১৯৩৩-৩৪ সালে হিন্দি ভাষায় 'মজদুর', 'নয়া দুনিয়া', 'মজদুরোকা ডঙ্কা' প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ সালে 'মার্কসবাদী' নামে একটি তাত্ত্বিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ওই বছরেই 'মার্কসপন্থী' নামক মাসিকপত্র এবং ১৯৩৪ সালে 'গণশক্তি' প্রকাশ করেন। ১৯৩৯ সালে 'আগে চলো' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এইসব পত্রিকা বৃটিশ সরকারের কোপদৃষ্টির জন্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

অবিভক্ত বাংলাদেশে তিনি কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার পথিকৃত। আবদুল হালিমের উদ্যোগে 'দি কমিউনিস্ট' নামে একটি ইংরেজি সাইক্লো করা পত্রিকাও কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি গণশক্তি পাবলিশিং হাউস

নামে একটি প্রকাশনা সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি নামক পার্টির প্রকাশনভবনের সূচনা। ওই প্রকাশনার মধ্যে ১৯৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো নামক বিখ্যাত গ্রন্থের টীকাসহ বাংলায় অনুবাদ করেন আবদুল হালিম। এঙ্গেলস-এর কমিউনিজম নামক গ্রন্থের অনুবাদকও তিনি ছিলেন। ইতিমধ্যে জেলে চলে যাওয়ায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। সারাজীবনে মোট বারো বছর তাঁকে কারালাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়।

১৯৪০ সালে পরিণত বয়সে অশ্রুকণা দাস নামে একজন শিক্ষিকাকে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৫২ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁর স্ত্রীও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যা ছিলেন, তাঁদের এক পুত্র ও এক কন্যা।

১৯৫২-৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অন্যতম কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ২৯ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : (জন্ম—১৮/২১ মার্চ ১৯০১, মৃত্যু—২ জানুয়ারি ১৯৭৬) বীরভূম জেলার রূপসীপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম ধরণীধর মুখোপাধ্যায়। কালিকলম যুগের বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ মাত্র তিন বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর বর্ধমানে মামাবাড়িতে দাদামশাই রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বড় হন। দাদামশাই ছিলেন ধনী কয়লা ব্যবসায়ী এবং জাঁদরেল। বর্ধমানে স্কুলে পড়ার সময় নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। দুজনের এই বন্ধুত্ব ছিল কিংবদন্তীপ্রায়। তখন শৈলজানন্দ কবিতা লিখতেন আর নজরুল লিখতেন গদ্য। প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে দুজনে পালিয়ে যুদ্ধের সৈনিক হবার জন্য চেষ্টা করেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় শৈলজানন্দ বাতিল হন কিন্তু নজরুল উত্তীর্ণ হয়ে যুদ্ধে যোগ দেন। শৈলজানন্দ ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়েও নানা কারণে আর পড়া শেষ না করে কয়লাকুঠিতে চাকরি নেন। পরে সেকাজ ছেড়ে সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত হন। বাঁশরী পত্রিকায় তাঁর লেখা আত্মঘাতীর ডায়েরি প্রকাশিত হলে ধনী দাদামশাই তাকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শৈলজানন্দ কলকাতায় চলে আসেন। এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং কালিকলম, কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকশ্রেণিভুক্ত হয়ে যান। উপন্যাস ও গল্প মিলিয়ে প্রায় ১৫০ খানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কয়লাকুঠির দেশ, ডাক্তার, বন্দী, কনেচন্দন, এক মন দুই দেহ, ক্রৌঞ্চমিথুন, রূপং দেহি প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। একসময় অনেকগুলি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পাতালপুরি'।

মধ্যযৌবনে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রেজাউল করিম : (জন্ম—১১ জুন ১৯০২, মৃত্যু—১৯৯৩) বীরভূমের মাড়গ্রামে (শাসপুর গ্রামে?) জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাসংগ্রামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। মা জারিনা খাতুনের কাছে বাল্যের শিক্ষা। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে প্রধান সহায়তা পেয়েছেন লেখক ও সাংবাদিক অগ্রজ মইনউদ্দিন হোসেনের কাছে। বাবা আরবি ফারসি জানতেন। ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে থেকে মা-বাবা রক্ষণশীল ছিলেন না। অগ্রজের আগ্রহে প্রথমে কলকাতার তালতলা পরে কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাস করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই এ পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাস করেন, ১৯৩৬ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে, বহরমপুর ও আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। পরবর্তীকালে ওকালতি ছেড়ে বহরমপুর গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করেন, ১৯৮২ সালে অবসর নেন। রেজাউল করিমের প্রকৃত নাম রেজাউল করিম মুহম্মদ জওয়াদ। বাঙালি মুসলমান সমাজের আধুনিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত 'কোহিনূর', 'নবনূর' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। মুহম্মদ আলি জিন্নার চোদ্দ দফা শর্তের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুসলিম মানসে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য তিনি ১৯৩৮ সালে 'দূরবীণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতার পর 'গণরাজ', 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। প্রাকস্বাধীনতা যুগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেশপ্রেম, উদার যুক্তিনির্ভর মানসিকতা, বলিষ্ঠ লেখনি রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। ১৮ মে ১৯৩৭ সালে আলমোড়া থেকে এক পত্রে করিম সাহেবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রেজাউল করিম তাঁর For India and Islam গ্রন্থের ভূমিকায় মওলানা মুহম্মদ আলির রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের বক্তব্য উদ্ধৃত করে নিজ আদর্শ ব্যক্ত করেন—"I am an Indian first, and Indian second and Indian last, and nothing but an Indian."

সংস্কৃতি-সমন্বয় সাধক ড. রেজাউল করিম

১৯৭২ সালে রাজ্য সরকার প্রদত্ত বার্ধক্যভাতা মাসিক ৫০০ টাকায় তাঁর সংসার চলত, কিন্তু আদর্শের তাগিদে কোনদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভাতা গ্রহণ করেননি। তাঁকে বলতে শোনা যেত 'দেশ সেবার মূল্য নেব তা আমার ধাতে সইবে না।'

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় : (জন্ম—৭ মার্চ ১৯০৪, মৃত্যু—২৫ এপ্রিল ১৯৭৫) বীরভূম জেলার নাগাড়া কোলাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম ছিল তারাদাস। হেতমপুর কলেজে আই এ

পড়ার সময় রাজরোষে পড়েন। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। কিছুদিন 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও অন্য ধরনের গ্রন্থও রচনা করেছেন। 'কাশবনের কন্যা' তাঁর কাব্যগ্রন্থ, একখানা প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে—হিঙ্গুর নদীর কূলে, আকাশ বনানী জাগে, ধরণীর ধূলিকণা, পথের ধুলো, জলে জাগে ঢেউ, জীবনরুদ্র, চিতা বহ্নিমান, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, জ্যোতির্গময়, তুঁহু মম জীবন, হৃদয় দিয়ে হৃদি, আশার ছলনে ভূলি প্রভৃতি। একখানা ছোটোদের গ্রন্থও আছে—গুণধর ছেলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক নিবাস ছিল বীরভূমের রামপুরহাটে। জন্ম ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ। পিতা উকিল অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতনামা ইংরেজির অধ্যাপক। জে এল ব্যানার্জি নামে ছাত্রমহল ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সমধিক পরিচিত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম এ পাশ করেন। ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে তৎকালীন যুগে তাঁর খ্যাতি প্রায় প্রবাদতুল্য ছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে স্যার সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী ছিলেন। একসময় তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৯২৪ সালে তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে—বিদ্যাসাগর কলেজে কৃষ্ণলাল নাগের স্থলাভিষিক্ত হন। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অর্থ-বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরভূম জেলার মল্লিকপুর গ্রামে ১২৬৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বেণীমাধব

চট্টোপাধ্যায়। বি এ ও আইন পাশ করে প্রথমে সিউড়ি পরে বিহারের চাইবাসায় ওকালতি করে প্রচুর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর গৃহে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র ছাত্ররা আশ্রয় পেয়ে পড়াশুনো করত। দাতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। পিতার নামে সিউড়িতে বেণীমাধব ইনস্টিটিউশন ও বিহারের মানপুরে বাংলা স্কুল রাখালচন্দ্র-থাকোসুন্দরী শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠা তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। মানপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও গ্রামের মানুষের জলকষ্ট দূর করতে পুষ্করিণী ও কূপ খনন করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছানুসারে বিহার সরকার তাঁর প্রদত্ত জমিতে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ৩০ কার্তিক তাঁর জীবনাবসান হয়।

ড. মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা খোন্দকার আবদুল মুকিত, মাতা ফাসিহা খাতুন। কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এম এস সি পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বৃত্তি নিয়ে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ভর্তি হন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিপ্লোমা ও বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পান। ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন (১৯৩১)। ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও পরে বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে ওই কলেজের অধ্যক্ষ পদও লাভ করেন। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান ও বাংলায় কোরান অনুবাদের জন্য তিনি বিখ্যাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইসলামিয়া কলেজেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হন। ১৯৪৯-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কোতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত বিজ্ঞান সংস্থার সদস্য ছিলেন। বিজ্ঞান ও রসায়ন সম্পর্কে তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

হংসেশ্বর রায় বীরভূমের বোলপুর গ্রামে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধীরচন্দ্র রায়। বি এ ও পরে আইন পাশ করে কিছুদিন ওকালতি করার পর তা ছেড়ে দিয়ে বোলপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল। গান্ধীজির বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সবরমতি আশ্রমে চলে যান। এরপর উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে গিয়ে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে খাদিকেন্দ্র খোলেন এবং কলকাতায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনায় খাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। পরবর্তীকালে বোলপুরে ফিরে এসে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোলপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের দায়িত্ব, বোলপুর নীচুপটি নীরদবরণী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বোলপুর সাধারণ পাঠাগার, বেড়গ্রামের পল্লীসেবা নিকেতনের দায়িত্ব নেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ এপ্রিল তাঁর জীবনাবসান হয়।

শিবরতন মিত্র বীরভূম জেলার বড়রা গ্রামে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ১ চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পর্যন্ত পড়েন। কলেজের ছাত্র হিসেবে বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। রতন লাইব্রেরি ও বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহকর্তা। মানসী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জীবনী, ইতিহাস, শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—দূর্বা, তপোবন, চিন্ময়ী, বঙ্গসাহিত্য, বীরভূমের ইতিবৃত্ত, সাঁওতালি উপকথা, Types of Early Bengali Prose, Easy Poems. প্রভৃতি। এছাড়া উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ২০ পৌষ তাঁর জীবনাবসান হয়।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন বীরভূম জেলার কুড়মিঠা গ্রামে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাহিত্যতত্ত্ববিদ। পিতা বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে মাসিমা সারদাসুন্দরী দেবীর কাছে লালিত হন। স্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো করেছেন। কিশোর বয়সে গ্রাম থেকে হেঁটে সিউড়ির শিবরতন মিত্রের লাইব্রেরিতে গিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা ও গবেষণা করতেন। বীরভূমি পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ 'প্রাচীন মঙ্গলদিহি' প্রকাশিত হয়।' কলকাতার এন্টালি থেকে 'গৃহস্থ' পত্রিকায় হেতমপুরের মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখিত 'নূপুর' প্রবন্ধ উপলক্ষে যে বাগবিতণ্ডা হয় তাতে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ পড়ে বিদ্যোৎসাহী মহারাজকুমার তাঁকে হেতমপুরে নিয়ে যান। তাঁর পরামর্শে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার উপদেষ্টা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সভাপতি নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক ও সহসম্পাদক যথাক্রমে মহিমানিরঞ্জন ও হরেকৃষ্ণ। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে হেতমপুর রাজ কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে হেঁটে বহু তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে তিন খণ্ডে বীরভূম বিবরণ রচনা করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত হলেও ইতিহাস, পুরাকীর্তি,

স্থাপত্য, নৃতত্ত্ব, অতীত শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বীরভূম বার্তা, বৈকালী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ও পরবর্তীকালে আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ—কমণ্ডলু (কাব্যগ্রন্থ) কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দ, পদাবলী পরিচয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, গৌড়-বঙ্গসংস্কৃতি, বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি। তিনি সুহৃদ ও আত্মীয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে 'চণ্ডীদাস পদাবলী' সম্পাদনা করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৩ ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়।

যুগলপদ দাস বীরভূম জেলার কোপা গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়স থেকে অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হন। রাজশাহী জেলায় তাঁর রাজনীতির পাঠ শুরু। পরে জাতীয় আন্দোলনে ও সাম্যবাদী আন্দোলনে জড়িত হয়েছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই দল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়। যুক্ত দলের শেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধিবেশন তাঁর এলাকা জোগাই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে আর সি পি আই সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তার থেকেই দমদম-বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা ঘটে। এই কারণে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত অনেক দুর্ভোগ ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়। শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শেষজীবন কাটে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৫ আগস্ট তাঁর জীবনাবসান হয়।

গোপীকাবিলাস সেনের বীরভূম জেলার কোটাসুর গ্রামে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বীরভূমে কংগ্রেস সংগঠন তৈরি করে তার সম্পাদক হন। খাজনা বন্ধ আন্দোলনে ৮০টি গ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি 'স্বরাজ আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একান্ত সচিব ছিলেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ওই সম্মেলনকে সরকার বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন নেলি সেনগুপ্তা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ আগস্ট তাঁর জীবনাবসান হয়।

নবনী দাস ১২৯৯ সালে ৮ আশ্বিন বীরভূম জেলার সিউড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বাউল-সঙ্গীত শিল্পী। সুলতানপুরের শ্রীরাম উচ্চবিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। উদাসী বাউল সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত অনেক গান আছে। তাঁর দুই পুত্রের নাম লক্ষ্মণদাস বাউল ও পূর্ণদাস বাউল।

রাখালদাস বায়েন বীরভূম জেলার পরোটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তথাকথিত মুচি সম্প্রদায়ের, জন্ম ও মৃত্যু সাল অজ্ঞাত। গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। কবিগানের শিক্ষা কোনও তথাকথিত বর্ণহিন্দু কবিয়ালের কাছে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আহমদ হোসেন—'হামদু' কবিয়ালের শিষ্য হন। রাখালদাসের রচনা থেকে গুরু-শিষ্যের কিছু সংবাদ এবং তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আংশিক খবর জানা যায়। তাঁর একটি গানে আছে—আমার গুরুর গোরো রং গাওনা ভালো জানে / তাঁর কাছে নাই কোনো ভেদ হিন্দু-মুসলমানে। .....গাঁয়ের কতক মোল্লা মোড়ল দেখতে নারে তাঁকে / তাইতো তিনি গাওনা করেন লুকিয়ে ফাঁকে ফাঁকে / আমার গুরুর ধর্মে নাকি গাওনা বারণ আছে / আমরা যেমন অচ্ছুৎ আছি উচ্চ জাতের কাছে।' গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনকালে তিনি বেঁচে ছিলেন। দুই একটি ছড়াগানে গান্ধীভক্তি ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিলুপ্ত।

নবনী দাস

উৎস : ধূসরমাটি স্মারক সংখ্যা ১৯৮৭, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান / সাহিত্য সংসদ

লেখক : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদকীয় শাখায় কর্মরত

বাম থেকে দক্ষিণে : শেখ গুমহানি, সুধী প্রধান ও রমেশ শীল

রাঢ় বীরভূমের কবিওয়ালা ও কবিগান

কিশোরীরঞ্জন দাশ

কবিগানের উদ্ভব ও বিবর্তন

বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে বীরভূম জেলার একটি বিশিষ্ট অবদান অনস্বীকার্য। বীরভূমের বাউলসংগীত, ঝুমুর, কীর্তন, বোলান, আলকাপ, কবিগান, পটুয়াসংগীত, হিন্দু-মুসলমানের বিয়ের গান, সাপ খেলানো গান, আদিবাসী সংগীত প্রভৃতি লোকসংগীত ও ধর্মীয় সংগীতগুলি ওই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। বিশেষ করে, কবিগানে বীরভূমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বীরভূমের কবিগান সম্পর্কে কিছু বলার আগে কবিগানের উদ্ভব ও বিবর্তনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে সম্রাট লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মূলত বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। তুর্কি আক্রমণের পর থেকে মোঘল শাসনকাল পর্যন্ত দেশে নানা অবস্থান্তরের মধ্যে জাতীয় জীবনের বন্ধুর পথপরিক্রমায় বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং

লোক-সাহিত্যের সংবেদনশীল সৃষ্টিপ্রবাহ চলতে থাকে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অপশাসন-নিপীড়ন চলতে থাকে, অন্যদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও কঠোর বাস্তব জনজীবনের প্রস্তর-কাঠিন্য ভেদ করে ঝরনাধারার উৎসারণের ন্যায় বাঙালিবুকের সুখ-দুঃখ-বেদনার গান মূর্ছিত হতে থাকে। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে শোভা সিংহের বর্ধমান আক্রমণ ও উৎপীড়নে পশ্চিমবাংলা প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবাবি আমলে বাংলার কৃষককুল ও শ্রমিকশ্রেণি চূড়ান্ত শোষণ-শাসন-উৎপীড়নের শিকার হয়। আর্থ-সামাজিক বনিয়াদ ভেঙে পড়ে বণিক-জমিদার-ইজারাদারদের শোষণ-পীড়নে। নবাবি অপশাসনে সামাজিক জীবনে নৈতিকতার ভ্রষ্টাচার, লোভ-লালসায় ভোগবিলাস আবিলতা সঞ্চার করে। এরপর নবাবি ও দ্বৈত-শাসনব্যবস্থায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দশ বছর নবাব আলিবর্দির আমলে বাংলায় বর্গী হাঙ্গামা এক চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করে। আজও 'বর্গী এলো দেশে' শিশুদের ভয় দেখিয়ে ঘুমপাড়ানোর গান হয়ে টিকে গেছে। নবাবি আমল তো বিশ্বাসঘাতকতার নতুন অধ্যায় রচনা করে। পলাশির প্রান্তর কেবল ক্লাইভের খঞ্জরে রাঙা হয়নি, মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় তা ম্লান হয়েছে বেশি। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা এ দেশের রাজদণ্ড গ্রহণের সুযোগ পায়। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী।' তখন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

বণিকরাজের এই বিজয়ে বাংলায় নগরজীবন-স্বভাবের উজ্জীবন, গ্রামীণ জীবনধারার বিচ্ছিন্নতা এবং প্রতীচ্য ভাবধারার অনুসরণে ও অনুকরণে প্রাচ্য জীবন-ভাবনার সংঘর্ষে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সাময়িক শূন্যতা দেখা দিলেও পরে নতুনত্ব সঞ্চারিত হয়। নগরকে আশ্রয় করে গ্রামীণ সংস্কৃতির লৌকিক ধারার মরা গাছে ফুল ফুটতে থাকে। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈত-শাসনকালে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', পরে পরে নীলকর সাহেবদের বাংলার চাষিদের ওপর অকথ্য নিষ্ঠুর অত্যাচার, ১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসন শুরু থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত বাঙালি জীবনে যে অভিঘাত, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয় তাতে অনেক দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চেতনা-উন্মেষ ঘটায় সন্দেহ নেই।

> রবীন্দ্রনাথ এই কবিওয়ালাদের দেখেছেন 'হঠাৎ রাজা'-দের সান্ধ্য মজলিসে আসর মাতাতে। তিনি এঁদের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেই কলকাতার আসর থেকে নিঃশেষিত হতে দেখেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলতে হয়, তিনি বিংশ শতকে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে এসে বুঝেছিলেন, বাংলার কবিগান শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত লম্বোদর গুমানীর কবিগান তিনি শান্তিনিকেতনে বসেই শুনেছিলেন সেকথা অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো অনেক গুণী ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ-বিংশ—তিনশো বছরে প্রায় আড়াইশো কবিওয়ালার এ জেলায় নামধাম পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার পরও বিগত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে শিষ্ট সাহিত্যের সমূহ উন্নতি ঘটেছে পরাধীন ভারতের রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, শৈলজারঞ্জন, সজনীকান্ত প্রমুখের প্রসারিত সাহিত্যচর্চার ধারাপ্রবাহে। যদিও শেষোক্ত কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক পরাধীন ও স্বাধীন ভারতের উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণ করে শিষ্ট ও অশিষ্ট বা লৌকিক ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছেন। অন্তত তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কবি'-তে গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপটি ধরা পড়েছে। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনায় সজনীকান্ত কবিগানের বিষয় আলোচনা করেছেন। গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অভাব-অভিযোগ ও অশিক্ষার ক্ষেত্র ছেড়ে ধনীরা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাচ্ছে, তখন গ্রামীণ সংস্কৃতিও শহরের আশ্রয়ে গিয়ে কিছুদিন টিকে থাকতে থাকতে পিছু হটতে থাকে। কবিগান এমনই একটি লোকসংগীত যা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ধনীর সান্ধ্য মজলিসের আশ্রয়ে গিয়ে আসর জমিয়ে তুলত। রবীন্দ্রনাথ এই কবিওয়ালাদের দেখেছেন 'হঠাৎ রাজা'-দের সান্ধ্য মজলিসে আসর মাতাতে। তিনি এঁদের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেই কলকাতার আসর থেকে নিঃশেষিত হতে দেখেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলতে হয়, তিনি বিংশ শতকে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে এসে বুঝেছিলেন, বাংলার কবিগান শেষ হয়ে যায়নি। অন্তত লম্বোদর গুমানীর কবিগান তিনি শান্তিনিকেতনে বসেই শুনেছিলেন সেকথা অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো অনেক গুণী

ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন। আমার ক্ষেত্র সমীক্ষায় অষ্টাদশ-উনবিংশ-বিংশ—তিনশো বছরে প্রায় আড়াইশো কবিওয়ালার এ জেলায় নামধাম পাওয়া যায়।

এই কবিগানের উদ্ভব ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে নানা পণ্ডিতের নানা মত থাকাই স্বাভাবিক। বিশিষ্ট পণ্ডিত সমালোচক ড. সুশীলকুমার দের মতে, The existence of Kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th ; but the flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830 ('Nineteen Century Bengali Literature').

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক এবং বিখ্যাত সমালোচক সজনীকান্ত দাস কবিগানের উদ্ভব ও সংজ্ঞা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত তর্জা, পাঁচালি, খেউড়, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, দাঁড়াকবি, বসা কবিগান, ঢপ কীর্তন, টপ্পা, কৃষ্ণযাত্রা, তুক্কগীতি প্রভৃতি নানা বিচিত্রনামা বস্তুর সংমিশ্রণে 'কবিগান' জন্মলাভ করে। 'কবি' অর্থে এখানে অশিক্ষিত পটু স্বভাব-কবি, তাঁদের রচনা ও সংগীত বিভিন্ন নামে পরিচিত কবিগানের বিভিন্ন শাখা। শেষ পর্যন্ত এটা বিতণ্ডামূলক সংগীত-সংগ্রামে পর্যবসিত হয় এবং তর্জা, হাফ-আখড়াই, পাঁচালি নামে সমধিক প্রচলিত হয়। নিধুবাবুর টপ্পা, দাশরথির পাঁচালি, গোবিন্দ অধিকারির কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি কবিগানের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রচলিত রূপ।' *('বাংলার কবিগান')*

'সম্বাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের জীবনী ও গান সংগ্রহের এবং প্রকাশের কাজে প্রথম প্রয়াস পান। তিনি 'কবিওয়ালা' ও 'কবিগান' অভিধা দিয়ে এঁদের স্থায়ী নামকরণ করেন। আধুনিক কালে সুধী প্রধান এঁদের 'লোককবি' আখ্যা দেন এবং বিংশ শতকের কবিওয়ালাদের প্রধান গুমানী দেওয়ান নাম দেন 'চারণকবি'। তিনি নিজে চারণকবি সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে কেউ কেউ এঁদের বলতেন-'সখের কবি'। ড. আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও এঁদের 'কবিওয়ালা'ই বলেছেন।

'সম্বাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের জীবনী ও গান সংগ্রহের এবং প্রকাশের কাজে প্রথম প্রয়াস পান। তিনি 'কবিওয়ালা' ও 'কবিগান' অভিধা দিয়ে এঁদের স্থায়ী নামকরণ করেন। আধুনিক কালে সুধী প্রধান এঁদের 'লোককবি' আখ্যা দেন এবং বিংশ শতকের কবিওয়ালাদের প্রধান গুমানী দেওয়ান নাম দেন 'চারণকবি'। তিনি নিজে চারণকবি সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে কেউ কেউ এঁদের বলতেন-'সখের কবি'। ড. আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও এঁদের 'কবিওয়ালা'ই বলেছেন।

ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন মনে করেন, ঝুমুরগান থেকেই কবিগানের উৎপত্তি হয়। ঝুমুরগান 'আদিরসাত্মক', বিষয়—রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অপকর্ষজাত গান। কবিগানের সঙ্গে ঝুমুরগানের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, যেমন—বিরহ, সখীসংবাদ, লহর-খেউড় ইত্যাদি জাতীয় গানে এবং সুরে। অবশ্য অন্যেরা বলেন, পাঁচালিগানের সঙ্গেও কবিগানের মিল আছে অনেক বিষয়ে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'বিদ্যাসুন্দর' আখ্যানে নদে শান্তিপুরে 'খেঁড়ু' বা খেউড় গান প্রচলনের উল্লেখ আছে। বিশ্বকোষের 'কবি' নিবন্ধে জানা যায়, নবদ্বীপে দুর্গোৎসবে নবমীর বলিদানের পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজকুমারদের মধ্যে অশ্লীল কাদা-খেউড় গান রচনা ও গীত পরিবেশনের রীতি ছিল। এই খেঁড়ুগান আদিরসাত্মক স্থূলরুচির অশ্লীল ভাষায় রচিত গান। এটি কবিগানের আদি রূপ। তবে কবিগানকে খেঁড়ুগান থেকে উদ্ভূত বলা চলে না। কারণ এটা কবিগানের একটা অংশমাত্র বলা যায় ; খেঁড়ু ও কবিগান সমার্থক নয়। খেউড় কবিগানের শেষ পর্যায়—উপসংহার বা শেষ অংশ বলা যায়। এখন অবশ্য কবিগানের শেষে আর খেউড় গাওয়া উঠে গেছে। নিধুবাবুর আখড়াই গানে ও মোহনচাঁদবাবুর হাফ-আখড়াই গানে এমনকী পরে মনোমোহন বসুর মার্জিত হাফ-আখড়াই গানেও খেউড়ের এই অশ্লীলতা দেখা যায়। হাফ-আখড়াই ও দাঁড়াকবির ন্যায় পাঁচালিতেও কেউ কেউ কবিগানের সাদৃশ্য খুঁজেছেন। পাঁচালিতেও দুই দলে সংগীত-সংগ্রাম হলেও চাপান-উতোর ছিল না। কবি-গানে প্রশ্ন-উত্তর থাকায় তা পাঁচালি থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তবে পাঁচালিতে ছড়া ও গানের লড়াই হত।

ঝুমুরে নাচের সময় পায়ে ঝুমুর পরে নাচা হত। এগুলি নৃত্য-সংগীত। এই ঝুমুরে স্ত্রী-পুরুষ একত্র দাঁড়িয়ে বিরহ, সখীসংবাদ, লহর ও খেউড় গান হত সুরে। অবশ্য ঝুমুরের সুরের সঙ্গে কবিগানের অনেকখানি সুর-সাদৃশ্য আছে। আগে রাঢ়ে ধামালিকে ঝুমুর বলা হত। এখনও দিনাজপুরে ধামালি গানের প্রচলন আছে। ঝুমুরগানের মাঝে মাঝে কবিগানের মতো চাপান-উতোরের রীতি লক্ষ করা যায় পুরুলিয়াতে। জয়দেবের

চারণকবি মুকুন্দ দাস

'গীতগোবিন্দ' ও বড়ুচণ্ডীদাসের নাট্য ভঙ্গিমার গানে কবিগান ও ঝুমুরের লৌকিক ধারায় চাপান-উতোর রীতি দেখা যায়। কবিগানের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও গায়নরীতির সাদৃশ্যে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মত সমর্থনে বলেন, 'ঝুমুরই কবিগানের উৎস।' ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালও পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চলের কবিগানের অঙ্গবিন্যাসে ঝুমুরের সংস্থান লক্ষ করেছেন।

কবিগানের সঙ্গে তর্জার বিষয়বস্তুগত ও সংলাপধর্মিতার সাদৃশ্য থাকলেও কবিগানের চাপান-উতোরের সাদৃশ্য নেই তর্জায়। তর্জার মধ্যে হেঁয়ালি আছে, রহস্য আছে, কিন্তু বিতর্কের সুস্পষ্ট তীব্রতা নেই। কবিগান তাই তর্জা থেকে উদ্ভূত নয়। তর্জা ও কবিগান এক নয়।

কবিগানের বিষয়বস্তু, রীতি ও আঙ্গিকের বিচারে, বিশেষ করে গায়কী রীতিতে দেখা যায়—প্রথমে বন্দনা বা গুরুদেবের গীত। এতে সরস্বতীর বন্দনা, গণেশ বন্দনা বা জনগণের বন্দনা, গুরু বন্দনা ও আসর বন্দনা করে থাকেন কবিয়ালরা। পরে মালসী (ভবানী বা রাধাকৃষ্ণ বিষয়াঙ্গ) গান গাওয়া হয়। অনেকে একে বলেন ঠাকরুণ বিষয়ক গান বা আগমনী (সপ্তমী) গান। এসবের পর সখীসংবাদ, বিরহ, লহর ও খেউড়—এই চারটি বিষয়ে পর্যায়ক্রমে গান গাওয়া হয়। তবে খেউড় এখন চলে না। অনেক জায়গায় গানের শেষে দুই কবিয়াল সামনাসামনি বিষয়ভিত্তিক তর্ক-বিতর্ক করেন। প্রাচীন কবিগানের আঙ্গিকে দশটি ভাগ বা পঙ্‌ক্তিবিন্যাস ছিল—চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শওয়ারি, খাদ, ২য় ফুকা, ২য় মহড়া ও অন্তরা। এখন চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, খাদ ও অন্তরা—এই পাঁচটি ভাগ বড় জোর মানা হয়। তবে এক এক অঞ্চলে এই আঙ্গিকের বৈচিত্র্যও দেখা যায়।

মালসী বা আগমনীর মধ্যে শাক্তপদাবলী ও পৌরাণিক হরগৌরী ধারার এবং সখীসংবাদের মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব এখনও বর্তমান। তবে শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীর সূক্ষ্ম ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনা কবিগানের গায়করা ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, যেমন কীর্তনে সেই ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। কবিগানে সখীদের অভিযোগ, কৃষ্ণের ছলনা, রাধার কলঙ্ক প্রভৃতি বিষয় গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে—'শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল, এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ।' অবশ্য সখীসংবাদের গানে প্রাচীন কবিওয়ালা হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসুর রচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য অনেকটাই এসেছে। রাম বসুকে অনেকে আধুনিক গীতি কবিতার পথপ্রদর্শক বলেছেন।

'মনে রইল মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি
আর বলা হল না।'—গানে তৃষিত নারীমনের লজ্জারুণ বেদনার ছবি আঁকার আধুনিক শিল্পী বলা চলে। বিশ শতকের বীরভূমের কবিওয়ালা লম্বোদর চক্রবর্তী, কিশোরীমোহন রায় প্রমুখের কবিগানে খণ্ডিতা নারীর মনোবেদনা লক্ষ করা যায়। বাউলগানে তর্ক-বিতর্ক হয়। বাউলগানের সুর কবিগানে মিশে আছে।

কবিগানে আগের ব্যক্তিগত কুৎসা, গ্রাম্য অশ্লীলতা, অমার্জিত ভাবাভঙ্গি, আদিরসাত্মক গ্রাম্য ইতরতা এখন আর নেই, তা বর্জিত হয়েছে আধুনিক কবিগানে। তাই যে কবিগান আগে গ্রামের বাইরে বা শহরে ও বাগানবাড়িতে গাওয়া হত, এখন তা সভ্য-ভদ্রজনের আসরে পরিবেশনযোগ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সাধের শান্তিনিকেতনে প্রতিবার পৌষমেলায় এখনও সাঁওতালি গান, যাত্রাগান, বোলান-বাউলের গানের সঙ্গে কবিগানও গাওয়া হয়। আর স্বাধীনতার পর কলকাতায় বঙ্গ

সংস্কৃতি সম্মেলনে আমি কয়েকবার লম্বোদর, গুমানী, দেবেন দাস, কিশোরীমোহন রায়ের কবিগান শুনেছি। এঁরা বীরভূম-মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট নামকরা কবিওয়ালা। এঁদের গানে লহর ও খেউড়ের অশ্লীলতা ছিল না। লহরের মূল কথা ছিল ব্যক্তিগত আক্রমণ, এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ উঠিয়ে দিয়ে তাঁরা কবিগানের বিষয়গত চরিত্রের মুখে পরস্পর আক্রমণ চালাতেন। যেমন রাম-রাবণ পালায় রামের সীতাহারা আক্ষেপ বা মন্দোদরীকে নিয়ে রাবণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাঁদের লহরের গান, চুটকি গাওয়া হত।

অনেক সময় কবিগান ও দাঁড়াকবি নিয়ে বিতর্ক উঠত। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' সংকলনের ভূমিকায় কবিগান, দাঁড়াকবি ও হাফ-আখড়াইয়ের আঙ্গিকের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ড. সুকুমার সেনের মতে, তর্জা ভেঙ্গে দাঁড়াকবি হয়েছিল, তিনি দাঁড়িয়ে কবিগান করাকে দাঁড়াকবিগান বলেছেন। কিন্তু তাঁর মতের সঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, মনোমোহন বসুর মতের মিল নেই। একসময় যখন কলকাতায় অনেক ভদ্রলোক পেশাদারি দাঁড়াকবির দল তৈরি করেন, তখন যজ্ঞেশ্বরী, মোহিনী দাসী, গোলকমণি, দয়ামণি, রত্নমণির মেয়ে-কবির বা নেড়িকবিদের নৃত্য-গীতযুক্ত গানের দল ছিল। এঁদের ডাক পড়ত বেশি; পেশাদারি কবিওয়ালাদের তাই আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয়। বীরভূমে কয়েক বছর আগে মেয়েকবিদের কবিগান শুনেছি লীলারানী সাধুখাঁর মুখে। কিন্তু তাঁর বাড়ি নৈহাটি, বীরভূমে নয়। বীরভূমে মেয়েদের কীর্তন, বাউল, ঝুমুর প্রভৃতি গানের আসরে গাইতে দেখেছি, কিন্তু এ জেলায় কোনো মেয়েকবির সন্ধান পাইনি। কলকাতায় তো আইন করে মেয়েকবির দল বন্ধ করা হয়, তখন কেউ কেউ পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

ড. সুকুমার সেনের মতে, তর্জা ভেঙ্গে দাঁড়াকবি হয়েছিল, তিনি দাঁড়িয়ে কবিগান করাকে দাঁড়াকবিগান বলেছেন। কিন্তু তাঁর মতের সঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, মনোমোহন বসুর মতের মিল নেই। একসময় যখন কলকাতায় অনেক ভদ্রলোক পেশাদারি দাঁড়াকবির দল তৈরি করেন, তখন যজ্ঞেশ্বরী, মোহিনী দাসী, গোলকমণি, দয়ামণি, রত্নমণির মেয়ে-কবির বা নেড়িকবিদের নৃত্য-গীতযুক্ত গানের দল ছিল। এঁদের ডাক পড়ত বেশি; পেশাদারি কবিওয়ালাদের তাই আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয়।

যাই হোক, এতক্ষণ আমরা কবিগান ও অন্যান্য লৌকিক ধারার গানের যে আলোচনা করলাম তাতে দেখা যায়, লৌকিক মিশ্রধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে কবিগান। সজনীকান্ত দাস মহাশয় সেদিক থেকে এর জন্ম-রহস্য যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন। পরবর্তী কবিগানের বিশিষ্ট গবেষক ড. ভবতোষ দত্ত মহাশয় বলেছেন—'এর উদ্ভব নিতান্তই লৌকিক।' তবে বিশেষ কোনো একটিমাত্র গীতিধারা থেকে কবিগানের উদ্ভব হয়নি। মিশ্র-উপাদানে গঠিত এই লৌকিক ধারা ক্রমশ একটি নিজস্ব রূপ (form) ধারণ করে গীত হওয়ার ফলে জনগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে। মুখে মুখে রচিত বলে অনেক গানই লুপ্ত।

অনেকে এই কবিগানে উচ্চ কবিত্বের নিদর্শন খুঁজে পাননি। আবার অনেকে স্বীকার করেছেন, অনেকের কবিগানে কবিত্বশক্তি ছিল এবং 'They have got a literary tradition behind them.' তাই কবিওয়ালাদের কীর্তি স্মরণে ঈশ্বর গুপ্ত সযত্ন প্রয়াসে 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর সংগৃহীত জীবনী প্রকাশ করেন। তাতে 'দেশের উচ্চ সম্মান রক্ষা পাইয়া গৌরব পুষ্প সর্বত্র বিস্তৃত হইবে।' এই কবিগান ও কবিওয়ালারা মূলত গ্রামের সৃষ্টি, গ্রামেই এঁদের জন্ম। একদা কলকাতা শহরে এঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, এখন কলকাতায় কবিগান নেই বললেই চলে, মফস্বল গ্রামাঞ্চল থেকেই কবিওয়ালারা কলকাতায় এসে গান করে যান।

ড. সুশীলকুমার দে কবিওয়ালাদের সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেন—'These poets were, no doubt, born among the people (lowest classes), lived with the people and understood perfectly their ways of thinking and feeling; hence their direct hold upon the masses of whom many a modern writer is Contentedly ignorant.' ড. দে-র এই মন্তব্য কবিগানের ও কবিওয়ালাদের লোকপ্রিয়তার তথা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তির যথার্থতা নির্ধারণ করে। অনেকেই কবিগানকে লোকসাহিত্য বলে স্বীকার করেননি, তবে কবিগানের লৌকিক ধারার উদ্ভবে ও গণচেতনার বৈশিষ্ট্যে, গণমানস-সাযুজ্যে একে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত। বাস্তব লোক-সমাজমুখী, মুখে মুখে আসরে রচিত গণসংস্কৃতির মাধ্যম হিসাবে একে আমরা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

□

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ (ইং ১৮৫৪-৫৫) বঙ্গাব্দে মাসিক 'সম্বাদ প্রভাকরে' প্রাচীনতম কবিওয়ালা গোঁজলা গুঁই ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যসহ দশজন কবিওয়ালার জীবনী ও তাঁদের ২৭০টি গান সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই দশজনের মধ্যে লালু-নন্দলালকে একজন ধরা হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন তাঁদের পৃথক দুই ভাই—দুজন কবিওয়ালা ধরেছেন এবং দাবি করেছেন তাঁরা ছিলেন সিউড়ি-সন্নিকট মুড়োমাঠ-কচুজোড় অঞ্চলের অধিবাসী। এই সময়ে মুড়োমাঠে ছিলেন হারাধন পাল ওরফে কালো পাল এবং পার্শ্ববর্তী বরুলের বলহরি রায়।

ড. সুশীলকুমার দে কবিগানের ইতিহাসকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন : (১) ১৭৬০-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ, (২) ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী এবং (৩) ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী। আর ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগানের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে ঈশ্বর গুপ্ত ও ব্রজসুন্দর সান্যালের অনুমানের সমর্থনে ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) প্রথম পর্ব—অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী, (২) ২য় পর্ব—(১৭০০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) এই যুগে গোঁজলা গুঁই ও তাঁর তিন সংগীতশিল্পী—লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী, (৩) ৩য় পর্ব—(১৭৬০-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) উৎকর্ষ পর্ব—হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, কেষ্টা মুচি এ পর্বের সেরা কবিওয়ালা, (৪) চতুর্থ পর্ব (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, (৫) পঞ্চম বা উপসংহার পর্ব কাল বিংশ শতক। এ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা বা চারণকবিদের মধ্যে পড়েন—পূর্ববঙ্গের হরিচরণ আচার্য, রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া প্রমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গের জানকী মহারাজ, গুমানী দেওয়ান, লম্বোদর চক্রবর্তী, দেবেন দাস, কিশোরীমোহন রায়, রজনীকান্ত দাস, কিশোরী কোঁড়া, শিবশঙ্কর পাল প্রমুখ। এঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রাম-শহরের ধনী, গৃহস্থ, জমিদার এবং বারোয়ারি পূজা কমিটি ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। স্বাধীনতার পর কলকাতার বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গনে এদের পাকা আসর হল।

গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য রামজী। এই নামে জাগলাই গ্রামে রামজীর মাথুর, গৌরাঙ্গ-বন্দনা ও কবির লহর সংক্রান্ত চারটি গান সংগ্রহ করেন হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়। তিনি লালুকে, কালো পাল ও বলহরি রায়ের গুরুপদে বসিয়েছেন। রাঙামাটির ভাঙা দেউল ও সামন্ততান্ত্রিকতার ধনরসে পুষ্ট এই গুরুস্থানীয় কবিওয়ালারা তীর্থময়ী বীরভূমের সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রাণরসে বেগবান করেছিলেন লৌকিক ভাবনায়। সেখানে পুরাণ-ইতিহাস-মন্দির-মসজিদ, ধনী-দরিদ্র জীবনধারা কবিগানে বিধৃত হয়েছে।

□

এই কবিগানের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারায় বীরভূমের অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তিনশো বছরের প্রায় আড়াইশোজন কবিওয়ালার নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির সংখ্যাই সমধিক জানা যায়। অবশ্য এই আড়াইশোজন কবিওয়ালার সবার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। লালু-নন্দলালের সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বীরভূম জেলায় কবিগান ও কবিওয়ালাদের ধারা অব্যাহত আছে। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারায় বীরভূমের এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদের সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বীরভূমের কবিওয়ালা ও কবিগান :

এ পর্যন্ত বীরভূমের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীনতম কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্বমোট ১৯ জনের নাম পাওয়া যায়। কয়েকজনের কিছু কিছু কবিগানও পাওয়া গেছে। তাঁরা সকলেই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কবিওয়ালা। কবিগান ও কবিওয়ালাদের আদি জীবনী সংগ্রাহক কবি ও কবিওয়ালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ সালের ১ অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সম্বাদ প্রভাকরে' আদি কবিওয়ালা গোঁজলা গুঁই ও তাঁর তিনজন সংগীত শিষ্য—লালু-নন্দলাল, রঘুনাথ ও রামজীর সন্ধান দেন। তিনি তথ্য দেন, ...লালু-নন্দলালের শিষ্য, তাদের সমকালীন একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা-কেষ্ট মুচি ওরফে কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার। গুপ্ত কবি নিতাইদাস বৈরাগীর 'ওস্তাদ' বা গুরু লালু-নন্দলালের একখানি মাত্র গান সংগ্রহ করেন।

'হল এই সুখোলাভো পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে॥ ......' ইত্যাদি

তিনি গানটির প্রশংসা করে বলেন, ১২৬১ সালের ৮০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে লালু-নন্দলাল এই গান রচনা করেন। শিষ্য নিতাই দাসের (১৭৫১-১৮২১ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববর্তী এবং আনুমানিক ৬০/৭০ বছর বেঁচেছিলেন ধরলে তাঁকে অষ্টাদশ শতকের ১ম বা ২য় দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলা যায়। তাঁর উক্ত গানটি সখীসংবাদ বা বিরহ-বিষয়ক। প্রেমের ব্যর্থতার সুরটি আন্তরিকতাপূর্ণ এবং প্রকাশভঙ্গিতে আধুনিক বিরহিনী নারীর অন্তরের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

'যাত্রার ইতিবৃত্ত' ('বঙ্গদর্শন' ১২৮৯ বঙ্গাব্দ) প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—'তখন ভারতচন্দ্র লেখক, কবিওয়ালা নন্দলাল, কীর্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম বৈরাগী, পুরাণবক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণি, যাত্রাওয়ালা শ্রীদামযুগল।' অনুমান, লালু-নন্দলালের আবির্ভাব ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমকালে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনাকাল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ এবং তাঁর মৃত্যুকাল ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' খেউড়জাতীয় কবিগানে 'চুঁচুড়া নিবাসী লালু-নন্দলাল বিখ্যাত ছিল' বলা হয়েছে। ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালের লালু-নন্দলাল-ভনিতাযুক্ত সংগৃহীত পদগুলিতে 'লালু ভণে', 'লালু ও নন্দলাল ভণে', 'লালু-নন্দলাল ভণে' ইত্যাদি উল্লেখ লক্ষ করা যায়। তাই তিনি এবং ড. হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নও লালু ও নন্দলালকে দুই পৃথক ব্যক্তি বা দুই ভাই বলে মনে করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের মতে, লালু ও নন্দলালের জন্ম বীরভূমে। কারণ এঁদের অনেক গানে বীরভূমের কেন্দুলী, বক্রেশ্বর, গোদাকুড়ির আখড়া ও মুড়োমাঠের গ্রামের উল্লেখ আছে। মুড়োমাঠের সদ্গোপজাতীয় কালো পাল বা হারাধন পাল ও পার্শ্ববর্তী বরুল গ্রামের বলহরি রায় এই লালু-নন্দলালের শিষ্য ছিলেন। তাঁদের ৫০টি সম্পূর্ণ পদ তিনি সংগ্রহ করেন। (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল—কবিওয়ালা লালু-নন্দলাল প্রবন্ধ এবং বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ২৩২ দ্রষ্টব্য।) এর থেকে ড. প্রফুল্লচন্দ্র পাল 'প্রাচীন কবিওয়ালার গানে' (১৯৫৮, পৃঃ ৪।./.) উল্লেখ করেন, 'বীরভূমই কবিদ্বয়ের জন্মস্থান। তবে পরবর্তীকালে এই দুই কবি চুঁচুড়ায় কোনো স্থানে চলিয়া আসিয়া থাকিবেন।'

ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে নন্দলালের একটি গান পেয়েছিলেন (বঃ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২৯)। তবে গানটি কবিগানের পদ্ধতিতে লেখা নয়।

এই নিয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্ক তুলেছেন : লালু-নন্দলাল 'দুজন, না একজন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না ? কারণ এ বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কোনো নির্দেশ দেননি।' গানের ভাষাও তাঁর মতে 'ভারতচন্দ্রের অর্ধশতাব্দী পরে।'

আমাদের মত, ঈশ্বর গুপ্ত তো লালু-নন্দলালের কোনো পরিচয় সংগ্রহ করতে পারেননি। কাজেই তাঁর 'নির্দেশের' অপেক্ষা রাখে না। ঈশ্বর গুপ্ত একখানিমাত্র গান সংগ্রহ করেন। পরে ২৯টি পদ পাওয়া যায়—ঈশ্বর গুপ্তের ১টি, সুনীতিবাবুর ১টি, কয়েকটি হরেকৃষ্ণবাবুর, বাকিগুলি ড. প্রফুল্লচন্দ্র পাল সংগৃহীত। এর মধ্যে বিষয়—ভবানী বন্দনা ৯টি, কৃষ্ণকালী সংবাদ ৫টি, নারদ সংবাদ ১টি, সখী সংবাদ ৪টি, বিরহ ১টি, যশোদার খেদ ১টি, রামায়ণ পালার কবির লহর ৭টি গান এবং চৈতন্য বিষয়ক ১টি-সর্বমোট ২৯টি গান। 'সখী সংবাদের পদগুলি যেমন করুণ, তেমনি মধুর। ইহাদের বিরহ বিষয়ক পদগুলি আক্ষেপ ও আকুতিতে ভরা। ......এই কবিদ্বয়ের রচিত রূপাভিসার পদটির গঠনকৌশল বৈষ্ণবপদের অনুরূপ।' কালী ও কৃষ্ণ বিষয়ক পদে সমন্বয়ী সুর শোনা যায়। এঁদের লহর ও খেউড় গানের সংখ্যাও বেশি। ড. সুনীতিকুমারের সংগৃহীত সখী সংবাদ গানের কিছু অংশ এখানে দেওয়া গেল :

'একি অপরূপ দেখি শুনি।
পৃষ্ঠেতে লম্বিত ধরনী সম্বিত কিংবা ফণী কিংবা বেণী
অলকবেষ্টিত কনকে রচিত সীঁথি কিম্বা সৌদামিনী।
তার অধোদেশে অন্ধকার মাঝে সিন্দুর কি দিনমণি॥
খঞ্জনযুগল নয়ন চঞ্চল কি সফরি অনুমানি।
কিম্বা বিধুবর কি মুখ সুন্দর, কিছুই না জানি॥ ......'

ইত্যাদি।

আলোচ্য গানটির শেষে 'লালচন্দ্র কহে' এবং 'নন্দলাল ভণে' উভয় ভণিতাই পাওয়া যায়।

তাঁদের ভবানী বিষয়ক একটি গানের ('মা জগদ্ধাত্রী শবশিবে বড অবতার') একটি চরণে আছে—'সেই কপটা মেয়ে বসে আছে নটা কেনে হয়।' 'কেনে হয়' বীরভূম অঞ্চলের লোকমুখের ভাষা। রামায়ণ পালার ৭টি গানে—'দিও না', 'টুটি', 'খালি গতর', 'লেজুর' (লেজ), 'রেতে', 'গোঁসা করিস', 'ভুখা পুষে রেখেছিস গতর', 'জেতের' 'দাঁত নিকুটে তেড়ে', 'ঘরকাটা', 'যেয়ে', 'লড়াইতে পারলি না', 'ভাবকি দিও না', 'বটে', 'মরকটে', 'পাকুরবিচি', 'বাবলা' ইত্যাদি শব্দ, ক্রিয়াপদ ও শব্দগুচ্ছ বীরভূম অঞ্চলের লোকমুখের ভাষা ব্যবহারের নমুনা।

লালু-নন্দলালের কালীকৃষ্ণ সংবাদ গানে রামপ্রসাদে সমন্বয়ী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'আজ অনন্তরূপিণী এই যে কৃষ্ণকালী হেরলাম নয়নে।
আমি নয়ন ফিরাতে নারি বারি ধারে কি করে যাব ভবনে॥'

তাঁদের যশোদার খেদ (বিরহ) বিষয়ক একটি গানে আছে—

'কান্দিছে যশোদারানী করি হাহাকার,
এখানে আছিল ভাল নীলমণি আমার।
* * *
আঁখি মেল প্রাণের গোপাল ডাক রে মা বলে,
ক্ষীর-ননী দেব তোমার বদনকমলে,
বাঁচবে না তোর পিতা নন্দ লালু-নন্দের এই বাণী॥'

ভবানী বিষয়ক আর একটি পদে আছে—

'......হরের ঘরনী তুমি ভবের তরনী,
কবি লালু ভনে, তোমার রণে কত অসুর হলো ক্ষয়।'

ভারত ও কালো পাল :

লালু-নন্দলালের সমসাময়িক 'রামজীদাস, রঘুনাথদাস ও ভারত তিনজনের গানেই কালো পালের উপর যথেষ্ট গালাগালি আছে।' (১২১২ সালে ২৫ অগ্রহায়ণ তারিখ একটি খাতায় পেয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়) পূর্বোক্ত ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় ভারতবর্ষে লালু-নন্দ নিবন্ধে ভারতের উল্লেখে মন্তব্য করেন যে, ভারতের কবিগানে এই 'গালাগালি' লহর-খেউড় পর্যায়ের অন্তর্গত ছিল।

অষ্ট কোনাকৃতি মন্দির—ইলামবাজার হাটতলা

ছবি : অনির্বাণ সরকার

শীর্ষা কামারবাবুদের পুরাতন মন্দির

সৌজন্যে : দেবপ্রসাদ দাস
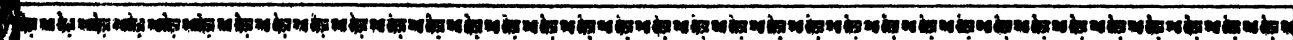
ভারতের কবিখ্যাতি জেলাসীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি কালো পালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। সঠিক গ্রাম ও ব্যক্তি-পরিচয় জানা যায় না।

লালুর শিষ্য কালো পাল সিউড়ি থানার মুড়মাঠ গ্রাম নিবাসী ছিলেন। তাঁর ডাকনাম কালো, ভালো নাম ছিল—হারাধন পাল। পিতা রামকান্ত পাল। তাঁর পুত্র নিতাই এবং কন্যার নাম আনন্দময়ী। ১৩৩৩/৩৪ বঙ্গাব্দে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মুড়মাঠ গ্রামের কালো পালের বাড়ি ও 'পালের গড়ে' দেখে আসেন। পালের ভিটায় তখন বাস করতেন তাঁর বৃদ্ধা কন্যা আনন্দময়ী। তাঁর মুখে হরেকৃষ্ণবাবু শোনেন, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১২৩৪-১২৪০ সাল নাগাদ পিতা হারাধন পাল দেহ রাখেন। তা থেকে অনুমান কালো পাল ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি লোকান্তরিত হন। একজন প্রাচীন কবিওয়ালার কাছ থেকে হরেকৃষ্ণবাবু হারাধন পাল রচিত চাপান গানের অংশত সংগ্রহ করেন।

'কাল মূর্তি কালী নয়, উলঙ্গ বেশেতে রয়
শিবের বরেতে আসি হয়েছে সদয় ;
নাক কাটা কান কাটা বটে চোখে ঠুলী দিয়েছে।
গর্দ্দান কাটিলে মুণ্ড বল কার জল খেয়ে বাঁচে॥
যোগী ঋষি কি তপস্বী, তার রুধির পান ক'রে তারা সবাই হয় খুশি
তার অস্থিমাংসে মুণিগণ সব বসে যজ্ঞ করেছে।
গর্দ্দান কাটিলে মুণ্ড বল কার জল খেয়ে বাঁচে॥'

এই পৌরাণিক খণ্ডিত গানে কোনো ভণিতা নাই এবং অন্য গানের নমুনা না পাওয়ায় তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যায় না। মুড়মাঠ সিউড়ি দুবরাজপুর বড় রাস্তার ওপর ৫ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ছোটো পল্লী। তখন ব্যক্তিগত বা জাতিগত আক্রমণ চলত। কালো পাল জাতিতে সদেগাপ ছিলেন। আগে এই ব্যক্তিগত আক্রমণ লক্ষ্য করা যায় ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির উদ্দেশে—'জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গী' বলে এবং নিজের জাতিগত পেশার কথাও অকপটে স্বীকার করেন—'আমি ময়রা ভোলা, ভিয়াই খোলা বাগবাজারে রই।'

বলহরি রায় (১৭৪৩-১৮৪৯) : সিউড়ি অঞ্চলের বরুল গ্রামের বিখ্যাত কবিওয়ালা বলহরি রায় ছিলেন 'কবির গুরু'। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন রাজস্থান রাজপুত সৈনিক। এসেছিলেন আকবর-জাহাঙ্গিরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে বারো ভুঁইয়া দমনে। তাঁরা এ দেশেই থেকে যান এবং বিভিন্ন গ্রামে (বড়তুরী গ্রাম, বরুল প্রভৃতি) বসতি স্থাপন করে চাষবাস করে মনের আনন্দে ক্রমশ বাঙালি বনে যান। বলহরির জন্ম হয় এই ধরনের বাঙালি রাজপুত বংশে। এখনও এঁদের বিবাহাদি নিজ জাতকুলের মধ্যেই হয়ে থাকে। বলহরির পিতা আলমচাঁদ। আনুমানিক ১১৫০ বঙ্গাব্দে তথা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে বলহরি রায়ের জন্ম এবং ১২৫৬ সালে শতাধিক বৎসর বয়সে মারা যান। ১১৫০ থেকে ১৩৫০ প্রায় দুশো বছরে বরুলের রায়বংশের অন্তত পাঁচজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। বলহরির গুরু আগেই বলা হয়েছে লালু। পরবর্তী কবিওয়ালারা তাঁর কবিগানে নৈপুণ্য দেখে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন।

'কবির গুরু সেই বলহরি,
ছিরু ঠাকুর সঙ্গে ফেরে কৈলাসের যাই বলিহারি।'

এই ছিরু ঠাকুর বা সৃষ্টিধর ঠাকুর ও মল্লিপুর নিবাসী পরে কচুজোড় নিবাসী কৈলাস ঘটক বলহরির অনুজ শিষ্যকল্প হলেও তিনজনেই বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চক্রবর্তী ও মল্লিকপুরেরই সারদা ভাণ্ডারী প্রমুখ। এখানে বলহরির বিজয়া বিষয়ক একটি পদের ভণিতাংশটি দেওয়া গেল :

'......বিল্বপত্রে পূজিলাম চরণ
দিয়ে গঙ্গাজল অনাথা ভেব না মনে
ভক্তিহীনে রেখ মনে।
ওগো জননী, বলহরি দাস কহে
শুন গো ভবানী॥

পদটিতে লক্ষ্য করা যায়, মা মেনকা নয়, পিতা গিরিরাজ হিমালয় কন্যা উমা বা ভবানীকে বিল্বদলে পূজা করে বিদায় দিয়েছেন বিজয়া-দশমীতে। মানবী ও দেবী এখানে একাকার।

তাঁর 'নিকুঞ্জে চল কিশোরী, রাই গো হবে মহারাস মনে অভিলাষ, ও বাজিল সংকেতে বনে শ্যামের বাঁশরী॥' ইত্যাদি রাসের পদে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণ দেখা যায়। এখানে রাসে গোপিনীদের উল্লাস মাধুর্য ও ভাবপ্রকাশের ভাষায় বৈষ্ণবীয় ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

শম্ভুনাথ মণ্ডল (১৭৭৩-১৮৩৩) : বীরভূমের একচক্রা গ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুকে বক্ষে ধরে ধন্য হয়েছে। তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রের নামানুসারে গর্ভবাসের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম বীরচন্দ্রপুর। এই গ্রামে বহু পৌরাণিক জনশ্রুতি—মহাভারতীয় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের ও নিত্যানন্দের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যস্থানের চিহ্নাঙ্কিত হয়ে আছে। বীরচন্দ্রপুরের পাশের গ্রাম ডাবুকে ডাবুকেশ্বর শিব মন্দির আছে। জনশ্রুতি, এখানে মহাভারতের অর্জুন শিবের পূজা করেন। পরে জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার করেন সাধক কৈলাসানন্দ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ২ আষাঢ় এখানে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করান। তখন খননকার্যে দুটি বাসুদেব মূর্তি (বিষ্ণু মূর্তি) পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ-পিতা হাড়াই পণ্ডিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর শিবের পূজারী। এই বীরচন্দ্রপুর গ্রামে শম্ভুনাথ মণ্ডল, জাতিতে সদ্গোপ, জন্মগ্রহণ করেন। পৌরাণিক

বৈষ্ণবীয় ধারার সঙ্গে লৌকিক ধারার সমন্বয় ঘটে এই গ্রামে। আরাধনার মেলা, শিব পূজা এবং পার্শ্ববর্তী ঘোষ গ্রামে মা লক্ষ্মীর বিগ্রহে পূজা ও মেলার সঙ্গে কবিগানের মধ্যে লোক-সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটে দুশো বছর ধরে। একদিকে বৈষ্ণবীয় ও শৈব ধারা, অন্যদিকে তারাপীঠ অঞ্চলে শাক্ত ধারার সমন্বয়ে কবিগান বনফুলের মতো আপন সৌরভে ও সৌন্দর্যে জনপদের মানুষজনকে তৃপ্তি দিয়েছে। বীরচন্দ্রপুর-তারাপীঠ অঞ্চলেই দুশো বছরের মধ্যে জন্মেছেন শম্ভুনাথ মণ্ডল থেকে জানকী মহারাজ, লম্বোদর চক্রবর্তী, কিশোরীমোহন রায়, বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মদনমোহন রায় প্রমুখ কবিওয়ালারা।

শম্ভুনাথ মণ্ডলের পিতা ঘোষগ্রামের নিকটবর্তী বীরভূম পূর্ব সীমান্ত গ্রাম গাঙেড্ডা থেকে বীরচন্দ্রপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর ছিল বৈষ্ণবভক্তি এবং আত্মীয়তা সূত্রে বসতি স্থাপন। বাঁকা রায়ের মন্দির যেখানে তার অনতিদূরে কোবেল পরিবারের বাস। মন্দিরে প্রায়ই কীর্তন গানের আসরে বাল্যকাল থেকে শম্ভুনাথের আকর্ষণ জন্মে। জোব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত নয়া কলকাতা নগরে যখন হঠাৎ রাজার সাদ্ধ্য মজলিসে কবিওয়ালার দল আসর মাত করছেন, তখন বীরভূম-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কবিওয়ালার দল ছিল। শম্ভুনাথ তারাপীঠ-বীরচন্দ্রপুর অঞ্চলে কবিগায়ক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। লালু-নন্দলাল যদি হন বীরভূমের আদি কবিওয়ালা, তাহলে বীরভূম সংলগ্ন মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার জাগলাই গ্রামের রামজি (কর্মকার) নামে জনৈক কবিওয়ালাই আদি কবি। এই রামজি আর আদি কবি গোঁজলা গুই-এর শিষ্য রামজি একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। যা হোক, সে সময় বীরচন্দ্রপুরে শম্ভুনাথ কবিগানের দল তৈরি করেন। তাঁর বংশানুক্রমে বিংশ শতক পর্যন্ত পারিবারিক কবিগানের ধারা অব্যাহত ছিল। তাঁর গানের বিষয় ছিল ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনি এবং রাধা-কৃষ্ণ, নিতাই-গৌর প্রসঙ্গ। তার পাশে ছিল বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব সাধনার ত্রিবেণী সঙ্গম। সেই ভাবরসে পুষ্ট ছিল তাঁর কবিগান। তাঁর বংশের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত কবি বলে তাঁর পরিবারকে ওই অঞ্চলের লোক 'কোবেল' বাড়ি নামে অভিহিত করে। ৬০/৬৫ বৎসর বয়সে আনুমানিক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

শম্ভুনাথের কবিখ্যাতি অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমোহন ও কনিষ্ঠ কৃষ্ণমোহন। রামমোহন পিতার পরিধি অতিক্রম করেন, ছোটো ভাই কৃষ্ণমোহন কবিগান করতেন না। এই বংশের ভরত ও শত্রুঘ্ন উনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কবিওয়ালা ছিলেন। বিংশ শতকের শেষদিকে বৈদ্যনাথ মণ্ডল এই বংশের শেষ কবিওয়ালা। তাঁর দক্ষতার অভাব ছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি কবিগান ছেড়ে দেন।

নন্দলাল চৌধুরী (১৮শ ২য় ভাগ-১৯শ প্রথম) : সিউড়ির প্রাচীনতম কবিওয়ালা নন্দলাল চৌধুরী (ব্রাহ্মণ) 'খোঁড়ানন্দ' নামে পরিচিত ছিলেন। 'ভারতকোষে' শশীভূষণ বিদ্যালংকার উল্লেখ করেন, নন্দলাল চৌধুরী একজন খ্যাতনামা কবিওয়ালা। খুঁড়িয়ে চলতেন বলে তাঁকে 'খোঁড়ানন্দ' বলা হত।

তাঁর কোনো ব্যক্তিপরিচয় ও বংশধরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সিউড়িতে বারুইপাড়ায় যাত্রার দল চলত। শোনা যায়, মালীপাড়ায় চলত কবিওয়ালা নন্দলালের কবিগানের দল।

মাধব হাড়ি ও মধু গড়াই (অষ্টাদশ শতকের শেষে জন্ম ১৯শ শতকের ষষ্ঠ দশকে মৃত্যু) : সিউড়ি বারুইপাড়ার মাধব হাড়ির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্রীনিকেতন সুরুল গ্রামের মধু গরাঞী। উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন। শেষোক্ত জন কলু বংশীয়। এক সময় মধু-মাধবের জেলায় খুব প্রসিদ্ধি ছিল। আজও দু দলের বা দুজনের তুমুল ঝগড়াকে বলে মধো-মাধায় পাল্লা লেগেছে। খিস্তি-খেউড়ে উভয়েরই দক্ষতা ছিল। মধু মাধবের কয়েক বৎসর পর মারা যান। উভয়ের কোনো গান পাওয়া যায় না। শোনা যায় মাধব হাড়ির গুরু ছিলেন খোঁড়ানন্দ।

কন্ন ডোম ও অক্ষয় ঠাকুর : বারুইপাড়ার ডোমবংশীয় কন্ন ডোম মাধবের সমসাময়িক এবং আপন চেষ্টায় হিন্দু পুরাণ শাস্ত্র আয়ত্ত করেন। সে জন্য বোলপুরের বাহিরী গ্রামের অক্ষয় ঠাকুরকে পাল্লাদার নির্বাচন করেন। বয়সে অক্ষয় ঠাকুর কনিষ্ঠ। তাঁর উপাধি ছিল চক্রবর্তী। দুজনে তুল্যমূল্য পাল্লাদার ছিলেন। কবিগানের ভাবে-ভঙ্গিতে কন্ন ডোম-অক্ষয় ঠাকুর মাধব-মধুর বিপরীত ছিল। মধু-মাধব চটুল, কন্ন-অক্ষয় গুরুগম্ভীর। শেষ বয়সে কন্ন ডোমের কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল। অনেকে তাই মন্তব্য করেন, ডোমের ছেলে বেদ ভেঙেছে, এখন তার ফলভোগ করছে। কন্ন ডোমও খোঁড়ানন্দের শিষ্য ছিলেন। অক্ষয়ের গুরুর কথা জানা যায় না। অক্ষয়ের শেষজীবনের পাল্লাদার ছিলেন তরুণ কবিওয়ালা হাটসেরান্দীর রামতারণ পাল।

কৈলাস ঘটক (১৭৯৮-১৮৭৩) : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মল্লিকপুরের (সিউড়ি থেকে ৩/৪ মাইল দক্ষিণে) কৈলাস ঘটক একজন ওস্তাদ কবিওয়ালা ছিলেন। পিতা হরমোহন ও পিতামহ সর্বানন্দ সরস্বতী। কচুজোড়ের রাজা রুদ্রচরণ রায় পণ্ডিত সর্বানন্দ সরস্বতীকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। হরমোহনেরও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল।

কৈলাস বিবাহসূত্রে মল্লিকপুর থেকে কচুজোড়ে শ্বশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে কঞ্চিকা দেবীর বেদী আছে, কোনো বিগ্রহ নেই। রাজার বাস্তুভিটা, কালী মন্দির, গোপাল মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং রাজার সিদ্ধিস্থান পঞ্চমুণ্ডীর আসন বিদ্যমান। রাজা একজন সাধুর কাছে অষ্টধাতুর

রাজরাজেশ্বরীর মূর্তিসহ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য রাজার কুলগুরু ছিলেন। রাজার নিবাস ছিল আড়াডাঙ্গালীতে। যাদবেন্দ্র পার্শ্ববর্তী হরিশপুর নিবাসী ছিলেন। বর্গার হাঙ্গামার সময় রাজা রুদ্রচরণ যুদ্ধে নিহত হন। কচিকা দেবীর নামেই গ্রামের নাম কচুজোড়।

কৈলাসের সমসাময়িক রামানন্দ, সৃষ্টিধর ঠাকুর, রাজারাম গণক, নিতাইদাস-রাইচরণ-রাধাচরণ (বরুল), চাকর যুগী, দশরথ মণ্ডল, বনওয়ারী চক্রবর্তী প্রমুখের নাম জানা যায়। রামানন্দ ও কৈলাসের গুরু হিসাবে বলহরি রায়কেই ধরা হয়। কৈলাস-ছিরু ঠাকুর তৎকালীন কবিগানের প্রবাদপুরুষ ছিলেন। তখন কৈলাস বৈশাখী ডাকনামের (হরিনাম) চাপান-উতোরের পদ লিখে দিতেন। কবিগানে তখন এক আসরে দাঁড়িয়ে চাপান-উতোর হত মুখোমুখি—একে বলা হত 'বোল কাটাকাটি' বা 'বোল গান'। 'ডাকনাম' ও 'বোল গানে' কৈলাসের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শহরে কৈলাসের কবিত্ব, রচনাশক্তির কাছে কোনো সমকক্ষ ছিল না। তাঁর আগমনী-বিজয়া, ভবানী বিষয়ক, সখী সংবাদ, গোষ্ঠ বিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনাসম্বলিত গান রচনায় শক্তিও ছিল প্রভূত। এখানে 'গোষ্ঠ বিষয়ক' একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল।

'গগনে উঠেছে বেলা, দেখ নাই চিকন কালা,
যত সব রাখাল ডাকে
তুই বিনে ভাই কালিয়ে রতন যত ধেনুগণ,
চেয়ে আছে উর্ধ্বমুখে,
তুমি কোন্ ঠাকুরের বেটা একি ঠাকুরাল,
নিতুই নিতুই তোমার কেবা চরাবে ধেনুর পাল,
এমন মিনি কড়ির নফর তোমার কোন্
রাখাল আছে কেনা।.....'

—কৈলাসের গানে একটা সহজ মানবিক আবেদন আছে। ভাষাও সহজ সরল ও অনাড়ম্বর।

সারদা ভাণ্ডারী (ওই সমসাময়িক) : ওই মল্লিকপুরের কৈলাসের সমসাময়িক সারদা ভাণ্ডারীর গুরু বা পিতার নাম জানা যায় না। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। দুই কন্যা—নিস্তারিণী ও খুকুরানীর নাম জানা যায়। খুকুরানীর ভাগুরের পুত্র-কন্যার বংশধররা এখন মল্লিকপুরে আছেন।

সারদা ভাণ্ডারীরও কবিগানে সুখ্যাতি হয়। তাঁর সাতখানি গানের উল্লেখ আছে ড. প্রফুল্লচন্দ্র পালের 'প্রাচীন কবিওয়ালা' গ্রন্থে। তাঁর বিরহের গানে বিরহিণী রাধার চিত্তব্যাকুলতা সুন্দরভাবে বর্ণিত—

'সাধের বৃন্দাবন শূন্য করে গেছেন শ্যাম।
কাতর হয়ে কাঁদিছেন প্যারী উচ্চস্বরে॥

* * *

এই সারদা কয়, প্যারী ধূলায় পড়ে,
আমায় বিনে আছেন ওরে কোকিলে রে,
কারণ এখন কহি তোরে,
ডাকিস না আর কুহুস্বরে॥'

সৃষ্টিধর ঠাকুর (১৭৯৮-১৮৭৮) : ইনি বোলপুর থানা কাঁদুটিয়া গ্রামে বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশেই 'চৈতন্য মঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাসের বিবাহ হয়েছিল। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ভক্ত শিষ্যদের অনুরোধে জানুরী গ্রামে বাস করেন। এই গ্রামেই ছিল এ যুগের ঠাকুর সত্যানন্দের পিতৃভূমি। গ্রামে ঠাকুর বংশের বংশধররা বাস করেন। জানুরীর রাসে এখনও খুব ধুমধাম হয়। ছিরু ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য হলেও গুরুবংশীয় বলে ঠাকুরের সম্মান লাভ করেন। একটা কথা প্রচলিত ছিল—'ছিরু যদি গান লিখিতেন, বলহরি তাতে সুর দিতেন এবং সে গান যদি কৈলাস গাহিতেন তবে আর তুলনা মিলিত না।' ছিরু বলহরির শিষ্য ছিলেন। বরুলের নিতাই দাসের সঙ্গে ছিরুর বোলগানের চাপান-উতোর ভালোই জমত। তাঁর কিছু কিছু গান পাওয়া যায়।

রামানন্দ চক্রবর্তী (রামাই ঠাকুর) : কৈলাসের সমসাময়িক রাইপুরের (এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত) অধিবাসী রামানন্দ চক্রবর্তী 'সুবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণ' ছিলেন। বন কেটে একজন রুইদাস বা মুচি—রাইচরণ দাস গ্রামটির পত্তন করেন বলে গ্রামের নাম হয় রাইপুর। আগে গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল। রথের মেলা বসত। সাতদিন ধরে মেলায় যাত্রা-ঝুমুর-কবিগান হত। এখানে জীবন উড়ের কবিগানও হয়েছিল বলে জানা যায়। রামানন্দ বলহরির শিষ্য। তাঁর পূর্ব গোষ্ঠ ও উত্তর গোষ্ঠের দুটি পদ পাওয়া যায়। কৈলাস ছাড়া তাঁর অন্য প্রতিযোগী ছিলেন রাধানাথ দাস। রাধানাথের কোনো ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া যায়নি। একটিমাত্র গোষ্ঠের বোলগান ('ও মা নন্দরানী এই নাও তোমার....') রামাই ঠাকুরকে চাপান হিসাবে গাওয়া। ইনি কৈলাসের রামাই ঠাকুরের সমসাময়িক ও বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন।

রামমোহন মণ্ডল (১৭৯৮-১৮৮৩) : বীরচন্দ্রপুরের শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামমোহনের নাম আগেই বলা হয়েছে। ইনি 'কোঁড়েল' বংশের সেরা কবি ছিলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে হুগলি জেলা পর্যন্ত কবিগান করতে যেতেন। একটি ছেঁড়া পরিত্যক্ত খাতায় মোহনের নামে একটি গান ওই বংশের অনিলকুমার মণ্ডলের সৌজন্যে পাওয়া গেছে। তাতে ভণিতা আছে—'ওস্তাদ মোহন কয় কাতরে.....'। পদটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক। এছাড়া লালা ঘোষ নামে রামমোহনের জনৈক পাল্লাদারের নাম জানা যায়। তিনি

বীরচন্দ্রপুর অঞ্চলেরই কোনো এক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে জানা যায়।

জলপা মাঝি : তিনি রামমোহন মণ্ডলের অন্যতম পাল্লাদার। সেকালের বীরভূম সীমানায় হরিণপাহাড়ি গ্রামের (বর্তমান দুমকা জেলা, ঝাড়খণ্ড) অধিবাসী ছিলেন, জাতিতে আদিবাসী সাঁওতাল শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। তাঁর কোনো কবিগান সংগৃহীত হয়নি। তিনি কবিগানে সহজাত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

এ যুগের কবিওয়ালাদের কারো কারো ভাষাভঙ্গি আধুনিকতার সারল্যে সহজ স্বাভাবিক থাকলেও ধাচা ছিল মধ্যযুগীয় পৌরাণিক প্রেরণাসম্ভূত। পৌরাণিক বিষয়েই গানের চাপান-উতোর হত। এর বাইরে ঐতিহাসিক-সামাজিক বিষয়-বিতর্ক তখনও স্থান পায়নি। এই পৌরাণিক বিষয় ও প্রাচীন কবিগানের ঐতিহ্য নিয়েই আমরা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবিগানের আসরে প্রবেশ করব। আদিবাসী সাঁওতাল—জলপা মাঝি কবিওয়ালা হলেও অষ্টাদশ শতকে কোনো মুসলমান কবিওয়ালার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বীরভূমের উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবিওয়ালা ও কবিগান (১৮০১-১৮৬০) :

উনবিংশ শতকের কবিওয়ালাদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ। প্রথমার্ধ কাল ধরা যায় ১৮০১-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ এবং বাকি ১৮৬১-১৯০০ পর্যন্ত দ্বিতীয়ার্ধ বা অপরার্ধ। অষ্টাদশ শতকের ধারানুসরণে এবং আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ধারায় উনবিংশ শতকের কবিগানের প্রচলন ছিল। কিন্তু ১৮৬০ সালের পর অপরার্ধে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই পরিবর্তন বীরভূমের এ যুগের কবিওয়ালাদের মধ্যেও দেখা যায়।

প্রথমার্ধের কালসীমায় যেসব লোককবি জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের অনেকের গানে আধুনিক যুগচেতনা—স্বদেশ ভাবনা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রসঙ্গ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে নিতাইদাস রায়, আহম্মদ হোসেন, রাখালচন্দ্র বায়েন, মহম্মদ কেনাতুল্লা, রামতারণ মণ্ডল প্রমুখ উল্লেখ্য। এই যুগের ৩৫ জন কবিওয়ালার নাম জানা যায় এ জেলায়। এ যুগে মুসলমান কবিওয়ালার আবির্ভাব লক্ষণীয়, যা আগের যুগে ছিল না। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবিওয়ালাদের মধ্যে প্রথমেই নামোল্লেখ করতে হয় চাকর যুগীর।

প্রথমার্ধের কালসীমায় যেসব লোককবি জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের অনেকের গানে আধুনিক যুগচেতনা—স্বদেশ ভাবনা হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রসঙ্গ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তাঁদের মধ্যে নিতাইদাস রায়, আহম্মদ হোসেন, রাখালচন্দ্র বায়েন, মহম্মদ কেনাতুল্লা, রামতারণ মণ্ডল প্রমুখ উল্লেখ্য। এই যুগের ৩৫ জন কবিওয়ালার নাম জানা যায় এ জেলায়। এ যুগে মুসলমান কবিওয়ালার আবির্ভাব লক্ষণীয়, যা আগের যুগে ছিল না।

চাকরদাস যুগী : উনিশ শতকের প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন পুরন্দরপুর গ্রামে। প্রবাদ, বিখ্যাত পুরন্দর খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে এর নাম হয় পুরন্দরপুর। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুরন্দর ধর্মরাজ। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা ও মেলা হয়। ধর্মরাজ বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবিত দেবতা। এই গ্রামের চাকর যুগী পূর্বোক্ত ছিরু ঠাকুর ও কৈলাস ঘটকের অনুজকল্প। তিনি ছিরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বয়সে ৪/৫ বছরের ছোটো বলে মনে করা হয়। তাঁর গোষ্ঠজাতীয় পদে কোমলমধুর চিত্র পরিস্ফুট। আর একটি বোলগানে মা যশোদার কাছে 'চাঁদ চাওয়া'র মধ্যে প্রতিবৎসল্যের স্নেহসিক্ত চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'চাঁদ নিব মা চন্দ্র চাই। / কপালেতে চিত্তা দিতে হাতছানিতে ডাকছিলে যে বলছি তাই।.....' ইত্যাদি গানটিতে শিশু কৃষ্ণের আবদার শোনা যায়। পৌরাণিক কৃষ্ণ-অনুষঙ্গ বাদ দিলে এটি আধুনিক ছড়ার কবিত্বপূর্ণ প্রকাশ বলা যায়। তাঁর বোলগানের উত্তর দিয়েছেন বনওয়ারী চক্রবর্তী। তিনি চাকর যুগীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

দশরথ মণ্ডল : দশরথের কোনো ব্যক্তিপরিচয় জানা যায় না। তিনি চাকর যুগী, কুড়মিঠার বনওয়ারী চক্রবর্তী প্রমুখের সমসাময়িক। এঁদের সমসাময়িক আর একজন কবিওয়ালা ছিলেন বাঁশশঙ্কা গ্রামের রাজারাম গণক। বনওয়ারী চক্রবর্তীর সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখে হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁদের আত্মীয় মঙ্গলডিহির বনওয়ারী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। বনওয়ারী মুখোপাধ্যায় তাঁর মাতুল বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যান। এইভাবে বনওয়ারী চক্রবর্তী মঙ্গলডিহির বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজের কাছে সঙ্গীত ও কবিগান পদ্ধতি শিক্ষা করেন। এই বিষ্ণুচন্দ্র চট্টরাজ কোনোদিন আসরে কবিগান করেননি, তবে তিনি অনেকের বাঁধনদার ও কবিগানের শিক্ষাদাতা ছিলেন। আর তাঁর শিষ্য বনওয়ারী চক্রবর্তী চাকর যুগীর পাল্লাদার ছিলেন।

বনওয়ারী চক্রবর্তীর শিষ্যদের মধ্যে **রামচরণ ডোমের** নাম জানা যায়।

চণ্ডীকালী ও অন্নদাচরণ ঘটক : পূর্বোক্ত বিখ্যাত কবিওয়ালা কৈলাস ঘটকের দুই পুত্র—চণ্ডীকালী ও অন্নদাচরণ। প্রথমজনের জন্ম আনুমানিক ১৮২০-২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তিনি পিতার কাছে কবিগান শিক্ষা করেন। দীর্ঘদিন দল চালিয়ে ছিলেন। কনিষ্ঠ অন্নদাচরণও যৌবনে কবিগান করেন, পরে **নীলকণ্ঠের যাত্রার দলে** যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের আগেই চণ্ডীকালী দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তখনও কনিষ্ঠ অন্নদাচরণ ও তাঁর পুত্র রাধাকিঙ্কর বর্তমান ছিলেন।

চণ্ডীকালী পিতার ন্যায় সমুল্লেখ্য না হলেও কবিগানে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর গৌরাঙ্গ-বন্দনা গানের মাধুর্য শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকৃষ্ট করত। গানটিতে গৌরাঙ্গ-বন্দনাই মুখ্যত প্রাধান্য পেয়েছে।

রাধাচরণ রায় ও রাইচরণ রায় : দুজনেই সিউড়ি সন্নিকট বরুল গ্রামের অধিবাসী এবং লোকশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এই বরুলের কৃষ্ণদাস রায়ের পুত্র **নিতাইদাস রায়** (১৮২৩-১৮৯৯) একজন বাঁধনদার ছিলেন। তবে ছিরু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বোলগানের চাপান-উতোর দেখে মনে হয়, তিনি আসরে কবিগান করতেন। নিতাইদাসের মোট ১১ খানি গান সংগৃহীত হয়েছে।

নিতাইদাস রায়ের সমসাময়িক বীরভূমের **গোঁসাই হরিচন্দ্র, দ্বিজ রাখাল, দ্বিজ গোপাল**, হেতমপুরের **প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য** (১৮২৩-১৮৯৩) ও রাজবংশীয় বাবু **কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী** (১৮২৭-১৮৬১) কবিগান রচয়িতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। তবে নিতাইদাস ও গোঁসাই হরিশ্চন্দ্র বা গোঁসাইচাঁদ হরি প্রতিযোগী হলেও বাকি চারজন আসরে গান করেননি, গান রচনাই করতেন। হেতমপুরে দুর্গা-সরস্বতী ও অন্যান্য পূজানুষ্ঠানে কৃষ্ণচন্দ্র ও পরবর্তী রাজন্যবর্গ কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

বীরচন্দ্রপুরের 'কোবেল' বংশের আদি কবিওয়ালা শম্ভুনাথ ও তৎপুত্র রামমোহন মণ্ডলের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রামমোহনের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্রজলাল কবিগান করতেন না। জ্যেষ্ঠ ছবিলাল ও মধ্যম মুকুন্দলাল কবিগান শিক্ষা করেন পিতার কাছেই। **ছবিলালের** (১৮২৬-১৮৯৫) ও **মুকুন্দলালের** (১৮৩৩-৯৮) কবিখ্যাতি পিতা রামমোহনের খ্যাতিকে অতিক্রম করতে পারেনি। ছবিলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে **ভরত ও শত্রুঘ্ন** কবিগানে আঞ্চলিক সুনাম অর্জন করেন। তাঁর কিছু কিছু প্রাচীন ধারার গানের নমুনা পাওয়া যায়।

ছবিলাল অপেক্ষা মুকুন্দলালের কবিগানে দক্ষতা বেশি ছিল। তাঁর দুই পুত্র—**গোপেশ্বর** (১৩০০-১৩৬২ বঙ্গাব্দ) ও উপেন্দ্রলাল (?)। গোপেশ্বর দু-এক পালা করে কবিগান ছেড়ে দেন, উপেন্দ্রলাল কোনোদিন কবিগান করেননি।

রামচরণ ডোম (১৮৪৫-১৯১০) : ইলামবাজার থানার কুড়মিঠা গ্রামের বনওয়ারী চক্রবর্তীর উপযুক্ত শিষ্য রামচরণ ডোম গোল্‌টিকুড়ি গ্রামনিবাসী ছিলেন এবং লোকমুখে তাঁর নাম ছিল—চরণ ডোম।

জীবন উড়ে (১৮৫০-১৯২০/২৫) : ওড়িশা থেকে আগত জীবন বা জীবনে উড়ের পূর্বপুরুষরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বর্ধমান জেলায় গুসকরায় স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেন। গোপাল উড়ে যাত্রাগানে এবং জীবন উড়ে কবিগানে বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। জীবন উড়ে বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন অস্থায়ীভাবে। প্রথমে তিনি রাইপুরে (মল্লিকপুর সন্নিকট) কিছুদিন বাস করেন। কিছুদিন কুণ্ডলা গ্রামে, কিছুদিন গড়গড়িয়া এবং কিছুদিন নগরী গ্রামেও ছিলেন। তবে তিনি স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধেন সিউড়ি সোমাতোড় পাড়ায়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে ভোলাপদ থেকে হন দিলমহম্মদ। তাঁর যখন ৭৫/৮০ বৎসর বয়স তখন (১৩৮৭ বঙ্গাব্দে) আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এক মসজিদে। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, জীবন উড়ের পিতা শিবপদ সোমাতোড়ে এসে বসবাস স্থাপন করেন। জীবন উড়ে ছিলেন কৈলাস ঘটকের শিষ্য। জীবন গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র পাঁচ কন্যা। অন্য দুই পুত্র—তারাপদ ও গুরুপদ। জ্যেষ্ঠ কন্যা কমলি বা ডোমরতন অনেক সময় কবির সঙ্গে যেতেন। জীবন তাঁর সখন্ধী সীতানাথ ও খুড়তুতো ভাই গোবর্ধনকে নিয়ে কবির দল গড়েন। পুত্ররা কেউ কবিগান করতেন না। দারিদ্র্যের জন্য তাঁরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

জীবন উড়ে কবিগানে দক্ষতা দেখিয়ে কুণ্ডলার জমিদার বন্দিরাম মুখোপাধ্যায়ের কাছে ৮ বিঘা জমি ও একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। বাহিরী গ্রামেও জমি কিনে সেখানে বেশ কিছুদিন ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক মাস নগরীতে থেকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জেলা জুড়ে ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ইন্দে মুচি, শশীভূষণ মুচি, সীতা হাড়ি, বঙ্ক হাড়ি, কুচিল ডোম, রামতারণ মণ্ডল, অবিনাশচন্দ্র দাসবৈরাগ্য উল্লেখ্য। তখনকার উঠতি যুবক কবিওয়ালাদের মধ্যে গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর দু-এক পালা গান হয় বলে মনে হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী অবিনাশ দাসবৈরাগ্যকে জীবন উড়ের দুটি চাপান ছিল।

(১) 'একটি নারীর গর্ভে দেখ, দেখরে বিধাতার ঘটন।
তাহে জন্মিল নন্দন।
শিশুটি গর্ভের ভিতর, বয়স তার বারো বৎসর,

ছেলেটি দেখতে সুন্দর,
সে বটে কোন জন ?
ওই শিশুটির প্রসবকালে, (ছেলেটির) জীবন ছিল না
জন্মাসিন্ধু হবে না।
শিশুটি লয়ে কোলে, শ্মশানে দেয় গা ফেলে,
বল দেখি সেই কালে
প্রাণ দিলে কোনজন ?
নয় পশুপক্ষী, দানবদৈত্য, নয়কো পাতালবাসীগণ।
বল বল খুলে, সভাস্থলে, কথা বলছে রামজীবন॥
ওগো জগদীশ্বর, ঘোচাও মনের কষ্ট,
কি রকমে ঘটল বিষম দায়।
বলি হায় হায় হায়॥'

—কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত—এই চাপানের উত্তর। শিবতেজ অগ্নিরূপ ধারণ করে ; তেজ কমলে তিনি নদীরূপা কুটিলার গর্ভে থাকেন পঞ্চবর্ষসহস্র, পরে ব্রহ্মার নির্দেশে কুটিলা শরবনে তা নিক্ষেপ করেন। দশ শতবর্ষ পূর্ণ হলে সেই তেজ থেকে এক বালক জন্মে। ছয় কৃত্তিকা এই বালককে স্তন্যপানে লালনপালন করেন। এই বালকের নাম হয় কার্তিক।

(২) 'ওরে হাত থেকে ছুড়লাম ঢেলা, সে ঢেলার গর্ভ হৈল।
সে ঢেলা কে ছুড়েছিল,
তাহার নামটি বল,
কন্যা না পুত্র হৈল, আমারে বল॥' ইত্যাদি

এটিও একটি পৌরাণিক চাপান।

বলা বাহুল্য, অবিনাশচন্দ্র দাসবৈরাগ্য দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেননি। ভণিতা থেকে তাঁর নাম ছিল জানা যায়—রামজীবন দাস। দুদিক থেকে 'রাম' ও 'দাস' উড়ে যায়, কবিনাম হয় জীবন বা জীবনে উড়ে। গুমানী সাহেবের কাছে শোনা, রামপুরহাট সন্নিকট বুমকোতলার মেলায় দুবার, বক্রেশ্বরের (মুর্শিদাবাদ) মেলায় একবার ও কয়েথতলার মেলা একবার—মোট চারবার যুবক গুমানীর সঙ্গে প্রবীণ জীবন উড়ের পাল্লা হয়। গুমানী তাঁকে বলেছিলেন—'ওরে উড়ে যারে উড়ে' ইত্যাদি। উত্তরে জীবন বলেন—'বলিস না বলিস না উড়ে / ওরে ছোঁড়া, দেখবি মজা, দেখো খুঁড়ে / আপন জ্বালায় মরবি পুড়ে / ভস্ম হয়ে যাবি উড়ে'.....ইত্যাদি।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আমজোড়ার পুলিন বাগদি, হরিপুরের হরি বাউড়ি প্রমুখের নাম জানা যায়। তাঁর অনুরাগী ছিলেন গান্ধী মাহারা ও স্বভানন্দ ডোম। তবে তাঁরা জীবন উড়ের কাছে কবিগান শিক্ষার সুযোগ পাননি।

পূর্বোক্ত ইন্দ্র বা ইন্দে মুচির বাড়ি ছিল গুলালগাছি (বর্তমান দুমকা জেলায়), পরে বর্ধমান জেলায় বনকাটি অযোধ্যায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে আবির্ভূত হন এবং বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শশী মুচির বাড়িও ছিল বননবগ্রামে (অধুনা দুমকা জেলায়)। তখন গুলালগাছি বা বননবগ্রাম বীরভূম জেলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শশী মুচির শিষ্য ছিলেন রাধাকান্ত লেট।

গীতা হাড়ির বাড়ি ছিল রামপুরহাট কলঘাটা পাড়ায়। তাঁর গান অমার্জিত ও অশ্লীলতা মিশ্রিত ছিল। রঙ ফুৎকারে তাঁর মুখে খই ফুটত।

মধু হাড়ির বাড়ি ছিল মহম্মদবাজার। তাঁর অন্যান্য পাল্লাদারদের মধ্যে সাঁইথিয়ার কুচিল ডোম, মাঝিগ্রামের ভূদেব মজুমদার ও বিরাজপুরের গোপাল লেটের নাম করা যায়।

একালের অন্যতম কবিওয়ালা কীর্ণাহারের পোখলা গ্রামের আহম্মদ হোসেন। তিনি কবিগান কমই করেন, তবে ভালো বাঁধনদার ছিলেন। তাঁর শিষ্য পরোটা গ্রামের রাখালচন্দ্র বায়েনের নাম জানা যায়। লাভপুর থানার সাওগ্রামের রামেশ্বর কাহার রাখালের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। রামেশ্বরের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার ফকিরচন্দ্র আদিত্য। ফকিরচন্দ্রের পুত্র তারাপদ আদিত্যেরও কবিগানে দক্ষতা ছিল।

মহম্মদ কেনাতুল্লা (১৮৫৩-১৯৬২) : নানুর থানার পালিটা গ্রামের মহম্মদ কেনাতুল্লার পিতা মহঃ সাহেবজান, মাতা আবেজান বিবি। তিনি কবিগান, শ্যামাসংগীত, পাঁচালি প্রভৃতি গান লেখেন ৬৫ বৎসর বয়সে। বাঁধনদার হিসাবেই তাঁর খ্যাতি ছিল বেশি, কবিগান গাইতেন কম।

অটলবিহারী দাস (১৮৬০-?) : বারাগ্রামের কাছে জ্যেঠা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র বিভূতিভূষণ দাসেরও কবিগানের দল ছিল।

এ যুগের একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হাটসেরান্দী গ্রামের **রামতারণ মণ্ডল** (১৮৬০-১৯২৬)। গ্রামের ভজহরি পোদ্দার কবিগানে তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি করেন। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে তারণ মণ্ডলের ঝুমুরগান সন্নিবেশিত হয়েছে। রামতারণ মণ্ডলের প্রায় ২৬ খানি গান সংগৃহীত হয়েছে।

এছাড়া এ যুগের **নিত্যগোপাল ঠাকুর** (১৮০৫-১৮৭৫) নলহাটি থানার ভদ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আর নিত্যগোপালের সমসাময়িক ও প্রতিযোগী উদয় মালের নাম জানা যায়। উদয় মাল ওই অঞ্চলের কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের গান উচ্চমানের ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৬১-১৯০০)

কবিগান :

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের (১৮০১-১৮৬০) কবি-ওয়ালাদের গানে আধুনিকতার সূচনা হলেও মূল আশ্রয় ছিল

প্রাচীন ধারার পৌরাণিক বিষয়বস্তু এবং পুরাতন আঙ্গিক। নিতাইদাস রায়, আহম্মদ হোসেন, রাখালচন্দ্র বারেন, মহঃ কেনাতুল্লা, রামতারণ মণ্ডল প্রমুখের গানে কিছু পরিমাণে আধুনিক যুগসমস্যা ও মানবিক আবেদনের ভাবচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিওয়ালাদের গানে পুরাতন আঙ্গিকের রূপান্তর ঘটতে থাকে, দশটি আঙ্গিকের সবগুলিই তাঁরা অনুসরণ করেননি ; সরলীকরণের দিকে ঝোঁক, মাত্র ৪/৫টি অঙ্গের ধারানুসরণ এবং বাঁধাগানের খাতা বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিক আসরে গান বেঁধে গাইতে শুরু করেন। নতুন নতুন বিষয় নিয়েও গান করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে জাতীয় জীবনেও নানা পরিবর্তন—ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। সাহিত্যেও স্বাধীনতার, স্বদেশপ্রেমের চেতনার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়। ধীরে ধীরে তার ভিতরে নরম ও চরমপন্থীর ভাগ হয়। এইভাবে কেউ আপস রফায়, কেউ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কবিগানেও স্বদেশীয়ানা ও যুগসচেতনতায় আধুনিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে থাকে। তবে তার গতি ছিল ধীর-মন্থর।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই জেলায় ৫১ জন কবিওয়ালার নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই **নবীনচন্দ্র মণ্ডলের** (১৮৬৩-১৯৩০) নাম করতে হয়। তিনি বর্তমান মাড়গ্রাম থানার কামাখ্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাশের গ্রাম দেখুরিয়া-উদয়পুরে 'ভবানীমঙ্গল' রচয়িতা গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। উভয় গ্রাম দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত ও কালীপূজার জন্য বিখ্যাত। উদয়পুরের কালীপূজায় শূকর বলিদান হয় এবং দেখুরিয়ার কালী উচ্চতায় দীর্ঘ, ছাদ নেই মন্দিরের। নবীনচন্দ্র কামাখ্যা গ্রাম ছেড়ে যৌবনে বীরচন্দ্রপুর সংলগ্ন গোপাড়া-সাহাপুর (গ্রাম পঞ্চায়েতের) অঞ্চলের শাসপুর গ্রামে আত্মীয়র বাড়িতে এসে ওঠেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বীরচন্দ্রপুরের রামমোহন মণ্ডলের কাছে তিনি কবিগান শিক্ষা করেন। তিনি সেকালের রীতি অনুসারে খাতা ধরে হাতঢোলের সাহায্যে কবিগান গাইতেন আসরে। তাঁর গানের ভাবা অমার্জিত ও তীক্ষ্ণ ছিল। উপস্থিতবুদ্ধি ও রঙ্গফুকারে আসর মাত করতেন। তিনি বীরচন্দ্রপুরের ভরত-শত্রুঘ্নের সঙ্গে, কড়কড়িয়ার পুলিন চক্রবর্তীর ও গোপাড়া-সাহাপুরের জানকী মহারাজের এবং মুর্শিদাবাদের হরিনারায়ণ দে, সৃষ্টিধর প্রধানের সঙ্গে কবির পাল্লা দেন। তাঁর কোনো গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর পর বংশধরেরা তাঁর গানের খাতা গঙ্গাসলিলে বিসর্জন দেন।

পাঁচকড়ি ও রাখালচন্দ্র মণ্ডল : এঁদের নিবাস ছিল নলহাটী থানার ব্রাহ্মণী নদীতীরস্থ এক লোকচরিত্রগত নিন্দাসূচক গ্রাম নাককাটিপাড়ায়। 'নাককাটি' একটি বৌদ্ধ উপদেবতার নাম। তেমনি পার্শ্ববর্তী 'বুককেশরী' (খয়রবোনা) তলায় মেলার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধমূর্তি ভাঙাচোরা পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে নবীন লম্বোদর-গুমানীর কবির লড়াই হয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়া মহম্মদবাজার থানার গোঁসাইপুর গ্রামের ফণীভূষণ মজুমদার (মাঝিগ্রামের ভূদেব মজুমদারের শিষ্য), নানুর থানার পোত্তর গ্রামের শচীনন্দন ঘোষ, গোষ্ঠ বাগদি, হরিপদ সাহা, গোপাড়া-সাহাপুরের জানকী মহারাজের সঙ্গেও লম্বোদর-গুমানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এঁদের মধ্যে জানকী মহারাজ ওস্তাদ কবিওয়ালা ছিলেন। লম্বোদর চক্রবর্তীর পাঁচ গুরুর অন্যতম জানকী মহারাজ আসরে মুখে মুখে গান রচনা করতে পারতেন। লম্বোদর-গুমানী-দেবেন দাস প্রমুখ সকলেই এই প্রবীণ কবিওয়ালাকে শ্রদ্ধা-সমীহ করতেন।

জানকী মহারাজ (রায়) (১৮৬৯-১৯৪৯) : ইনি জাতিতে ভট্ট-ব্রাহ্মণ, মুর্শিদাবাদ জেলার দোপুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গয়ানাথ রায়, পিতামহ বংশীবদন, প্রপিতামহ খুশাল। খুশালের পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে রাধাকৃষ্ণ ও ছয়কড়ি। প্রথম যৌবনে তাঁর বিয়ে হয় তারাপীঠ সন্নিকট গোপাড়া-সাহাপুরে সরোজিনী দেবীর সঙ্গে। বিবাহের পর জাতি-কলহের বিড়ম্বনা এড়াতে স্বগ্রাম ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাই গোপাড়া-সাহাপুরের অধিবাসী হয়ে যান বংশানুক্রমে। তাঁর কবিখ্যাতি ঈর্ষণীয়। তাঁর দুই পুত্র কিশোরীমোহন রায় ও মদনমোহন রায় বিখ্যাত কবিওয়ালা এবং মদনমোহনের পুত্র সুকুমার রায় বর্তমানে কবিগান করেন। লম্বোদর-গুমানী-দেবেন দাসের গানের আসরে জানকী মহারাজ অমীমাংসিত গানের মীমাংসা করে দিতেন।—'এঁরা গানের জানে না কিছু, কদুকে বলছে কচু' বলে। তাঁরা এঁর কথা মেনে নিতেন। মাড়গ্রামে এক কবিগানের আসরে গুমানী কৌতুক করে বলেন—

মাড়গ্রামে কলার পেকেছে, একে কে করেছে আমন্ত্রণ,
কোথা থেকে চলে এলো এক ঘটিবাজা ব্রাহ্মণ।

মুসলমানপ্রধান মাড় গ্রামে 'কলার' বলতে গোমাংসের ইঙ্গিত বুঝে তিনি গুমানীকে বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ গোদুগ্ধ, গোময়, হাড় ও চামড়ার ভাগ নিয়ে খেতে, পবিত্র হতে এবং চাষের কাজে হাড় এবং উৎসবে ঢোল বাজার যন্ত্রে চামড়া ব্যবহার করে জয় ঘোষণা করতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাৎক্ষণিক উত্তরে গুমানী এ নিয়ে আর প্রশ্ন করেননি। 'টুট্টুরে বামুন' জানকী মহারাজকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আর লম্বোদরের কবিগানের অন্যতম গুরু হিসাবে একদা হতাশ কবিকে উৎসাহ দেন এই জানকী মহারাজ। লম্বোদর শ্রদ্ধাভরে জানকীকে 'খুড়ো' বলে সম্বোধন করতেন। এসব আমার নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা বাস্তব ঘটনা। তাঁর অনেক গান সংগৃহীত হয়েছে। এখানে রাধার মানভঞ্জনের একটি গানের অংশ উদ্ধৃত হল।

আদিবাসী লোকনৃত্য ও বাদন

সৌজন্যে : গোপা বসু শেঠ

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি 'বহুরূপী'

সৌজন্যে : গোপা বসু শেঠ

(ত্রিপদী ছন্দে)—

......রাধার প্রাণান্ত পণ হেরব না কালাবরণ
কুঞ্জ হতে দিল বাহির করে।
তখন শ্যাম নটবরে ভেসে যায় আঁখি নীরে
কাঁদতে কাঁদতে যায় রাধাকুঞ্জের তীরে।
কুঞ্জে রাধায় ভেদ নাই অন্তরে জেনে কানাই
ধীরে ধীরে আসিলেন তখন।
হা রাধা হা রাধা বলে ভাসাব রাধাকুঞ্জের জলে
এ প্রাণ দিব বিসর্জন॥

'পদ'টি মানের একটি সার্থক নিদর্শন। মানবিক আবেদন ব্যক্ত পৌরাণিক বিষয় নিয়েই। নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতির' ধারানুসরণে জানকী রায় গেয়েছেন—

'জাত যাবে জাত যাবে বলে দেশে পড়ল হৈচে।
আমি বিশ্ব মাঝে বেড়াই খুঁজে জেতের তত্ত্ব পেলাম কৈ॥'

গানের অংশটিতে লালন ফকিরের ভাবটিও মিশে গেছে। —শিক্ষিত বাঙালিবাবুদের বাবুগিরি ও কর্মভোগের বিরুদ্ধে তাঁর আক্ষেপটিও অন্য একটি গানে ধরা পড়ে।

'এল বিলাসিতা রোগ, দিল অলসতাযোগ,
বঙ্গমায়ের ছেলেগুলোর কেমন কর্মভোগ।
ভাই রে তিন পয়সার ফুটুকবাবু, আমরা সবে সেজেছি॥'

ইংরেজ শোষণের কথাও বলেন—

'সতেরশো সাতান্ন সালে পলাশীর আমবাগানে
বদনে কালিমা মেখে লুকালো মা কোনখানে।
সেদিন হতে ভারতবাসীর সুখ-রবি ডুবিল,
বিদেশি বণিকের হাতে আমাদের পরাণ গেল॥
শোষকের পাল্লাতে পড়ে গায়ের রক্ত ক্ষরিল
জীয়ন্তে হয়েছি মরা কি আছে মোদের বল॥

—এই সব সুরে আধুনিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

আশি বৎসর বয়সে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা, নাতি-পুতি ও বহু শিষ্য-প্রশিষ্য রেখে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন রাত্রি ৩টায় সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অপ্রধান কবিওয়ালাদের মধ্যে মাড়গ্রাম থানার কৈড়ো-বেলের যুগল মণ্ডল, বড় কার্তিক চুর্ড়ির বাঁকু সরকার, শশীভূষণ মণ্ডল, দুবরাজপুর থানার পাঁচড়া গ্রামের হরি বাউরী, নানুর থানার পোস্তর-জয়কৃষ্ণপুরের গোলকচন্দ্র সাহা, আতকুলা গ্রামের বিনোদ মেটে, দাসকল গ্রামের যোগেশ বাগদি, পাড়ুই থানার অধীন শিরশিট্টা গ্রামের মাসম আলি ও আব্দুল আজিজ, রাখহরি কর্মকার উল্লেখ্য।

ওই গ্রামের অবিনাশচন্দ্র দাসবৈরাগ্য (১৮৭১-১৯১১) একজন বিশিষ্ট কবিওয়ালা। তাঁর পিতা নবীনকিশোর দাসবৈরাগ্য। তাঁরা রাওতড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রামে গোস্বামীবংশীয়া এক যুবতীকে ভালোবেসে বিয়ে করে গ্রাম ছাড়েন এবং শিরশিট্টার গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সেখানে বসবাস শুরু করেন। তিনি হাটসেরান্দীর রামতারণের কাছে কবিগান শিক্ষা করেন এবং যশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পাল্লাদার ছিলেন জীবন উড়ে এবং বন্ধু ও শিষ্য ফকির বাউরী (১৮৭৩-১৯৩৫)। অবিনাশের পুত্র রজনীকান্ত ও নাতি লক্ষ্মীকান্ত কবিগানে আরো যশস্বী হন।

ফকিরচন্দ্র বাউরীর হাতে লেখা ৩৭টি গানের সংকলন পাওয়া গেছে। তাঁর বাড়ি ছিল দুবরাজপুর থানার 'কান্তরি' গ্রামে। কান্তরির গরুর হাট আজও ফাঁকা মাঠে বসে। তাঁর নাম (ডাকনাম) 'ফকরে বাউরী'; চলতি কথার গানে তাঁর খ্যাতি ছিল। দুখু কাহার, বাবুলাল ডোম, আশুতোষ হাজরা, ছকু হালদার, চরণমতি ডোম, তাপাসপুরের ঈশান মাল প্রমুখ এ জেলার অন্যান্য অন্ত্যজ কবিওয়ালারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুখু কাহারের (১৮৮০-১৯৪৫) বাড়ি ছিল বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ ময়নাডাল (খয়রাসোল থানা) এবং হরি বাউরীর শিষ্য বাবুলাল ডোমের (১৮৮০-১৯৪০) বাড়ি ছিল খয়রাসোল থানার পলপই-এ।

কিশোরীমোহন রায় (১৮৭৩-১৯৩৮) : তিনি বরুলের রাজপুতবংশীয় নিতাইদাস রায়ের ভাগিনেয় মাধব দাসের পুত্র ছিলেন। তিনি উত্তম গান বাঁধতে পারতেন। লাভপুর থানার সিদ্দল গ্রামের অধুনা শীতল গ্রামের শম্ভু বাজিকর নামে একজন কবিওয়ালার নাম জানা যায়। অনুমান, তিনি উনিশ শতকের এই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। ওই সময়ের আর একজন কবিওয়ালা উপেন্দ্রলাল চক্রবর্তী (মৃত্যু ১৯৫৮) কুনুরী গ্রামে (সিউড়ি-সাঁইথিয়া রোডে) জন্মগ্রহণ। তাঁরই পুত্র লম্বোদর চক্রবর্তী বিংশ শতাব্দীর বীরভূমের সেরা কবিওয়ালা। তিনি কুনুরী ছেড়ে পত্নী শরদিন্দু নিভাননীকে সঙ্গে নিয়ে খরুণ গ্রামে (রামপুরহাট থানায়) গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ভরতচন্দ্র (১৮৮১-১৯৩৫) ও শত্রুঘ্ন মণ্ডল (১৮৮৫-১৯৪০) : ছবিলাল মণ্ডলের (বীরচন্দ্রপুর, ময়ূরেশ্বর থানা) পুত্রদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্ন পৌরাণিক ধারার প্রাচীনপন্থী কবিওয়ালা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। একটা খাতায় ভরতের ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি গান ও 'লবকুশ' পালা পাওয়া গেছে। তিনি তৎকালীন অধিকাংশ কবিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এ সময়ে বক্রেশ্বরের পাশে গোহালিয়াড়া গ্রামের রাখাল বাগদি শিষ্য সীতানাথ বাগদি ও মুকুন্দ বাগদিকে নিয়ে কবিগানের দল গড়েন। রাখাল পরে ইলামবাজার থানার শলকা গ্রামে গিয়ে বাস করেন। তাঁদের দলে ছিলেন ছকু হালদার। সীতানাথের কবিগান শুনে কাশীনাথ বাগদি (পিতা : মহেন্দ্র) এবং ওই গ্রামের ব্রাহ্মণবংশীয় অনিল পৈতণ্ডী কবিগানের প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে নিজ দল খোলেন। এই সময় ইলামবাজার অঞ্চলে মতিলাল ডোম নামে একজন কবিওয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর কোনো পরিচয় জানা যায়নি।

বোলপুর-পালিতপুর বাসরুটে সরিষা-পালুন্দী গ্রামে যোগেশ ঘোষ (১৮৮৮-১৯৫৩) সদ্‌গোপবংশীয় একজন কবিওয়ালার নাম জানা যায়। তখন খয়রাসোলের বাবুইজোড় গ্রামের রজনী ডোম (১৮৯০-১৯৪৫) এবং দাঁড়কা গ্রামের (লাভপুর থানা) কিশোরী কোঁড়া বা কুনাই (১৮৯২-১৯৬৮) কবিগানে বেশ খ্যাতিলাভ করেন।পিতা হরিশ্চন্দ্র, মাতা মেগনবালা । গুরু কেনারাম। তাঁর প্রথম পাল্লাদার ছিলেন রামকাটার রামপদ বাগদি এবং দ্বিতীয় পাল্লাদার রূপালীচাঁদপুরের সুবল মাল। তাঁর কবিগানের খ্যাতি জেলা ছেড়ে আশপাশের জেলায় বিস্তারলাভ করে। জেলার জানকী মহারাজ, রজনী দাস, লম্বোদর, শিবশঙ্কর পাল, মুর্শিদাবাদের রাঘব সরকার, গুমানী দেওয়ান, বর্ধমানের চাঁদ মহম্মদ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সিউড়ি বড়বাগানের মেলায়, বিদ্যাসাগর কলেজে, শান্তিনিকেতনের মেলায়, কাশিমবাজারে, কলকাতার বউবাজারে তাঁর বিশেষ আসরে সমাদর হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে এবং সিউড়ি সারদা মেলায় তিনি চারণকবির সম্মান ও প্রশংসাপত্র লাভ করেন এবং ঝামাপুর, শ্রীখণ্ড, বোলপুর হাইস্কুল প্রভৃতি আসরে রৌপ্যপদক লাভ করেন। উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট ওস্তাদ কবিওয়ালা হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বর্ধমান জেলার ভগীরথ মণ্ডল, মধুসূদন ঘোষাল, কমলকৃষ্ণ দাস, নাড়ুগোপাল ঘোষ, নদিয়া জেলার সৃষ্টিধর বাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার গণপতি ও নরপতি দাস এবং এই জেলার শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা, নিমাই কুণ্ডু জগন্নাথ বৈরাগ্য, বলাই মণ্ডল, লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল প্রমুখ উল্লেখ্য। কবিগান করে তিনি সাংসারিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর পুত্র কাশীনাথ কবিগান করতে করতে ছেড়ে দেন। তাঁর অনেক গান পাওয়া গেছে। গানগুলি উন্নত শ্রেণির। এখানে একটা জাগরণী গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। গানটি স্বাধীনতার পর লেখা :

'শুদ্ধ যে স্বাধীনানন্দ, পাবে সেদিন সে আনন্দ,
ছন্দে ছন্দে মিলন দ্বন্দ্ব, রক্তে রক্ত চলাচল॥

* * *

শুদ্ধভাবে সদাই ভাব বাপুজি আর নেতাজি,
বোড়ের চালে কিস্তি কাবার, মাত্‌ হবে সুখের বাজি॥
কিশোরী কয়, লক্ষ্য যাহার সূক্ষ্মভাবে করবে বিহার,
মিলবে তাহার উপহার, আনন্দ অমৃত ফল॥'

—আনন্দ অমৃত ফল তেমন না ফলুক, দেশের স্বাধীনতালাভে কবি সেদিন বলেছিলেন আশার আনন্দে—'বন্দে মাতরম্ রবে কাঁপাও সবে হিমাচল।' হাল আমলের ভাগচাষের আইনের কথাও অন্য একটি পদে আছে :

'চলবে না আর চুষে খাওয়া
দিন এসেছে চষে খাওয়া, বিশ্বশান্তিদানে।
.....ভাগচাষের আইন পাশে
ভদ্র চাষী নামল চাষে,
নতুন ধারা ভেসে আসে
কালের তুফানে॥'

আবার তেরশো ছেষট্টি সনে ময়ূরাক্ষী-অজয়ের প্লাবনে ৯টি জেলা ভেসে গিয়েছিল। সে দুর্দশার কথাও তাঁর গানে ভেসে ওঠে :

'.....প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত, নয়টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত,
স্বাধীন সরকার সে সমস্ত, জানাইল সারাৎসারা॥'

এই শতকের অন্যান্য কবিওয়ালাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা গ্রামের কালীপদ ভাণ্ডারী ওরফে বিভূতিভূষণ দাস (১৮৯৪-১৯৬৬), ইলামবাজারের গোলটিকুড়ির আশুতোষ হাজরা (১৮৯৫-১৯৫৪), নলহাটী থানার রহড়া গ্রামের রাধারমণ দাস (১৮৯৫-১৯৫৫), কুড়মিঠার রত্নাকর স্বর্ণকার, রামপদ বাগদি (১৮৯৫-১৯৮১) ও পূর্বোক্ত রজনীকান্ত দাসবৈরাগ্যের (১৮৯৮-১৯৬০) নামোল্লেখ করা যায়। এঁদের মধ্যে রজনীকান্ত আর একজন ওস্তাদ কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁরও অনেক গান সংগৃহীত হয়েছে। পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে গান ছাড়াও সমসাময়িক সমাজ বিষয়ে ও স্বদেশমূলক অনেক গান লেখেন। এই জাতীয় নানা বিষয়ক ৪৭টি গান এবং একটি রাম-রাবণের পালা সম্পূর্ণ (৫৯ পৃষ্ঠার) উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি পাওয়া গেছে তাঁর শিষ্য সুরুলের পঞ্চানন দাসের বাড়ি থেকে। তিনি গরিবদের পক্ষে গেয়েছেন :

'মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার কি সুখ আছে।
স্বার্থ দেশে অর্থ বিনা কেউ ঘেঁসে না তাঁর কাছে॥
মানুষ মানুষ সবাই মানুষ নশ্বর কেবল নাম,
পাতু খেতু জিতু সুবল যদু মধু শ্যাম॥'

তিনি মৃত্যুকালে (১৯৬০) তিন পুত্র ও অসংখ্য শিষ্য রেখে যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার আদর্শে কবিগান করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ কর্মকার, পঞ্চানন দাসবৈরাগ্য, অঞ্জনকুমার সাহা, মনোহর রুইদাস, ভোলানাথ গড়াই, কালীপদ দাসের নাম করা যায়। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিওয়ালাদের মধ্যে মল্লারপুর-গোয়ালার জগন্নাথ মণ্ডল, সুরেন্দ্রনাথ ডোম, খরুণের সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী ও ফুলচাঁদ ডোমের নাম জানা যায়।

এ যুগের কবিওয়ালাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শক্তিমান ওস্তাদ কবিওয়ালার আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা যুগচেতনাকে লোকমানসে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন অনেকখানি।

বিংশ শতকের বীরভূমের কবিওয়ালা ও কবিগান :

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভাঙা বাংলা জোড়া লাগে। কিন্তু ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়াটা বাংলার ক্ষেত্রে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলার কবি-নাট্যকার-সাংবাদিক-সাংস্কৃতিক কর্মিবৃন্দকে যেভাবে আলোড়িত করে এবং ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে সামনের সারিতে এনে দেয় তাতে বাঙালিজাতির সর্বভারতীয় মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু পরে ১৯১৯ এবং ১৯২১ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন গান্ধীজি। তিনি অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, তারও আগে লবণ আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাঙালি নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালে কলকাতা-কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন সম্মেলন নজরুল-দিলীপ রায়-সুভাষচন্দ্র প্রমুখকে এগিয়ে দিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাঙালির গুরুত্ব কিছুটা বাড়ে। একা সুভাষচন্দ্রই দেশে ও দেশের বাইরে যে আন্দোলন ও ইংরেজ শাসন মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করেন তাতে বিশ্বের কাছে বাঙালির গৌরব বাড়ে। আই পি টি এ, মুকুন্দ দাসের স্বদেশি যাত্রা দল এবং বিভিন্ন কবিওয়ালার গান সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণে জাতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও ইংরেজ-বিদ্বেষকে গণচেতনায় সঞ্চারিত করে দেয়। বিশেষ করে কবিগানে আঙ্গিকের ওপর জোর না দিয়ে আধুনিক বিষয়বস্তু সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-চেতনা সৃষ্টির কাজে কবিগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বিংশ শতকের কবিগানে এই দিকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলা যায়। এই পরিবর্তনকে লালন করেছেন বিংশ শতকের বীরভূমের প্রায় ১৩০-১৩৫ জন কবিওয়ালা বা লোককবি, গুমানীর কথায় চারণকবি।

আই পি টি এ, মুকুন্দ দাসের স্বদেশি যাত্রা দল এবং বিভিন্ন কবিওয়ালার গান সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণে জাতীয় চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও ইংরেজ-বিদ্বেষকে গণচেতনায় সঞ্চারিত করে দেয়। বিশেষ করে কবিগানে আঙ্গিকের ওপর জোর না দিয়ে আধুনিক বিষয়বস্তু সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-চেতনা সৃষ্টির কাজে কবিগান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বিংশ শতকের কবিগানে এই দিকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলা যায়।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কবিগানের শুরুতে আসর-বন্দনায় সরস্বতী-বন্দনা, ভবানী-বন্দনা ও ইষ্টগুরু-বন্দনার সঙ্গে জনগণেশ শ্রোতৃমণ্ডলীর বন্দনা করার রীতি শুরু হয়।

.....'আজ এই সুধীজনের সভায়
একে একে বলে যাই—
পাল্লাদারের ইচ্ছামত
শুনুন যত শ্রোতৃবৃন্দ,
বীণাপানির আশীর্বাদে
দশজনারি মনসাধে
আমি অবতীর্ণ 'ভক্তি'র ভূমিকায়।'......

কবির লক্ষ্য এখানে 'দশজন'। দেববাদের পাশে মানবতাবাদের অনুসরণ আধুনিক কবির এবং কবিওয়ালারও লক্ষণ। তেমন ভাববাদ থেকে যুক্তিবাদ ও বাস্তব সমাজ পটভূমিকা অনুসরণেও উত্তরণ ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে কলকারখানার ঠনাঠন শব্দে যখন কর্মের ও ধর্মের মানুষের মিছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা যোগাতে এবং 'ভগ্ন বুকে' আশা ধ্বনিত করার জন্য চারণকবির দলও গান করেন গ্রাম-শহরে। এঁদের মধ্যে বিংশ শতকের সেরা কবিওয়ালা লম্বোদর চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৬৯) বিংশ শতকের প্রথম ঊষার আলোরাগে আবির্ভূত হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বীরভূমে এবং গুমানী দেওয়ানের প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে এবং রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া প্রমুখের প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে এবং তাঁদের মিলিত প্রয়াসে সারা অখণ্ড বঙ্গে নতুন ধারার কবিগানের সুরে বাংলার জনগণ আন্দোলিত হয়। বলা যায়, এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীতে কবিগানের নবজন্ম হল।

লম্বোদর চক্রবর্তী ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ৮ পৌষ শুক্রবার মাতুলালয় মল্লারপুর সন্নিকট গোয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সদ্য তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর পৈত্রিক নিবাস খরুণে। পিতা উপেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, মাতা শরদিন্দু নিভাননী। মাতা অপেক্ষা লম্বোদর মাতামহীর মাসীমা কমলা দেবীর স্নেহেই

বেশি মানুষ হয়েছিলেন। গোয়ালায় তাঁর জীবনের ৩৫টি বছর অতিবাহিত হয়। তখনই তিনি ফতেপুর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরে সংস্কৃত পড়েন টোলে। কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতাও করেন পাঠশালায়। ১৩২৬ সালে তাঁর বিবাহ হয় আনন্দময়ী দেবীর সঙ্গে গোয়ালার ডোমপাড়ায় লেটো-ঝুমুরগানের দলের আসরে গিয়ে বসতেন। তিনি টোলের পণ্ডিতমশাই মোহিনীমোহনের (ভট্টাচার্য) কাছে সংস্কৃত ও পৌরোহিত্য শিক্ষা করেন। আর শিক্ষক রঘুনাথ মণ্ডলের কাছ থেকে সাহিত্যরসের জোগান পান। এই সব মিলে তিনিও 'ঠাকুরমশাই' হয়ে ওঠেন। অন্যান্য কবিওয়ালারা তাঁকে ওই নামেই সম্বোধন করতেন।

তাঁর জীবন বিচিত্র। তিনি স্ত্রী আনন্দময়ীকে নিয়ে গোয়ালা থেকে খরুনে চলে আসেন। সাতসিকের পণ্ডিতী ছেড়েই আসেন। রামপুরহাটে রেল স্টেশনে চাকরিতে ঢোকেন। তখন অফিসের প্রভাত ভাণ্ডারী (ব্রাহ্মণী গ্রাম, রামপুরহাট), করিম মিঞা ও প্রাক্তন এম এল এ গোবর্ধন দাস (গোয়ালা) সহকর্মী হিসাবে সুমধুর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে তাঁকে কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁর এ চাকরি বেশিদিন টেকেনি। তিনি পরে শুরু করেন পৌরোহিত্য ও সাইনবোর্ড লেখার পেশা। কিন্তু এতে সংসার চলে না। তখন গ্রামের জমিদার অম্বুজাক্ষ রায়ের সহযোগিতায় রামপুরহাটের অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটা চাকরির অনুরোধ জানান। উদারপ্রাণ জিতেন্দ্রলালের সুপারিশে তিনি রিলিফ বিভাগের পে-মাস্টারের চাকরি পান। পথের কাজে কুলি-মজুরদের জীবন থেকে চারণকবি হওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করেন লম্বোদর। কিন্তু রিলিফ বিভাগের কাজও তাঁর বেশিদিন থাকল না। তখন পিতা উপেন্দ্রলালের (বাঁধনদার) সহায়তায় লম্বোদরের সম্বন্ধী খরুনের সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী কবিগানের দল চালাতেন। সেই দলে লম্বোদর সহযোগী হলেন। মাঝে মাঝে লম্বোদর আসরে গাইতে ওঠেন। ক্রমশ তিনি কবিগান গাইতে শেখেন। এককথায় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা চারণকবি লম্বোদর চক্রবর্তীর এইভাবে হাতেখড়ি হয়।

> বিংশ শতকের সেরা কবিওয়ালা লম্বোদর চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৬৯) বিংশ শতকের প্রথম ঊষার আলোকরূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বীরভূমে এবং গুমানী দেওয়ানের প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে এবং রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া প্রমুখের প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গে এবং তাঁদের মিলিত প্রয়াসে সারা অখণ্ড বঙ্গে নতুন ধারার কবিগানের সুরে বাংলার জনগণ আন্দোলিত হয়। বলা যায়, এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিংশ শতাব্দীতে কবিগানের নবজন্ম হল।

স্বাধীনভাবে কবিগানের প্রথম পালা শুরু করেন প্রতিদ্বন্দ্বী সাঁইথিয়া থানার মাঝিগ্রামের ভূদেব মজুমদার ও পরে মহম্মদবাজার থানার বিরাজপুরের গোপাল লেটের সঙ্গে। তখন রামপুরহাট থানার প্রবীণ কবিওয়ালাদের মধ্যে ভরত-শত্রুঘ্ন, নবীন মণ্ডল, পুলিন চক্রবর্তী, আশুতোষ সাহা, জানকী মহারাজ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে জানকী মহারাজ সবচেয়ে ওস্তাদ কবিওয়ালা। লম্বোদর কবিগান করতে করতে হতাশায় ভোগেন, আর্থিক কষ্টে পড়ে রামপুরহাটে ধানের আড়ত করেন। তখন জানকী মহারাজ তাঁর কাঁটাহুন্দর গুটিয়ে তাঁকে পর পর ৬ রাত্রি কবিগানের আসর দিয়ে উৎসাহ দিলেন। লম্বোদর জানকী খুড়োকে তৃতীয় গুরুরূপে বরণ করলেন। প্রথম গুরু তাঁর পিতা, দ্বিতীয় গুরু সম্বন্ধী সত্যকিঙ্কর আর তৃতীয় গুরু জানকী মহারাজ। পর পর ৬ পালা গান করলেন কান্দীতে ও আশপাশের আসরে। যা টাকাকড়ি পেলেন বাড়ি ফিরে স্ত্রী আনন্দময়ীর হাতে তুলে দিলেন। শুরু হল কবিগানে নবীন পান্থের উল্লাসময় জয়যাত্রা, যা আর কোনোদিন থামেনি। এই জয়যাত্রায় সারথি জানকী মহারাজ।

আবার একদিন ডাক পেলেন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি তখন বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৩৪৫ সাল। রামপুরহাটে মেলায় কবিগানের পালা হবে গুমানী ও দেবেন দাসের (বলানপুর, মুর্শিদাবাদ) কোনো কারণে দেবেন দাস আসতে পারেননি ; জিতেন্দ্রলাল গুমানীর পরামর্শে খরুন থেকে লম্বোদরকে ডেকে পাঠান। সেদিনটি আধুনিক কবিগানের ইতিহাসে নতুন যুগলবন্দী, যেন বাংলা সাহিত্যে পদাবলী সাহিত্যের দুই যুগন্ধর পদকর্তা চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মহামিলন—লম্বোদর-গুমানীর কবিগানের শুভ সূচনা। সেদিন পালা ছিল 'লক্ষ্মী-সরস্বতী'। যুগলবন্দীতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর শুভদৃষ্টি হল। দুজনেই সরস্বতীর জ্ঞান ও কবিগানে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে পেলেন, বাংলার লোকসংস্কৃতিতে ঘটল নবতর সমৃদ্ধি ও গুণগত সমুন্নতি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যখন কলকাতার রাস্তায় গ্রামের নিরন্ন মানুষের ডাস্টবিনে কুত্তার সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের চিত্র এঁকেছেন কবিরা, পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনের জন্য শিকল ছেঁড়ার গান রচনা

করেছেন, তখন গ্রামবাংলার চারণকবিরা তার অংশীদার হয়েছিলেন। লম্বোদর-গুমানী ও পরবর্তী আরো কবিওয়ালা তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁরা ডাক পেলেন ১৩৫০ সালে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি-লেখক সম্মেলনে। পূর্ববঙ্গের প্রবীণ রমেশ শীলও সে সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লম্বোদর-গুমানী কলকাতার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে ডাক পেতেন। লম্বোদর মাঝে দু-তিন বছর যেতে পারেননি।

লম্বোদর চক্রবর্তীর চারণকবি-জীবনের প্রধান দুটি ভাগ— প্রথম দশ বছর প্রস্তুতি পর্ব, কলকাতা যাওয়ার আগে পর্যন্ত। এই পর্যায়ের গান অধিকাংশই পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতা ও বহির্বঙ্গের আসরে গানের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে—দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে রচিত।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে খরুনের জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কামাখ্যার হরেকৃষ্ণ দাস, মুর্শিদাবাদ জেলার ঝিল্লিখাসপুরের শরৎচন্দ্র দাস, নদিয়ার সুরেন্দ্রনাথ সরকার, বেণুকর মণ্ডল (গোপীনাথপুরের) প্রমুখ উল্লেখ্য। বীরভূমের আরো অনেকে তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন। পুত্রদের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখর কিছুদিন পাঁচী গেয়ে ছেড়ে দেন। কনিষ্ঠ পুত্র তুষারকান্তি কবিগান করতেন। তাঁরা কেউ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না।

তিনি বিংশ শতকের বহু অনুজ চারণদের সঙ্গে কবিগান করেন। তার মধ্যে কিশোরীমোহন ঘোষ (১৯০২-১৯৭০, রাজগ্রাম), রসার মনীন্দ্র ডোম (১৯০৩-১৯৬৮, রসা), চৌহাট্টার শিবশঙ্কর পাল (১৯০৪-১৯৮০), বাবুইজোড়ের গোবিন্দচন্দ্র ডোম (১৯০৫-১৯৭১), আমডোলের অনাদিভূষণ মণ্ডল (১৯০৫-১৯৮৬), হীরাপুর-চৌহাট্টার কালীপদ মেটে (১৯০৬-১৯৮৫), গোবিন্দপুর-নলহাটীর শুকদেব ভাণ্ডারী (১৯০৭-?), আমজোড়ার পুলিন বাগদি, ফুলুরের বিভূতিভূষণ মণ্ডল, রামপুরহাটের তারাপদ আদিত্য (১৯১১-১৯৮৭), সুরুলের পঞ্চানন দাসবৈরাগ্য (১৯১২-১৯৭২), কাঞ্চননগর-সাঁইথিয়ার রমাপদ মণ্ডল (১৯১২-?), পোপাড়া-সাহাপুরের কিশোরীমোহন রায় (১৯১৪-১৯৭৩), চিরুলিয়া-সাঁইথিয়ার জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা (১৯১৫-?), বারার শ্রীপতিভূষণ দাস (১৯১৫-১৯৮৫), সন্ধ্যাজোড়ের শ্রীপতি মণ্ডল (১৯১৬-?), বীরচন্দ্রপুরের বটকৃষ্ণ চক্রবর্তী (১৯১৮-১৯৮৪), ঝাঁঝরা পরে সাঁইথিয়া নিবাসী রাধিকামোহন সরকার (১৯১৮-১৯৮৪), পলপই-এর রাধেশ্যাম ডোম, জানুরীর অঞ্জনকুমার সাহা (১৯২১-১৯৮১), সর্বশীডাঙ্গা-ভদ্রপুরের অর্কেন্দুভূষণ রায় (১৯২২-?), শিরশিট্টার লক্ষ্মীনারায়ণ দাসবৈরাগ্য (১৯২৩-১৯৮১), ঝিল্লি পরে পাইকপাড়া-নলহাটী নিবাসী শরৎচন্দ্র দাস (১৯২৩-?), তারাপুরের ভূদেব মণ্ডল (১৯২৬-?), পোপাড়া-সাহাপুরের মদনমোহন রায় (১৯২৭-১৯৮৪), কামাখ্যার হরেকৃষ্ণ দাস (১৯২৯-?), চিৎপুর-নানুরের অজিতকুমার ঘোষ (১৯৩০-?), পদ্মাৎপুরের হরিকিঙ্কর দাস (১৯৩৫-?), গোহালিয়াড়ার অনিলকুমার পৈতণ্ডী (১৯৩৫-?), বানিওরের জিতেন্দ্রনাথ নরসুন্দর (১৯৪০-?), খরুনের জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২-?) বাবার শেখ মহঃ সফিক (১৯৪২-?), খরুনের তুষারকান্তি চক্রবর্তী (১৯৪২-?), মোড়দীঘির লাভপুর ধ্রুবপদ মণ্ডল, মাঠবহড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল (১৯৪৬-?), আমোদপুরের মৃণাল আচার্য (১৯৪৭-?), ঘুসকিরা, মুরারই-এর আবুল কালাম (১৯৪৯-?), কয়েথার মতিয়র রহমান (১৯৫০-?), পাইকপাড়ার মহঃ খলিলুর রহমান (১৯৫০-?), মীরপুর ময়ূরেশ্বরের নীলরতন পাল (১৯৫১-?), ডিহিকোপার জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (১৯৫৩-?), ভালাসের তাপসকুমার ভাণ্ডারী (১৯৫৬-?), পোপাড়া-সাহাপুরের সুকুমার রায় (১৯৫৭-?), পূর্ণার হেমন্ত ঘোষ (১৯৫৭-?), বারার তোজেমল হক প্রমুখের নাম করা যায়। একেবারে নতুনদের মধ্যে বুজুং গ্রামের প্রণব দত্ত, হরি মাল, সুরুলের যাদব দাস, জাগার হাটপাড়ার হাসনের গঙ্গাধর মণ্ডলের নাম করা যায় যাঁরা কবিগান শুরু করেছেন কয়েক বছর।

এ যুগের কবিওয়ালাদের মধ্যে শিবশঙ্কর পাল, কিশোরীমোহন রায়, অর্কেন্দুভূষণ রায়, মদনমোহন রায়, তারাপদ আদিত্য, শেখ মহঃ সফিক, সুকুমার রায় প্রমুখ আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে যতই বেতার-টিভি-সিনেমা প্রভৃতি আধুনিক বৈদ্যুতিক প্রমোদের প্রসার ঘটছে, ততই ক্ষীয়মান প্রতিভার লোককবিদের কদরও কমছে। পৃষ্ঠপোষকের অভাবেও তাঁদের চর্চা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটছে না। সরকারি প্রচার মাধ্যম হিসাবে পরিবার পরিকল্পনা, জোতদার-বর্গাদার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁদের কাজে লাগালেও সবাই সুযোগ পান না। কবিগানের বর্তমান মান নিম্নমুখী বলা যায়।

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, হেতমপুর কলেজ
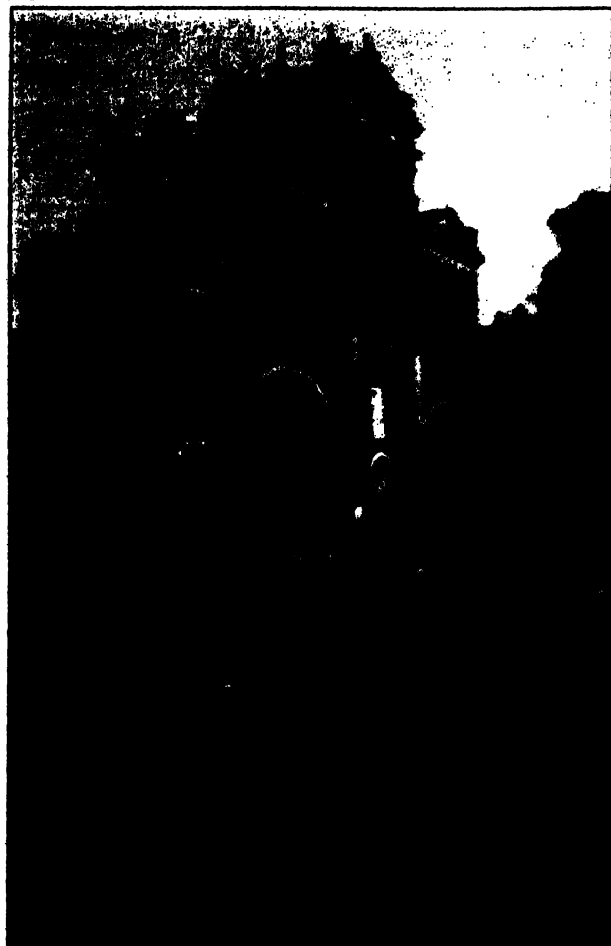
হেতমপুরের হাজারদুয়ারী তোরণ
ছবি : বিষ্ণুপ্রসাদ দাস

রায়পুরের গম্বুজ (সিউড়ি থানা)
ছবি : সুকুমার সিংহ

বীরভূমের কীর্তন ও যাত্রাগান

প্রভাতকুমার দাস

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব এবং পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস—তাঁদের আবির্ভাবের সময় এক না হলেও, পদাবলী সাহিত্যের বিকাশ-বিস্তার-প্রতিষ্ঠায় উভয়ের ভূমিকা বাঙালির সংস্কৃতিতে একটা বড়ো স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষত পদাবলী কীর্তনের যে প্রসার তার মূল ভিত্তি এঁদের রচনাকে অবলম্বন করেই আজও দাঁড়িয়ে আছে। পদাবলী সংগীতের প্রতি আবাল্য অনুরক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মন্তব্য করেছেন : 'বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস শ্রীগীতগোবিন্দ। কীর্তনের কথা বলিতে গেলেও শ্রীজয়দেব হইতে আরম্ভ করিতে হয়। জয়দেব মহাকবি, জয়দেব পরমভক্ত, পরম প্রেমিক। জয়দেব সংগীতশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ এবং পরমপ্রেমিক ছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতিটি গানে তিনিই তাল ও রাগের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত সেই ধারা চলিয়া আসিতেছে।' পিতা ভোজদেব ও মাতা বামদেবীর সন্তান জয়দেবের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে, তা সত্ত্বেও সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

'জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় মৌলিক কবি। সেকালের লৌকিক-সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃতে ঢালিয়া সাজিয়া ইনি দেবভাষায় অভিনব কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি এক হিসাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য-ভাষার আদিকবিও বটেন। ইহারই গীতিকবিতার আদর্শে বাঙ্গালাদেশে মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারাস্রোত নামিয়াছিল।' দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন—এই অনুমান সমর্থন করে তিনি বলেছেন : 'জয়দেব বাঙ্গালি ছিলেন—এই মতই সাধারণ্যে স্বীকৃত। তবে উড়িষ্যাতেও জয়দেবের ঐতিহ্য আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। জয়দেবের কোন কোন গানের ভণিতায় নিজেকে "কেন্দুবিল্বসম্ভব-রোহিণীরমণ" বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে তাঁহার অভিজন অথবা নিবাস ছিল কেন্দুবিল্বে।' আমাদের আদি যাত্রাগানের সঙ্গে *শ্রীগীতগোবিন্দ* কাব্যের রাধাকৃষ্ণ প্রণয়াখ্যানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও বাংলাভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। কাব্য ও নাটকের গঙ্গা-যমুনা মিলন হিসেবেও এই রচনাকে চিহ্নিত করে কেউ কেউ মনে করেছেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এই কাহিনী জনসমাজে লোকনাট্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের অভিমত : 'এমনও হইতে পারে যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লইয়া জনগণের মধ্যে যে যাত্রা বা লোকনাট্য পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল দরবারী কবি জয়দেব তাহাই রাজরুচি অনুযায়ী মার্জিত করিয়া সংস্কৃতে পরিবেশন করিয়াছেন।'

বীরভূমে জয়দেবের উত্তরাধিকার খুব সার্থকভাবে লক্ষিত হয়েছিল তাঁর উত্তরসূরি চণ্ডীদাসের মধ্যে। স্বভাবকবি চণ্ডীদাসের পদ শুনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভাবসমাধিস্থ হতেন। এই চণ্ডীদাসকে নিয়েও পণ্ডিত মহলে অনেক বিতর্ক আছে। সুকুমার সেন বলেছেন : 'চণ্ডীদাসের বাসস্থান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক জনশ্রুতি আছে। দুইটিরই প্রাচীনত্ব সমকালীন, অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। একমতে চণ্ডীদাসের নিবাস অধুনাতন বীরভূম জেলার অন্তর্গত নানুরে, অন্য মতে বিষ্ণুপুরের অল্প দূরে ছাতিনায়। প্রথম মতের সমর্থন পাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের রচনায়, দ্বিতীয় মতের সমর্থন ছাতিনায় বাশুলীতে। চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী ও সাধন সঙ্গিনী, তারা বা রামতারা বা রামীর উল্লেখও নানুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।' জয়দেব ও চণ্ডীদাসের রচনা যে বাঙালি সমাজে বিশেষত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল শুধু তাই নয়, বাংলা যাত্রার পালাতেও তাঁদের রোমাঞ্চকর প্রণয়কাহিনি রূপায়িত হয়ে নানা সময়ে আসরে-আসরে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে চলেছে আজও। প্রবাদ আছে, নানুরের নিকটে কীর্ণাহার গ্রামে রামীর সঙ্গে কীর্তন করার সময় নাটমন্দির ভেঙে পড়ে তাঁর দেহাবসান ঘটে। এমনও শোনা যায় গৌড়াধিপতির এক মহিষী চণ্ডীদাসের কীর্তনের মুগ্ধ শ্রোতা ছিলেন, সেই মুগ্ধতা নবাব সহ্য করতে পারেননি—ফলে তিনি গোলাবর্ষণের আদেশ দিলে নাটমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চণ্ডীদাসের প্রাণ নাশ হয়। কীর্ণাহারের কাছাকাছি নাগডিহি পল্লিতে চণ্ডীদাসের সমাধি আছে।

বীরভূমে কীর্তন গানের প্রসারের প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবগণ বহু কেন্দ্রে এবং বহু নতুন প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে শাস্ত্র ও সংগীতাদির শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ দুটি পুরাতন কেন্দ্র শ্রীখণ্ড ও কান্দরা এবং একটি নতুন কেন্দ্র ময়নাডাল। তিনটি বীরভূমে ছিল এখন থেকে প্রায় ১০৫ বৎসর আগে। বর্তমানে শ্রীখণ্ড ও কান্দরা বর্ধমানে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কান্দরা ময়নাডাল ও শ্রীখণ্ড মনোহরশাহী কীর্তনের তিন প্রধান কেন্দ্র। ময়নাডালের চতুষ্পাঠী কীর্তনের সংগীত ও বাদ্যশিক্ষা এবং শ্রীখণ্ডের চতুষ্পাঠী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য দর্শন, সংগীত ও বাদ্য শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।'

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে নিত্যানন্দ এবং তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র বীরভূমের কীর্তনগানকে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচক্রা গ্রাম, পিতা হড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে অগ্রজের মর্যদায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে সংসারে ফিরে দার-পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর পত্নী বসুধার গর্ভে বীরচন্দ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নাম্নী এক কন্যার জন্ম। বিবাহের পর পত্নী-সহ নিত্যানন্দ খড়দহে গিয়া বাস করেন, পরে জন্মভূমি একচক্রায় এসেছিলেন কিনা জানা যায় না। একচক্রা গ্রামে বীরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিম রায় বিগ্রহ আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অম্বিকা-নিবাসী সূর্যদাস সরখেল তাঁর দুই কন্যা বসুধা এবং জাহ্নবীকে নিত্যানন্দের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। জাহ্নবী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর জাহ্নবী দেবী তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খেতরীর বৈষ্ণব সম্মেলনে নেতৃত্ব দেন এবং যাজীগ্রাম যাত্রার পথে জাহ্নবী দেবী একবার একচক্রায় এসেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে এই খেতরীর উৎসব একটি স্মরণীয় ঘটনা। খেতরী উৎসব থেকেই লীলাকীর্তনের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়। এই মহোৎসব থেকে সুরের প্রণালী এবং বৈচিত্র্য অনুসারে কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ নির্দিষ্ট হয়। এই বিভাগ অনুসারেই বীরভূমের কীর্তনগান মনোহরশাহী ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষিত বীরচন্দ্র পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ

করে শ্রীচৈতন্যদেবের অভীপ্সিত কার্যসম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'পিতার মত বীরচন্দ্রও বৈষ্ণব ধর্ম-প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি এই প্রেমোচ্ছাস আচার্য সারা বাঙ্গালায় এবং বাঙ্গালার বাহিরে অকুণ্ঠ কণ্ঠে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। ...নাম সংকীর্তন ও লীলা কীর্তন-প্রচারে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অক্লান্ত প্রয়াস বৈষ্ণব ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। লীলাকীর্তনে ইঁহার আবেগের কথা শ্রীনরোত্তমবিলাসে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।'

বীরভূম জেলার বোলপুরের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বে বরাগ্রাম। এই বরাকে লোকে বরা-ডোংরা নামেও চিহ্নিত করেছে। এই গ্রামের রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক। রামলালের পিতাও রামায়ণ, 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কীর্তনগান করতেন। রামলালের পুত্র অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বছরেই পিতৃবিয়োগ হয়, ফলে অনেক যত্নে তাঁর মাতুল তাঁকে লালন করেন। অল্প বয়সে তাঁর পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা, সুর ও তাল জ্ঞান নবদ্বীপের বৈষ্ণব পণ্ডিত সমাজে প্রশংসিত হয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : 'অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্প বয়সেই দল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ ছিল প্রচুর। তিনি নিজের চেষ্টায় শ্রীমদ্ভাগবত ও উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ...বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গানে রস যেন মূর্ত হইয়া উঠিত। বাংলার বহু বৈষ্ণব, বহু পণ্ডিত, বহু নরনারী তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। রসজ্ঞ শ্রোতৃসমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল। এই সদালাপী, নিরভিমান, রসজ্ঞ ও ভাবুক গায়ক বাংলার অলঙ্কার ছিলেন।'

বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের কাছে মধুডাঙ্গা গ্রামে ১২৬৬ বঙ্গাব্দে জন্মেছিলেন অবধৌত দাস, পিতা নীলকমল দাস। প্রায় নিরক্ষর অবধৌত চৈতন্যমঙ্গল গানে খ্যাতি ও অর্থের সঙ্গে বহু জ্ঞানী-গুণী ও ভক্তের কৃপা পেয়েছিলেন। হরেকৃষ্ণ তাঁর কথা বলতে গিয়ে একটি প্রবাদের উল্লেখ করে লিখেছেন : 'ময়নাডালে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোৎসব গানের সময় শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়েছিল। শ্রীবিগ্রহের উত্তরীয় সিক্ত হইয়াছিল। শ্রীধাম-নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থের সর্বত্রই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন, ভক্তগণের কৃপা লাভ করিয়াছেন।'

'বাঙ্গালার কীর্তনীয়া' শীর্ষক নিবন্ধে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ময়নাডাল প্রসঙ্গে ময়নাডালের কীর্তন ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত তথ্য উল্লেখ করে লিখেছেন : 'ময়নাডালে কীর্তনের চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভপূর্বক বহু ব্যক্তি মৃদঙ্গ বাদনে ও কীর্তনগানে খ্যাতিলাভ করেন। এমন একদিন ছিল যেদিন ময়নাডালে না আসিলে কীর্তন-গায়ক ও মৃদঙ্গবাদকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। পাথর গ্রামের স্বনামধন্য মৃদঙ্গবাদক জটে কুঞ্জ দাসের (মাথায় জটা ছিল বলে তাঁকে জটে কুঞ্জ বলা হত) ছাত্র ইলামবাজার-নিবাসী নিকুঞ্জ বাইতি ও ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্রঠাকুর সমসাময়িক মৃদঙ্গবাদক। উভয়েই মৃদঙ্গবাদ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। জটে কুঞ্জ ভালো কীর্তন গাইতে পারতেন কিন্তু মৃদঙ্গবাদনেই তাঁর পারঙ্গমতা সর্বজনবিদিত হয়েছিল। রসিকানন্দ মিত্রঠাকুর, বৈকুণ্ঠ মিত্রঠাকুর প্রভৃতির নাম আজিও কীর্তন গায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই সেদিনও কিশোরী মিত্রঠাকুর, রাসবিহারী মিত্রঠাকুর ময়নাডালের মুখ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।' রাজুর গ্রামের নৃসিংহ মিত্রঠাকুর, যাঁকে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের চিহ্নিত সেবক মঙ্গল ঠাকুর দীক্ষা দান করেছিলেন, তাঁর থেকে রাসবিহারী ছিলেন একাদশ অধস্তন পুরুষ। হরেকৃষ্ণ বলেছেন : 'বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কীর্তন গায়কগণের মধ্যে ইঁহাকে অন্যতম রূপে গণনা করা হইত। ১৩৫৪ সনের ৬ই ফাল্গুন ইনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। পুত্র শ্রীনবগোপাল মিত্রঠাকুর গীত সুধাকর ও শ্রীগোবিন্দগোপাল মিত্রঠাকুর সুধাকণ্ঠ কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক ময়নাডালের ধারা রক্ষা করিতেছেন। ময়নাডালের অন্য দুইজন সুগায়কের নাম শ্রীনদীয়ানন্দন ও শ্রীমানিক মিত্রঠাকুর।'

বৈষ্ণব সমাজে এই খেতরীর উৎসব একটি স্মরণীয় ঘটনা। খেতরী উৎসব থেকেই লীলাকীর্তনের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়। এই মহোৎসব থেকে সুরের প্রণালী এবং বৈচিত্র্য অনুসারে কীর্তনের শ্রেণিবিভাগ নির্দিষ্ট হয়। এই বিভাগ অনুসারেই বীরভূমের কীর্তনগান মনোহরশাহী ঘরানার অন্তর্ভুক্ত। জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষিত বীরচন্দ্র পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীচৈতন্যদেবের অভীপ্সিত কার্যসম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

বীরভূমের কীর্তনগান প্রসঙ্গে ভক্তিঠাকুর সম্প্রতি তাঁর একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন : 'মানিক মিত্রঠাকুর আজও জীবিত আছেন। বর্তমানে প্রভাত মিত্রঠাকুর, নির্মলেন্দু মিত্রঠাকুরের নামডাক আছে। আর একজন কীর্তনীয়া ময়নাডালেরই বাসিন্দা সন্তোষ মুখোপাধ্যায় নানা স্থানে কীর্তন গান করেন। তাঁর স্ত্রীও একসময় গান করতেন। বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী নদীয়ানন্দনের পুত্র নিত্যানন্দ মিত্রঠাকুরও বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর এই নিবন্ধ থেকে জানা যায় ঠাকুরদাস আচার্য (কৃষ্ণপুর) দুর্গাদাস বিশ্বাস (রামনগর সাঁইথিয়ার কাছে), হীরালাল পাল (ডমুরিয়া), সুনীলসিন্ধু গরাঁই ও তাঁর ভাই গৌরসিন্ধু গরাঁই (বাবুইজোড়), সিদ্ধেশ্বর কবিরাজ (দুবরাজপুর), হারাধন পাল (ময়নাবুনি), মানিক ঘোষ ও তাঁর পুত্র মলয়চাঁদ ঘোষ (ধগরিয়া), অশোককৃষ্ণ মণ্ডল (বাবুপুর), দিলীপ মাজি (বড়রা), রাধারানি মণ্ডল (ঘোরা), জীবনকৃষ্ণ ঘোষ (বড়ঘাটা), প্রভৃতি কীর্তন গায়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও জয়দেব মেলায় তাঁদের সংগীত পরিবেশন করে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও নুড়াই পাড়ায় ঠাকুর বংশের তিন পুরুষ কীর্তন গানের জন্য প্রসিদ্ধ। এঁদের আদি পুরুষ রাধাবল্লভ ঠাকুর ময়নাডালের নিরঞ্জন মিত্রঠাকুরের কাছে কীর্তনগান শিখেছিলেন। তাঁর পুত্র গুরুনারায়ণ ঠাকুর সিউড়ির সন্নিকটে বহু স্থানে পালা কীর্তন গেয়ে থাকেন। তাঁর তিন পুত্র রামগোপাল, গোবিন্দ-গোপাল, আনন্দগোপাল ; প্রথমজন গাইতে পারেন না কিন্তু পরবর্তী দু-ভাই এখনো গান করেন। এঁরা পেশায় শিক্ষক।

জগদানন্দ ঠাকুর, মঙ্গলডিহি পদাবলী রচয়িতা। ইলামবাজারের কাছে শ্রীপাট পায়ের বীরভূমের অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র। বীরভূমের নিকটে পায়ের গ্রামের শ্রীনিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত এবং কালীশ্বর পরিবারভুক্ত গোস্বামীগণ বীরভূমের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। পায়েরের বড় বাড়ির পরমানন্দ গোস্বামীর দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্তীর কীর্তনগানে সুনাম ছিল। ইলামবাজারের মনোহর চক্রবর্তীর কীর্তন-নৈপুণ্য পিতা-পিতামহকেও অতিক্রম করেছিল। লাভপুর থানার মাকুরা গ্রামের হরিপদ দাসবৈরাগ্য এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে হারাধন গোস্বামী, দক্ষিণবঙ্গের রামনিরঞ্জন ঠাকুর, চৌহাট্টার অমরনাথ কবিরাজ, গড়গড়িয়ার অশ্বিনী দাস সুখ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁতিপাড়ার নিতাই দাস, ইলামবাজারের মনোহর চক্রবর্তী, পায়েরের জটে কুঞ্জ, গজা নাপিত, কালো হৃদয়, জামাই হৃদয় বিখ্যাত ছিলেন। পূর্বোক্ত জটে কুঞ্জের ছাত্র শরণ বাইতি, বৈষ্ণব বাইতি, নিকুঞ্জ বাইতি, উমেশ বাইতি একসময় কীর্তনীয়া হিসেবে যথেষ্ট সম্মানের ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। চিনপাই গ্রামে ভাগবত আশ্রম, মুলুকের রামকানাই আটে গোষ্ঠাষ্টমীর সমাবেশ, ভাণ্ডীর বনের অনুষ্ঠান, পানুরিয়ার বিশ্রামতলায় নিত্যানন্দ তিথির অনুষ্ঠান, কোটাসুর আশ্রমের অনুষ্ঠান—বহু সমাগমে বীরভূমের কীর্তনচর্চাকে এখনো জনপ্রিয় করে রেখেছে। বীরভূমের কীর্তন ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বহুপঠিত তথ্যসমৃদ্ধ *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া* গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'বীরভূমের বহুস্থানে চব্বিশপ্রহর এবং নবরাত্রি নাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থা ছিল। কোথাও কোথাও সে ব্যবস্থা এখনো বজায় আছে। উদাহরণস্বরূপ দুবরাজপুরের নাম করতে পারি। গৌরদাস মোহান্ত, ফুলচাঁদ কবিরাজ এবং রামকল্প মোদী এই তিনজন নেতা দুবরাজপুরের নাম সংকীর্তনের আসর বহুদিন সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করিয়াছিলেন। আরম্ভ হইত চব্বিশ প্রহর ; তাহার পর বাহির হইতেন গৌরদাস মোহান্ত। এই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের এমনই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে, কোন গৃহে, দোকানে বা গদিতে তাঁহার পদধূলি পড়িলেই লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য দান করিত। কোন ধনী মহাজন একদিনের সমগ্র খরচই নির্বাহ করিতেন। এইরূপ সংকীর্তনের আসরে একজন, দুইজন, তিনজন, এমনকি চারিজন পর্যন্ত লীলা সংকীর্তন-গায়ক আমন্ত্রিত হইতেন।' একথা ঠিক যে এই কীর্তনগানের অসাধারণ সামাজিক স্বীকৃতি, কীর্তনীয়া সমাজের আচার-আচরণ বীরভূমের সর্বজনমান্য কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় খুব অন্তরঙ্গ চিত্রণে ধরা আছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, *স্বর্গ-মর্ত* নামের একটি উপন্যাসে তিনি এই রাঢ় অঞ্চলের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন : 'অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলি হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচীমায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয়—সেদিনও মানুষ বুঝিতে পারে নাই এই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নূতন ভাব-ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়া গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু অজয়ের কূলের এই অঞ্চলের সাধক কবি তাহার বহুকাল পূর্বে ধ্যান-কল্পনায় এ প্লাবন যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন মাটিতে চাঁদ নামিয়া আসিল—জ্যোৎস্নায় পৃথিবী সত্য সত্যই ভাসিয়া গেল। নানুরের সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—'আজ কে গো মুরলী বাজায়—এত কভু নহে শ্যামরায়।' শুধু তাই নয় বৈষ্ণব ভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। অজয়ের দশ কোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্রা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীরচন্দ্রপুরের লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন। এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালে ছাওয়ানো আখড়া ; যদুপতির পাথরে গড়া বিরাট রাজপ্রসাদ নয় যে, কাল

ভাঙিয়া দিলে আর গড়া যায় না, যে ভাঙা পাথরের স্তূপই সরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। মাটির আখড়া কাল ভেঙে—জলে গড়িয়া পড়ে, ইঁদুরে গোড়ায় গর্ত কাটিয়া তলাটা ফোঁপরা করিয়া দেয় তখন একদিন ধ্বসিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে ফাটে-ভাঙে, মানুষ ওই ভাঙা দেওয়ালেই জল ঢালিয়া কাদা করিয়া আবার দেওয়াল দেয়, লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ মাথায় করিয়া আনে, দেওয়ালের উপর চাল তুলিয়া সযত্নে নিজের হাতে রাঙা মাটি দিয়া নিকাইয়া, আলপনা আঁকিয়া মনোমন্দিরের অধীশ্বরকে হাত জোড় করিয়া বলে—আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হও।' মানগোবিন্দপুরের বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাসের এই আখড়ার ছবি, তারাশঙ্করের কলমে রাঢ় সংস্কৃতির একটা মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরেছে। 'রাইকমল' বা 'রাধা'র ধারায় এ এক অনন্য সৃষ্টি। এই অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাঠ করে, পরিমল গোস্বামী সন্দেহ করেছিলেন, 'লেখক স্বয়ং এদের ধর্মে দীক্ষিত এবং কোনো না কোনো আখড়ার পরিচালক।'

২

রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতি, বিশেষত তার সংগীত ও নাট্য মাধ্যমের নানা বৈচিত্র্য তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে সবচেয়ে বেশি করে ধরা আছে। আমাদের আক্ষেপ হয়, গ্রামবাংলার যাত্রাগানের দীর্ঘ ধারাবাহিকতা নিয়ে তিনি তাঁর কোনো বড়ো ধরনের সাহিত্য রচনা করেননি। যদিও বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে শহর কলকাতার, বিশেষ করে চিৎপুরের পেশাদার যাত্রার পালাবদল অবলম্বন করে তিনি *মঞ্জরী অপেরা* নামে একটি মহাউপন্যাস রচনা করেছেন। তাতে গ্রামবাংলার যে অসংখ্য যাত্রাদল নানা সময়ে গড়ে উঠেছিল, তার কোনো বিশদ চিত্র ধরা পড়েনি। সেই উপন্যাসে যোগামাস্টার মত্ত অবস্থায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিল বুয়েচেন—আমার মশাই সাধক নীলকণ্ঠ মশায়ের কাছে যাত্রাদলের হাতেখড়ি। বারো বছর বয়সে রাখাল বালক সাজতে ঢুকেছিলাম। মুকুজ্জেমশাই বলতেন-বুয়েচেন-কিনা যোগানন্দ—।' উপন্যাসের নায়ক রীতুবাবু যোগামাস্টারের প্রগলভতা থামিয়ে দিয়ে বলেছে : 'তুমি এবার থাম যোগানন্দ। মাইনে তোমার চার টাকা বেড়েছে। হুকুম হয়ে গেছে। এবার নীলকণ্ঠ মশাই রাখ।' উপন্যাসের লেখক, এরকম যোগানন্দকে না থামিয়ে দিলে, হয়তো নীলকণ্ঠের দলের কথা, তাঁর সময়ের কথা, আরো বিস্তারিত ভাবে শোনা যেত। হয়ত বৃহত্তর কোনো পরিকল্পনা ছিল বলেই কলকাতার ইতিবৃত্তে, মফস্বলের যাত্রাকে তিনি ইচ্ছে করেই প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর তাঁর অল্প বয়সে সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব দু-চোখ ভরে দেখেছিলেন, সেই দ্বন্দ্বের একটি চিত্র তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন। কীভাবে গ্রামের ব্যবসায়ী ধনীর বাড়িতে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দল পণ্ড করে দিয়েছিল লাভপুরের উচ্ছৃঙ্খল একদল যুবক। তারাশঙ্কর বলেছেন : 'এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়িতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সেকালের নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ তিনভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতিনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে।' সেই জমজমাট লাভপুর গ্রামের যুবকরা সে বছর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নীলকণ্ঠের দলকে, 'আগুন' 'আগুন' চিৎকার করে আসরের দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। তারাশঙ্কর সেই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন : 'নীলকণ্ঠের সহোদর শ্রীকণ্ঠ এবং শিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নিচু করে আসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পর বৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সেবার তিনি গান করলেন। সে কি গান। আর সে কি জনতা। সে কি ভদ্রতা। মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল। কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না। লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় করে নীলকণ্ঠ সেবার ফিরে গেলেন।'

বাংলার যাত্রাগানের বিবর্তনের ইতিহাসে নীলকণ্ঠের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু তাঁর পূর্বসূরিদের অনেকেই বীরভূমের মাটিতে জন্মলাভ করে বাংলার যাত্রাগানকে নানাভাবে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছেন। সে ইতিহাসটি কম গৌরবের নয়। জয়দেবের *শ্রীগীতগোবিন্দম্*-এর মধ্যে যাত্রাগানের আদিরূপ নিহিত ছিল মন্তব্য করে বলেছেন : 'মনে হয় জয়দেবের দলে কবিই অধিকারী ছিলেন সম্ভবত মূল গায়নও। পরাশর প্রভৃতি আত্মীয় ছিলেন দোহার ও বায়েন। নাচ করিতেন পদ্মাবতী। একটি পদের ভণিতায় জয়দেব নিজেকে 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী' বলেছেন। এ

এ বিতর্ক এখনও নিরসন হয়নি, প্রকৃতপক্ষে কীর্তন অথবা পাঁচালী থেকে যাত্রাগানের উদ্ভব হয়েছে কিনা, তবে অস্বীকার করা যায় না গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মহাপ্রভুর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানত কৃষ্ণলীলা বর্ণনাই যাত্রাগানের প্রাথমিক রূপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তবে কৃষ্ণলীলা প্রচার কালক্রমে কবিগানের প্রাদুর্ভাবে অশ্লীলতা দুষ্ট নিম্নরুচির বাহনে পরিণত হয়।

কথার একমাত্র সঙ্গত অর্থ—'যিনি পদ্মাবতীর চরণ চালকদের অধ্যক্ষ'। 'প্রেরণ' নৃত্যকারীর চরণ চালক মানে গায়ন ও বায়ন। আর তাহাদের চক্রবর্তী বলিতে দলের অধিকারী।'

এ বিতর্ক এখনও নিরসন হয়নি, প্রকৃতপক্ষে কীর্তন অথবা পাঁচালী থেকে যাত্রাগানের উদ্ভব হয়েছে কিনা, তবে অস্বীকার করা যায় না গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মহাপ্রভুর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রধানত কৃষ্ণলীলা বর্ণনাই যাত্রাগানের প্রাথমিক রূপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তবে কৃষ্ণলীলা প্রচার কালক্রমে কবিগানের প্রাদুর্ভাবে অশ্লীলতা দুষ্ট নিম্নরুচির বাহনে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার যে বীজ পত্তন হয়েছিল তা উনবিংশ শতকে রুচিবিকৃতির মধ্য দিয়ে এমন নিন্দনীয় রূপ ধারণ করে যে যাত্রা দেখাকে স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এবং ধর্মনাশের কারণ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয় সমাচার দর্পণ পত্রিকায়। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় মন্তব্য করেন উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে শিশুরাম অধিকারী যাত্রাগানের এই নিম্নগামিতা রোধ করার প্রয়াসে সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল বলেছেন : 'গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশত বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সংকীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়।' পরবর্তীকালে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও শিশুরামের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন : 'রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সময়ে কেঁদেলী গ্রাম নিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় নাম করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্বে যাত্রার উপর লোকের রুচি কমিয়া আসিতেছিল। শিশুরাম ইহার নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়া যাত্রার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। লোকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।' কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তক হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু যাত্রার প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 'শ্রীকৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন ও প্রধান অধিকারীদিগের মধ্যে পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বীরভূমে ইহার বাস ছিল। ইহার সমকালবর্তী আর কোন অধিকারীর নাম পাওয়া যায় না।' পরমানন্দ সম্পর্কে অবশ্য অমূল্যচরণ অন্য রকম তথ্য দিয়েছেন, তাঁকে শিশুরাম-পরবর্তী শ্রীদাম, সুবল অধিকারীর শিষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরমানন্দের বিষয়ে ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন, দাস পদবি চিহ্নিত করে তাঁকে হুগলি জেলার তাবানিবাসী বলেছেন। তবে সুশীলকুমার দে তাঁকে বীরভূমবাসী বলেই উল্লেখ করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পুরোনো কাগজপত্র দেখে তাঁকে 'রামটবাটী' গ্রামের অধিবাসী বলেছেন, এবং বীরভূমে এরকম একখানি গ্রামের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুমান, আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথে লাভপুর স্টেশন থেকে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্বে রামবাটী নামে একটি গ্রামেই পরমানন্দের বাস ছিল। যা হোক, পরমানন্দর যাত্রাগানের খ্যাতি অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিজের দলে দূতী সাজতেন এবং যে গ্রামে যাত্রা হত সেখান থেকে শাড়ি গহনা সংগ্রহ করে তিনি অভিনয় করতেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তাঁর অভিনয় কৃতিত্বের প্রসঙ্গে জানানো হয়েছিল, তিনি স্থূলকায় ছিলেন বলে, একখানি শাড়িতে না কুলালে দুখানি শাড়ি চেয়ে নিতেন। নাসায় বেসর, হাতে বাজুবন্দ—যে অঙ্গে যে অলঙ্কার জুটত তিনি তাই ধারণ করতেন। 'বঙ্গদর্শন' তাঁর কৃতিত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'পরমার তুক্কোর ন্যায় সুশ্রাব্য আর কিছুই বাঙ্গালায় হয় নাই।'

বীরভূমের যাত্রাগানের ধারায়, এরপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণযাত্রার রূপায়ণের ক্ষেত্রে যিনি 'কণ্ঠ মহাশয়' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নীলকণ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধাকৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করে মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী রচিত *বীরভূম-পরিচয়* গ্রন্থে বলা হয়েছে : 'নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৪৮ সালের ৬ বৈশাখ তারিখে ধবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধবনি পূর্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর হইল বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের পিতার নাম বামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম সরস্বতীদেবী। বামাচরণের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ, মধ্যম সিতিকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ শ্রীকণ্ঠ, তিন সহোদরের নামের শেষে কণ্ঠ শব্দ সংযোজিত থাকিলেও লোকে নীলকণ্ঠকেই 'কণ্ঠ' বলিয়া ডাকিত এবং কণ্ঠের গান বা কণ্ঠের দল বলিলে নীলকণ্ঠের গান ও নীলকণ্ঠের যাত্রার দল বুঝিত। তাহার অনেক গানেও ভূমিকায় কেবল 'কণ্ঠ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।' বর্ধমানের লোক হিসেবে পরিচিত হয়েও বীরভূম ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র, বিশেষ করে হেতমপুরের রাজবাড়িতে তাঁর একটা আলাদা স্থায়ী মর্যাদার আসন তৈরি হয়েছিল। গোপেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন : 'হেতমপুর রাজবাড়িতে নীলকণ্ঠ দোল, রাস, দুর্গোৎসব, সরস্বতী পূজা, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি পূজা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিয়মিতভাবেই আসতেন এবং সেখান থেকে বহু টাকাও উপার্জন করেছিলেন। হেতমপুরের মহারাজা নীলকণ্ঠের প্রতি প্রসন্ন হয়ে আট মৌজা গ্রাম ও চারশো বিঘা জঙ্গল দান করেন।' শেষের দিকে তাঁর অবসর সময় বেশিটা কাটাতেন হেতমপুরের রাজবাড়িতে।

গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য কৃষ্ণযাত্রার রুচিসম্মত জনপ্রিয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সফল হয়েছিলেন, বিশেষত ভক্তিরসের সঙ্গে অন্তরের ভাবমাধুর্য মিশিয়ে তিনি তাঁর সংগীত পরিবেশনে একটা আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠের ভক্তিরসাশ্রিত গান শুনে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কেশবচন্দ্র সেন এমনকী রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলে বিবেকানন্দ, তখনো নরেন্দ্রনাথ হিসেবে পরিচিত, নীলকণ্ঠের গান গাইতেন ভক্তিআপ্লুত কণ্ঠে : 'কত দিনে হবে সে-প্রেম সঞ্চার।' জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসবে নীলকণ্ঠের গান সমাদৃত হয়েছিল। প্রমথনাথ বিশীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তিনি লিখেছেন : 'দুপুরবেলা আহারান্তে যাত্রাগান আরম্ভ হইত। আমরা সারিবদ্ধভাবে আসরে গিয়া বসিতাম। যাত্রাগান আমাকে চিরদিন মুগ্ধ করে, আমি তন্ময় হইয়া বসিয়া দেখিতাম। নীলকণ্ঠ অধিকারীর কৃষ্ণ বিষয়ক কোনো একটা পালা।' সে সময় প্রমথনাথের বয়স ন-বছর সদ্য শিক্ষার্থী হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ছাত্রাবস্থাতেই প্রমথনাথ একাধিক পালা লিখেছিলেন, তাঁর প্রথম পালা 'বীরভূমেশ্বরের পরাজয়' এবং 'ঘোষ যাত্রা' শান্তিনিকেতনে আসর বেঁধে অভিনয় হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকী রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরিহাসের সঙ্গে পালা লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে না-লেখার অনুনয় জানিয়েছিলেন তাঁর স্নেহধন্য প্রমথনাথ। রবীন্দ্রনাথ পালা লেখেননি, যদিও তাঁর নাটককে অন্যভাবে পালা বলে উল্লেখ করেছেন, এ কথা ঠিক বাংলার ঐতিহ্যানুসারী যাত্রাগানের অনেক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর নাট্যচর্চায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সচেতন আগ্রহে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২০ শ্রাবণ প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ হয়।

বীরভূম বিবরণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ইটণ্ডায় প্রসিদ্ধ গায়ক গদাধর দাস ছিলেন নীলকণ্ঠের প্রিয় শিষ্য। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে : 'সন ১২৬৪ সালে গদাইয়ের জন্ম হয়, পিতার নাম রামকৃষ্ণ দাস, মাতার নাম হরসুন্দরী দাসী, জাতি তাঁতি। তাঁতি জাতির চারি শ্রেণীর মধ্যে ইহারা মধ্যম বলিয়া পরিচিত। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া গদাই নিকটবর্তী আট গ্রামের রামশরণ চট্টোপাধ্যায় যাত্রা দলে ভর্তি হইয়াছিল। কণ্ঠ মধুর এবং বুদ্ধি প্রখর ছিল বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গদাইকে বড় ভাল বাসিতেন। গত সন ১৩১৪ সালের ১০ পৌষ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গদাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে।' নীলকণ্ঠের দলে বহুকাল যুক্ত ছিলেন গদাই, শুধু একবার নিজে একটি দল করেছিলেন, পুনরায় নীলকণ্ঠের দলে ফিরে এসে আর দল ত্যাগ করেননি কোনো দিন। নীলকণ্ঠের দলে বীরভূমের বাসনা গ্রামের যোগীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় সুনামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বীরভূমের মঙ্গলডিহি গ্রামে শ্রীরাধা-মদনগোপালের রাসযাত্রায় তিনি নিয়মিত গান করতেন।

কৃষ্ণযাত্রা থেকে আধুনিককালে যখন অপেরায় রূপান্তরিত হয়ে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার প্রসার দেখা যায় শহর কলকাতার পেশাদার যাত্রাচর্চায়, তখন ঢেউ চিৎপুরের থেকে গ্রাম-বাংলার নানা দলকেও প্রভাবিত করেছিল। সে-সময় হেতমপুরের রাজাদের আগ্রহ ও অনুগ্রহে কলকাতার যাত্রার আসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সূত্রেই কমলানিরঞ্জন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঞ্জন অপেরা, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শুরুর দিকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। কালক্রমে সেই দল সমসাময়িক- কালে একটি সেরা দল হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সে দলের প্রথমের দিকে প্রধান পালাকার ছিলেন। বছর দশেক

চারণকবি মুকুন্দ দাস

বছর দশেক শৌখিন দল হিসেবে চলার পর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পেশাদার দলে পরিণত হয়। শোনা যায় পেশাদার হিসেবে হেতমপুর গ্রামেই সারা বাংলা শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষে তাঁদের প্রথম পালা পরিবেশিত হয়। ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের আগ্রহে ও পরামর্শে চিৎপুরে তাদের দলের গদি বা দপ্তর খোলেন ওই বছরেই। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই দলে একসময় পালা রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমসাময়িক কালের প্রায় সব প্রধান অভিনেতৃবর্গ কোনো না কোনো বছর এই দলে যুক্ত থেকেছেন। কমলানিরঞ্জন তাঁর পুত্র বিশ্বনিরঞ্জন দুজনেই তাঁদের কালে দলটির সুনামের সঙ্গে চালান, কিন্তু পরে তাঁর পুত্র রেবতীরঞ্জন দায়িত্ব না নিতে রাজি হওয়ায় সাংগঠনিক কারণে দলটি বন্ধ করে দেওয়া হলে, ওই দলের পঞ্চু সেন, শরৎ মুখার্জি, বড় ফণিভূষণ বিনোদ প্রমুখ অভিনেতারা জীবনকৃষ্ণ দাসকে দলটি চালানোর জন্য উৎসাহ দেন। নবরঞ্জন অপেরা নাম নিয়ে তারপর সেটি নিয়মিতভাবে চালানো হয়, বর্তমানে তপনকুমারের নেতৃত্বে সেটির অস্তিত্ব অব্যাহত আছে। সম্প্রতি এই দলে যুক্ত থাকা অবস্থায় যাত্রালক্ষ্মী বীণা দাশগুপ্ত একটি পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে এই দলের মালিকানা গ্রহণ করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ, তার বছর দুয়েক আগে বীরভূমের কৃতী যাত্রাভিনেতা অনাদি চক্রবর্তী ওই দলে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি অল্প বয়সে যাত্রায় যোগ দিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজের কৃতিত্বের গুণে যাত্রা জগতে শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিলেন। বর্তমানে যাত্রা জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর জন্মস্থান হেতমপুরে অবসর যাপন করছেন। উৎপল দত্ত যে নতুন ধারার যাত্রা প্রবর্তনায় ষাটের দশক থেকে যাত্রায় যুক্ত হয়েছিলেন, অনাদি চক্রবর্তী পরবর্তীকালে তাঁর প্রশিক্ষণে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছিলেন। হেতমপুরের রঞ্জন অপেরার দুই নৃত্যশিল্পী দেবীদাস আচার্য এবং লক্ষ্মী আচার্য যাঁরা 'দেবু-লক্ষ্মী' হিসেবে সমধিক পরিচিত—তাঁরা দীর্ঘকাল এলাকায় সুনামের অধিকারী ছিলেন। আধুনিককালে সিউড়ির ভৈরব চট্টরাজ এবং অর্ণব মজুমদার পালাকার হিসেবে বিশেষ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত। সিউড়ি বঙ্গ বিদ্যালয় ও জেলা স্কুলের ছাত্র ভৈরব, সাপ কাটার চিকিৎসক ছিলেন পেশায়। তাঁর লেখা অনেক পালা জনপ্রিয় হয়েছিল। অর্ণব মজুমদার পালা লিখলেও সম্প্রতি বীরভূমের যাত্রাশিল্প বিষয়ে একটি গবেষণামূলক ধারাবাহিক নিবন্ধ লিখছেন *আননামুখ* পত্রিকায়। তিনি লিখেছেন : 'বীরভূম জেলার বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সখের নাচ, একালে সংগীত বিবেকের উদাত্ত কণ্ঠের গান সমন্বিত সখের যাত্রার ব্যাপক চল শুরু হলেও পাঁচের দশক পর্যন্ত পাশাপাশি কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। দরিদ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায় তথা সামাজিক ব্রাত্যজনদের শিল্পবিনোদনের দুটি মুখ্য ধারার একটি লেটো-অল্পকাল অন্যটি ছিল কৃষ্ণযাত্রা।'

চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রবর্তিত স্বদেশি যাত্রা বীরভূমের জনসমাজে এক সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাইকর গ্রামের হিমাংশুবদন চট্টোপাধ্যায় প্রথম মুকুন্দদাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশি যাত্রাদলের পত্তন করেছিলেন। তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাত্রাগানে আকৃষ্ট হয়ে দল গড়েছিলেন। তাঁর দলের অনুসরণে সে সমস্ত ভদ্রপুরে একটি স্বদেশি দল গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে লাভপুরের কাছে কামোদ-পুরের ডাক্তার গোপীকিশোর ঠাকুর একটি স্বদেশি দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকারি কর্মী গোপীকিশোর স্ত্রী যোগমায়া দেবীর মালিকানায় দল করে সেই দলে তাঁর দুই শিশু কন্যা অংশগ্রহণ করতেন। অর্ণব মজুমদারের কাছে তাঁর বড় মেয়ে নীহারবালা চট্টোপাধ্যায় (শ্বশুরবাড়ি বাউটিয়া বীরভূম) বলেছেন : 'ছোট বোন পারুলবালার গানের গলা ছিল খুব ভালো। সে মাঝে মাঝে আসরে গান গাইতো। পরে আবাডাং-এ বিয়ে হয়। আমাদের দলে চৌহাট্টা, দাঁড়কা, মীরবাঁধ, আবাডাং, লাভপুর ও সিউড়ির কাছে গণেশপুরের কিছু যাত্রানুরাগী ও শিল্পী কাজ করতেন। লাভপুরের রামগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পাখোয়াজ বাজাতেন।' নীহারবালার পুত্র বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মায়ের কাছে শোনা তথ্য জানিয়েছেন; 'যতদূর শুনেছি প্রোপাইটার যোগমায়া দেবীর এই স্বদেশী দলে মালিক পক্ষের কেউ থাকতেন না। দল চালাতেন দল

চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রবর্তিত স্বদেশি যাত্রা বীরভূমের জনসমাজে এক সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাইকর গ্রামের হিমাংশুবদন চট্টোপাধ্যায় প্রথম মুকুন্দদাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশি যাত্রাদলের পত্তন করেছিলেন। তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাত্রাগানে আকৃষ্ট হয়ে দলে গড়েছিলেন। তাঁর দলের অনুসরণে সে সমস্ত ভদ্রপুরে একটি স্বদেশি দলে গঠিত হয়েছিল।

ম্যানেজার। একটি ছইবিহীন গরুর গাড়িতে, সাজ-পোষাক, যন্ত্রানুষঙ্গ ও অন্যান্য মালপত্র চড়িয়ে বেদুইনের মত দল রওনা হতো আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে। ব্যস। তারপর রাতের পর রাত চলত বায়নার গান। দাঁড়কায় দল ফিরে আসত বৈশাখের মাঝামাঝি।' ১৯৪৪ থেকে এই দলের প্রধান গদি ছিল দাঁড়কায়। বীরভূমের স্বদেশি যাত্রার এই দলটি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সিউড়ি থানার অবিনাশপুরে (সুলতানপুর) অনুকূল বাগদি একটি স্বল্পস্থায়ী দল গঠন করেছিলেন।

সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের অবসরের চিত্তবিনোদনের একটা প্রধান মাধ্যম যাত্রাগান। দুবরাজপুর, শিব রাউতারা, নাচনশা, বোলপুর, ডামরা, বাকুল, খরুন, পাটচন্দ্রহাট, কুসুমগ্রাম, গদাধরপুর ও দেবপুর প্রভৃতি গ্রামে একদা যাত্রাগানের খুব রমরমা ছিল। ১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বর্ষে সরকারি সাহায্য লাভ করেছিল এমন কয়েকটি দলের তালিকা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হচ্ছে : সিউড়ি শক্তি অপেরা পার্টি (সিউড়ি), বেনেপুকুর যাত্রা (সিউড়ি), কাশীপুর যুবসংঘ যাত্রাপার্টি (সিউড়ি), লাভপুর অঞ্চলে বাবনা মিলন সংঘ যাত্রাপার্টি (আমেদপুর), নানুর অঞ্চলে বেলগ্রাম পল্লীমঙ্গল যাত্রাপার্টি (সাঁইথিয়া), মালিরাম অপেরা যাত্রাপার্টি (সাঁইথিয়া), বোলপুর অঞ্চলে বোলপুর মহামায়া অপেরা পার্টি (বোলপুর), ইলমবাজার রিক্রিয়েশন যাত্রাপার্টি (ইলমবাজার), খয়রাদুল এলাকার পরসুন্দী রাধিকাসুন্দরী যাত্রাপার্টি (পরসুন্দী), ময়ূরেশ্বর অঞ্চলে ঝলকামহেশ্বর অপেরা পার্টি (গানুটিয়া), সনজ পল্লীমঙ্গল সমিতি যাত্রাপার্টি (সনজ), রামপুরহাটে জেন্দুর কোপামা অপেরাপার্টি (করবোনা), কালীপুর ট্রাইবাল যাত্রা (বসওয়া), নলহাটি অঞ্চলে দেবগ্রাম যুবসংঘ যাত্রাপার্টি (খিথা), সিমলান্দি স্বদেশী যাত্রাপার্টি (ভদ্রপুর), মুরারাই ব্লক ক্লাব (মুরারাই), জগাই তরুণ সংঘ যাত্রাপার্টি (রুদ্রনগর-মুরারাই)। এই সব দল নিশ্চয় এখনকার দিনে এখনো তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অসমর্থ হয়ে হারিয়ে গেছে।

হেতমপুর রাজাদের রঞ্জন অপেরা কলকাতার পরিষদের পত্তন করলে, অনেকেই সে দল ছেড়ে যাত্রা জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেন, আবার কেউ কেউ যাত্রাগানকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নানা দলের সঙ্গে যুক্ত হন। রঞ্জন অপেরার মোশনমাস্টার কৃষ্ণচন্দ্র ভুঁই যোগ দেন নব নাচনাই চণ্ডী অপেরায়। ফ্লুট আর কর্নেট ছাড়া আর সব বাজনা বাজাতে পারতেন দক্ষতার সঙ্গে। আদিযুগে, শতবর্ষ পূর্বে এই নাচনশার দলটি যখন নাচনাই চণ্ডী অপেরা নামে গঠিত হয়েছিল, তখন দলের প্রধান ছিলেন কানাইলাল অধিকারী। বীরভূমে প্রাচীন অভিনেতাদের মধ্যে চণ্ডীচরণ পালের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। এছাড়া বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যে অন্যতম তারাপদ তপাদার অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে নাট্য শিক্ষকতা করেছেন, নিজে বৃদ্ধের ভূমিকায় দক্ষ ছিলেন। পুরুষ যাঁরা নারী চরিত্র রূপায়ণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, অভয় অধিকারী, ধীরেন্দ্র ঘোষ, নন্দলাল মাঝি এবং তারাপদ দাসের নাম তাঁদের তালিকায় অগ্রগণ্য। অর্ণব মজুমদার তাঁর স্মৃতি উদ্ধার করে যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আরো যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি লিখেছেন : 'হারাধন দাস, ত্রিভঙ্গমুরারি ঘোষ, ভোলানাথ ঘোষ এবং (খলনায়ক) রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখতে তথা নাচনশায় যাত্রাগান শুনতে দু-তিন ক্রোশ (ছয় আট কি মি) দূরের লোক মুড়ি বেঁধে হ্যারিকেন নিয়ে উপস্থিত হত আসরে। এটা ঘটনা।' তিনি এই দলের একানে শিল্পী দুকড়ি ঘোষ এবং বিবেক গায়ক কালিপদ লোহারের কথাও বলেছেন। অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী সুদর্শন চেহারার বসন্তরঞ্জন পালই ছিলেন শিব রাউতারার অধিবাসী এবং দুবরাজপুর থেকে বোলপুর আর সিউড়ি থেকে ইলামবাজারের মধ্যবর্তী ছয়শো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তিনিই ছিলেন এক কথায় সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক অভিনেতা। সিউড়ির প্রদীপ রাজ তরুণ বয়সে কলকাতার তরুণ অপেরায় যোগ দিয়েছিলেন, কিছুদিন করার পর কলকাতার যাত্রার দলে সম্প্রতি আবার ফিরে এসেছেন।

প্রকৃতপক্ষে শহর কলকাতার পেশাদার যাত্রার পাশাপাশি বীরভূমের এই গ্রামীণ যাত্রাগান নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজও বিবর্তনের পথে নানা প্রতিযোগিতার মধ্যেও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। 'আননায়ুধ' পত্রিকা তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এই শক্তিশালী নাট্যমাধ্যমটির নানা পর্বের একটা তথ্য-ভিত্তিক ইতিহাস অর্ণব মজুমদারের কলমে প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি তাঁর অসমাপ্ত ধারাবাহিকের এক জায়গায় বলেছেন : 'এই বিবর্তনের নানা পর্যায় ভিত্তিক ইতিহাস আছে। এবং আছে আঞ্চলিক বিন্যাসে তার বিকৃতি ও সমৃদ্ধি। নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের মতো আমরা তাকেই খুঁজছি বীরভূমের সীমিত সীমার মধ্যে। যথেষ্ট অভিনিবেশের মধ্যে আমাদের এই অন্বেষণ। তবে তা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো দুরূহ ব্যাপার। কতটা সফল হব কে জানে।' আমরা তাঁর সাফল্যের পক্ষে আশাবাদী হয়ে অপেক্ষা করছি, কেননা আমাদের সংস্কৃতি ইতিহাসে এটা একটা জরুরি অন্বেষণ।

লেখক : বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক
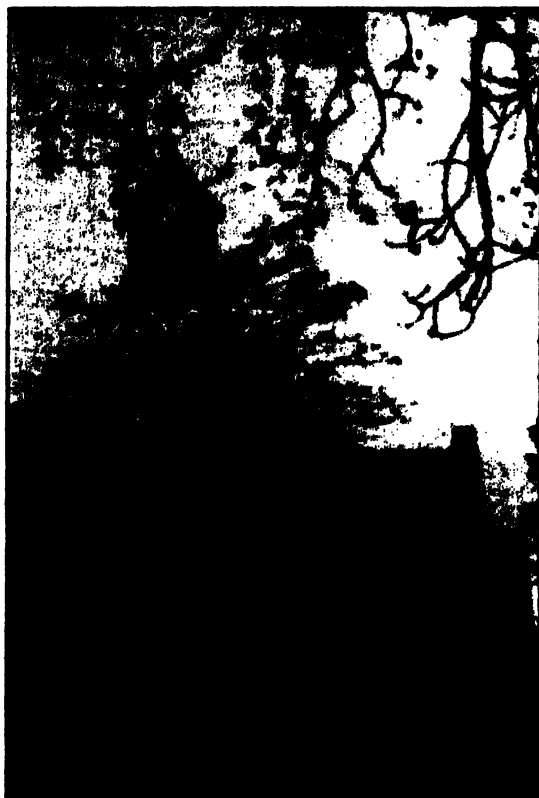
সিউড়ির গীর্জা ছবি : সুকুমার সিংহ
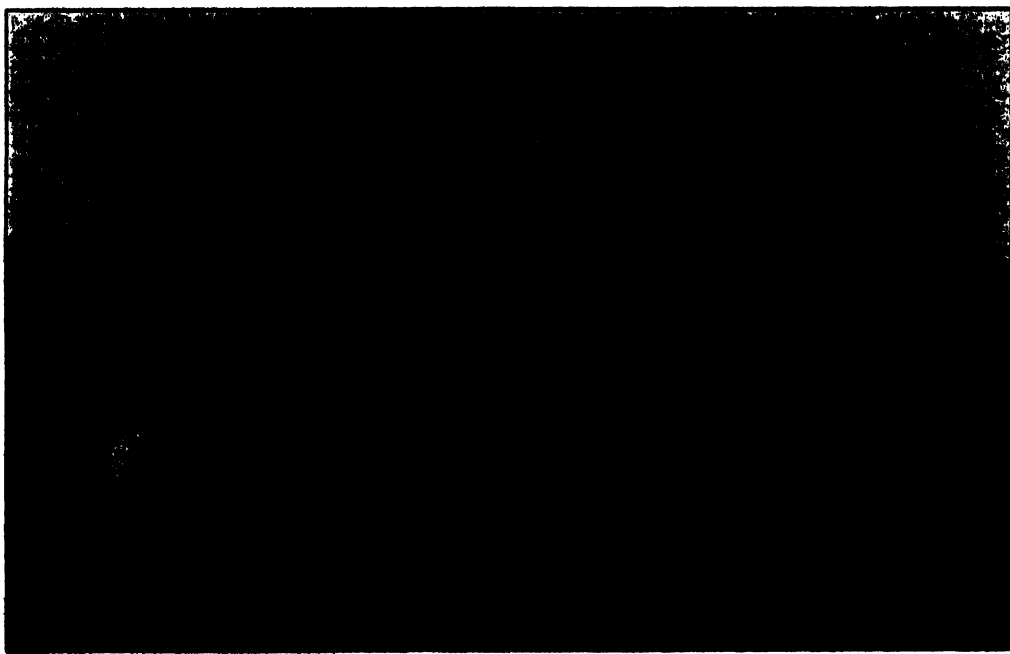
ইংরেজদের সমাধিক্ষেত্র ছবি : সুকুমার সিংহ
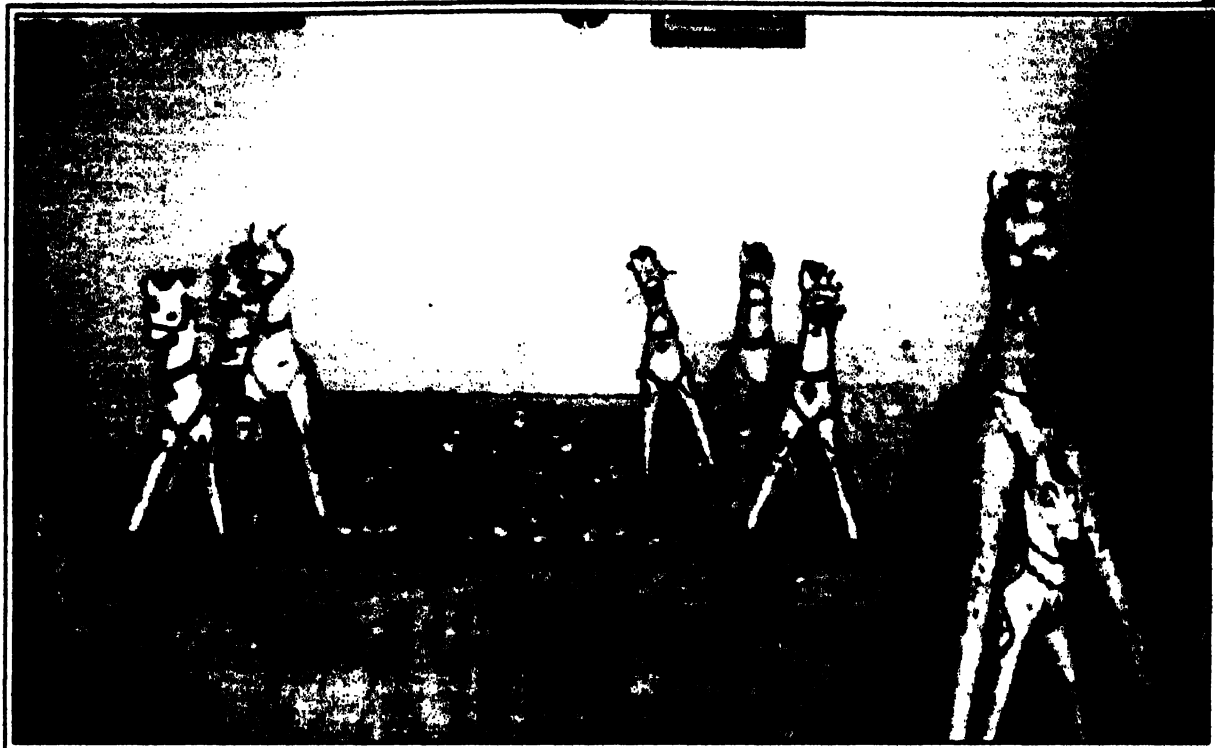
ধর্মরাজ পূজাস্থল বীরভূমের গোয়ালপাড়া ছবি : পাপান ঘোষ

বীরভূমের লৌকিক দেবদেবী

অজিতকুমার মিত্র

বীরভূমের প্রাচীনকালের প্রাকৃতিক পরিবেশ—ঘন অরণ্যানি, খরস্রোতা নদী আর ধূ-ধূ লাল কাঁকর মাটি সেকালে যাদু ইন্দ্রজালের যে মোহ সৃষ্টি করেছিল তাই বীরভূমের মানুষের প্রকৃতিকেও সেইভাবে গড়ে তুলেছিল। শ্বাপদসংকুল বনভূমি সেকালে যেমন খাদ্যের যোগান দিয়েছে, তেমনি লড়াই করে বাঁচার মানসিকতাও গড়ে তুলেছিল। তাই বীরভূমের মানুষের মাঝে নানান লোকবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে বাঁচার অন্তরায় প্রতিহত করতে। এমনি করে লোকবিশ্বাসগুলি মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ভর সন্ধ্যায় কাউকে বাঘে ধরে খায় তাই অনুশাসন তৈরি হয়ে যায়—ভর সন্ধ্যায় খাদ্যান্বেষণে যেতে নেই। হাঁচি-টিকটিকির অনুশাসনও এমনি করে সমাজ শাসন করে।

নানান অনুশাসনের রক্ষাকবচ নানান লোকদেবতা। কোন প্রাচীনকালে লোকদেবতার উৎপত্তি হয়েছিল। আদিবাসী জীবনে যেমন পাহাড়-পর্বত মানুষকে খাদ্য আর গাছের ডালে নিরাপদ আশ্রয় জুগিয়েছিল। তাই পর্বত—মারাং বুরু অবশ্যই দেবতা। সূর্য তো জীবনকে রক্ষা করে—আজও আদিবাসী সমাজে ভোরের

প্রথম-ওঠা সূর্যের মতো ঝলমলে পালক মুরগি যেন প্রথম প্রভাতের রং আজও বলিদান করা হয়। পৃথিবীর সকল মানুষই সূর্যকে পূজা করে। তেমনি যেখানে বাঁচার অন্তরায় সেখানেই মানুষ নানান লোকবিশ্বাস থেকে বিভিন্ন লোকরীতির জন্ম দিয়েছে। এই লোকরীতিগুলি পালন করতে গিয়ে লোক-দেবতার সৃষ্টি হয়েছে সেই আদিবাসী সমাজ থেকে।

এই আদিবাসী সমাজভাবনা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সমাজকে গতিশীল রাখতে, ভূমিনির্ভর সমাজকে কৃষিতে সম্পূর্ণ করতে নানান লোক-মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। তাই আরণ্যক জীবনের ঐন্দ্রজালিক মোহ আস্তে আস্তে ভূমিনির্ভর সমাজের প্রয়োজনে লোকদেবতার সৃষ্টি করেছে। বৃষ্টির দেবতা, মাঠে নির্ভয়ে কাজ করার জন্যে সর্পের দেবতা, সন্ধ্যায় অন্ধকারে ফসল তোলার জন্যে নানারকম অপদেবতাও কল্পিত হয়েছিল। সবই ভূমিনির্ভর সমাজকে নিরঙ্কুশ রাখতে। তাই বীরভূমের লৌকিক দেব-দেবীর ইতিহাস বীরভূমের সেকাল থেকে লোকসমাজের ইতিহাস।

বীরভূমের পাথুরে মাটি কেটে সেকালে নাবাল জমি করেছে মানুষ। আজ সেই জমিতে সোনা ফলছে। সেই জমির ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে, হাজার হাজার মানুষের ঘাম-রক্ত আর নানান যন্ত্রণার কথা অনুভব করতে গেলে এই লৌকিক দেবতাদের কথা এসে পড়ে। যেমন ধনকুবরো চলিত নামে সেকালে এক লোকদেবতার (ধনকুবের) অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এই লোকদেবতা মাঠের ফসল রক্ষক। বীরভূমের মধ্যযুগে এই দেবতাই ক্ষেত্রপাল। আর্য প্রভাবে এই সকল দেবতা পৌরাণিক হয়ে যায়। যেমন সর্প থেকে সর্পদেবী। জলে-কাদায়, বনে-জঙ্গলে অন্নের সন্ধানে মানুষকে দৌড়তে হয়েছে। সর্প দংশনের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ সর্প প্রশস্তি করেছে। তাই সর্পদেবী। লোকবিশ্বাস থেকে সেই লোকরীতি। তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে লোকদেবতায়। আমাকে বাঁচাও। তাই বাঙালির সাধনা ভালো করে বাঁচার জন্যে। মৃত্যুর পর ভালো থাকার দুর্ভাবনাতে বাংলার দর্শন তৈরি হয়নি। ভালো করে বাঁচার সাধনাই বাংলার প্রকৃত জীবন দর্শন—কুটির ঘেরা জীবনের পরিবেশ।

চাঁদ সূর্য ভগবান। আদিবাসীদের মধ্যে এই লোকবিশ্বাস থেকে একটা লোক-কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। সকল মানুষের দেবতা ভগবান চাষ করেন মানুষের খাবার সংস্থান করতে। আর পাপ-রাজা দোসাদ চাষ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে। ভগবান নিজের কায়িক পরিশ্রমে চাষ করেন তাই ফসল কম হয় আর পাপ-রাজা দোসাদ চাষ করে শূয়রের পিঠে চাবুক কষে তাই তার ফসল ভালো হয়। গোটা পৃথিবীর মানুষ তো ভগবানের সন্তান তাই ভগবানের কুলায় না। আর দোসাদ রাজার খাবার লোক নেই। তাই ভগবান তার কাছে আড়াই শামুক ধান ধার নেন। পরিশোধ আর করতে পারেন না। দোসাদ যে শামুকের তলা ফুটো করে রেখেছে, যতই ধান ঢালছে শমুক আর ভরে না। কোন আদিমকাল থেকেই মানুষের প্রকৃতিতে প্রবঞ্চনা করার শঠতা রয়েছে জানা যায়। দেনার ঠেলায় ভগবান চাঁদ সূর্য হয়ে আকাশে ছুটে বেড়ায়। দোসাদও আকাশে ধরতে পারলে গিলে ফেলে। তখনই গ্রহণ লাগে। এমনি করে নাকি চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয়।

এই লোকবিশ্বাস থেকে একটা লোকরীতির সৃষ্টি হয়েছে। আদিবাসী সমাজে চন্দ্র সূর্য গ্রহণের সময় বাড়ির উঠোনে গোবরের মাড়ুলি দিয়ে একমুঠি ধান রেখে ঝুড়ি ঢাকা দেওয়ার লোকরীতি আজও আদিবাসী সমাজে দেখা যায়। ভগবানের তো অনেক ছেলেপুলে তাদের জন্যেই তো ভগবান ধারদেনা করেছেন। মানুষের উচিত সেই দেনা পরিশোধ করা।

লোকদেবতা তাই সমষ্টিগত লোক-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। বড় পর্বত থেকে সমতল জমিতে চাষ করতে নেমে আসে আদিবাসী মানুষ। লৌকিক দেব-দেবী তাই ভূমিনির্ভর মানুষের গোষ্ঠী-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আদিবাসী সমাজে কৃষির সঙ্গে যুক্ত নানান লোক-উৎসব দেখা যায়।

এখানে কৃষি উৎসবের সঙ্গে যে সংস্কৃতি ওতপ্রোত জড়িত তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

(১) এড়োঃসিম বীজ বপন উৎসব। নাচে গানে ভরা। তারপর শস্য বপণের শেষে, (২) সর্প পূজা ও নাচ, (৩) কার্তিক মাসে গো-পূজা ও নাচ। বাদনা পরব, (৪) সহরাই ফসল কাটার উৎসব, (৫) বাহা পরব তো ফুলদোল, বসন্ত উৎসব। হয়তো আর্যদের আগমনের পূর্ব হতেই। কে যে কার কাছে ঋণী বোঝা যায় না। তবে আদিবাসীদের মধ্যে নারী দেবতার দেখা মেলে না। প্রাথমিক সমাজে একখণ্ড শিলাই লৌকিক দেব-দেবী প্রাথমিক অন-আদিবাসী সমাজেও। অ-আদিবাসী সমাজে পুরুষ ও নারী দেবতার প্রচার হয়।

একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, লৌকিক দেব-দেবীর প্রশস্তিমূলক নানান উপাখ্যান। কথা কাহিনী কি আদিবাসী সমাজ থেকে, কি অন-আদিবাসী সমাজ থেকে গাথা গানও রচিত হতে দেখা যায়। এমনি করে বাংলার মঙ্গল কাব্যের যুগ এসে পড়ে। লৌকিক দেব-দেবীর পরিকল্পনাই তো মঙ্গল কাব্যের পাদপীঠ। বাংলার সংস্কৃতি সম্পদ (১) চণ্ডীমঙ্গল, (২) ধর্মমঙ্গল, (৩) মনসামঙ্গল প্রভৃতি তো এভাবে রচিত হয়। কিন্তু তার পূর্বে বহু কথাকাহিনী কল্পিত ও রচিত হয়েছিল। এই সকল কথাকাহিনী ও গাথা গানগুলি বাংলাসাহিত্যে বিশেষ প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে।

চণ্ডী লৌকিক দেবী। এই চণ্ডী কিন্তু পুরাণের চণ্ডী নয়। গবেষকরা বলেন—এই চণ্ডী আদিবাসী মানসিকতার ফসল। ডঃ দীনেশ সেন বলেন, Chandi (চণ্ডী) the goddess, as doughter of a Hadi (হাড়ি সে আমলে অচ্ছুৎ জাতি) 'হাড়ির ঝি চণ্ডীমা' is a familier line which occurs often the

colophon. We know the Hadis in olden times used to perform the pristhy functions in some of the Kali temples and they even do so in same parts of Bengal (Folk Literature of Bengal ৯০-৯১ পৃষ্ঠা) বাংলাদেশের বহু স্থানে ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস ও স্বমত প্রসারের জন্যে অনেক সময় এই সব দেবতাদের পূজা ও ভক্তি প্রসারে সহায়তা করে। এমনি ছোট ছোট আরো অনেক লোক-দেবতা আছে যাদের নাম জানা যায়নি।. Their names are unknown and won Sanskriti and the modern of their worship is strange. (Folk Literature of Bengal ২৪৩ পৃষ্ঠা।)

এই সব দেবতাদের পূজা প্রসার আর ভক্তি উদ্রেক মানসে আদিবাসীদের গ্রহণ লাগার গল্পের মতো অনেক গাথা কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল।

ওঁরাওদের লোকউৎসব— ডান্ডা কাটনা। হিন্দুদের যেমন যে কোনো দেবতা পূজার পূর্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ-এর পূজা করা অবশ্য কর্তব্য, তেমনি ওঁরাওদের যে কোনো উৎসবের পূর্বে ডান্ডা কাটনা উৎসব করতে হবেই। ওঁরাওরা তখন বলে ডান্ডা কাটনা লোকদেবী। কেউ বলে দেবতা। নানা জনের নানা মত। আবার বলে এটা একটা আচরণীয় বা কৃত্য। এই উৎসব আলোচনা করবার পূর্বে মোটামুটি ওঁরাও সমাজের কথা আলোচনা করলে কোন্ সামাজিক পরিবেশে এই সকল উৎসব আচরিত হয় তা বোঝবার সুবিধা হবে।

দেশের গবেষকরা বলেন, ওঁরাওরা প্রাগৈতিহাসিক কালে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। অনেকে বলেন, এরা দাক্ষিণাত্যের কোঙ্কন প্রদেশ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন। ওঁরাওদের লোক পুরাণে আদি বাসস্থানের নাম নাকি পিপড়িগণ বা অধুনাতন পিপলান। কখনো গুজরাটের হবদিনানগরের কথা বহু লোকউপাখ্যানে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, সিন্ধু সভ্যতার কালে ওঁরাওদের কথা জানা যায়।

দেশের গবেষকরা বলেন, ওঁরাওরা প্রাগৈতিহাসিক কালে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। অনেকে বলেন, এরা দাক্ষিণাত্যের কোঙ্কন প্রদেশ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েন। ওঁরাওদের লোকপুরাণে আদি বাসস্থানের নাম নাকি পিপড়িগণ বা অধুনাতন পিপলান। কখনো গুজরাটের হবদিনানগরের কথা বহু লোকউপাখ্যানে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, সিন্ধু সভ্যতার কালে ওঁরাওদের কথা জানা যায়। এমলিভিনট্রিকেড নামে এক বিদেশি গবেষক বলেন, ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পার শতদ্রু নদীর অববাহিকায় বিস্তীর্ণ উপজাতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্যদের আগমনের সময় ওঁরাওদের আর্যদের চাপে পুরনো এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরতে ঘুরতে ৮০০-৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা বিহারের রোটাসে এসে একত্রিত হন। রোটাসে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পূর্বে হরিয়ানা আর জম্বুতে তারা অস্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। আইআমগড় আর উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন ওঁরাওরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে। এঁদের দেখা যায় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ আর উত্তর প্রদেশে। আন্দামানেও এদের বসতি ছড়িয়ে পড়ে পুরনো ভারতবর্ষে।

একটি লোকপুরাণের কথামতো জানা যায় যে, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাবাব নামে এদের এক প্রাগৈতিহাসিক রাজা নিজেদের জাতিটাকে সুসবদ্ধ করতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ওঁরাওরা নিজেদের এই কাবাব রাজার বংশধর বলে মনে করেন এবং নিজেদের কুরুখ জাতি বলে মনে করেন। ওই রাজার নাম থেকে নাকি কুরাখ শব্দের উৎপত্তি। আর্য হিন্দুরা ওদের ওঁরাও বলতেন। ওঁরাও কথাটা তরগোরা থেকে এসেছে। তরগোরা কথাটির অর্থ বাজপাখি। উৎকট টোটেম বিশ্বাসী এই উপজাতির নিকট বাজপাখি নিষিদ্ধ।

এইভাবে আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম ও ট্যাবুর বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকে বলেন ওদের আদি পিতামাতা ভার্যা আর ভাইয়ের ঔরসে জন্ম বলে ওঁরাও নামে অভিহিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে বাংলায় প্রবেশ করেন এই ওঁরাও সম্প্রদায়। ওই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আজও কিছু কিছু অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে পশ্চিম দিকে মুখ করে অনুষ্ঠানাদির রীতি রয়েছে বীরভূম অঞ্চলে। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যায় লৌকিক জীবনে প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্য বাসস্থানকে স্মরণ করবার মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের আত্মীয়তাবোধ টিকিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এদের লৌকিক জীবনবোধ তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য অনেকাংশে সাংকেতিক।

তাই এদের লৌকিক কৃত্যাদি আর অনুষ্ঠানে প্রাথমিক লৌকিক দেবতার নানান সূত্র দেখা যায়।

ধর্মরাজ মন্দির　　গোয়ালপাড়া, বীরভূম　　ছবি : পাপান ঘোষ
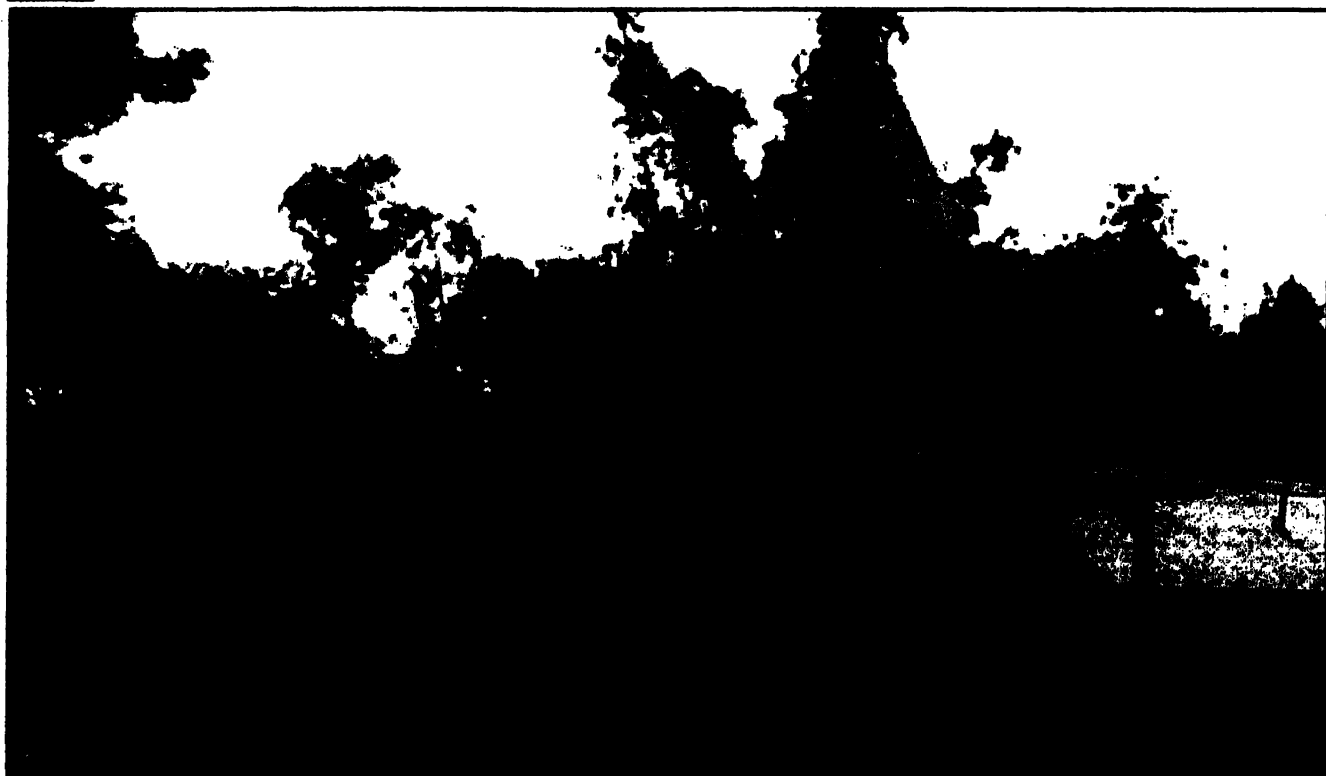
এমনই উৎসব ডাভা-কাটনা। এই ডাভা-কাটনা লোক-কৃত্য অবশ্য ঈশ্বরের অনুষ্ঠান। সাংকেতিক রেখাঙ্কন করা হয় উৎসব স্থানে। তারপর আমপল্লব আর একটি ডিম সাজিয়ে দেওয়া হয়। বলিদান দেওয়া হয় ঘন লাল রঙের ঝলমলে মুরগি। কিন্তু মেয়েদের এই মুরগির মাংস খেতে নেই।

এই ডাভা-কাটনা তৈরির উপাদান :—

(১) চালগুঁড়ি
(২) ইটগুঁড়ি
(৩) কাঠকয়লাগুঁড়ি
(৪) আতপচালগুঁড়ি

পয়লা মাঘের উৎসব।

মুরগি বলিদান করার পর ধানের বীজ জমিতে ফেলার রেওয়াজ আছে। তাকে বলে বিছেটি উৎসব। এই উৎসব পারিবারিক উৎসব। ভাই বোন সবাই মিলে নাচে।

লাল মুরগি যেমন পুরুষরা খাবে, তেমনি সাদা মুরগি বলিদান হবে ডাভা-কাটনা উৎসবে, তা পুরুষরা খেতে পাবে না—মেয়েরা খাবে। যেমন পৌষ ডাভা-কাটনা তেমনি বর্ষার প্রারম্ভে বীজ ফেলার সময় আষাঢ় ডাভা-কাটনা।

ডাভা-কাটনা উৎসব যে কোনো সময় করা যায়। অতি বিচিত্র লৌকিক উৎসব। বছরের প্রতি মাসে মাসে এই ডাভা-কাটনা দেবতার আরাধনা করা যায়। কখনো কখনো নতুন কুলোর উপর ও বহু বিচিত্র যাদুময়ী ডাভা-কাটনা উৎসব ও আরাধনা করা যায়। বিচিত্র জাতি তাই বিচিত্র সাংস্কৃতিক জীবন।

(আদিবাসী দর্পণ পত্রিকা ও দৈনিক ওভারল্যান্ড পত্রিকার আদিবাসী সংস্কৃতি পাতায় লেখকের প্রবন্ধ লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্য পয়ার ছন্দে বিরচিত হয়। এখন লোকমুখে এই সব কথা-কাহিনী আজও প্রচলিত।)

বীরভূম জেলায় কতকগুলো চণ্ডীপূজা একসূত্রে বিধৃত দেখা যায়। অনেক সময় এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা শুনত জনসাধারণ। নানা প্রকার গাথা গীতিকা রচিত ও লোকমুখে গীত হত। বীরভূম জেলার খয়রাসোল থানার পারশুণ্ডী গ্রামের পায়রাচণ্ডী দুবরাজপুর থানায় রাউতরা গ্রামের বাঘরাইচণ্ডী, সদর থানার সিউড়ি থেকে আমজোড়া যাবার পথের ধারে বাবাইচণ্ডী আর সদর থানার চোরমুড়া যাবার পথের ধারে সেকালের গভীর জঙ্গলের মধ্যে সোনাইচণ্ডী শাক্তদেবীর বিভিন্ন রূপ। নিষাদ সভ্যতার লোকবিশ্বাস হয়তো এর মর্মমূলে। অবশ্যই লোকদেবী। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীও কালকেতু ব্যাধের ভূপে বাঁধা লোকদেবী চণ্ডী স্বর্ণ গোধিকা রূপে। সবই অপৌরাণিক লোকদেবী। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার মানসে পৌরাণিক আলখাল্লা পরাবার চেষ্টা হয়েছে বারবার। লোক-দেবতা ইহকালে সুখ ঐশ্বর্য

আকাঙ্ক্ষার দেবতা। লৌকিক দেব-দেবীর পূজা তো লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছে।

[১৩৭৭ বাংলা সন, আষাঢ় সংখ্যা সমকালীন মাসিক পত্রিকায় (২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৪) এক লোকউপাখ্যান প্রকাশিত হয়। এই লেখকের সংগ্রহ।]

চন্দ্র শর্মার মায়াবতী নামে স্ত্রী অতি সাধ্বী পতিপ্রাণা। অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। সুখে সংসার করে। এমন সময় একজন গণৎকার এসে বলল, তোমার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হবে সেই সন্তানের মুখ দর্শন করলে তোমার মৃত্যু। এখন যথাকর্তব্য পালন কর। এই সব কথা শুনে চন্দ্র শর্মা বিচলিত হল এবং স্ত্রী মায়াবতীর কাছে গিয়ে সব কথা বলল।

সন্তানকে হত্যা করবার জন্যে সে স্ত্রীকে বারবার অনুরোধ করল। তারপর যথাসময়ে স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। কিন্তু চন্দ্র শর্মাকে মৃতসন্তানের কথা বলা হল। এদিকে ধাত্রী মায়াবতীর পুত্রকে গোপনে নিয়ে চলে গেল। প্রতিপালিত করতে লাগল। কিন্তু একথা কি গোপন থাকে! ব্রাহ্মণ চন্দ্র শর্মা ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং স্ত্রী মায়াবতীকে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মার নিকট বিক্রয় করে দিল।

দিনেদিনে দিন যায়। মায়াবতীর পুত্র দেবীদাস জানল ধাত্রী তার মা নয়। তার মা ক্রীতদাসী ব্রাহ্মণ বিষ্ণু শর্মার ঘরে। তখন সে গর্ভধারিণীর মুক্তির জন্যে চণ্ডীর আরাধনা করতে লাগল। চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে তার মায়ের মুক্তির জন্যে বর দিল। এদিকে বিষ্ণু শর্মা ব্রাহ্মণ বলল—

বিপ্রের চরণ ধরি করে নিবেদন।
মায়ের মুক্তি কিসে হইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কহিল তবে দেবদাস প্রতি।
অবশ্যই মাতা তব পাইবে মুকতি॥
যাহা চাই তাহা যদি তুমি দেহ আনি।
তবে তো হইবে মুক্ত তোমার জননী॥

দেবীদাস মা চণ্ডীর উপাসনা আরম্ভ করল। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূতা দেবী বর দিলেন।

দেবী বলে দেবীদাস বাসনা যা থাকে।
দেবীদাস বলে দেবী মুক্ত কর মাকে॥
ব্রাহ্মণ চাহিবে যাহা তাহা দিতে হবে।
তবে তো ব্রাহ্মণ মোর মাকে মুক্তি দিবে॥

দেবী চণ্ডী দেবীদাসকে আশ্বাস দেওয়ায় পুত্র কিচ শর্মার কাছে এসে মায়ের মুক্তি ভিক্ষা চাইল। ব্রাহ্মণ বলল, উঠানময় হাজার বস্তা সরিষা ছড়িয়ে দাও। তাই শুনে তার লোকরা সরিষা ছড়িয়ে দিল। ব্রাহ্মণ বলল, দেখি এই সরিষা তুলে দাও। দেবীদাস মাকে ডাকল। হাজার হাজার পায়রা রূপে দেবী এসে উঠান থেকে বস্তা বস্তা সরিষা তুলে দিল।

খয়রাসোল থানার পারশুণ্ডী গ্রামে দেবী পাররাচণ্ডীর থান আছে। এই গাথাকাহিনী মানুষ জানে না। পয়লা মাঘ এই লোকদেবীর পূজা হয়, মেলা বসে। লৌকিক দেব-দেবী পূজার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের মেলা হয় পূজার সময়।

ব্রাহ্মণ বলল, না না এতে হবে না। বাঘের দুধ এনে দিতে হবে। মাকে দেবীদাস স্মরণ করামাত্র হাজার হাজার বাঘ ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে মায়াবতীর পুত্র বললে যত ইচ্ছা বাঘের দুধ দুইয়ে নিতে। ব্রাহ্মণ ভটস্থ। —না না, বাঘের দুধ চাই না। বীরভূমের বহু গ্রামে বাঘরাই চণ্ডীর পূজা হয় পয়লা মাঘ। মোটা মোটা শাল গাছের মাঝে পাথরের চাঁই—বাঘরাই চণ্ডী মা। সেকালের ঘন জঙ্গলের মাঝে।

—না না বাঘের দুধ দরকার নেই, সর্পবিষ চাই। মাকে স্মরণ করামাত্র বারো ফণাবিশিষ্ট সর্প এসে হাজির। ব্রাহ্মণ তো অস্থির। ভয়ে তার মাকে মুক্তি দিল। তখন দেবীদাস সোনার চণ্ডিকা মূর্তি তৈরি করে পূজা করল। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে এই সোনাই চণ্ডীমাতার পূজা হয় আজও। তবে জঙ্গলে পূজা হত। এখন আর সে জঙ্গল নেই। তাই এইসব লোকদেবতা-পূজার মাধুর্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু লোকদেবতার পূজা আজও হারায়নি। বীরভূমে বহু বাবাহি চণ্ডীর থান আছে।

বীরভূমে অপৌরাণিক লোক-দেবতা পূজা সাত ভাই পূজা। সাধারণত ভাদ্র মাসে রাধা অষ্টমীর সন্ধ্যায় এই উৎসব আরম্ভ হয়। সারা রাত্রি ধরে পূজা করা হয়। আর বিষম ঢাকি বাজিয়ে গান করে গানের সম্প্রদায়, সঙ্গে ভক্ত্যাদের ভর নৃত্য। তার পরদিন সকালবেলায় ভেড়ার পাঁঠার বলিদান করে সেই পাঁঠার রক্ত বড় বড় ঘটি-বাটিতে রেখে দেয়। ভর নৃত্য করতে করতে চোঁ-চোঁ করে এক একজন ভক্ত্যা রক্ত খেয়ে দড়াম করে পড়ে। ভর ভেঙে যায়।

গানের সম্প্রদায় গান করে :—

ধোবাঘাটের জল খেয়ে
ঘোষ পড়ল দরাম দিয়ে।

এই সাত ভাই সাধারণত তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের দেবতা। তবে সবই তো একাকার হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্ম সবই গ্রাস করে নিয়েছে। নানান চিন্তা-ভাবনা বা নানান লোকবিশ্বাস সবই কিন্তু মানুষের বাঁচার জন্যে।

সাত ভাই মানে অশরীরী প্রেতাত্মা। এই অশরীরী অপশক্তি নাকি মানুষকে অশরীরী অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করে। বনে কাঠ কুড়তে গেলে মানুষ ভুলোভূতের কবলে পড়ে বেভুল পথে চলে যায়। সাত ভাইকে স্মরণ করলে উদ্ধার পায়। মাছ ধরতে গেলে মেছোভূতে ডুবিয়ে মারে বা মাছ কেড়ে নেয়। সাত ভাইরা রক্ষা করে। প্রথম পোয়াতির পায়ে পায়ে তা শরীরে প্রবেশ করে সন্তান হয়ে জন্ম নেয়। জ্বালানোর পর জ্বালিয়ে তারপর মারা যায়। শাকচুন্নি ছেঁড়া কাঁথাখানি ছিঁড়ে বেড়ায়—সাত ভাইরা তাদের

কোটাসুরের মদনেশ্বর মন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন শিলামূর্তি — ছবি : মানস দাস

তাড়িয়ে দেয়। ষাট-সত্তর বছর আগে বীরভূমের গোবিন্দপুর গ্রামে দেখা উৎসবের কথা। এখনো বীরভূমের বহু স্থানে এই লোক-দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। সাত ভাইরা নাকি জীবিতকালে মানুষের উপকার করত। এক যুদ্ধে তারা মারা যায়। মৃত্যুর পরেও তারা মানুষের উপকার করে চলে।

কৃষিনির্ভর আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো সমাজে জলে ডাঙায় চাষের মাঠে মাঠে মানুষকে লড়াই করে ফসল তুলতে হয়। তাই তেমনি পরিবেশ। সেকালে তো মুনাফা লটকানো রোজগার ছিল না মুনাফাবাজির। তাই তো এইসব লৌকিক দেব-দেবী পূজার প্রচলন হয়েছিল। এইসব লৌকিক দেব-দেবী মানুষকে সুন্দর করে বাঁচার জন্যে সাহায্য করে। পরকালের নিরর্থক ভাবনা ছিল না।

যে যুদ্ধে সাত ভাইরা হত হয়েছিল তার লৌকিক ইতিকথা সংগ্রহ করলে আজও সব জানা যায়। এই সাত ভাই পূজা অবশ্যই কৃষি উৎসব।

এই পূজার ভেতর একটি অনুষ্ঠান আছে। মূল দেবাংশী লাঠি হাতে ভর নামে রাখাল নাচের মাঝেই। একজন ভর নাচের মাঝেই বাঘের প্রেতাত্মায় উদ্দীপিত। আর সব উপোসী ভক্ত্যারা মহিষের প্রেতাত্মায় ভরপুর। বাঘ খেতে যায় মহিষদের। আর লাঠি হাতে নাচতে নাচতে রাখাল বাঘকে আগলায়। নাচতে নাচতে ভর নাচের মাঝেই মহিষরা বাঁচতে চেষ্টা করে। সব নাচই চিরকাল প্রচলিত লোকনাচ। গানের সম্প্রদায় তখন বিষমঢাকি বাজিয়ে গান করে। মূল গায়েন গায় আর দোহাররা ধুয়া ধরে। এই অনুষ্ঠান ষাট/সত্তর বছর আগে দুদিন ধরে গ্রামকে উথাল-পাথাল করে ছাড়ত।

(১৩৫৪ সংহতি মাসিক পত্রিকায় এই উৎসবের কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ও লেখকের গাথা-গীতিকায় চিরন্তনী বাংলা পুস্তকে বিধৃত।)

মূল গায়েনের গানের ভাষা এমনি :—

সাত ভাইরা বাণ সিং।
সতেরো শয়তান হবে॥
সাত বেগুন জালির বন।
সাত ভাই তাই খেলে জিয়ল সাত॥
ছুটোমুটো জিয়ল কাঠি।
ভুমে লুঠে যায়—
তাহারই তলে সাত ভাই ঠাকুর খেলে।
সাত ভাই খেলে জিয়ল সাত॥

এই পূজা হত নিম শ্যাওড়ায় বা জড়াজড়ি গাছের তলায়। গাছের গোড়ায় বড় চিমটে আর চিমটেয় জড়ানো চাঁদমালা পত্‌পত্‌ করে বাতাসে উড়ত। দু-এক জোড়া খড়ম নামানো থাকত গাছতলায়। ভর-নামা দেয়াসীর কাছে রোগী আসত নানান জটিল রোগের। চাউর হত মৃত আত্মারা এসেছে ভরের মধ্যে দেয়াসীর শরীরে। কাঁদতে লাগত উচ্চৈঃস্বরে মৃত মানুষের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা।

শক্ত পেশী চাষে খাটা মানুষের অদ্ভুত লোক-বিশ্বাস। তাদের কত অশরীরী শক্তির কাছে অসহন করে তুলত। অতি সম্প্রতি এই সকল লোক-দেবতা হাসির খোরাক জোগায়, কেন না আজ সমাজ পালটে যাচ্ছে। উৎপাদন-নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। রোজগারের নানান কায়দা কসরৎ সমাজকে তছনছ করে দিয়েছে। ভূমি-নির্ভরতা কমে গেছে গ্রামীণ স্তরে। বিরাট কৃষি শ্রমিকের সমাজে চিন্তা জগতেরও ওলটপালট হয়ে গেছে। জীবিকার ওলটপালট জীবনচর্যারও ওলটপালট করে দিয়েছে। নিম শ্যাওড়া জড়ানো গাছতলায় লোক-দেবতার আটন টলটল করছে। এই সামাজিক ইতিহাস হারিয়ে যেতে বসেছে। জীবিকার রূপান্তর জীবনেরও রূপান্তর করে তুলেছে।

আজ বাংলার কৃষি জীবিকার নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। কাছাকাছি শহরে কৃষি শ্রমিকরা রাজমিস্ত্রির ইট জোগানদার। বাড়ির পর বাড়ি তৈরি হচ্ছে—ঠিকাদারদের।

বাংলা ১৩৭৭, মাঘ সংখ্যা সংহতি মাসিক পত্রিকায় (২০৩/২বি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা) আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিচিত্র লোক-দেবতার কথা, তার প্রশস্তিমূলক উপাখ্যান সমেত। এই লোক-দেবতার নাম—রাম খেলোমান। বিহারের প্রান্তঘেঁষা প্রাচীন বীরভূমের গ্রাম।

লোক-দেবতা জাগতিক সুখ-শান্তি বিধানের দেবতা। এ জীবনে গোয়ালির গরু, মরাইয়ের ধান, ঢেঁকিশালের ঢেঁকি আর কোলের বাছার অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। ছোট্ট চাওয়া, তাই পাওয়াও যায় অনবরত। এই জীবনে প্রয়োজনের সেবিতার বিষবাষ্পে মানুষের কণ্ঠ রোধ হয়ে আসেনি। কিন্তু অসংযত চাওয়া অনবরত পাওয়াকে নিঃশেষ করে মানুষকে লোভাতুর করে তুলল। প্রয়োজনের বেড়াজালে যেদিন হতে আটকে গেল মানুষ সেই দিনই মনুষ্যত্বের দারুণ দুর্দিন। উৎকট প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাভাবিক উপার্জন সমতা না রাখতে পেরে অবৈধ উপার্জনের কাছে মনুষ্যত্ব পরাজয় বরণ করেছে তাই ধানমাঠের পাহারাদার আর মরাইয়ের পাহারাদার দেবতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। হাসির খোরাক আজ ব্যাঙ্কের ফিক্সডিপোজিটই অপূর্ব লোক-দেবতা। সেদিনের সামাজিক কাঠামোতে আত্মসন্তুষ্টি ছিল। আজ লেলিহান আগুনের শিখা। সমাজকে পুড়িয়ে দেবে যেন। তাই লোক-দেবতার ইতিহাস লিখে যাচ্ছি। আজ ধনতান্ত্রিকতার বিষবাষ্পে মনুষ্য সমাজ বিষাক্ত হয়ে গেছে। মানুষও যেন ধ্বংস হয়ে যাবে। এর উত্তর দেবে কাল। সে মহাকাল অকরুণ, নির্মম, প্রতিশোধস্পৃহ। নকশার দাগে দাগে মানুষ তাদের হৃদয়ে দগদগে ঘা করে। দগদগে ঘা করে তোলে মা বসুমতীর বুকে। মাটিকে ভাগ করে চিরে চিরে। এটা আমার, ওটা তোমার করতে করতে অবৈধ লালসাকে লালন করে। সবটা কি সবারই করা যায় না। মাটির ক্ষুধা ফসলের সঞ্চয় অন্যেল চাওয়ার নেশায় না খেতে পাওয়া মানুষের সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। দেবতাকে তাই বাধ্য হয়ে পালাই পালাই করতে হয়েছে। মানুষ দেবতাকে আমল দেয়নি আজ। কেন না দেবতা মানুষকে কোনোদিন ছোট করেনি। নিরর্থক সঞ্চয়কামী আর সঞ্চয়কারী সমাজের কাছে বিত্তহীন ঘৃণার পাত্র হয়েছে। দেবতা এখানে কোথায় থাকবে তাই দেবতার ও সমাজের ইতিহাস লেখার অবশ্যই প্রয়োজন।

রাম খেলোয়ান ঐহিক মঙ্গল বিধানের দেবতা। একটি প্রচলিত ছড়ায় দেখা যায় রাজার রানী সন্তানহীনা। দেবতা রাম খেলোয়ান তো গৃহস্থের বাড়িতে থাকা একটি লম্বা পাথর খণ্ড। নতুন লাল শালু পরিয়ে মরাইয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়।

সন্তান যদি না থাকে তো রাম খেলোয়ানের অযথা পাহারা। তাই খেলোয়ানের আশীর্বাদ পেয়ে সন্তান হয়। এখানে কিছু ছড়ায় দেখা যায়—

ধন বইছে আংগালে ডাংগাল।
বিধাতা করেছে আমায় পুত্রের কাঙাল॥
আকাশেতে চেয়ে দেখ লক্ষ লক্ষ তারা।
যার ঘরে যাদু নাই সে জীয়ন্ততে মরা॥

তারপর রানী রাম খেলোয়ানের তপস্যায় বসেন। রানীর তপস্যায় রাম খেলোয়ানের আশীর্বাদে রাজার পুত্র হয়। রাম খেলোয়ান তো পালোয়ান মানুষ ছিল। মানুষের উপকার করত। তাই মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে গেছে। এই তো লৌকিক দেব-দেবীর ইতিহাস।

তাই ভিখারি সাজা রোগা পচা ফকিরকে দেখে অন্য রানীরা যখন হাসেন ছোটো রানী সম্মান করে ভিক্ষা দেয়।

দুয়ারে ভিখারি দেখে রানীরা ভিক্ষা দিতে এলো।
হেনকালে রানীগণ কি বুদ্ধি করিল॥
সরাপূর্ণ তণ্ডুল লয়ে ভিক্ষা দিতে এলো।
রোগা পচা ফকির দেখে রানীগণ হাসে॥
মুখে কাপড় চাপা লয়ে চলে নিজ বাসে॥
মানুষের মধ্যে আমরা আটকুড়া হব।
রোগা পচা ফকিরে তবু ভিক্ষা নাহি দিবো॥

সব রানীরা চলে গেল। কিন্তু ছোটো রানী পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে ফকিরকে ভিক্ষা দিল। অবজ্ঞাভরে সব রানীরা কিন্তু তাচ্ছিল্য করেছিল ভিক্ষুককে। ঐশ্বর্যের মোহে অন্ধ অন্য রানীরা। কিন্তু রাম খেলোয়ান যে ঐশ্বর্যের রক্ষক। তারা এই রক্ষককে ভুলে গেল। ছোটো রানী সন্তানবতী হওয়ার আশীর্বাদ পেল দেবতা রাম খেলোয়ানের নিকট।

কিন্তু ছোটো রানীর সন্তান প্রসবের সময় ছয় রানী অত্যাচার করল—

হেনকালে ছয় রানী কি বুদ্ধি করিল।
ছোটো রানীর মুখে সাতপুরু কাপড় বান্ধ্যা দিল॥
অপূর্ব সুন্দর পুত্র কোলেতে হইল।
সমুদ্রের জলে গিয়া ভাসাইয়া দিল॥
হেনকালে ছয় বউ কানাকানি করে।
কুকুর ছা থেকল ছোটো রানীর উদরে॥
তারপর এক ধারী সেখানে আইল।
ছোটো রানীর উদরে প্রভু কুকুর ছা হল॥
আটকুড়া রাজা হয়ে সতত উদাসী।
ক্রোধে করে ছোটো রানীরে ঘোড়াশালের দাসী॥

তারপর রানী ঘোড়াশালের দাসী হয়ে থাকে। এদিকে রাম খেলোয়ান অন্তর্যামী। তাই ছোটো রানীর সন্তানকে রাম খেলোয়ান পালন করে। সেই সন্তান দিগ্বিজয়ী হল। মায়ের বন্ধন দশা মুক্ত করল আর অন্য রানীদের হেঁটকাটা উপর কাটা দিয়ে মাটি চাপা দিল।

খেলোয়ানের সেবা শোন সোয়া সের আটা আন।
তাতে দিও সোয়া সের চিনি॥
খেলোয়ানের সেবা শোন সোয়া গণ্ডা পান আন।
তাহে দিও এলাচ ও সুপারি॥

এই গাথার মধ্যে খেলোয়ানের সামান্য বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা অনুযায়ী কোনো মূর্তি পরিকল্পিত হয়নি।

খেলোয়ান চলিয়া যায়।
সোনার খড়ম দিয়া পায়॥
লোকে বলে কোন রাজার ব্যাটা।
খেলোয়ান চলিল রঙ্গে॥
জোড়া বাঘ চলে সঙ্গে।
সিদ্ধি বলে লেগে গেল ল্যাঠা॥

এই গীতিকার মূল ভিত্তি-কাহিনী কল্পনা। লোক-জগৎ লোক-দেবতা আর লোক-সংস্কৃতি তো অপৌরাণিক। এই সকল দেবতার উপর সংস্কৃত মন্ত্রের ছিটেফোঁটা জল ছিটিয়ে পৌরাণিক সংস্কৃতি আর লোক-সংস্কৃতির মধ্যে একটা সেতুবন্ধ রচনা করার চেষ্টা হয়েছে চিরকাল। এমনকি আজও।

তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে বা গ্রামের উপান্তে বা অনেক কয়টি গ্রাম নিয়ে একটা এলাকার ব্রহ্মদৈত্যের থান থাকে। চাষী মানুষ পথ চলতে নমস্কার করেন। পরলা মাঘের বিশেষ পূজায় মেলা বসে। একদিনের মেলা। ব্রহ্মদৈত্য মেলা। বীরভূমের বহু গ্রামে এই ব্রহ্মদৈত্য মেলা হয়। এই ব্রহ্মদৈত্য পূজাও অপৌরাণিক। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কৃতি আপস করে চলেছে। ব্রহ্মদৈত্যও অশরীরী লোক-দেবতা। গ্রামের থেকে সামান্য দূরে আটন। ধান কাটা শেষ হলে আজও মানুষ শেষ ধানের আঁটিটি ছুঁড়ে দেয় বাবা ব্রহ্মদৈত্যের আটন-এ। ব্রহ্মদৈত্য মানুষের উপকার করে। অশরীরী অপশক্তির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। বীরভূমের লৌকিক জগতে অশরীরী লোক-দেবতার আকর্ষণই সমধিক।

বাংলাদেশে এক সময় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ শাসিত বাংলায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়। ব্রাহ্মণ আর রাজাতে কোনো তফাৎ ছিল না সে সময় কয়েকটি এলাকাভিত্তিক জনপদ। এমনই শাসন ব্যবস্থা। অনেক সময় ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ গণনিপীড়নের সুযোগ লাভ করত। তাদের দণ্ড ছিল অত্যন্ত অকরুণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্প্রসারণের জন্য অনেক সময় অ-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে নিষ্পেষিত করা হত। বাংলাদেশে এই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যেতর ধারাও প্রবলতরভাবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায়, যা কিছু অ-আর্য অ-ব্রাহ্মণ্য তাই শূদ্র বা দাস ভাবধারা ম্লেচ্ছ বা যাবনিক সংস্কৃতি অর্থাৎ সর্বথা পরিত্যাজ্য। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতির দ্বন্দ্ব যেমন এককালে ইতিহাসে দেখা যায়, তেমনই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংঘর্ষ দেখা যায়। কিন্তু লৌকিক বা অ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আজও আপন ধারায় বয়ে চলেছে। সংঘর্ষের ইতিহাসে এই লোক-দেবতা ব্রহ্মদৈত্য। গ্রামের উপকণ্ঠে বাবা ব্রহ্মদৈত্যের থান আছে বীরভূমের নানান গ্রামে।

বাংলাদেশে এক সময় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ শাসিত বাংলায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়। ব্রাহ্মণ আর রাজাতে কোনো তফাৎ ছিল না সে সময় কয়েকটি এলাকাভিত্তিক জনপদ। এমনই শাসন ব্যবস্থা। অনেক সময় ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ গণনিপীড়নের সুযোগ লাভ করত। তাদের দণ্ড ছিল অত্যন্ত অকরুণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ সম্প্রসারণের জন্য অনেক সময় অ-ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিকে নিষ্পেষিত করা হত। বাংলাদেশে এই ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যেতর ধারাও প্রবলতরভাবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করেছে।

পূজা হয়। বিশেষ পূজা হয় পয়লা মাঘ। একটি উপাখ্যান সংগৃহীত হয় ও প্রকাশিত হয়, ১৩৭৬ বাংলা সাল, সংহতি মাসিক পত্রিকায়। (হারানো বাঙলা—লেখক)

উৎপত্তি

অবধানে শুন কিছু নিবেদন করি।
ব্রহ্মদৈত্য উপকথা কহিব বিস্তারি॥
চন্দ্রকান্ত নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তান।
রাঢ় দেশে বাস করে অতি গুণবান॥
দ্বাদশ বর্ষ যবে বয়স হইল।
হোম যজ্ঞ করি তারে উপবীত দিল॥
দণ্ড কমণ্ডলু আর গেরুয়া বসন।
ব্রহ্মচারী সাজাইলো অতি সুশোভন॥
গৃহেতে রাখিল তারে আবদ্ধ করিয়া।
একমাত্র মাতা যায় খাবার লইয়া॥
মাতা ছাড়া কেহ নাহি যাইতে না পায়।
এইভাবে তিন রাত্রি ব্রাহ্মণ কাটায়॥
বাহির হইল বিপ্র তিন দিন পরে।
ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
আড়াই চরণ ভূমি করে অতিক্রম।
না যাইবে ব্রাহ্মণ আর এই তো নিয়ম॥
নিয়ম না মানি বিপ্র তিন পদ ফেলে।
ভিক্ষা ফেলিয়া গৃহ ছাড়ি বনে যায় চলে॥
মাতা পিতা গুরুজন নিষেধ করিল।
কারো কথা না শুনিয়া বনে চলে গেল॥
করিল দ্বাদশ বর্ষ তপ বিল্বমূলে।
জীবিত সমাধি নিল বিল্বভূমি তলে॥
চারিদিকে ঢেলা ছুঁড়ি করয়ে উৎপাত।
বিভৎস মূরতি যত দেখায় সাক্ষাত॥
ব্রহ্মদৈত্য হল সেই শুন সমাচার।
উৎপাত করয়ে সদাই বনের মাঝার॥

* * *

বাক নগরেতে এক আগুরি নন্দন।
নরসিং বলি তারে ডাকে সর্বজন॥
পত্নী তার জ্বালামুখী নামেতে রমণী।
সর্বদা জ্বালায় তারে কিছু নাহি শুনি॥
সংসারে পত্নী আর অভাব জ্বালায়।
ঘর ছাড়ি নরসিং পালাইয়া যায়॥
রাজার দরবারে গিয়া চাকুরী করিল।
মল্লযুদ্ধ শিখিয়া মল্লবীর হইল॥
মল্লযুদ্ধে না পারিল কোনো বীরগণ।
বীরবাহু নাম তাই দিলেন রাজন॥
সেই হেতু বীরবাহু বলে সবে তাই।
বিদ্যমান থাকে সদা রাজার সভায়॥
একদিন এক মল্ল তথায় আইল।
রামসিং নাম তার পরিচয় দিল॥
রাজার নিকট বীর করে নিবেদন।
আমাকে চাকুরী দিয়া রাখহ রাজন॥
রাজা বলে তোমায়ে চাকুরী পারি দিতে।
নরসিংহে তুমি যদি পারহ জিনিতে॥
রাজার বচন শুনি দুই মল্লবীর।
বীরমাটি মাখি আইল লড়িতে সমরে॥
লাগিল ভীষণ যুদ্ধ দুই বীরবরে।
কেহ কভু নীচে পড়ে কখনও উপরে॥
এইরূপে বহুক্ষণ সমর হইল।
নরসিংহে রামসিং আছাড়ে মারিল॥

* * *

এই নরসিংহ কথায় দেখা যায়, রণে হেরে নরসিং ব্রহ্মদৈত্য-বনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায়। ব্রহ্মদৈত্য রক্ষা করে। তারপর ব্রহ্মদৈত্য তাকে নানান চিকিৎসা শেখায়। নরসিং ভালো গুণীনের খ্যাতি পায়।

কিন্তু একদিন এক রোগী দেখতে গিয়ে নরসিং দেখে দন্ত কিটিমিটি করছে—অবশ্যই বুঝতে পারে এই রোগীকে ব্রহ্মদৈত্য অবশ্যই পেয়েছে। তাই নরসিং তাকে হরিনাম করতে বলে। কেন না ব্রহ্মদৈত্য হরিনাম-বিদ্বেষী। নাম শুনলে সে স্থান ছেড়ে যাবে। সত্যি রোগী ভালো হয়ে গেল। ব্রহ্মদৈত্য তা বুঝতে পেরে নরসিংকে হত্যা করল।

কিন্তু জনসাধারণকে বলল, নরসিংয়ের দোহাই দিয়ে ওষুধ খেলে সেই রোগীর আরোগ্য হবে। আজও বীরভূমের অনেক স্থানে নরসিংতলা বা আটন আছে। (জাহ্নবী সদর থানা ইত্যাদি) বিচিত্র লোকসমাজ।

পল্লী অঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণি পূজিতা সাতটি দেবী ভগ্নি আর শাস্ত্রীয় সপ্তমাতৃকা—লৌকিক সংস্কৃতির সেতুবন্ধন তা তো জানারই কথা। এই মতের সমর্থনে জানা যায় যে বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে বীরভূম জেলায় যে সাতটি লৌকিক দেবী প্রচলিত সেই সব অঞ্চলে সপ্তমাতৃকা পূজারও প্রাধান্য। বীরভূম জেলার নানা স্থানে সাত বোন পূজায় প্রাধান্য দেখা যায়। মুসলমানরাও ওলাবিবি মতিবিবির কথাও বলেন। দক্ষিণ ভারতে মীনাক্ষী ও তার ছয় বোনের রূপকল্পিত হয়। কোথাও বা বাসুলী রঙ্কিনী ইত্যাদি ছয় বোনের রূপকল্পিত হয়। অনেক পণ্ডিত বলেন, বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ের অনেক নারী ধর্মচারিণী ডাকিনী যোগিনী তন্ত্র সাধিকা সপ্তদেবীরূপে কল্পিত ও পূজিত হত।
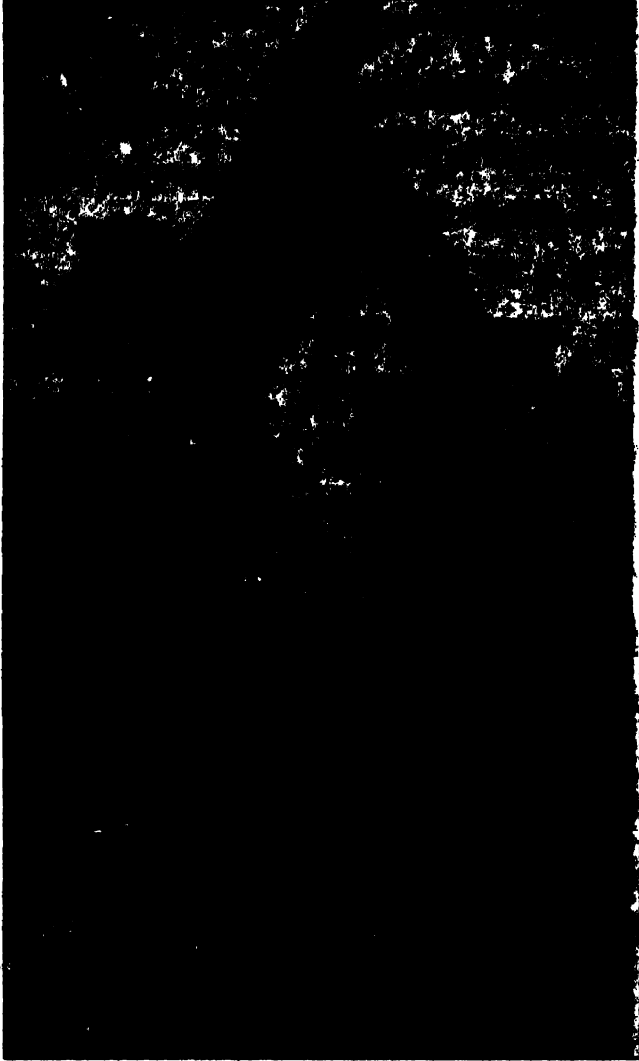
শীতলা মন্দির

বীরভূমে অ-আর্য জীবনধারায় ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নারী দেবতার পরিকল্পনা করা হয়। আর্যরা তো পুরুষ দেবতার পরিকল্পনা করে। অ-আর্যরা পরিকল্পনা করে লৌকিক নারী দেবতার। আর্যরা জনসমর্থন ও প্রচার মানসে সেই দেবতাদের পাঙক্তেয় করেছে। পদ্মপুরাণ লেখা হয়েছে মনসাকে নিয়ে। তেমনি শীতলাও মারী ভয় নিবারণের দেবতা হলেও তাকে পৌরাণিক করে নেওয়া হয়েছে। মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। লৌকিক দেব-দেবীর কোনো মূর্তি নেই। সাধারণত শিলামূর্তি। শীতলা শব্দটিই অনার্য এ কথা বলেন অনেক পণ্ডিতরা। অনেকে বলেন, শীতলার মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যেও অনার্য ছাপ সুপরিস্ফুট। এই দেবী তো অবশ্যই আদিম যুগের ভয় ও বিপদের দেবতা। শীতলার ধ্যানে যে মূর্তি পরিকল্পনা দেখা যায় তা পণ্ডিতদের কাছে অ-আর্য দেবতার প্রকারভেদ। শীতলার ধ্যানে আছে—

শ্বেতাংগীং রাসবস্থাং কর যুগবিল সন্মার্জনীপূর্ণ কুম্ভাম।
মার্জন্যা পূর্ণ কুম্ভাদ্ মৃতময় জলং তাপসানো কিবাস্তীমঠ
দিগ্ বস্ত্রাং মূর্তি শূর্পাং কনকমণি গণে ভূষিতাংগীং ত্রিনেত্রাং
বিস্ফোদ্যু প্রতাপ প্রশমণকরীং শীতলাংতাং ভজামি॥

এই মূর্তি পরিকল্পনা আবার পণ্ডিতদের মতে বেদোক্ত দেবতার পঙক্তিতে স্থান লাভ করে।

পণ্ডিতের কচকচিতে না গিয়ে আমরা দেখতে পাই বীরভূমে চৈত্র মাসের শনি মঙ্গলবার দিনে গ্রামে গ্রামে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলার হাতে ঝাঁটা। আদিম মানুষের চিকিৎসা পদ্ধতিতে মন্ত্রের বিশেষ প্রচলন ছিল। এই মন্ত্র পড়ার সময় রোগিণীর গায়ে ঝাঁটা চালনার বিশেষ রীতি ছিল। অনেক সময় 'ঝাঁটায় করিয়া বিষ ঝাড়ে তিনবার।' এই সকল লোক-দেবতা পূজার ইতিহাসে দেখা যায় যুগের বিবর্তনের ফলে এই শীতলা লোক-দেবতার স্তর থেকে পৌরাণিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং শীতলা মঙ্গল কাব্য লিখিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়। যেমন বীরভূমে সংগীত লোক-উপাখ্যানগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলা মঙ্গল-এ বসন্ত রায়ের কথাই উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক বসন্ত রায়ের কথা অনেক সময় দেবতার কথায় রূপান্তরিত হয়।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে সংগৃহীত লোক-কথা ও গাথা-গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল নানান লোক-দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারকে কেন্দ্র করে। বীরভূম অঞ্চলে নানা প্রবাদ আজও শোনা যায়—

শীতলা হইলে রুষ্ট লোক সব পায় কষ্ট।
পাছে পাছে ফেরে নানা রোগ॥
শীতলার দয়া হলে ধন পুত সবই মিলে।
দূরে যায় দুঃখ জ্বালা শোক॥

এই সব লোক-দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নানান গাথা-গীতিকা প্রচলিত হয়েছিল। কবি কৃষ্ণরামের শীতলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে মাত্র তার নজীর এই আলোচনায় বিস্তারিত জানানো হচ্ছে। উদ্যোগ নিয়ে এই মঙ্গল গীতিকাগুলি প্রকাশ করলে ইতিহাসে নজীর সৃষ্টি হবে।

মন দিয়ে শোন সব শীতলার কথা।
শুনিলে সংসারে সুখে থাকিবে সর্বদা॥
প্রতিবার চৈত্র মাসে শনি মঙ্গলবারে।
পূজিবে শীতলা দেবী হরিষ অন্তরে॥
খইল ও সরিষা দিবে পূজা সামগ্রীতে।
গ্রহচার্য্য মন্ত্রপুতঃ করিবে তাহাতে॥
গোধন মঙ্গল তার সে খইল দিয়া।
প্রত্যেক গরুকে সন্ডে দিবে খাওয়াইয়া॥
মন্ত্রপুতঃ সরিষা যতন করি লইয়া।
গৃহ চতুর্ভিতে সন্ডে দিবে ছড়াইয়া॥
এই সব আনু জেনো যে জন করিবে।

যত অমঙ্গল তার সংসারে ঘটিবে॥
নামুনি (কলেরা) রোগেতে তার সমস্ত সংসার।
শীতলা মায়ের কোপে হইবে ছারখার॥
শীতলা পূজিত নাম্নী মালতী নামেতে।
তার মতো দক্ষলা নাই পৃথিবীতে॥
নাগরিকগণ যায় শীতলা পূজিতে।
নাগরিকগণে কহে বিদ্রূপ করিয়া।
মা এ যে বাবা কোথা কহ বিবরিয়া॥
বারবার এই কথা মালতী বলিল।
তাহা শুনি মা শীতলার ক্রোধ উপজিল॥
বসন্ত রোগেতে তার যত গরু ছিল।
গোয়াল হইল শূন্য সব মরে গেল॥
একমাত্র পুত্র তার নাম হারাধন।
নামুনি রোগেতে তার হইল মরণ॥
পুত্রবধূ ছিল তার নামে লীলামতী।
বাপেরবাড়িতে ছিল অতি গুণবতী॥
হারাধনের যেই দিন নামুনি হইল।
সেই দিন গুণবতী শীতলা পূজিল॥
তাহাতে শীতলা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া।
কি করিল শীতলা দেবী কহি বিবরিয়া॥
মৃত হারাধনে সভে স্কন্ধে করিয়া।
সৎকার করিতে যায় অতি সত্বরিয়া॥
চিতার উপরে মৃত করিল শয়ান।
আগুন লাগাইয়া দিল যত বন্ধুগণ॥
আগুনের তাপ পেল মৃত হারাধন।
মায়ের কৃপায় ওঠে পাইয়া জীবন॥
মায়ের অপার লীলা কে পারে বুঝিতে।
মৃতজন প্রাণ পায় মায়ের লীলাতে॥
এতক্ষণে শীতলা মঙ্গল শেষ হল।
প্রেমানন্দে সবে বারবার মা মা বল॥

(সংহতি মাসিক পত্রিকা, ১৩৭৬ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম আবিষ্কৃত)

বীরভূমে প্রচলিত বিচিত্র লোক-দেবতার পূজার ইতিহাস বহু সংগ্রহ করা যায়।

সদর সিউড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি মুচিপাড়ার উপকণ্ঠে বিস্তীর্ণ নিশিন্দা ঝোপের মাঝে বাঁধানো বেদীতে রক্ষিত আছে প্রায় তিন ফুট লম্বা আর দু ফুট চওড়া একটি কালো পাথরের প্রদীপ। সিন্দুরলিপ্ত এই প্রদীপটির পাশে পাশে প্রচুর পোড়ামাটির ঘোড়া পড়ে আছে আর নিশিন্দা গাছের ডালে ঝোলানো নানারকম চাঁদমালা হাওয়ায় দুলছে। নিত্য সেবা হয় এই প্রদীপটির। হরিজন পুরোহিতই পূজক। বিশেষ পূজা হয় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে। সিন্দুরলিপ্ত প্রদীপটির সামনে জোড়া ঢাক বাজে। বহু লোক সমাগম হয়।

মহাভারতের কালে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসের সময় এই স্থানে ভয়াবহ জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলেই নাকি পাণ্ডবরা অজ্ঞাত বাসের কুটির রচনা করে বাস করেছিলেন। ওই কুটিরেই মা কুন্তী দেবী সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্তানদের মঙ্গল প্রার্থনা করতেন। এই প্রদীপ নাকি সেই প্রদীপ, শিবলিঙ্গবিহীন কোনো সছিদ্র গৌরীপট্ট নয় এইটি তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এই কুন্তীর প্রদীপ পূজার রীতি লৌকিক আর ভিত্তি পৌরাণিক। তাই এখানে লোক-সংস্কৃতি আর পৌরাণিক সংস্কৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন বিশাল নিম্নকোটি ব্রাত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে উচ্চকোটি মানুষের সেতুবন্ধন রচনা করেছিল।

অনুসন্ধানে জানা যায় বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে এই কুন্তীর প্রদীপ পূজার প্রচলন আছে। সিউড়ির পশ্চিম প্রান্তে আনন্দপুরের প্রদীপ পূজায়ও মন্দিরে রক্ষিত প্রদীপ দেখা যায়। সাঁইথিয়া থানার কোটাসুরে আবার রক্ষিত আছে কুন্তীর প্রদীপ বিভিন্ন মূর্তির সঙ্গে। এই কোটাসুরে আবার মহাভারতকে আরো মেলে ধরা হয়। এ মহাভারতের সময় ভীম নাকি অজ্ঞাত বাসের সময় বকরাক্ষসকে এখানেই বধ করেন। বকরাক্ষসের হাড় এখানে ফসিল হয়ে আছে। বকরাক্ষকের কোট বা অস্থি পড়েছে তাই এখানকার নাম কোটাসুর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরগুলি রাক্ষসের হাড় নামে প্রসিদ্ধ।

রামায়ণ মহাভারতের প্রভাবে অপরপক্ষে রামায়ণ মহাভারতকে জনারণ্যে গ্রহণীয় করতে এই সকল কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। এমনই প্রদীপ বীরভূমের বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এখন আবার এই সব কিংবদন্তী হারিয়ে যাচ্ছে। মা ষষ্ঠী বলেও পূজা পাচ্ছে এই প্রদীপগুলি। লোক-দেবতার নানান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক একটি থান যুগে যুগে এক চিন্তাধারা থেকে অন্য চিন্তাধারায় বিবর্তিত হচ্ছে—তা আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

(দৈনিক যুগান্তর-এ ফটো সমেত প্রকাশিত ৪-৪-১৯৮৪)

বীরভূমের ঘেঁটু আর ভাজো পূজা এককালে তো হৈচৈ তুলত। এই লোক-দেবতা পূজা অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, সংগীতবহুল। বাংলার লোক সাহিত্যের ইতিহাসে তো বীরভূমের ঘেঁটুগান প্রসিদ্ধ। ঘেঁটু নাকি খোস-প্যাঁচড়া নিরাময়ের দেবতা। পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে দেখা ঘেঁটু মূর্তি মাটি দিয়ে তৈরি হত। চোখ তৈরি হত ছোট্ট ছোট্ট। সর্বাঙ্গে কুঁচফল বসিয়ে দেওয়া হত কাঁচা মাটিতে। গর্তে বসানো কুঁচফলের অর্ধেকটা বেরিয়ে থাকত। এই পূজার বিশেষ অনুষ্ঠান ভক্তদের মাগন। ছড়ি হাতে বাড়ি বাড়ি মাগনের দল বের হত। তারা টাকা-পয়সা, চাল-ডাল সংগ্রহ করে উৎসব শেষে এখনো খাওয়া-দাওয়া করে। এই ঘেঁটুগানে মাগনের দলের গানের নমুনা—

ঘাটু ঘাটু লড়ি — বোল রাম।
শাকনে খাড়ি মালন দাড়ি — বোল রাম॥
চোর পালালো বাড়ি বাড়ি — বোল রাম।
লাল ব্যোম ভেঙে খায় — বোল রাম॥
লাল ব্যোমের চুমচুমি — বোল রাম।

বুড়ি আনলো গুমগুমি — বোল রাম॥
গুমগুমিতে তাতব চাঁদ — বোল রাম।
গুমগুমিতে তাতব দাঁত — বোল রাম॥
আজ বুড়ি তোর চোত মাস — বোল রাম।
চোত মাসে চতুর্দশী — বোল রাম॥
বুড়ি তোর কপালে চন্দন ঘষি — বোল রাম।
চন্দন ঘষা পড়ল টোপা — বোল রাম॥
হ্যা বুড়ি তোর কয়টা ব্যাটা — বোল রাম।
সাত ব্যাটা তো সাতাশয় — বোল রাম॥
এক ব্যাটা নাম মদনতোর — বোল রাম।
মদনতোরের ভাই রে — বোল রাম॥
ফুল তুলতে যায় রে — বোল রাম।
ফুলের মালা গলায় করে — বোল রাম॥
ঘাটু করতে যায় রে — বোল রাম।
ঘাটু করা কি কি গুণ — বোল রাম॥
পান্তাভাতে কলকল — বোল রাম।
ডাক কুমলি কলকল — বোল রাম॥
ধোবাঘাটের জল খেয়ে — বোল রাম।
মোষ পড়ল দরাম দিয়ে — বোল রাম॥

একজন মূল গায়ক অপর সকল ভক্তরা দোহার। হাতের ছড়ি ঠকঠক করে এই গান করা হয়।

লোক-দেবী ভাদু বা ভদ্রেশ্বরী পূজা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এমনকি সাঁওতাল পরগনার অনেকাংশে ভাদ্র মাসে এই ভাদু পূজা হয়। শোনা যায় পুরুলিয়া জেলা থেকে নাকি ভাদু পূজার উৎপত্তি। সমস্ত ভাদ্র মাস ধরে পূজা হয় এবং সংক্রান্তির দিনে স্থানীয় নদীতে বিসর্জন হয়। নদী না থাকলে পুকুরে বিসর্জন করা হয়।

ভাদু পূজার উৎপত্তি বিষয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর রাজ এস্টেট নাকি প্রাচীনকাল থেকে বিশাল রাজত্ব ছিল এবং কাশীপুর রাজার কন্যা নাকি ভদ্রেশ্বরী বা ভাদু রূপে গুণে অতুলনীয়া। প্রজাদের দুঃখে কাতর কন্যা সকলের মধ্যে সমান আদরনীয়া। বিশেষ করে গ্রামে গরিব তফসিলি সম্প্রদায় প্রজাদের ওই একরত্তি মেয়েটা যেন কোলে করে রাখত। ষোল বছরের কন্যা যেন প্রজাদের মা।

সেই মেয়ে ভাদ্র মাসে ইহলোক ত্যাগ করে। সারা রাজ্য জুড়ে চলে শোকের প্লাবন। সারা মাস ধরে অরন্ধন—মানুষ খেতে ভুলে যায়, নাইতে ভুলে যায়। শোকগাথা গেয়ে বেড়ায় মানুষ কন্যার গুণের কথা কীর্তন করে সারা মাস ধরে। কুমারী ভাদু মূর্তি গড়ে কোলে করে নিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়। এইভাবে কুমারী রাজকন্যার স্মৃতি রক্ষার জন্যে ভাদু উৎসব। অনেক পণ্ডিত বলেন, এই সব অঞ্চলে শস্য রোপণের পর কৃষক আর কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত হয়। সব দেশেই শস্য রোপণের পর নানা রকম উৎসব হয়।

বীরভূমে লোকমুখে রচিত ভাদু গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ভাদু কন্যার হাসিতে যেন কচি শস্যের নাচন জাগে। পূজার উপকরণ সামান্য। গরিবঘরের কন্যাকে যেন আদর করা হচ্ছে।

ভাদু নামল দেশে চরণ মুছব মাথার কেশে
ভাদু নামল দেশে
কাশীপুরের মহারাজা গো সে করে ভাদুর পূজা
সাঁঝের বেলা শীতল দেয় করকরে কলাইভাজা
ভাদু আমার ছোটো মেয়ে গো কাপড় পরতে জানে না
কাপড় পরিয়ে দাও গো তোমরা পয়সা পাবে পাঁচ আনা
ভাদু আমার দখিন যাবে খুটে বাঁধা আধুলি
আমার লেগে এনো ভাদু গলাভরা মাদুলি
ভাদুমতি মা জননী গো বাছাকে সো কদম পেরো না
পাকলে পড়ে সবাই খাবে কেউ তো মানা করবে না
মল্লারপুরের রসের মিষ্টি সদর সিউড়ির মোরব্বা
তোর লাগি এনেছি ভাদু যতই পারিস ততই খা
ছোট ছোট ধানমাদুলি কোমরে সোনার বিছে
আর ভাদু গো বোল না ওরা গাল দিছে
ভাদু আমার মান করেছে কি দিয়ে মান ভাঙাব
আঁধার ঘরে পিদিম জ্বেলে জোড়হাত করে দাঁড়াব
ভাদ্র মাসে ভাদু এনে মাঠে হল জল টানা
মাঠের মুনিষ রইল মাঠে ধরে গেল রাতকানা
ভাদুর আমার বিয়ে দোব ইস্টিশানের বাবুকে
যেতে আসতে ভালোই হবে চাপবো কলের গাড়িতে
ভদ্রেশ্বরী ভদ্রাবতী ভাদু মামণি
কেউ বলে রাজকন্যে কত কি শুনি
ভাদ্র মাসে ভাদু কোলে নাচে নাচুনি
চাল-টাকা দেয় গাঁয়ের মানুষ ভাদু গান শুনি।

(লেখকের নানান ছড়া পুস্তক হতে জেলা সাক্ষরতা সংস্কৃতিতে প্রকাশিত)

প্রাচীনকালে বীরভূমে পাথরবুড়ির থান ছিল। গ্রামের পুরোহিত সমগ্র গ্রামের মন্দিরে মন্দিরে দেব পূজা করার পর এই পাথরবুড়ির থানে দুটি ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজা করত। পাথরবুড়ি নাকি শক্তির আর এক রূপ। হিন্দুধর্ম সবই গ্রাস করে নিয়েছে। সবাই নাকি শিবশক্তির আর এক রূপ।

কিন্তু গ্রাম ঢুকতে নুড়ি পাথরের স্তূপে আজ থেকে ৬০/৭০ বছর আগে একটি লোকবিশ্বাস ছিল যে, অন্য গ্রাম থেকে আসবার সময় যদি ছেলে-মেয়েরা পথ চলতে চলতে পথে কুড়ানো পাথর, পাথরবুড়ির নামে তুলে নিয়ে এসে গ্রামে ঢোকবার মুখে পাথরবুড়ির থানে ছুঁড়ে দিয়ে প্রণাম করে তাহলে আর পায়ে ব্যথা

হবে না। কোনো পথকষ্ট থাকবে না। পুরনো আমলে পাথরের স্তূপ হয়ে যেত নুড়ি পাথর জড়ো হয়ে।

মানুষের বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে। আজ আর ছেলে-মেয়েরা পথে আসতে আসতে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে আনে না পাথরবুড়ির থানে জমা দেবার জন্যে।

প্রাচীনকালে পাশাপাশি গ্রামে বিয়ে কুটুম হত ছেলে-মেয়েদের। কিন্তু এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম যেতে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পার হতে হত। তাই বয়স্ক লোকরা হাতে লাঠি ছাড়া বাড়ির বাইরে যেত না, জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে। আর ঠ্যাঙাড়ে দস্যু তো সেই মোগল পাঠান আমল থেকে বনে-জঙ্গলে ওৎ পেতে থাকত। তাই মানুষকে অত্যন্ত সাবধানে বাড়ি থেকে বের হতে হত। ঢেলা পাথরের টুকরো হাতে ছেলেদের মাসির বাড়ি পিসির বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে নিশ্চিন্ত হয়ে পাথরবুড়ির থান তৈরি হয়েছিল ফেলে দেওয়া পাথরের স্তূপে। আজ এই সব কৌতুককর কথা মানুষ বিশ্বাস করতে চাইবে না। এখনো পাথরবুড়ি লৌকিক দেবী।

দুবরাজপুর থানার মেটেলায় ধরমপূজার সময় বাণ ফোড়া হয়। ভক্তরা নাচতে থাকে জিভে লোহার শলাকা ঢুকিয়ে। গজাল কাঁটার ঝোপে ঝাঁপ দেয়। বৌদ্ধ মহাজন প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই জানা যায় বীরভূমের লৌকিক দেব-দেবী পূজায় অনস্বীকার্য বৌদ্ধ প্রভাব। বীরভূমে প্রচলিত একটি ছড়া বহু অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। এই ছড়াটিই বৌদ্ধ প্রভাবের প্রমাণ—

ধবল পাট ধবল ঘাট ধবল সিংহাসন
তাহাতে বিরাজ করেন দেব নিরঞ্জন
দেববন্ধন দেবাংশী বন্ধন
উলের খাট পারং লাঠি বন্ধন
আর বন্ধন সরস্বতীর গাং
ডাইনে দামোদর বন্ধন
বাঁয়ে বীর হনুমান—

(কার্তিক ১৩৭৯ বাংলা সাল সমকালীন মাসিক পত্রিকা)

তাই দেখা যায় উত্তরকালে বীরভূমের লোকজগৎ বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। গবেষকরা বলেন, চর্য্যাপদ-এর অনেক রচনাকারের প্রাচীন বীরভূমে বাস ছিল। ময়ূরপুচ্ছের সাজে সজ্জিতা গুঞ্জমালা পরা নিবিড় যৌবনা শবরীবালার বীরভূমে বাস ছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার একান্ত অবলম্বন। তাই বীরভূমের সর্ব প্রাণবাদ-এর যুগ (anemisan) থেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংঘটনে যে দর্শন গড়ে ওঠে সেখানে ঈশ্বর নেই—ছিল জীবনকে ভালোবাসার আকুতি। চিরদিন বাঁচার লালসা। পৃথিবীকে ভোগ করার বাসনা। এখানে এই বীরভূমে মানুষ মোক্ষ চায় না। মাধবীলতার বেড়ায় ঘেরা প্রাচীরের আগল খুলে গৃহস্থ তার মাঠে চরা ধবলী গাইকে দেখতে চায়। তার সন্তান ছুটে আসে দু হাত তুলে কোলে চড়বার জন্যে। এখানে ঈশ্বর নেই। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেনি, মানুষই ভগবানকে সৃষ্টি করেছে ভালো করে বাঁচার জন্যে।

গাজন উৎসব তাই ধর্মের পোশাকে অবশ্যই লোক উৎসব। এই লোক উৎসবের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে বৌদ্ধ জৈন ধর্মের নানান কৃত্য। হিন্দু ধর্মেরও নানা অনুষ্ঠান, কিন্তু, ধর্মমঙ্গলে বাংলার জনস্রোতেরই বিশেষত্ব ধরা পড়ে। বীরভূমের লৌকিক জীবনধারায় প্রভাবিত হয়েছে সবাই। তাই বীরভূমের লৌকিক দেব-দেবীর ইতিহাস বলতে গিয়ে বাংলার ইতিহাসই জানা যায়।

এই সকল লোক-দেবতা থানে লৌকিক চিকিৎসা করা হয়। আজও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না। বীরভূমের এক একটা দেবস্থান এক এক রকম ব্যাধি চিকিৎসার জন্যে বিখ্যাত। যেমন আহম্মদপুর থানার বেলে গ্রামের ধর্মরাজ বাত ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে বিখ্যাত। ইলামবাজার থানার যাত্রা গ্রামের ধর্মরাজের হাঁপানির ওষুধ বিখ্যাত। সদর থানার লখিন্দরপুর গ্রামের ধর্মরাজতলার দেয়াশীর কসরৎ-এ আর গাছ-গাছড়ার প্রলেপে হাত ভাঙা পা ভাঙা সেরে যায়। একটু অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, লোক-দেবতার আটন লোক-চিকিৎসার ডাক্তারখানা। আজও হাজার হাজার লোক এই চিকিৎসা করে চলেছে। বীরভূমের যে কোনো লোক-দেবতার আটন-এ কবিরাজী ওষুধ পাওয়া যায়। আজও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না। কিন্তু এই যুগেও দেবতার নামে লোক-চিকিৎসা করার ধারা সমানে চলে আসছে কোন বিস্মৃতকাল থেকে।

লোক-দেবতা পূজায় সর্প পূজার সময় গুণিনে গুণিনে আজও লড়াই হয়। লোক-দেবতার থানে এই লড়াইয়ের কিছু সংগ্রহ—

ঘ্যাং ব্যাং কেচোর ঠ্যাং টিকটিকির রক্ত।
আর খেলাম কুটির সত্ত্ব॥
বাঁ হাতে আশবটি আগায় কোন বেটাবেটি।
তোর গুরুকে করব ঘোড়া॥
তোকে করব গাড়োয়ান।
চাবুকের বাড়িতে বেটার বধিব পরাণ॥

* * *

আমার এই অঙ্গে যে করবি ঘা।
তার শিকে দীক্ষে গুরুর মুণ্ডে॥
তুলে পাখালি বাম পা।
তিন মূর্তি তিন তেউরী॥
আমার মুণ্ডে দিয়ে পা।
অঘোরা ঘোরে চন্দ মোর পিতা॥
সূর্য মোর খুড়ো।
বসুমতী মোর মা॥
এই তিন দেবতাকে যে চিনতে পারিস।
সে আমার অঙ্গে মারিস ঘা॥

এই সকল গানে অপৌরাণিক কালের মনোভঙ্গী লক্ষণীয়।

লেখক : বিশিষ্ট প্রবন্ধকার
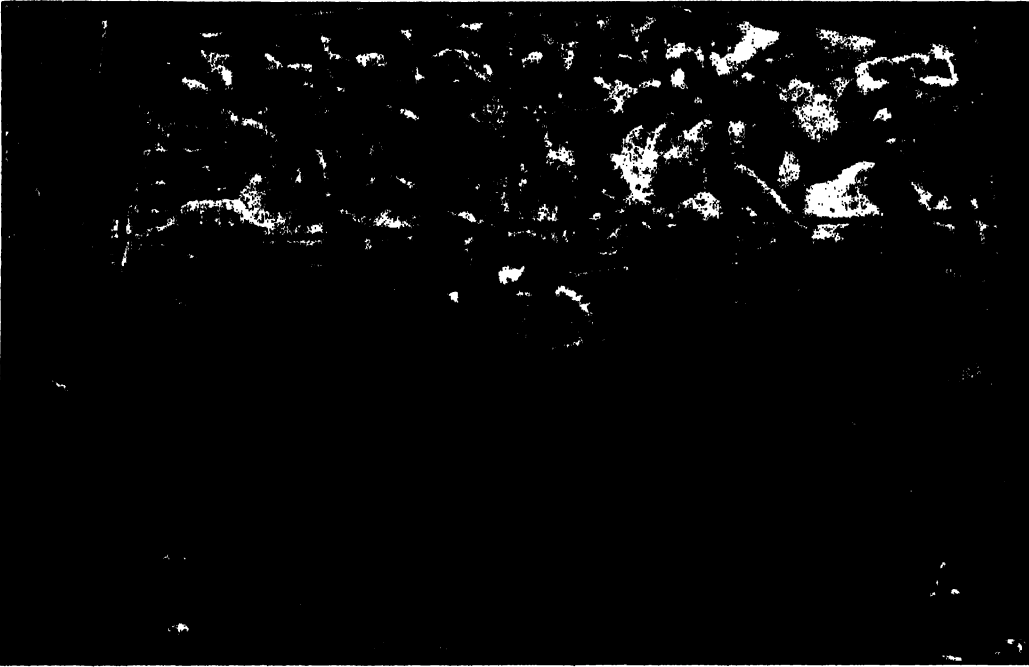
গণপুরের মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা   সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

মল্লা ময়ূরেশ্বর মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য   ছবি : সুকুমার সিংহ

শান্তিনিকেতনের রুক্ষ এলাকা, এখানেই গড়ে উঠবে চা বাগিচা — সৌজন্যে : গণশক্তি

বীরভূম জেলার সাম্প্রতিক চালচিত্র : সমস্যা ও সম্ভাবনা

সংকলন—গৌতম চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতনে চা চাষ

এবার খোয়াইয়ের দেশে মাথা তুলবে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। এবার রুক্ষ মোরামের বিস্তীর্ণ এলাকা ঢেকে যাবে সবুজ চা বাগানে। চলতি সপ্তাহেই শান্তিনিকেতনে শুরু হবে চা গাছের চারা লাগানোর কাজ। উদ্যোগ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজিত বসু অনেকদিন ধরেই এই প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষকদের। সকলেই আশ্বাস দেন, বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে চা বাগিচা সম্ভব। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাটির অম্লতার পরিমাণ চা চাষের উপযোগী এবং এখানে ওই ধরনের মাটিতে জল জমে থাকে না। এই দুটো বিষয় চা চাষে সহায়ক জানানোয় বিশ্বভারতী চা বাগিচা গড়ার চেষ্টা করছে। উপাচার্য সুজিত বসু জানিয়েছেন, চলতি বর্ষার মধ্যেই এইকাজ হবে। খড়্গপুর আই আই টি-র সঙ্গে

যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়ে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চা গাছ লাগানো হচ্ছে। আই আই টি-র সেনেট সদস্য হিসেবে সুজিত বসু সুই সংস্থাকে একত্রে এই উদ্যোগে শামিল করতে চান। খড়্গপুর আই আই টি প্রায় সাড়ে আট কিমি জায়গা জুড়ে চা বাগিচা গড়ে সাফল্য পেয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতাকে শান্তিনিকেতনে কাজে লাগানোর জন্য আলোচনা হয়েছে। বিশ্বভারতী পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যাপক ডঃ গুণেন চ্যাটার্জি এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছেন। তিনি জানান এক হাজার চা গাছের চারা আনা হচ্ছে, সেগুলো লাগানো হবে মূলত ঢালু জায়গায়। শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যাওয়ার পথের দুদিক ও রতনকুঠি বাংলোর বাগানের মতো কিছু জায়গাকে প্রথম দফায় বেছে নেওয়া হয়েছে। শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মে প্রচণ্ড উত্তাপ হলেও তার প্রভাব পড়বে না চা বাগিচায়।

বিকল্প চাষের সময় বিশ্বভারতী যদি চা বাগিচা গড়ে সাফল্য পায় তবে জেলার অনেক অঞ্চলেই ছড়িয়ে যাবে এই নতুন উদ্যোগ। আশাবাদী কৃষকসভার নেতৃত্বও। —গণশক্তি, ১৫.৯.০৫

সফেদ : একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্পের সূচনা

জয়দীপ সরকার : সফেদ মুসলীর চাষ শুরু হল বীরভূমে। শুধু বীরভূম নয় রাজ্যে এই সফেদ মুসলীর চাষ বাণিজ্যিকভাবে বীরভূমেই প্রথম শুরু হল। বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ধান্য গ্রামে ৬ একর জমির ওপর এই প্রকল্প শুরু করল বোলপুর-কোপাই অ্যাগ্রো ফার্মস প্রাঃ লিঃ।

শেকড় সমেত সফেদ মুসলি ছবি : জয়দীপ সরকার

স্থানীয় বা চলতি নাম সফেদ মুসলী হলেও এই আয়ুর্বেদ ওষুধের কৃষিবিজ্ঞানে নাম ক্লোরোফাইটাম বরিভিলিয়ানাম। গত কয়েক বছর ধরেই এই ওষধি চাষের চাহিদা বাড়ছে গোটা বিশ্বজুড়ে। অবস্থা এখন এমনই যে সামগ্রিক চাহিদা এবং জোগানের অনুপাত দাঁড়াচ্ছে সাত ভাগের মধ্যে একভাগ। এই বিরাট চাহিদা মেটাতে এখন বিকল্প চাষের সময় অনেকেই উদ্যোগী হয়েছেন এই চাষ করতে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মাটি 'সফেদ মুসলী' চাষের উপযুক্ত বলে কৃষিবিদরাই বলছেন। সেই আশায় ভর করেই সিউড়ির ধান্য গ্রাম এবং রামপুরহাটে এই চাষ শুরু করেছে বোলপুর-কোপাই অ্যাগ্রো ফার্মস সংস্থা। আর্থিক লাভের অঙ্ক বিরাট থাকলেও এ চাষে খরচ অনেক বেশি সাধারণ চাষের থেকে। সফেদ মুসলীর বীজ এখনো এ রাজ্যে মেলে না, হায়দারাবাদের একটি সংস্থা এই বীজ বিক্রি করে। অনেকটা রজনীগন্ধা ফুলের গাছের মতো দেখতে। তবে এ গাছে ফুল হলেই সে-ফুল কেটে দিয়ে শেকড়ে জোর বাড়ান কৃষকরা। জল দেওয়ার কাজটাও ব্যয়বহুল। প্রথমে জল ফিল্টার করতে হয়, পরে সেই জল পাইপলাইনে করে প্রতি গাছের গোড়ায় পৌঁছে দিতে হয়। প্রতিনিয়ত ফোঁটা ফোঁটা জল বালিমাটি নরম করে শেকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এর নতুন চারা বসানো হয় এবং আনুষঙ্গিক কাজ বেশি হয়। বাকি সময় কাজ কমে। সাধারণত একবছর প্রায় সময় লাগে শেকড় তুলতে। এই শেকড়ই সফেদ মুসলীর ফসল। শেকড় চাইছে বিদেশের বহু ভেষজ ওষুধ নির্মাণ সংস্থা। মধ্য-পূর্বের বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ, আমেরিকার অনেক সংস্থা ইতিমধ্যে তাদের চাহিদার কথা জানিয়েছে। তারা এই শেকড় থেকে কম করে একশো রকমের আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরি করবে। জিনসিং থেকে আসল ভায়গ্রা ও হরেক ওষুধের প্রধান উপকরণ সফেদ মুসলী। তাই এই শেকড়ের লাভজনক বাজারদর দিতে প্রস্তুত ওষুধ নির্মাণ সংস্থাগুলি। ইতিমধ্যেই সর্বত্র ভেষজ ওষুধ এবং প্রসাধন নির্মাণের নতুন বাজার গড়েছে, সেস বাজারের প্রধান উপকরণ হিসেবে সফেদ মুসলী যে বিরাট আশার দিক— কৃষকদের কাছে তা এখন পরিষ্কার। বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি মনসা হাঁসদা জানিয়েছেন ধান ছাড়াও অর্থকরী ফসল হিসেবে যেসব চাষকে বিকল্প চাষ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে তার মধ্যে সফেদ মুসলী অন্যতম। তবে একদম প্রত্যন্ত অংশের কৃষকদের কাছে এই চাষের জন্য আর্থিক পুঁজির অসুবিধে হতে পারে। তাই জেলাপরিষদ কৃষি ঋণের বিষয়ে ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে কথা বলে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন এই চাষে উৎসাহিত করতে চায়।

—গণশক্তি ১৬.৯.০৪
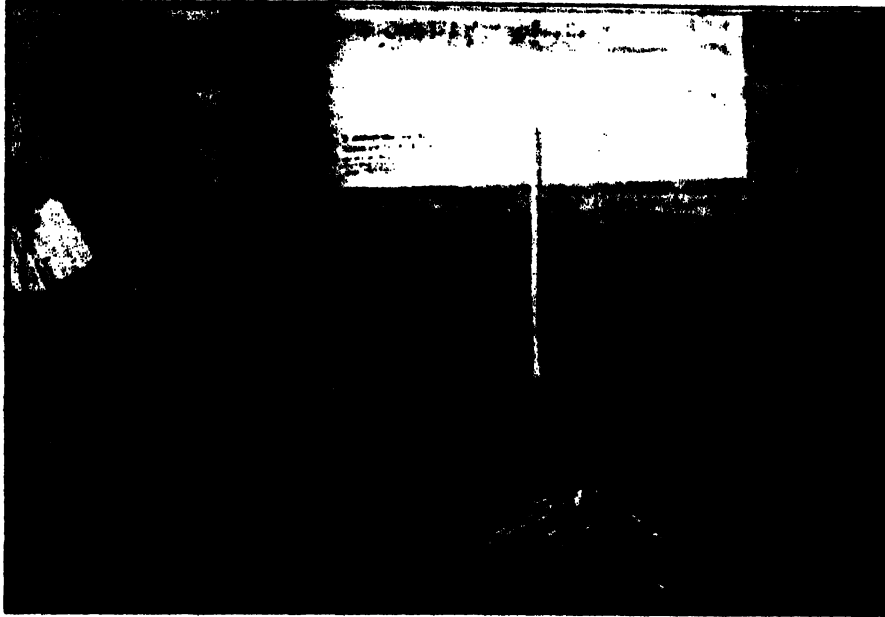
মানবেন্দ্র চন্দ্র (ইনসেটে) সফেদ মুসলি চাষের অন্যতম উদ্যোগী

রুক্ষ মাটিতে কৃষকদের লাভের পথ দেখাচ্ছে ওষধি চাষ

রাহুল রায় ও অর্ঘ্য ঘোষ : বাঁকুড়া ও বীরভূমের রুক্ষ মাটিতে ওষধি বা ভেষজ উদ্ভিদের চাষ কৃষিজীবীদের সামনে আয়ের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের প্রান্তিক বাঁকুড়া জেলায় যখন ধান-গমের মতো প্রচলিত ফসল প্রায়শই মার খাচ্ছে, তখন ভেষজ উদ্ভিদের চাষ এমন কি বিদেশি মুদ্রা অর্জনেরও সম্ভাবনা দেখাচ্ছে কৃষকদের। বিশেষ করে 'সফেদ মুসলি' নামে একটি ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করে ইতিমধ্যেই লাভের মুখ দেখেছেন চাষিরা। 'ইন্ডাস কৃষি বিকাশ' নামে একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে বাঁকুড়ার ছাতনা এবং ওন্দা ব্লকে ১৫০ একর জমিতে সফেদ মুসলির পাশাপাশি অ্যালোভেরা, সিট্রোনেলা, স্টিভিয়াসহ বেশ কিছু ভেষজ উদ্ভিদের চাষ শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, বীরভূমের সাঁইথিয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে সফেদ মুসলির চাষে নেমে পড়েছেন ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান মানবেন্দ্র চন্দ্র। ইন্টারনেট ঘেঁটে ওই ওষধির কথা জেনে সংলগ্ন মোনাই মৌজায় এক একর জমিতে চাষও শুরু করেছেন। উৎসাহী চাষিরাও আনাগোনা করছেন তাঁর খামার বাড়িতে।

সফেদ মুসলি ব্যবহৃত হয় হৃদরোগ সংক্রান্ত এবং ভায়াগ্রা জাতীয় ওষুধ তৈরিতে। মানবেন্দ্রবাবু জানান, এক একর জমিতে ওই ওষধি চাষের জন্য বীজ লাগে প্রায় ৫০০ কেজি। প্রতি কেজি

সফেদ মুসলি গাছ

ছবি : [illegible]

৩৫০ টাকা হিসাবে জানুয়ারি মাসে ২৫ শতাংশ টাকা দিয়ে হায়দরাবাদের কোনও অ্যাগ্রোটেক ফার্মে বীজ বুক করতে হয়। মে মাসের মধ্যে বাকি টাকা শোধ করলে কোম্পানি বীজ পাঠিয়েও দেয়।

মানবেন্দ্রবাবুর হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১০ মাসের মধ্যেই কম করে হলেও এক একরে কাঁচা ফসল পাওয়া যায় প্রায় ৪৫০০ কেজি, যা শুকিয়ে ৯০০ কেজিতে দাঁড়ায়। ভেষজটি বিক্রি করার সমস্যাও নেই। বীজ দেওয়ার সময়ে ওই ফার্মই ১০০০ টাকা কেজি হিসাবে উৎপাদিত পণ্য কিনে নেওয়ার চুক্তিপত্র করে দেয়। মানবেন্দ্রবাবুর দাবি, তিনি ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছেন, বিদেশে কেজিতে ৫০০০ হাজার টাকা দাম মিলতে পারে।

তিনি জানান, এক একরে সফেদ মুসলি চাষে খরচ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। আবাদি খরচ বেশি হলেও, 'স্টেট মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট বোর্ড' থেকে অনুমোদন নিয়ে ওই চাষ করা হলে, ব্যাঙ্কও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি মিলতে পারে। তাছাড়া অনুর্বর পতিত জমিতে ওই ওষুধ চাষ সম্ভব।

এদিকে, বাঁকুড়ায় সফেদ মুসলি ও অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ চাষে ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। ব্যাঙ্কের বাঁকুড়া শাখার ম্যানেজার তপন পণ্ডা জানিয়েছেন, 'একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে চাষিদের ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।' জেলা কৃষি আধিকারিক দ্বিজেন্দ্রনাথ কোল জানান, বাঁকুড়ার কাঁকুরে মাটি এবং শুষ্ক জলবায়ু এ ধরনের চাষে আদর্শ।

ইন্ডাস কৃষি বিকাশের কর্ণধার লক্ষ্মীনারায়ণ পাল জানালেন, 'গত ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সময়ে লক্ষ করি, সফেদ মুসলি বাঁকুড়ার মাটিতে অভূতপূর্ব ফলন দিচ্ছে।' সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বীরভূমের মুখ্য কৃষি আধিকারিক আশিস ত্রিপাঠী। জেলা হর্টিকালচার অধিকর্তা কৌশিক চক্রবর্তী জানান, এতে তিন গুণ লাভের সম্ভাবনা। উৎসাহী চাষিদের তাঁর দফতর সহযোগিতা করতে তৈরি।

—গণশক্তি, ৫.১২.০৪

বীরভূমের দুই গ্রামে বৃষ্টি থেকে পানীয় জল

জয়দীপ সরকার : বৃষ্টির জল জমিয়ে তাকে পরিস্রুত করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হচ্ছে বীরভূমে। রাজ্য সরকারের পরিবেশ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা এ কাজ করছে।

লতাবনী গ্রামে বৃষ্টির জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার প্রকল্প — ছবি : জয়দেব সরকার

বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণেই রুক্ষতা বেশি। সেচের সমস্যার সঙ্গে আছে পানীয় জলের সমস্যাও। সবসময় খনন করেও মাটির নিচে জল পাওয়া যায়না। তাই জলের সমস্যা মেটাতে বৃষ্টির জলকে পরিস্রুত করে ব্যবহারের দিকে নজর দিয়েছেন পরিবশেবিদরা। এর আগে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে এমন একটি প্রকল্প চালু হলেও বীরভূমে এই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে দুটি গ্রামে এই প্রকল্প হচ্ছে।

'ইনস্টিটিউট অব ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল ডিজাইন' নামে রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের একটি সংস্থা এ কাজ করছে। সিউড়ি-১নং পঞ্চায়েত সমিতির নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের লতাবনী এবং কামারডাঙা গ্রাম দুটোকে প্রাথমিক পর্যায়ে বেছে নেওয়া হয়েছে। গরিব, আদিবাসী অধ্যুষিত ওই গ্রামে পাইপলাইনে পানীয় জল সরবরাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলছেন গ্রামবাসীরা। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটাতে এই বিকল্প ব্যবস্থা সহায়ক হবে বলে নির্মাতাদের বিশ্বাস। নতুন বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জমা জলকে পরিস্রুত করে দুটো রিজার্ভার রেখে সরবরাহের কাজ নেওয়া হয়েছে। লতাবনী গ্রামে দুটো রিজার্ভারে দশ হাজার লিটার এবং কামারডাঙা গ্রামের দুটো রিজার্ভারে কুড়ি হাজার লিটার জল রাখা হবে। এই জল শুধুমাত্র পরিস্রুত পানীয় জল হিসেবেই ব্যবহার করা হবে। লতাবনী গ্রামে প্রকল্পের কাজ শেষে কিছুদিনের মধ্যেই উদ্বোধন হবে। দুটি গ্রামেই সিমেন্টের ট্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার লিটারের বেশি জল নিচে জমা থাকবে। ছাদকে পরিষ্কার রাখা বা ছাদের দুদিক উঁচু করে জল ধরে রেখে সেখান থেকে পাইপলাইনে বৃষ্টির জল রিজার্ভারে নিয়ে

আসা হচ্ছে। গোটা বিষয়টাই বৈজ্ঞানিক ভাবনার সঙ্গে ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে নির্মিত হয়েছে। প্রথম দফায় নির্মাতারা বলছেন কামারডাঙা এবং লতাবনী গ্রামের স্কুল পড়ুয়াদের পানীয় জল হিসেবে এই জল ব্যবহার করা হবে। এরপর গ্রামবাসীদের জন্য প্রকল্পের জল দেওয়া হবে। তবে কিছু বিষয়ে কৌতূহল আছে এলাকাবাসীদেরও। আদিবাসীরা এখনও বিশ্বাস করেই উঠতে পারছেন না যে, বৃষ্টির জল খাওয়া যায়। নগরী পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী মণ্ডল বলেন, প্রকল্পটা একদম নতুন, অনেকে বিশ্বাস করছে না। কারণ তাঁরা গত দু-দশক ধরে টিউবওয়েল আর পাইপ লাইনের জল খেতে খেতে ভুলে গেছেন এর বাইরে কোনো জল খাওয়া যেতে পারে। নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মসহায়ক রামানন্দ ব্যানার্জি বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহী। তিনি যুক্তও আছেন প্রকল্পের সাথে। তিনি জানান, গ্রামে একবার এবিষয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছিল। ফের চেষ্টা চলছে প্রকল্প শুরুর আগে নির্মাতা সংস্থা, পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, এলাকাবাসী সবাই মিলে নতুন বিষয়ে খোলামেলা প্রচার করবেন। সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করে এ নিয়ে জটিলতা বা কোনো সন্দেহ থাকলে তাও কাটিয়ে তুলবেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি মনা হাঁসদাও এধরনের প্রকল্প আরও নির্মাণের বিষয়ে আগ্রহী, তবে বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্প যে নতুন দিশা জাগাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—গণশক্তি, ২৬.৭.০৪

৫০১ দিন টানা উৎপাদনের রেকর্ড গড়তে চায় বক্রেশ্বর

জয়দীপ সরকার : হঠাৎ বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে সমস্যা তৈরি হয়েছিল রাজ্যে। এই সমস্যা অবশ্য কাটিয়ে ওঠা গেছে। তবে এই সমস্যার মধ্যেও নতুন দিশা দেখাচ্ছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রেরই তিন নম্বর ইউনিট একটানা বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ড করেছে। সেইজন্য সেরার সম্মান পেয়েও থেমে থাকতে রাজি নয় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ। তাঁদের লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। আরও বিদ্যুৎ উৎপাদনের তৎপরতা চলছে ওই কেন্দ্রে। টানা ৫০১ দিন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নতুন রেকর্ড স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক-কর্মচারি, অফিসার সবাই।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে তা সংরক্ষণ করা যায় না। তাই যে পরিমাণ চাহিদা থাকে, সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেইভাবেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এখানে জল বা জ্বালানির কোনো সমস্যাই নেই। দেশের অত্যাধুনিক মানের এই বিদ্যুৎকেন্দ্র দেশের সেরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের তালিকায় চলে আসায় আনন্দিত এখানকার পরিচালক, কর্মী থেকে সমস্ত অংশের মানুষজন। গত ২০০৩ সালের ৩ জুলাই থেকে শুরু করে একটানা একবছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ৩নং ইউনিট দেশের সেরা বলে চিহ্নিত হলেও কর্তৃপক্ষ বসে নেই। এখন ৫০১ দিনের একটানা উৎপাদন চালিয়ে গিয়ে বিশ্বের সেরা বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করা, কারণ, এখন পর্যন্ত একটানা ৫০০ দিন বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড আছে। বক্রেশ্বর সেই রেকর্ড ভাঙতে দ্রুতলয়ে এগোচ্ছে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার নির্মল চক্রবর্তী এবং অন্য পদাধিকারীরা জানাচ্ছেন, যা অবস্থা, এখনও তাতে এই উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীরাও নেমেছেন দিনরাত এক করে এই বিশ্বজয়ের কাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়তে।

জেনারেল ম্যানেজার চক্রবর্তী জানালেন, সামনে উৎসবের দিনগুলোতে পুরোদমে উৎপাদন চলবে। তবে দীপাবলীর পরে কিছু কাজ থামানো হলেও, ৩নং ইউনিট চলবে পুরোমাত্রায়। ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরাও দেখে গেছেন বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই নতুন অভিযানকে। শুক্রবার জেনারেল ম্যানেজার জানান, ভাইব্রেশন এবং কনডেনসার নিয়ে সমস্যা থাকলেও, উৎপাদনে কোন রাশ টানছেন না তাঁরা। চতুর্থ এবং পঞ্চম ইউনিট নির্মাণে দ্রুত ছাড়পত্র মিলছে এই খবরে সঙ্গতভাবেই উল্লসিত ছিলেন বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মীরা।

—গণশক্তি, ১৩.৯.০৪

বক্রেশ্বর প্রকল্প ঘিরে সবুজায়নের কাজ

মহিউদ্দীন আহমেদ : ২০০০-২০০১ আর্থিক বর্ষে বীরভূমের বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দূষণমুক্ত ও রিজার্ভারকে পলিমুক্ত করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে আর এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে যৌথভাবে কাজে নামে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতি। ২০ ধরনের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়। তার মধ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সবুজায়ন। বৃক্ষরোপণ ও ফুলের বাগান এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ৬২টি মৌজায় এই ধরনের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়। দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতি ইতিমধ্যে ৩০টি মৌজায় বৃক্ষরোপণ ও ফলের বাগান তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। দুবরাজপুরের বিডিও ভরত বিশ্বাস জানিয়েছেন, ৩.৩৮ হেক্টর জমিতে আম ও লেবুর গাছ লাগনো হয়। হরিদাসপুর মৌজা গাছ লাগানোর পক্ষে ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল হলেও ২.২৬ হেক্টর জমিতে গাছ লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি ৯১টি পুকুর খননের মাধ্যমে এলাকায় চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুকুরের জল থেকেই রবি ফসল চাষ হচ্ছে। এইসব কাজ করতে যে টাকা খরচা হয়েছে বা হচ্ছে, সবই দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রকল্পের অগ্রগতির কাজ দেখতে পরিদর্শনে আসেন পূর্ব জোনের দূষণ ও পরিবেশ

সবুজায়ন বীরভূম জেলার অন্যতম সাফল্য

দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর কারকেট্টা। কাজ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে প্রায় ১.২০ কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

—কোল্ডফিল্ড টাইম্‌স, ১৪-২০ ফেব্রুয়ারি '০৫

নদীস্রোতে প্রস্তর যুগের পাথর

জয়দীপ সরকার : বীরভূমে রামপুরহাটের ঝাড়খণ্ড সীমান্তে ফের পাওয়া গেল প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন। চিলা নামে একটা ছোট খালের জলস্রোতে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভেসে আসছে, আর সেসব সংগ্রহ করছেন ওই গ্রামেরই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক গোপালদাস মুখার্জি। মলুটি গ্রাম খালের ওপারে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও গ্রামের সবাই বাংলাভাষী। গোপালবাবু এর আগেও এইরকম কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে খতিয়ে দেখেছিল বিভিন্ন পাথর। তাদের মতে পাথরের যেসব টুকরো পাওয়া গেছে তার কোনটা মাংস কাটার জন্য সেই সময় ব্যবহৃত পাথরের ছুরি, কোনটা ছুঁচলো কুঠার, কোনটা বা বল্লমের ফলা। বিশেষজ্ঞরা ঢালাও সার্টিফিকেট দিলেও সেই সম্পদ সংগ্রহে রাখার বা সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করার কোন উদ্যোগই তাঁরা নেননি। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক অমূল্য নিদর্শন। গোপালবাবু তাঁর মলুটি গ্রামের বাড়ির সংগ্রহে রেখেছেন সম্প্রতি পাওয়া একটি পাথরের অস্ত্রের অংশ এবং কিছু অস্ত্রের ছোট ফলা। তিনি বলছেন, এগুলি জলের স্রোতের ধাক্কায় এসে খালের মাঝে বিভিন্ন গাছের খাঁজে আটকেছিল। চিলা খাল এসেছে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ি অঞ্চল থেকে, নদীপথে যার দূরত্ব খুব বেশিও নয়। তাহলে এই সম্ভার লুকিয়ে আছে মাঝপথেই কোথাও এমন দাবি এই প্রবীণ শিক্ষকের, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতাত্ত্বিকদেরও। তথাপি এই বহুমূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক সম্ভার উদ্ধার করতে অনুসন্ধান করছে না

জলস্রোতে ভেসে আসা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন গোপালদাস মুখার্জি
ছবি : জয়দেব সরকার

কেউই। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে চিলার পথে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গিয়েছিল কিছু অমূল্য সম্ভার। তাঁরাও জানিয়েছেন, প্রস্তর যুগের নিদর্শন এসব। কিন্তু এরপর বিশ্বভারতী থেকে আর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে কয়েকজন ছাত্র, গবেষক অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। গোপালদাস মুখার্জি অবসর সময়ে হাঁটু জলের মাঝে অনুসন্ধান চালিয়ে পেয়েছেন এমন অসংখ্য নিদর্শন। ভাগলপুরে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রয়েছে সেগুলি। এখন তাঁর আশা, গ্রামেই এক প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা গড়ার। ইতিমধ্যে ওই গ্রামকে পুরাতাত্ত্বিক গ্রাম বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে। কিন্তু সম্পদ সংগ্রহ বা সংরক্ষণে যেমন উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার তেমন গ্রামেরও সবাই তেমন উৎসাহী নন বলেও আক্ষেপ গোপালদাস মুখার্জির। তিনি বাধ্য হয়ে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে এই অমূল্য সম্ভার নিশ্চয় সঠিকভাবে রক্ষিত হবে।

—গণশক্তি, ২৫.১১.০৪

যজ্ঞনগরে
পরিযায়ী পাখি আর মানুষের প্রেমকথা

পরিযায়ী পাখিরা আজ বিপন্ন সব জায়গাতেই। দিন দিন বাড়ছে বিপন্নতা। সংখ্যাও কমে আসছে পরিযায়ীদের। পৃথিবী জুড়েই প্রকৃতি-প্রেমিকরা আজ চোরাশিকারীদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে আন্দোলন করে চলেছেন। কিন্তু এত সবের মধ্যেও বীরভূমের একটি গ্রাম স্থাপন করেছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

গ্রামের নাম যজ্ঞনগর। বোলপুর থেকে বড়জোর ১০ কিলোমিটার দূরে। এই গ্রামের বাসিন্দাদের বড় আদরের অতিথি এই পরিযায়ী পাখিরা। প্রতিবছর এই গ্রামে হাজির হয় হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি। এই পাখিরা একটু ভিন্ন ধরনের। সাধারণত ভারতবর্ষে পরিযায়ী পাখিরা আসে শীতকালে এবং শীতকাল শেষ হলেই উড়ে যায় তাদের আদি বাসস্থানে। কিন্তু যজ্ঞনগরে পাখিরা আসে বর্ষাকালে। বৃষ্টি দিনের ভেজা ভেজা পরিবেশেই তারা আসে, নতুন করে সংসার বাড়ানোর জন্য ঘরকন্না পাতে।

গ্রামবাসীদের কথায়, এই পাখিদের প্রজননের সময় হল বর্ষাকাল। বর্ষাকালে গ্রামের পুরনো গাছগুলির মাথায় সাময়িকভাবে বাসা বাঁধে এই পাখির দল। 'বাসা বাঁধতে আমাদের মতো ওদেরও অনেক কিছু লাগে। শুকনো ঘাস, খড়, গাছের শুকনো ডাল, কাপড় ছেঁড়া অনেক কিছু। ওদের আসার সময় হলে আমরা বাড়ির আশেপাশে ওদের ঘর করার জিনিসপত্র রেখে দিই। ওরা এলে ওইসব দিয়েই বাসা তৈরি করে।' বললেন এক গ্রামবাসী। —'তারপর তারা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বেরনো বাচ্চা পাখিরা খেলা করে গোটা গ্রাম জুড়ে। একটু উড়তে শিখলেই তারা মায়েদের সঙ্গে উড়ে যায় নিজেদের বাড়িতে, অক্টোবর মাস নাগাদ।' প্রথমজনের কথার পিঠে কথা জুড়ে দিলেন এক মহিলা। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই সময়টিতে পাখিদের আগলে রাখেন এঁরা সবাই। কেউ যাতে পাখিদের ক্ষতি করতে না পারে তার দিকে নজর থাকে গ্রামবাসীদের। বর্ষার সময়ে এই পরিযায়ীরাই হয়ে ওঠে গ্রামবাসীদের সন্তানসন্ততি।

পাখিদের চেহারা অনেকটা শামুক খোলের মত। জানা গেছে, এদের আদি বাসস্থান শ্রীলঙ্কা এবং তার আশপাশের কয়েকটি দ্বীপে। কিন্তু ভরা বর্ষায় যজ্ঞনগর গ্রামের বেশ কয়েকটি বুড়ো তেঁতুল গাছই এদের প্রিয় জায়গা। বছরের পর বছর এই গাছগুলোতেই বাসা বাঁধে এই পাখিরা। বাচ্চারা বড়ো হলে গ্রামের রাস্তায় অবলীলায় ঘুরে বেড়ায়। কেউ বিরক্ত করে না। শুনতে কিছুটা অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি যজ্ঞনগরে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, শেখ জসিমুদ্দিন ডুডু জানালেন, 'প্রজননের সময় প্রাণীমাত্রই খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়। নিজের চোখেই দেখুন, হাজার হাজার পাখি কেমন এসে হাজির হয়েছে গ্রামে। এর থেকে প্রমাণিত হয় এই গ্রামের প্রতি, গ্রামবাসীদের প্রতি অগাধ আস্থা এই পাখিদের। অবশ্যই তিল তিল করে অর্জন করতে হয়েছে এই আস্থা। প্রতি বছরই বাড়ছে আমাদের অতিথির সংখ্যা।'

গ্রামবাসীরা জানালেন, অনেকদিন আগে গ্রামের বয়স্করা মিলে তৈরি করেছিলেন একটি কমিটি। সেই কমিটির কাজ ছিল পাখিদের দেখভাল করা। নিয়মও তৈরি হয়েছিল, যদি কেউ কোনো পাখির ক্ষতি করে তাহলে ধার্য হবে মোটা অঙ্কের

পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আস্তানা বীরভূমের যজ্ঞনগর গ্রাম

জরিমানা। প্রথম প্রথম বেশ কিছু দোষী ব্যক্তি শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু এখন কমিটি থাকলেও কমিটির কাজ নেই, কারণ গ্রামবাসীরা স্বপ্নেও পাখিদের ক্ষতি করার কথা ভাবেন না। পরিযায়ীদের মমতায় বাঁধা পড়েছে যজ্ঞনগর।

পাখি সংরক্ষণ কমিটির প্রাক্তন প্রধান ও প্রবীণ গ্রামবাসী মুজিবর রহমানের কথা, 'আমাদের দাদুদের দেখেছি গ্রামের লোকেদের বোঝাতেন যে পাখিদের ক্ষতি করা উচিত নয়। পরে বাবারা বোঝাতেন। আমরাও বুঝিয়েছি একটা সময়, কিন্তু বিশ্বাস করুন এখন আর কাউকে বলতে হয় না। এই পাখিরা আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরাও তাই খুব ভালবাসে পাখিদের।' গ্রামবাসীরা এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য কোনোরকম সাহায্যও চান না কারও কাছ থেকে। শুধু তাঁরা বলেন যে, যেহেতু পাখির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন, সরকার যদি এই গ্রামে একটি বনসৃজন প্রকল্প হাতে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক পাখি আসতে পারবে এই অসাধারণ 'মরূদ্যানে'।

কিন্তু কিভাবে গড়ে উঠল এই পাখি-মানুষ আত্মীয়তা? প্রশ্নের উত্তরে মুজিবরবাবু জানালেন, 'দাদুর মুখে শুনেছি একবার ঝড়ে একটি পাখি উড়ে যাবার সময় আহত হয়ে গ্রামের মাঠে ছিটকে পড়ে। তারপর গ্রামের সবাই মিলে পাখিটিকে সুস্থ করে তোলে ও উড়িয়ে দেয় আকাশে। পরের বছর বেশ কিছু পাখি এসে বর্ষার সময় আস্তানা গড়ে গ্রামের মধ্যেই এবং তারপর থেকেই পাখির সংখ্যা বেড়েছে।'

যজ্ঞনগর ভালোবেসেছে পরিযায়ীদের, পরিযায়ীরা যজ্ঞনগরকে।

—দৈনিক স্টেট্‌সম্যান, ৩.৮.০৪

বীরভূম জেলায় মিড-ডে মিল চালু

পবন দুবে : বীরভূমে মিড-ডে মিল কিছু প্রাথমিক স্কুলে দেওয়া হচ্ছে। ৬৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। ১৫০ গ্রাম চাল সহ প্রতি ছাত্রছাত্রীকে অন্যান্য খাবার দেওয়া হবে। মাসে ২০ দিন ছাত্রছাত্রীরা খাবার পাবে। এর ফলে স্কুলে আসা ছাত্রছাত্রীর আকর্ষণ বাড়বে। স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাবে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের এরকম সুপারিশ ছিল। তিনি বলেছিলেন, মেধার সঙ্গে পুষ্টির সম্পর্ক আছে। সাধারণ খাবার থেকেও দুঃস্থ শিশুরা যথেষ্ট পুষ্টি পাবে। বীরভূমে প্রাথমিক স্কুল আছে ২৩৭টি। বাকিগুলো কখন শুরু হবে জানা যায়নি। পরিকাঠামোগত সমস্যা অতীতে ছিল। যার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েও পিছিয়ে আসতে হয়। শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। ক্লারিক্যাল জবে তাদের বেশি ব্যস্ত না রাখাই ভাল। ধারাবাহিকতার প্রয়োজন আছে। শিশুখাদ্য যাতে বয়স্কদের পুষ্টি না যোগায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। প্রক্রিয়াটি ইতিবাচক এবং জেলার মানুষ খুশি।

—কালান্তর, ৮.১১.০৪

তারাপীঠের পরিকল্পনামাফিক বিকাশ

পবন দুবে : বীরভূম জেলার তারাপীঠ এখন আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এই ধর্মস্থলে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক আসেন। অথচ এখনও এটিকে সঠিক পরিকল্পনায় আনা সম্ভব হয়নি। এর বিকাশ হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। লজ, হোটেল, দোকানে গিজগিজ করছে। দ্বারকা নদীকে ছোট হতে ছোটতর করে নিয়মিত নির্মাণ

চলছে। সড়কের দুপাশে বাস-ট্যাক্সি দাঁড়ায়। শৌচালয় নেই, যাত্রী আবাস নেই। অথচ বাসস্ট্যান্ডের জন্য অধিকৃত স্থানের বেশির ভাগটা জুড়েই মার্কেটিং কমপ্লেক্স হচ্ছে। ১০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ লোক প্রতিদিন তারাপীঠে আসে। অথচ সেভাবে পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। এটি পঞ্চায়েতের অধীনে। শ্মশান আছে। ডেথ সার্টিফিকেট দেখার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য এখানে বেআইনি লাশ সহজেই পোড়ানো যায়। ছোট পুলিশ ফাঁড়ি আছে তার পক্ষে যানবাহন থেকে আইনশৃঙ্খলা দেখা সম্ভব নয়। হোটেল, লজ, গলির অধিকাংশেই প্রচুর অবৈধ কাজ হয়। প্রায় মুক্তাঞ্চলের মতো।

—কালান্তর, ৭.১.০৫

আদিবাসীদের জমি বেহাত হতে দেবে না রাজ্য সরকার

জয়দীপ সরকার : আদিবাসীদের প্রতারিত করে কোনোভাবেই তাঁদের মালিকানাধীন জমি হস্তান্তর করা চলবে না। বীরভূমের পাথরখনি এলাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আদিবাসীদের সমস্যায় ফেললেও রাজ্য সরকার গোটা বিষয় নজরে রেখেছে। প্রয়োজনে আদিবাসীদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করবে রাজ্য সরকার। বুধবার বীরভূমের পাথরখনি এলাকায় কর্মরত আদিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে একথা জানান আদিবাসী ও অনগ্রসরকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উপেন কিসকু।

বীরভূমের পাথরখনি এলাকায় আদিবাসীদের মালিকানাধীন জমি তাঁদের অজ্ঞাতসারে বিক্রি বা প্রতারণা করে আদিবাসীর নাম দিয়েই সেই জমি কিনে পাথরখনি তৈরি, জমির উপযুক্ত দাম কখনোই আদিবাসীদের না দেওয়া, কৃষিজমির পাশে পাথরখনি করে কৃষিজমিকে নষ্ট করে ওই জমিও ধীরে ধীরে পাথরখনি হিসেবে গড়া, অন্যদিকে আদিবাসী মহিলাদের ওপর কিছু মানুষের নির্যাতন, খুন ইত্যাদি বহু অভিযোগ উঠছিল কিছুদিন ধরে। সবই বীরভূমের পাথরখনি এলাকা মহম্মদবাজারের পাঁচামী সংলগ্ন এলাকায়। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বুধবার জেলার অধিকাংশ খনি অঞ্চল ঘুরে দেখেন উপেন কিসকু। এইসব এলাকার আদিবাসী শ্রমিক-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে উপেন কিসকু জানান, এখানে অসংগঠিত মানুষদের নানা অভিযোগ আছে জীবিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ই খতিয়ে দেখা হবে। আদিবাসীদের প্রতারিত করা বা কখনো আদিবাসীদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে আদিবাসীদের ওপর আক্রমণ করানো, এসব ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়েও ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় প্রশাসনকে উপেন কিসকু নির্দেশ দিয়েছেন। ওই অঞ্চলের আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে নজর দিতে

মহম্মদ বাজারের হাটগাছিয়া পাথরখনি এলাকায় আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদিনের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন মন্ত্রী উপেন কিসকু ছবি : জয়দীপ সরকার

আকাশ জুড়ে কালো মেঘ, জল থই থই মাঠ, বীরভূমের নলহাটি দেবগ্রাম

সৌজন্যে : গণশক্তি

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী। তিনিও এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবন সংগ্রাম দেখে বলেন, আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। উপেন কিস্কু জানান, রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা চালুর বিষয়ে তাঁর দপ্তর রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চার ওপরও আদিবাসী শিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে কিছু কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

—গণশক্তি, ৩১.১০.০৪

জল ছাড়ল ঝাড়খণ্ড, বীরভূমে বন্যার কবলে প্রায় ৫০০০ মানুষ

ক্রমশ জল বাড়তে থাকায় ব্রাহ্মণী নদীর বাঁধ ধুয়ে গেলে বীরভূমের নলহাটি-২ নম্বর ব্লক এবং রামপুরহাট-চ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। কম করে দুই জায়গায় এই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকায় জল ঢুকে গিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বন্যার কবলে পড়েছেন। জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নজরদারি বাড়িয়েছে। জোর কদমে চালানো হচ্ছে ত্রাণের কাজ।

প্রশাসন কর্তারা জানিয়েছেন গত দুই দিন ধরে ঝাড়খণ্ডে প্রবল বর্ষণের ফলেই এই বিপত্তি ঘটেছে। বীরভূম-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে বৈতারা ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়েছে। সেখানে বৃষ্টির ফলে ব্যারেজের সুরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে। গত শনিবার রাত থেকে নদীর জল বিপদসীমা ছাড়াতে থাকলে রবিবার দুপুরে ব্রাহ্মণী নদীর জল বাঁধের দুটি অংশ ধসিয়ে দিলে ঢুকতে শুরু করে বীরভূমের ব্লকগুলিতে। নলহাটির হামিদপুরের কাছে নদীর বাঁ পাশের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। এখানে বাঁধ ভেঙে গেলে চারটি গ্রাম সম্পূর্ণ ডুবে যায়। রামপুরহাটের বলরামপুর গ্রামে বাঁধের ডান দিকে গর্ত হয়ে গিয়ে জল ঢুকতে থাকলে দুটি গ্রাম ভেসে যায়।

বীরভূমের জেলাশাসক খলিল আহমেদ বলেছেন, 'সেচ এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। তারা সেখানে ত্রাণের সামগ্রী নিয়েই পৌঁছে গিয়েছেন। কেবলমাত্র ঝাড়খণ্ডের ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলেই অবস্থার অবনতি হয়েছে।' গত বছরও বন্যায় গর্ত তৈরি হয় বাঁধের গায়ে। ক্ষতগুলি সারিয়ে তোলার কাজ চলছিল বলে প্রশাসন জানিয়েছে। হঠাৎ বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হলে কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গ্রামের নিচু এলাকায় যারা বাস করে তারা স্থানীয় স্কুল এবং অন্যান্য বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জেলাশাসক এলাকার মানুষদের আশ্বস্ত করেছেন।

—দৈনিক স্টেট্‌সম্যান, ১৮.৭.০৫

খাদানে বিস্ফোরণ : খতিয়ে দেখার নির্দেশ

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় : বীরভূমের পাথর খাদানগুলিতে যথেচ্ছভাবে ডিনামাইট বিস্ফোরণ, পরিবেশ দূষণ, শিশুশ্রম প্রভৃতি অভিযোগগুলি জেলা প্রশাসনকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন। জেলার মহম্মদবাজার, রামপুরহাট ও নলহাটি ব্লকের ঝাড়খণ্ড লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাথর খাদানগুলিতে পাথর ভাঙার জন্য দিনে রাত্রে সবসময় যথেচ্ছভাবে ডিনামাইট বিস্ফোরণে এলাকাবাসীদের বাড়ির দেওয়াল ফেটে বিপজ্জনক হয়েছে। বিকট শব্দে স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় সিউড়ি সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার অভিযোগগুলি শুনে দৃশ্যতই উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। অতিরিক্ত জেলাশাসক পিনাকী ঘোষকে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলেন।

—আজকাল, ২৭.১২.০৪

মাটির স্থাপত্য রক্ষার চিন্তায় বিশ্বভারতী

জয়দীপ সরকার : বর্ষায় নষ্ট হচ্ছে শান্তিনিকেতনের নান্দনিক শিল্প। যে-সব শিল্প মাটি দিয়ে তৈরি সেগুলো বৃষ্টির জলে ক্ষয়ে গিয়ে ধসে পড়ছে। শ্যামলী, চৈত্য, ব্ল্যাকহাউসের মতন মাটি দিয়ে তৈরি স্থাপত্যের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে এই বর্ষায়। ইতোমধ্যে চৈত্যের এক অংশ বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ এখন প্লাস্টিক জড়িয়ে রক্ষা করতে চাইছে ওইসব শিল্পকে।

বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ভাস্কর্য, ম্যুরাল স্থাপত্য। নির্মাণশৈলীতে যা সকলের নজর কাড়ে। কিছুদিন আগে বিশ্বভারতীর কয়েকজন অনুরাগী শান্তিনিকেতনে স্থাপত্য শিল্পকর্মের একটা খসড়া তালিকা করেছিলেন। যার সংখ্যা ৭৬। যাঁরা একাজ করেছিলেন তাঁরা বলছেন ওই সংখ্যাটা আরও বাড়বে, কারণ বিভিন্ন ভবনের দেওয়ালে বা ছাদে নানা জায়গায় যে শিল্পকলা আছে তা ওই তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই বিরাট সংখ্যার শিল্প যেখানে আছে তা সংরক্ষণের জন্য একটি আলাদা দপ্তর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্বভারতীর তা নেই। ২০০২ সালে সুজিত বসু উপাচার্য হিসাবে প্রথম উদ্যোগ নেন এইসব শিল্পসামগ্রীর সংরক্ষণের। দিলীপ মিত্রকে আহ্বায়ক করে ২০০২ সালের ২৩ মে এ বিষয়ে একটি কমিটিও গঠন হয়। কমিটিতে বিভাগীয় প্রধানরা ছাড়াও বিভিন্ন স্থপতি, শিল্পী, ভাস্কর ছিলেন। তাঁরা অনেকে প্রস্তাব দেন মাটির স্থাপত্য সংরক্ষণে তাকে ব্রোঞ্জে রূপান্তর, কোথাও প্রস্তাব আসে নিয়মিত সংরক্ষণের। সবমিলে ওই খাতে খরচের যে অঙ্ক দাঁড়ায় তা দেখে পিছু হটতে হয় বিশ্বভারতীকে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়েও তেমন সাড়া না পাওয়ায় কর্তৃপক্ষও চুপ। কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিল্পী দিনকর কৌশিক বলেন, মাটির স্থাপত্য সংরক্ষণের কোনো উপায় নেই। ওই নান্দনিকতাকে অটুট রেখে সংরক্ষণ করা অসম্ভব। তাঁর মতে, বিনোদবিহারী, নন্দলাল বসুর স্থাপত্য বা অলঙ্করণের ওপর সংরক্ষণের নামে অন্য কারো তুলি চালানোটাও বেমানান। তবু প্রাকৃতিক ক্ষয় থেকে স্থাপত্য রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উচিত বলে তাঁর ভাবনা।

১৯৩০ সালের পর নন্দলাল বসুর পরিচালনায় রামকিঙ্কর বেইজ, প্রভাস সেনের মতন শিল্পীরা মিলে গড়েন ব্ল্যাকহাউস। আলকাতরার রং দিয়ে ফি বছর দেওয়ালকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কখনও ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে, কখনও বা দেওয়ালে চটে যাচ্ছে রং। ফলে নষ্ট হচ্ছে অনবদ্য শিল্পকর্ম। শ্যামলী রক্ষায় কর্তৃপক্ষ এখনো চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্ল্যাকহাউস ও শ্যামলীকে কেন্দ্র করে কিছু কাজ ইতোমধ্যে হয়েছে। ঐতিহ্যময়ভবন রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টাও নেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে কোনার্ক বাড়িটি মেরামত করে দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, উত্তরায়ণের এক অংশে মেরামতের কাজও হচ্ছে। কিন্তু মাটির স্থাপত্য সংরক্ষণের কাজ সমানতালে এগোয়নি। কলাভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শিল্পী প্রবীর বিশ্বাস বলেন, কাঁকড়মাটির সঙ্গে খড় মিশিয়ে যে প্রযুক্তিতে ওইসব স্থাপত্য গড়েছিলেন বরণীয় শিল্পীরা, তা এই অঞ্চলের চেনা ছন্দের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নির্মিত হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণে এখন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছে, তবে এই সম্পদ রক্ষায় সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

—গণশক্তি, ১৭.৭.০৫

ফেরোমন ফাঁদে পোকা ছবি : জয়দেব সরকার

বেগুন গাছের পোকা ফেরোমন ফাঁদে

জয়দীপ সরকার : হরেক ধরনের রোগপোকার সংক্রমণ বেগুন চাষিদের প্রতিবারই কমবেশি বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে। সেই সংক্রমণ রুখতে যে পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তাতে ফসলের গুণমান যেমন নষ্ট হয়, তেমন চাষের খরচ বাজারের দাম সবই বেড়ে যায়। অথচ বিকল্প চাষের যখন প্রসার ঘটছে তখন এই অর্থকরী ফসল চাষ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা।

বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা বিভাগ এবার এক নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন করে বেগুন চাষিদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে। তারা তৈরি করেছে ফেরোমন ফাঁদ। এই ফাঁদে পোকা আটকে ফসলের ক্ষতি রোধ করা যাবে। বিশ্বভারতী পল্লী শিক্ষা বিভাগের উদ্ভিদ সুরক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অধ্যাপক কাঞ্চন বড়াল জানান, যেসব পোকা বেগুন চাষের ক্ষতি করে তাদের পর্যালোচনা করেই গড়া হয়েছে ফেরোমন ফাঁদ। যার মধ্যে থাকবে যৌন ফেরোমন, যার গন্ধে পোকারা আসবে ফাঁদে এবং ভেতরে ঢুকলে কোনমতেই বাইরে আসতে পারবে না। যৌন ফেরোমনের এ ধরনের ব্যবহার এই প্রথম বলে দাবি বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা শ্রীনিকেতন সংলগ্ন বাহাদুরপুর গ্রামে কৃষকদের খেতে দেখালেন বেগুন গাছের সারির পাশে লাগানো হয়েছে এই ফাঁদ। একটা লম্বা কাঠের টুকরোর সঙ্গে বাঁধা ওই ফাঁদ গাছ যত বাড়বে সেই উচ্চতায় সমান করে বাঁধতে হবে। এলাকার কৃষক ভমাল পাল জানান, তিনি এবার বেগুন চাষে কোন কীটনাশক ব্যবহার না করে বিশ্বভারতীর দেওয়া ফাঁদ ব্যবহার করছেন। এতে সমস্ত পোকা নষ্ট না হলেও কিছু পোকা কিন্তু ফাঁদে ধরা পড়ছে। তবে এর চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়া যাবে শীতে ফসল তোলার সময়। বিশ্বভারতীর উদ্ভিদ সুরক্ষা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের কথায়, যদি একটি গ্রামের সমস্ত চাষি ওই ফাঁদ ব্যবহার করেন তবে সাফল্য ভালভাবে পাওয়া যাবে। যে ফাঁদ তারা তৈরি করেছেন তার বাজার দরও খুব কম হবে বলে তাঁদের বক্তব্য। যৌন ফেরোমনকে ঠিকভাবে ব্যবহার করার বিষয়েও তাঁরা কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন বলে জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে এই প্রকল্প দেখতে কেন্দ্রীয় উদ্ভিদ সুরক্ষা দপ্তর থেকে তাইওয়ানের কৃষি বিশেষজ্ঞরাও ঘুরে গেছেন। প্রথম বছর পরীক্ষামূলকভাবেই এতে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে বলে তাদের কথা। কিন্তু প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। ত্রিপুরার চাষিদের জন্যও গেছে এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রচার পুস্তিকা।

—গণশক্তি, ১৪.১০.০৪

কেঁদুলিতে রবীন্দ্র-প্রতিমূর্তি ছাইদানি!

তিনি হাজির এখানেও। তবে ফকির বাউলদের মেলায় রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে নন, একদম 'ঠাকুর' হয়ে এসেছেন। অজয় নদের মাঝ বরাবর যে হাঁটাপথের দুদিকে অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি সাজিয়ে সামনে গামছা পেতে রেখে যায় বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা ভিক্ষুকরা। তারাই এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। তার সামনে রাখা গামছায় দিব্যি পড়ছে খুচরো পয়সা থেকে চাল—সবকিছুই। দুলাল মাহাতো। বি এ পাস, পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁর মতো অনেকেই আছেন, যাঁরা নির্বিকারচিত্তে চাল পয়সা গামছায় ফেলে প্রণাম ঠুকছেন। অবাক করার বিষয় এই ঘটনা অনেকের খারাপ লাগলেও, কেউ প্রতিবাদ করছেন না। স্বত্বমুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে এই অবস্থায় এসে পৌঁছবেন, দেখেই শঙ্কিত হতে হয়। একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল অন্য এক দৃশ্য। মেলার মধ্যে বিকোচ্ছে অ্যাশট্রে। রবীন্দ্রনাথের মূর্তির মাথায় গর্ত, সেখানে ছাই ফেলার জায়গা। ১০ টাকায় দুটো। বিক্রিও হচ্ছে। কেউ ভাবছেন না, কী করছেন! বিক্রেতা বলেন, টেবিলে সাজানোও হবে রবীন্দ্রনাথকে, আবার ছাইও ফেলা হবে। একজনও প্রতিবাদ করছেন না, তা বললেও ভুল হবে। স্থানীয় মানুষজন এবং মেলারই কিছু মানুষ রবীন্দ্রনথের মূর্তি দিয়ে ছাইদানি তৈরি করে বিক্রি করা দেখে প্রতিবাদ করায় বিক্রেতা সরালেন সেই সমস্ত পণ্য।

এমন হরেক ভাবনা, রুচি, সংস্কৃতির মেলবন্ধনে জমাট কেঁদুলি মেলায় এক বাউলশিল্পীর আক্ষেপ, এবার অনেক পুরানো
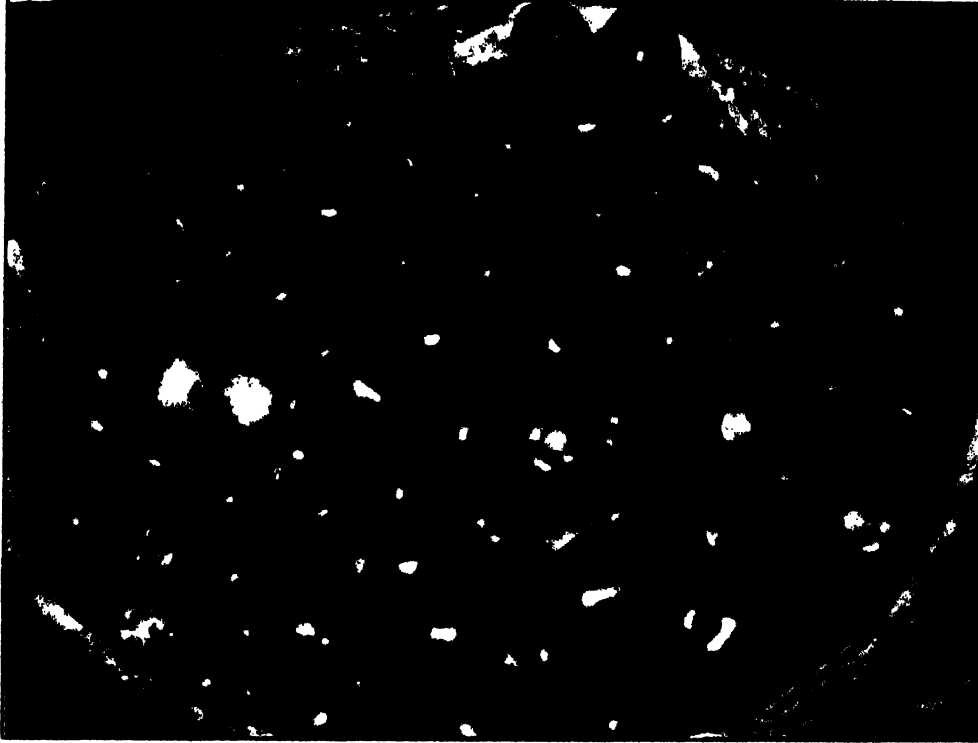
বীরভূমে টমেটো ফসলের প্রাচুর্য

বাউল আসেননি। শুনেছি কয়েকজন মারাও গেছেন। কে খবর রাখে কার? দেখা তো হয় ফি-বছর মেলায়, আখড়ায়। রাতভর গানে মাতানো মানুষদের শেষ জীবন নিয়ে কী কেউ ভাববেন না?

—গণশক্তি, ১৬.১.০৫

লোকসানের আশঙ্কায় বীরভূম জেলায় এবার টমেটো চাষ কমতে চলেছে

অশ্বিনী মান্না : বীরভূম জেলায় এবার লক্ষণীয়ভাবে টমেটো চাষ কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সাধারণত এই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে টমেটো চাষের জন্য বীজতলা ফেলতে হয়। কিন্তু জেলার চাষীরা এখন সেভাবে বীজতলা ফেলছেন না। বীজ ব্যবসায়ীরা উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড বীজ আনলেও তা বিক্রি হচ্ছে না। বীজ ব্যবসায়ীরা জানান, অন্যান্য বছর এই সময়ে যেভাবে টমেটো বীজ বিক্রিবাটা হত এ বছর তা হচ্ছে না। এতে কম খরচে অধিক লাভজনক এই টমেটো চাষ জেলায় কমতে চলেছে।

কৃষিবিদরা জানিয়েছেন, এক কাঠা জমিতে যদি টমেটো চাষ করা হয় তাহলে চার কুইন্টালেরও বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে। যেখানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় এই টমেটো চাষে জল সহ অন্যান্য খরচ কম হয়। কিন্তু দেখা গিয়েছে, টমেটো বাজারে উঠলে প্রথমের দিকে দাম দুটাকায় এক কিলো টমেটো বিক্রি হয় পরে তার দাম কমে দাঁড়ায় ৫০ পয়সায়। এতে চাষিরা টমেটো বিক্রি করা নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েন।

বড় চাষিরা জানিয়েছেন, জেলায় টমেটো বাজার না থাকায় ওই চাষ কমাতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, ঘরে খাওয়া ছাড়া টমেটো অন্য কোথাও বিক্রি করা যায় না। ভিন রাজ্যে রপ্তানি করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া কোনো কোল্ড স্টোরেজ নেই যেখানে টমেটো রাখা যায়। যার ফলে একই সময়ে ফসল ওঠায় বাজারে ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। এমনও দিন গিয়েছে যেখানে টমেটো কিলো ৫০ পয়সায় বিক্রি করতে হয়েছে। তখন জমি থেকে টমেটো তুলে বাজারে নিয়ে যাওয়ার খরচটাই পাওয়া যায় না। জমিতে পড়ে পড়ে নষ্ট হয় টমেটো।

কৃষিবিদরা জানিয়েছেন, চাষিরা দাম না পাওয়ার কারণেই টমেটো চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যদি টমেটো রপ্তানির ব্যবস্থা থাকত তাহলে চাষিরা চাষ করতে অনীহা প্রকাশ করত না।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি মনসা হাঁসদা বলেন, জেলা প্রশাসন থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে জেলায় ফুড প্রসেসিং করা যায়। এজন্য ছোট বড় শিল্পপতিদের নিয়ে সম্প্রতি বৈঠক করা হয়েছিল। তাতে শিল্পপতিদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া বর্ধমান ও বীরভূম জেলা মিলে চাষিরা যাতে বিভিন্ন ধরনের সবজি ফসল রাখতে পারেন সেজন্য ইলামবাজারে একটি ভেজিটেবল স্টোর গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট অনুমোদনও হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনাটি রূপায়ণ করা গেলে চাষিরা টমেটো সহ বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ রাখতে পারবেন। তবে জেলায় কৃষিবিদদের ধারণা, খুবই সাময়িকভাবে জেলার চাষিরা টমেটো চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই এই পরিস্থিতি খুব বেশিদিন চলবে না। কারণ রাজ্য সরকারও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যাবে।

—বর্তমান, ১৫.৯.০৪

সংকলক : সহানুশাসক, সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

রায়পুরের (সিউড়ি থানা) জীর্ণ মন্দির — সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ
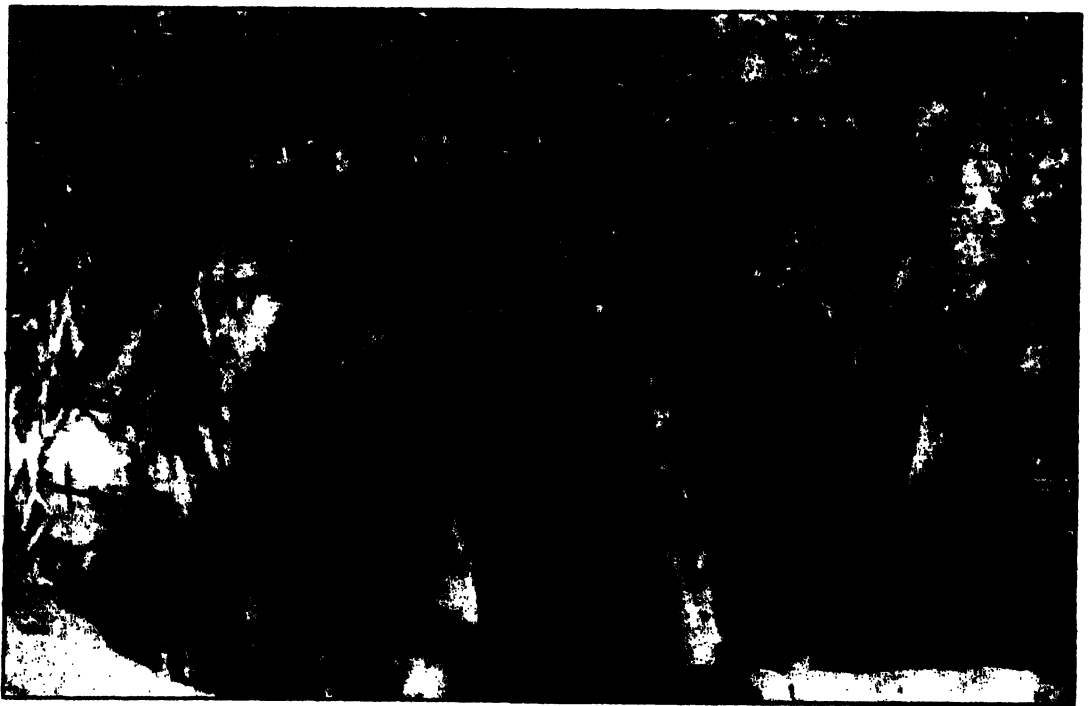
লাউসেনের যজ্ঞাগার, বারুইপুরের মন্দির — ছবি : অনির্বাণ সরকার
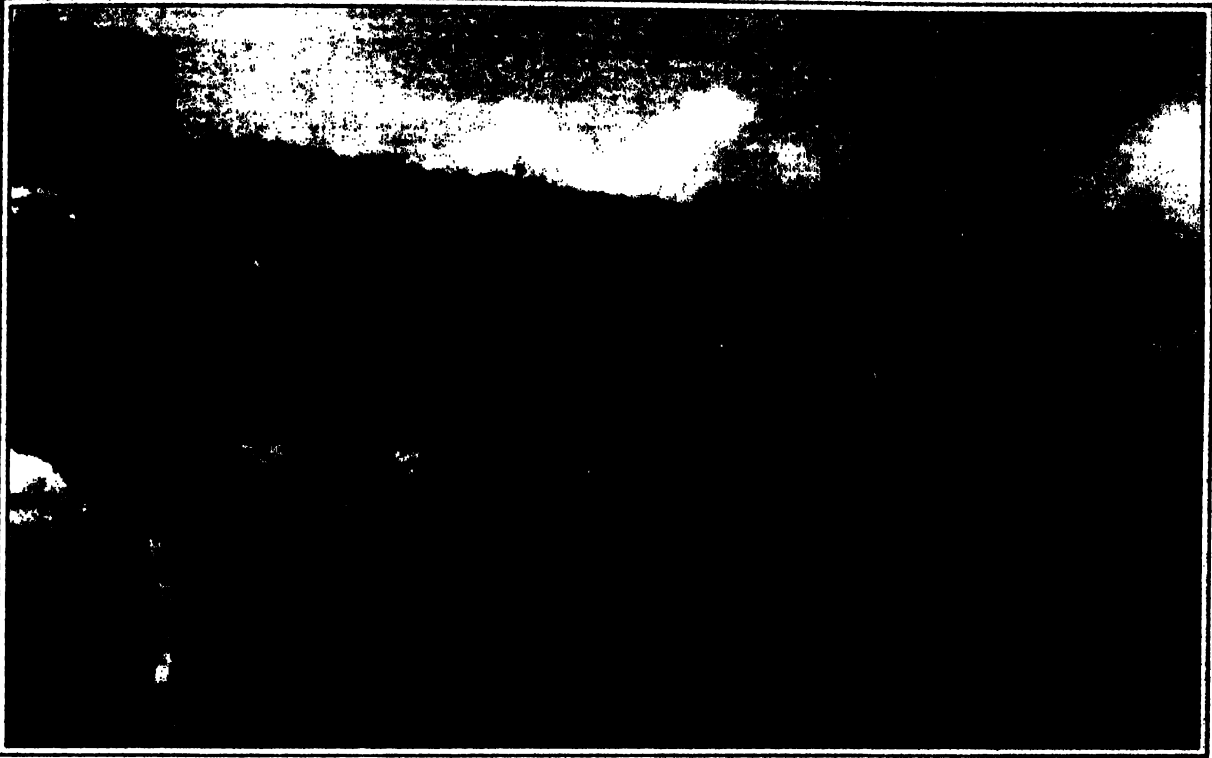
মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদ (আকালীপুর) সৌজন্যে : প্রণবকুমার রায়

ইতিহাসের ভাঙাগড়ায় বীরদেশ বীরভূম : গ্রন্থপঞ্জি

সুবর্ণ দাস

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বত।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ় দেশ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

এই 'বীরদেশ' তবে বীরভূমের নামান্তর। সুদূর অতীতে মল্লগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নামানুসারে এক একটি অঞ্চল বা এলাকার নামকরণ হয়েছিল। যেমন মানভূম বা মল্লভূম ইত্যাদি। বীররাজার নাম অনুসারে বীরভূম নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, সেনবংশের পূর্বপুরুষ বীরসেনের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম বীরভূম। কেউ বলেছেন সুদূর অতীতে পাঞ্জাব থেকে বীর চৈতন্যসিংহ এদেশে এসে অনার্যদের পরাজিত করে বীরসিংহপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীরসিংহই বীরভূমের শেষ সিংহপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই বীরসিংহই বীরভূমের শেষ হিন্দুরাজা ! স্যার ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার লিখেছেন "LAND OF HEROES" অর্থাৎ বীরদের ভূমি বা দেশ। কারো মতে এ অঞ্চলে আর্য ও অনার্যদের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করেছে বীরভূম নামটি। স্থানীয় মুন্ডারী ভাষাগোষ্ঠীতে 'বির' শব্দের অর্থ জঙ্গল। 'ভূমি' বা 'ভূম' সংস্কৃত শব্দ। বীরভূমের আগের নাম ছিল 'কামকোটি'। মহেশ্বর রচিত 'কুলপঞ্জিকা'

থেকে জানা যায়। যাই হোক অনেক উত্থান-পতনের পর ইংরেজ শাসনে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম একটি পৃথক জেলারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

উত্তর রাঢ় ক্ষেত্রাংশ বীরভূমে অধিবাসীরা রাঢ়দেশের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের তুলনায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই ধর্মচর্চা, শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ চেতনায় উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিল। এ অনুমান অসঙ্গত নয়। প্রাগ্বৈদিক যুগ থেকেই এই ক্ষেত্রে ধর্মচর্চা বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাসকবর্গের উত্থান-পতন ঘটেছে এই মাটিতে। পরিণামে রাজনৈতিক পুনর্গঠন হয়েছে নানাভাবে, বহুবার।

বীরভূমের ইতিহাসে দেখা যায় হিন্দু-মুসলিম রাজা-বাদশারা বিভিন্ন সময়ে এখানে কর্তৃত্ব করে গেছেন। রাজনগরের মুসলিম সামন্তরাজার আমলে বক্রেশ্বর শিবঠাকুরের নামে প্রায় হাজার বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দানের দলিল প্রামাণ্য হিসাবে দেখা যায়। 'বীরভূমের ইতিহাস', ২য় খণ্ডে একটি অকল্পনীয় উল্লেখ আছে যে, 'নামো সাপুরে' এইরূপ একটি বৃত্তিদানের সনন্দ দৃষ্ট হয়েছিল। এতে দেখা যায় শিবলিঙ্গ ঠাকুরের সেবাইত একজন মুসলমান।

বক্রেশ্বর শিবমন্দির ও উষ্ণ প্রস্রবন

পুরাণ বর্ণিত সতীপীঠ নলহাটিতে একই পাহাড়ে হিন্দুদের শক্তি সাধনার ক্ষেত্র ও মুসলিম সন্ত আনাপীর সাহেবের সমাধি ও মসজিদ এখনও ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে। রাজনগরের জনৈক মুসলিম ফৌজদার খয়রাশোল থানার পেরুয়া গ্রামের হিন্দু কবিরাজের ঔষধে কঠিন চর্মরোগ হতে আরোগ্য লাভের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঐ কবিরাজের কুলদেবতা রাধাবিনোদের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় সোয়া দু'শ বছর আগে। নলহাটি থানার অন্তর্গত বহু ইতিহাসের সাক্ষী বারাগ্রাম। এখানে মুসলিমরাই প্রধান অধিবাসী। এই গ্রামে যেমন হজরত মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একখণ্ড পাথর 'কদমরসুল' থাকায় মুসলিমদের পবিত্র তীর্থ হিসাবে বিবেচিত হয় তেমনি এখানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর অসংখ্য ভগ্নমূর্তি প্রমাণ দেয় এই অঞ্চলে একসময় তন্ত্রযানী বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। যদিও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সকলের সঙ্গে সংরক্ষণ পরবর্তী কোনো সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মেরও প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে।

ইলামবাজার থানার অন্তর্গত খুশতিগিরি গ্রামে 'আবদুল্লা কীরমানী' নামে এক মুসলিম সন্তের দরগা আছে। কীরমানী সাহেব সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্য দেশের কীরমান বা কেরমান নামে জায়গা থেকে এখানে এসেছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর নিদর্শন যে মুসলিম সন্তের এই দরগায় হিন্দু দেবী 'কালীর' সহ-অবস্থান ঘটেছে। দরগার আস্তানার ভিতর যেতে হলে আগে কালীস্থানে মাথা নুইয়ে যেতে হয়। আস্তানার চৌকাঠ সেই সূত্রে 'কালী চৌকাঠ' নামে লোকমুখে পরিচিতি লাভ করেছে। একই ক্ষেত্রে দুই বিপরীত ধর্মসাধনার এরূপ নিদর্শন কোনো যুগে কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। শুধু এখানেই নয় বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার মাড়গ্রামে ইসলাম ধর্মপ্রচারক জাফর খাঁ গাজীর সমাধি ও পুরাণে বর্ণিত মাণ্ডব্য মুনির মাণ্ডবেশ্বর শিবলিঙ্গ (লুপ্তপ্রায়) একই অঙ্গনে পাশাপাশি বর্তমান। এই সংযুক্ত ক্ষেত্র হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পুণ্য ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে। মল্লারপুর মন্দিরমণ্ডলে অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মূর্তি পূজা হয়। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন দালানে একটি বিস্ময়কর প্রস্তরমূর্তি আছে, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এক দেবমূর্তি ও পাদপীঠে কুকুর-সদৃশ প্রতিমূর্তি পণ্ডিতগণ কোনো জৈন তীর্থঙ্করের বলে অনুমান করেন। মন্দির স্থাপত্য ও শিল্পরীতি অনুযায়ী এইগুলিকে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে গণ্য করা হয়। এতদ্‌ভিন্ন ধর্মাদর্শের মধ্যে দূরত্ব তথা অসহিষ্ণুতার মূলোচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় সাধনের অন্যান্য প্রচেষ্টাও বিভিন্নভাবে হতে দেখা গেছে। মুলুক ও বীরচন্দ্রপুরসহ বীরভূমের অনেক ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যার নজির রয়েছে।

মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও গরুড় পুরাণে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পঞ্চপ্রদেশের নাম উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতম ঋষির ঔরসে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পাঁচ পুত্রের নামানুসারে পাঁচটি দেশ পরিচিত হয়। (১) অঙ্গ—বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চল (২) বঙ্গ—বর্তমান বাংলা, পূর্ববঙ্গ বা সমতট (৩) কলিঙ্গ—যাজপুর অঞ্চল (৪) সুহ্ম—বর্তমান রাঢ় দেশ (৫) পুণ্ড্র—বর্তমান গৌড় (মালদহ, গৌড়দেশ)।

পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমের পূর্ব দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে মহাভারতে সুহ্ম দেশের উল্লেখ আছে।

(ক) অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সুহ্মশ্চতে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি ॥
(মহাভারত, আদি পর্ব, ১০৪ অধ্যায়)

(খ) বলিঃ সুতাপসো যজ্ঞে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গকাঃ।
সুহ্ম পৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া অনপানস্থথাঙ্গতঃ॥

(গরুড় পুরাণ, ১৪৪ অধ্যায়)

(গ) হেমোৎ সুতপাঃ তস্মাদ্বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্য॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১৮ অধ্যায়)

পরবর্তীকালে কবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশে', বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিতে', আচার্য দণ্ডিত 'দশকুমার চরিতে' ও ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে, সুহ্ম প্রদেশের নাম দেখা যায়।

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্ম প্রদেশকে 'রাঢ়' বলে উল্লেখ করেছেন। সুহ্ম ! 'রাঢ়া' : প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'আমরাঙ্গ সূত্রে' (প্রাচীন জৈন গ্রন্থেও) এই সুহ্মকেই 'লাঢ়' বা 'রাঢ়' নামে নির্দেশ করেছেন।

"খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াঙ্গ এদেশে আগমন করেন। "সে সময় সুহ্ম বা রাঢ় দেশ বহু জনাকীর্ণ ছিল। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতে আমরা জানতে পারি সে সময় বঙ্গদেশ সাতটি ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে কর্ণসুবর্ণ একটি। এতে অনুমিত যে, বীরভূমি, কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত ছিল। বিনয় ঘোষ বলেন, "প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ় দেশই পশ্চিমবঙ্গ।" "মহাভারত (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন, ভীম, সহদেব ও নকুল উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয় করেন 'বৈদেহক ও জগতী পতি জনক'কে পরাজিত করেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে, সপক্ষে সুহ্ম ও প্রসুহ্ম নিয়ে মগধ গিরিব্রজে জরাসন্ধ পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে একটি প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্র আছে। সুহ্ম দেশের আগে যে দেশ, তার নাম প্রসুহ্ম। ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশে সুহ্ম দেশ। তার আগে বা দক্ষিণে প্রসুহ্ম, মগধ গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পূর্বে ভাগলপুর কর্ণের অঙ্গরাজ্য। কালিদাসের রঘুবংশে রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে সুহ্ম দিয়ে, কপিশা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয়, রঘু বঙ্গ থেকে সুহ্মে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, বেহুলা নদীর উত্তরভাগ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম। উত্তর রাঢ়, এর দক্ষিণে গঙ্গা পর্যন্ত প্রাচীন প্রসুহ্ম, দক্ষিণ রাঢ়। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনা এবং উত্তরে (বিহারের সীমানা উত্তর রাঢ়ের চতুঃসীমা আর পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে অজয়) পশ্চিমে পুরুলিয়া-মানভূম এবং দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর ও তার দক্ষিণে রূপনারায়ণ হল দক্ষিণ রাঢ়ের চতুঃসীমা। উত্তর রাঢ়ের অধিকাংশ নিয়ে কতক গ্রামভুক্তি, সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় ও উত্তর রাঢ়ের কতকাংশ নিয়ে বর্ধমান ভুক্তি।"

এখন এই সীমানার রদবদল হয়েছে অনেক। এখন পণ্ডিতরা মনে করেন সমগ্র উত্তর রাঢ় ছিল প্রাচীন বীরভূম। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে অজয় নদের উত্তর পর্যন্ত উত্তর রাঢ়; অজয় নদের দক্ষিণ থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিভাগ ছিল দক্ষিণ রাঢ়। উত্তর রাঢ়ই সুহ্ম। এখন সেটা বলা হয় দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্ম। এই বিতর্কের অন্ত নাই।

এই বীরভূম জেলার নাম বজ্রভূমি বা বজ্জভূমি নামে অভিহিত ছিল। বজ্রভূমি নামকরণের পেছনে মনে করা হয় বজ্রের মতো এই মাটি কঠিন। অথবা "বজ্রযানী বৌদ্ধসমাজ এই বীরভূম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। বজ্রযানের দুই শাখার মধ্যে (কালযান বা সহজযান), সহজযানের প্রবর্তক ছিলেন লুইপাদ নামে একজন বাঙালি। তিব্বতের বৌদ্ধসমাজ তাঁকে সিদ্ধার্থ বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।"—মন্তব্য করেন ড. অতুল সুর (বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন)। বীরভূমের নাম জৈন ও বৌদ্ধযুগে সুহ্ম বা লাঢ় বা রাঢ় অঞ্চলের বজ্জভূমি বা বজ্রভূমি বলে উল্লেখিত হতে থাকাকালীন অন্য একটি নাম কামকোটি হতে দেখা যায়।

সমগ্র উত্তর রাঢ় জুড়ে ছিল প্রাচীন বীরভূম। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে অজয় নদের উত্তর পর্যন্ত উত্তর রাঢ়, অজয় নদের দক্ষিণ থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিভাগ দক্ষিণ রাঢ়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে বর্ণিত রাঢ়ীখণ্ড ভাগীরথীর পশ্চিমে জাঙ্গল নামে এক জনপদ। এর অধীন বৈদ্যনাথ ধাম, বক্রেশ্বর, বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদীর নাম পাওয়া যায়।

সমগ্র উত্তর রাঢ় জুড়ে ছিল প্রাচীন বীরভূম। গঙ্গার দক্ষিণ থেকে অজয় নদের উত্তর পর্যন্ত উত্তর রাঢ়, অজয় নদের দক্ষিণ থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিভাগ দক্ষিণ রাঢ়। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে বর্ণিত রাঢ়ীখণ্ড ভাগীরথীর পশ্চিমে জাঙ্গল নামে এক জনপদ। এর অধীন বৈদ্যনাথ ধাম, বক্রেশ্বর, বীরভূমি প্রভৃতি স্থান এবং অজয় প্রভৃতি নদীর নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে 'ভীমের দিগ্বিজয়' বর্ণনায় 'রাঢ়দেশ'-র যে সীমা নির্দেশ আছে তাতে 'বীরদেশ' কথাটির উল্লেখ আছে—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥

ভাণ্ডীরবন গোপাল মন্দির — সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

সিউড়ি গণজালাল্কর পীরের মন্দির — ছবি : পুলক সিংহ

মতিচুর মসজিদ, রাজনগর

সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

অনেকের অনুমান এই 'বীরদেশ'—বীরভূমিরই নামান্তর। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকায় পাওয়া যায়—

"বীরাভূঃ কামকোটি স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গা জয়ান্বিতা
আরণ্যকং প্রতীচ্যন্ত দেশো দার্বদ উত্তরে।
বিন্ধ্য পাদোদ্ভবা নদ্যঃ দক্ষিণে বহ্যঃ সংস্থিতা ॥

কুলপঞ্জিকার শ্লোক থেকে জানা যায়—"কামকোটী বীরভূম জানিবে নির্বাস।" পূর্বে বীরভূমের নাম ছিল 'কামকোটী'। বসন্তকুমার দে মহাশয় বলেছেন, তারাপীঠের মুনি বশিষ্ঠের কন্যার নাম কাম্যা, তাঁর নামানুসারে বীরভূমের পূর্ব নাম কাম্যাকোটী বা কামকোটী। (মাতৃতান্ত্রিক) কাম্যার স্বামী ছিলেন মনুর পুত্র বীর। তাঁর নামে পরে নাম হয় বীরভূম (পিতৃতান্ত্রিক)। তবে সময় বিচারে এই পুরাণ-কল্পনা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা তর্ক সাপেক্ষ।

বীরভূমের প্রাচীন অন্যান্য নামের মধ্যে—উচ্চাল, বজ্রভূমি প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। উপরের শ্লোকে 'বীরাভূ' বা বীরভূমির চতুঃসীমার উল্লেখ পাওয়া যায়—পূর্বে গঙ্গা (অজয় সম্মিলিতা), পশ্চিমে অরণ্যভূমি (ঝাড়খণ্ডের ঘন অরণ্য), উত্তরে দার্বদ বা পাথরের দেশ (রাজমহলের পর্বতশ্রেণী) এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎসারিত দামোদর প্রভৃতি নদনদী। ড. হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নের মতে, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বীরভূমের সীমানা উদ্ধৃত শ্লোকানুরূপ ছিল। অতি পূর্বকালে এই স্থান সুহ্ম দেশের অন্তর্গত ছিল। যা হোক সুহ্ম যে রাঢ় হতে পারে দশকুমার চরিতের এই প্রমাণ তার বিরুদ্ধ নয়। দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক সংস্কৃতে ভূগোল গ্রন্থে সুহ্মের সীমা নির্ধারিত হয়েছে।

গৌড়স্য পশ্চিমভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্ম দেশ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

গৌড়ের পশ্চিম, বীরদেশের (বীরভূমের) পূর্ব ও দামোদরের উত্তর প্রদেশ সুহ্ম নামে কীর্তিত।

বিভিন্ন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ৪র্থ ও ৫ম খ্রিস্টাব্দে বীরভূমি অঞ্চল মগধরাজ্যের শাসনাধীন ছিল এবং ষষ্ঠ শতকে শশাঙ্কের রাজত্বকালে বীরভূম কর্ণসুবর্ণের অধীন হয়। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে রাজা আদিশূরের সময় এই অঞ্চল মানভূম প্রদেশের

অধীনে যায়। পাল সেন রাজত্বে এই বীরভূমি গৌড়েশ্বরের শাসনাধীন ছিল। অর্থাৎ তখন যে বৃহত্তর গৌড় দেশ তার অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিত' কাব্যে সন্ধ্যাকর নন্দী, রামপালের মিত্র সামন্ত রাজাদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে উচ্ছালের (বীরভূম) স্বাধীন রাজা ভাস্করের নাম আছে। তাতে অবশ্য বীরদেশের বীররাজা বা বীরসিংহের কোনো নাম পাওয়া যায় না। পুরাণে অরণ্য সমাচ্ছন্ন, কৃষ্ণবর্ণ আদিমজাতি অধ্যুষিত, লৌহখনির দেশ রাঢ় বা বীরভূমের সুদক্ষ তীরন্দাজ ও পরিশ্রমী চাষীদের উল্লেখ আছে। আর আছে 'নগর', 'সিপুল্য' প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ। অনেকে অনুমান করেন, কোনো স্থানীয় সামন্তরাজা ছিলেন এই বীরসিংহ। বীরভূমে কিংবদন্তী আছে, পাল-সেন রাজত্বের পর নগরের রাজা ছিলেন এই বীরসিংহ। মুসলমান অভিযানের পর তিনি নগর (বর্তমান রাজনগর) ত্যাগ করে সিউড়ির ৫ / ৬ মাইল পশ্চিমে ভাণ্ডীরবন সন্নিকট বীরসিংহপুর গ্রামে চলে আসেন। শোনা যায়, বীরসিংহপুরের কালী ঐ রাজা বীরসিংহের প্রতিষ্ঠিত। নগরে কালীদহে ঐ কালী প্রথমে প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন। নগরে কালীদহের পাড়ে বীররাজার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজো চোখে পড়ে। বলা হয়, এই 'লক্ষুর' বা নগর বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত। এটি গৌড়ের রাজধানী লক্ষোট বা লক্ষ্মণাবতী (মালদহে) নয়। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট, ব্লকম্যান, মনমোহন চক্রবর্তী এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে (১৮৭৩ ও ১৯০৮) আলোচনা করে দেখিয়েছেন লক্ষুর ও নগর অভিন্ন এবং স্থানটি বীরভূমের সীমান্তের অন্তর্গত।

বীরভূমে পাল যুগের ও সেন যুগের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব নগেন্দ্রনাথ বসু 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি'র সভাপতিরূপে বীরভূম বিবরণের (১ম খন্ড) ভূমিকায় (পৃঃ ১৪) মন্তব্য করেছেন—"বীরভূম গৌড়বঙ্গের অতীত কীর্তির একটি মহাশ্মশান। বীর সেন প্রমুখ সেন সামন্ত রাজাদের সদাচার পূর্বক রাঢ় শাসনের কাহিনী বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে জানা যায়। তিনি বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষ ছিলেন। সেন রাজত্বের পরই পূর্বোক্ত বীরসিংহের বা 'বীর' উপাধিধারী হিন্দু রাজবংশীয় রাজারা বীরভূমে রাজত্ব করেন। কেউ কেউ বলেন ৭ / ৮শো বছর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে (মতান্তরে পাঞ্জাব থেকে) বীরসিংহ ও চৈতন্যসিংহ নামে ভ্রাতৃদ্বয় রাজনগর অঞ্চলের আদিম জাতিবর্গের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন এবং 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। বাহুবলে তিনি রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। কিন্তু বীরভূমের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা বলে পরিগণিত।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বীরভূমের রাজনগরে মুসলমান রাজারাও প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন। রাজনগর মুসলমানদের অন্যতম প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল, এটি সীমান্ত-বঙ্গে অবস্থিত। বিহারের ছোটনাগপুর পার্বত্য এলাকার দস্যু ও বর্বরজাতিসমূহের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের প্রতিরোধের জন্যেও সে সময় বিভিন্ন ঘাঁটি স্থাপন ও ঘাটোয়াল রক্ষিত হত। রাজনগরে পাঠান রাজাদের পশ্চিম সীমান্তে শাসনকর্তারূপে অবস্থান পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেকের ধারণা, মেদিনীপুরের সামন্তরাজাদের বাদ দিলে বাঁকুড়ায় হিন্দু রাজারা এবং রাজনগরের মুসলমান রাজারা বাংলার পশ্চিম সীমান্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁরা খুব স্বাধীনচেতাও ছিলেন। "বাংলার জমিদারদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের এত কাছাকাছি ও এত শক্তিশালী বীরভূমের রাজাদের মত আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের নিজেদের সৈন্য সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং চারিত্রিক উদারতায় ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় তাঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।" অন্যান্য ঐতিহাসিকেরও এ বিষয়ে সমর্থন মেলে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নবাব আমল পর্যন্ত রাজনগরের বহু পাঠান রাজা শাসনকার্য চালান। বাংলার সুলতানদের কাছ থেকে তাঁরা জায়গির স্বরূপ এই অঞ্চল লাভ করেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। নবাবি আমলেও এঁদের বীরত্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলেও পাঠান রাজাদের বংশধরেরা শাসনকার্যে সহায়তা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজন্যবর্গের কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। জনসাধারণের জীবনধারার সঙ্গেও এঁদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল কিনা জানা যায় না। তবে জানা যায় যে, ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশারাজ বা কলিঙ্গরাজ যখন গৌড়াধিপতি সুলতান তুখান

রাজনগরে বর্ণাঢ্য তাজিয়া মিছিল

খাঁকে আক্রমণ করেন তখন সর্বাগ্রে বীরভূম বা লক্কুর অভিযান করেন এবং সে সময়ের লক্কুর শাসনকর্তা ফকর-উল-মুলক করিমুদ্দীনকে নিহত করেন। সে সময় বীরভূমের পশ্চিমাংশের সাঁওতাল প্রভৃতি পার্বত্যজাতি এসে নগর লুণ্ঠন করে। পাঠান আমলে বীরভূমের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে শিল্প-বাণিজ্য ন্যস্ত থাকলেও সাধারণ মানুষের আর্থিক সঙ্গতি স্বচ্ছল ছিল না। বীরভূমের রাজারা পাঠান সুলতানদের দরবারে যে রাজস্ব প্রেরণ করতেন তা প্রজা সাধারণের কাছ থেকেই সংগৃহীত হত, কিন্তু বিনিময়ে হিন্দু প্রজাদের হিতার্থে তেমন কিছু কল্যাণমুখী কাজ তাঁরা করতেন না।

বীরভূমের নাম ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এর বিভিন্ন বিভাগের নামের তালিকা পাওয়া যায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে প্রথমে ১২টি, পরে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করেন। তার অন্যতম সুবা হল বাংলা। সুবা বাংলা ২৪টি সরকারে এবং এক একটি সরকার কয়েকশো মহাল নিয়ে গঠিত ছিল। বীরভূমি মহাল, মাদারুণ সরকারের ১৬টি মহালের একটি ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে রাজস্ব বন্দোবস্তের সেরেস্তায় রাজনগর-রাজাদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সাম খাঁ-র প্রথম নাম পাওয়া যায়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন রাজা বীরভূমের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে রণমস্ত খাঁর আমলে দেশের লোকের অন্নকষ্ট ছিল না, তাঁর পুত্র খাজা কামাল খাঁ দানশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। প্রজারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

তাঁর পুত্র বাদি-উল-জমা খাঁ ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে পিতার সিংহাসন লাভ করেন ও নতুন করে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে সনন্দ লাভ করেন বীরভূম মহাল শাসনের। তিনি ছিলেন খুব বিলাসপ্রিয়। তাঁর আমলে দেশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্গীর হাঙ্গামা। বলাবাহুল্য, বর্গীরা বিহার থেকে বীরভূম পশ্চিম সীমান্তে বাংলায় অনুপ্রবেশ করে। বর্গীদের অত্যাচার রোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৭৪২-১৭৫২ মধ্যে বারবার বর্গীরা বাংলায় অভিযান চালায়। তখন বাংলার নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। বর্গীর হাঙ্গামায় রাজনগর-সিউড়ি-রায়পুর-কচুজোড়-হেতমপুর অঞ্চল দারুণভবে লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজনগরের রাজার অধীন তখন হেতমপুরের মধ্যবর্তী সংগ্রামপুরে (বর্তমান কচুজোড়ে) তখন হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন রাজা রুদ্রচরণ রায়। রাজার সঙ্গে যেখানে বর্গীদের যুদ্ধ হয়েছিল সে স্থান এখন সংগ্রামপুর নামেই পরিচিত। কচুজোড়ে রুদ্রচরণ পূজিতা রাজরাজেশ্বরী দেবীর ধাতুময়ী বিগ্রহ আজও বিরাজিতা। বিখ্যাত পদকর্তা যাদবিন্দ্র রাজার কুলগুরু ছিলেন। যাদবিন্দের নিবাস ছিল কচুজোড়ের সন্নিকট হরিণপুর গ্রামে। রাজা রুদ্রচরণ সন ১১৫০ থেকে ১১৫৪ সালের মধ্যে মারা যান।

বীরভূমের নাম ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এর বিভিন্ন বিভাগের নামের তালিকা পাওয়া যায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে প্রথমে ১২টি, পরে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করেন। তার অন্যতম সুবা হল বাংলা। সুবা বাংলা ২৪টি সরকারে এবং এক একটি সরকার কয়েকশো মহাল নিয়ে গঠিত ছিল। বীরভূমি মহাল, মাদারুণ সরকারের ১৬টি মহালের একটি ছিল।

হেতমপুরে হাতেম খাঁর মৃত্যুর পর হাফেজ খাঁ হেতমপুর দুর্গরক্ষকের দায়িত্বলাভ করেন। শোনা যায়, দিল্লির বাদশাহ মহম্মদ শাহের কন্যা আমিনা ও জনৈক সেনাপতি ওসমান প্রণয়াবদ্ধ হয়ে সুদূর দিল্লি থেকে পালিয়ে এসে বীরভূমের হেতমপুর গড়ে হাতেম খাঁর কাছে আশ্রিত হন। বাদশাহ নাকি কন্যা আমিনার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেনের সঙ্গে। ওই ওসমান ও আমিনাই হেতমপুরের শাসনকর্তা হাফেজ খাঁ ও শেরিণা। হেতমপুরে হাতেম খাঁর কবর, হাফেজ খাঁর বাঁধ ও শেরিণা বিবির সমাধি বর্তমান। হেতমপুর ও কৃষ্ণনগর গড়ের ধ্বংসস্তূপও দেখা যায়। উক্ত হোসেন আলি ওসমান ও আমিনার সন্ধানে বীরভূমে আসেন। শেরিণাকে হস্তগত করার জন্য হোসেন সিউড়ি কেন্দুয়ার ডাঙায় মহারাষ্ট্র শিবিরে রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে মিলিত হন এবং হেতমপুর দুর্গ আক্রমণের প্ররোচনা দান করেন। বলাবাহুল্য, হোসেনও তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। হেতমপুর দুর্গে আক্রান্ত হয়ে প্রবল প্রতিরোধ করেও হাফেজ খাঁ নিহত হন। পরে শেরিণাও তাঁর শিশুপুত্রসহ আত্মবিসর্জন করেন। এই যুদ্ধের কাল ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ। বাদীউল জমা খাঁ একদিকে যেমন বিলাসী ছিলেন তেমনি অন্যদিকে শাসনকার্যে উদাসীন ছিলেন। শৈফুল হক নামের জনৈক ফকিরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি এই ফকির সাহেবের সঙ্গে সর্বদা ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত থাকতেন। এজন্য তাঁর পুত্র আলি ও আহম্মদ বিরক্ত হন। তাঁরা মুর্শিদাবাদে গিয়ে আপন বলবীর্যের পরিচয় দিয়ে নবাব আলিবর্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নবাবের নির্দেশে ভ্রাতৃদ্বয় রাজনগরে এসে ফকিরের প্রাণ বিনাশ করেন।

পরবর্তীকালে মহারাজ নন্দকুমার তাঁর বাসভূমি বীরভূমের ভদ্রপুর গ্রামে যে এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা করেন,

ইলামবাজার হাটতলায় মন্দির

সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

ইলামবাজার হাটতলায় মন্দির

সৌজন্যে : সুকুমার সিংহ

সেই বিরাট অনুষ্ঠানে বর্ধমানের রাজা, কৃষ্ণনগরের (নদীয়ার) রাজা, নাটোরের রাজা এবং রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রমুখের সঙ্গে রাজা আলিনকি খান বাহাদুরও উপস্থিত ছিলেন। কামাল খাঁর সময়ে মৌড়েশ্বর থানার ঢেকা গ্রামের রাজা রামজীবন রায় বীরভূমির স্বাধীন জমিদার ছিলেন। আলিনকির হাতে রামজীবনের পুত্র রামচন্দ্র মতান্তরে পৌত্র রামশরণ পরাজিত ও নিহত হন।

এরপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে লর্ড ক্লাইভের কাছে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও পতনের সঙ্গে ক্রমশ শুধু বাংলারই নয় সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। বীরভূমেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইংরেজ আমলে রাজনগরের রাজারা ইংরেজদের অনুমতিক্রমেই সিংহাসনে ওঠাবসা করতে থাকেন। ইংরেজ সরকারের হাতে ক্রীড়নক এই বীরভূম রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আসাদউলা জমা খাঁর মৃত্যুর পর বাহাদুর উল জমা খাঁ, মহম্মদ উল জমা খাঁ, দাওরাউল জমা খাঁ, জহর উল জমা খাঁর পরপর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের অনুমতিক্রমে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। ১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালরা দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের কাছে উৎপীড়িত ও শোষিত হয়ে আসছিল। বাংলা ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে সাঁওতালদের বিক্ষোভ প্রজ্জ্বলিত হয়। তাঁরা সিধু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও গ্রাম্য কবি কৃষ্ণদাস রায়ের ভনিতায় এই সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ কবিতা পাওয়া যায় :

"বারশ বাবট্টি সাল, বর্ষাকাল, বানের বড় বৃদ্ধি
আব্দারপুরের মানুষ কেটে করলে গাদাগাদি ॥
রায় কৃষ্ণদাস ভনে, সাঁওতালগণে, রাখিল যে সুখ্যাতি।
যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সত্যি ॥"

গৌরীহর মিত্র মহাশয়ের উদ্ধৃত ছড়ায় '২৩ শ্রাবণে কুলকুড়ি লোটের' কথা উল্লেখিত হয়েছে। আত্মপরিচয়ে পাওয়া যায় এই কৃষ্ণদাস রায় কায়স্থ, বীরভূমের নোনি পরগনায় নাঙ্গুলিয়া থানার কুলকুড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই বিদ্রোহ দমনে হেতমপুরের জমিদারবাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্তী ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। তখন বীরভূমের ইংরেজ কালেক্টর ছিলেন আর আই রিচার্ডসন। বর্তমান বীরভূম ও সাঁওতালদের জন্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নতুন জেলা সাঁওতাল পরগনা (বা দুমকা জেলা) গঠিত হয় (Act 37 of 1855 and 10 of 1857) তখন থেকে এই জেলা ভাগলপুর কমিশনারের অধীন একজন ডেপুটি কমিশনার দ্বারা শাসিত হতে থাকে। এভাবে বীরভূম জেলার অঙ্গচ্ছেদ হয়।

ইংরেজদের শাসনাধীন আসার পূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বীরভূমির অন্য রাজন্যদের মধ্যে বাণরাজা, রাজা মানপতি, রাজা জয়সিংহ, রাজা চন্দ্রচূড়, দুর্জয় সেন, রাজা মল্ল, রাজা বীরসিংহ, রাজা রামজীবন রায়, রাজা রুদ্রচরণ রায়, রাজা বসন্ত রায়, রাজা রাজচন্দ্র, রাজা উদয়নারায়ণ প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। এঁরা অধিকাংশই জমিদার-ভূস্বামী ছিলেন। পরবর্তী-কালে হেতমপুর রাজাদের প্রাধান্য সূচিত হয় ইংরেজ আমলে। হেতমপুর রাজবংশের প্রথম 'রাজা' উপাধি লাভ করেন রামরঞ্জন চক্রবর্তী।

জেলা বীরভূমের আয়তন ও সীমানার বারবার পরিবর্তন হয়েছে। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের জন্য সমগ্র ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। মুর্শিদাবাদ চাকলার অধীন বীরভূমির জমিদারি বাংলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল। তখন সমগ্র দেওঘর, সাঁওতাল পরগনার অধিকাংশে, বিষ্ণুপুরের জমিদারী বাঁকুড়া বীরভূম জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বাঁকুড়া বাদে বীরভূম জমিদারীর তৎকালীন আয়তন ছিল ৩৮৫৮ বঃ মাঃ। পরে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীরকাশেমের ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির ফলে বীরভূমির প্রায় ½ অংশ বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত হয়।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার দেওয়ানি সনদ পেলেও ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের আগে তারা সরাসরি বীরভূমির শাসনভার গ্রহণ করেনি। তখন ছিল দ্বৈতশাসন। এই সময়েই ঘটে বিভীষিকাপূর্ণ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। বীরভূমি তখন মুর্শিদাবাদের অধীন থাকায় কোনো ইংরেজ শাসনকর্তা এখানে থাকত না। মাঝে মাঝে রাজকর্মচারী এসে এখানকার রাজা বা জমিদারদের শাসনকার্যে সাহায্য পরামর্শ দিতেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের নির্দেশে গেজেটে বীরভূম-বাঁকুড়া নতুন বিভাগে পরিণত হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি 'বোর্ড অব রেভেনিউ'-এর আদেশে বীরভূম থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর জমিদারি বর্ধমানের অন্তর্গত হয়। কয়েক বৎসর পরে

১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালরা দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের কাছে উৎপীড়িত ও শোষিত হয়ে আসছিল। বাংলা ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে সাঁওতালদের বিক্ষোভ প্রজ্জ্বলিত হয়। তাঁরা সিধু-কানুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১৮৩৫-৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া স্বতন্ত্র জেলা হয়। ১৮০৬ সালে বীরভূমের দক্ষিণ সীমা হয় অজয় নদ এবং কান্দী মহকুমা বীরভূমের অন্তর্গত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভরতপুর থানা পুনরায় মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের অনেক অংশ সহ স্বতন্ত্র সাঁওতাল পরগনা জেলা গঠিত হয়। ১৮৭২ সালে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা পুনর্নির্ধারিত হয়। রামপুরহাট মহকুমার রামপুরহাট, নলহাটি ও পলসা থানা মুর্শিদাবাদের অধীনস্থ করা হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দেই কান্দীর বদলে রামপুরহাটে একটি মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের আরও ৩৯ খানি গ্রাম মুর্শিদাবাদে যায়। এবং ওই বছর নভেম্বরেই ৫০টির বেশি গ্রাম মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূমে আসে। কয়েক বৎসর ধরেই এরকম সীমানা রদবদল চলতে থাকে। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের বড়এগ্রা থানা মুর্শিদাবাদে যায়, কান্দী মহকুমা গঠিত হয়। রামপুরহাট, নলহাটি, পলসা বীরভূমে ফেরত আসে। রামপুরহাটে মহকুমা স্থাপিত হয়। সাঁওতাল পরগনার তিনটি গ্রাম নলহাটি থানায় যুক্ত হয়। এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন সালের কলকাতা গেজেটে পাওয়া যায়।

বীরভূম জেলা বিষয়ক তথ্যসূত্র : গ্রন্থপঞ্জি

১। **অক্ষয় চৈতন্য**
বাংলায় তীর্থ, ২য় সং। কলকাতা : কথামৃত। ১৯৯০

২। **অতুল সুর**
বাংলা ও বাঙালি। কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮৪

৩। **অতুল সুর**
বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা : জিজ্ঞাসা প্রকাশন, ১৯৯৮

৪। **অনাথনাথ দাস**
শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। কলকাতা : আনন্দ, ১৯৮৮

৫। **অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়**
উত্তররাঢ়ের শাসাঁধর্ম। কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০০

৬। **অমলেন্দু মিত্র**
রাঢ়ের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০১ (ইতিহাস)

৭। **অমলেন্দু মিত্র**
রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর (বীরভূমিতে প্রাপ্ত তথ্যালোকে) কলকাতা : ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২

৮। **অমিত গুপ্ত**
বাংলার লোকজীবনে বাউল। কলকাতা : সংবাদ প্রকাশন, ১৯৮৩

৯। **অমিতা সেন**
শান্তিনিকেতন আশ্রমকন্যা, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ, ১৯৫৪ (আলোচনা)

১০। **অমিয় ঘোষ**
জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম (১৯১৫—১৯৪৭) বীরভূম : গ্রন্থনীড়, ২০০০

১১। **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৮০

১২। **অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**
শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ২০০০ (প্রবন্ধ)

১৩। **অশোক মিত্র**
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা (১—৪ খণ্ড), দিল্লি : ভারত সরকারের প্রকাশন, ১৯৭২

১৪। **অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়**
বাঙালির ধর্ম ও দর্শন চিন্তা, কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০

১৫। **অসীম চট্টোপাধ্যায়**
গ্রামবাংলার ইতিহাস, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৮৪

১৬। **আদিত্য মুখোপাধ্যায়**
লো.কা.য়.ত.—রামপুরহাট। বীরভূম : নবপাঠমালা, ২০০১

১৭। **আদিত্য মুখোপাধ্যায়**
লোকায়ত বীরভূম, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫

১৮। **আশুতোষ ভট্টাচার্য**
বাংলার লোকশ্রুতি। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫

১৯। **আশুতোষ ভট্টাচার্য**
বাংলার লোক সংস্কৃতি, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

২০। আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২

২১। আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকসাহিত্য, কলকাতা : দে'জ, ১৯৭২

২২। ইন্দ্রভূষণ অধিকারী
বাংলার লৌকিক ধর্ম। কলকাতা : পূর্বাদ্রি প্রকাশন, ১৯৯০

২৩। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী। কলকাতা : বসুমতী কার্যালয়, ১৩১১ বঙ্গাব্দ

২৪। একবিংশ বীরভূম জেলা গ্রন্থমেলা ২০০২
স্মারকগ্রন্থ—বীরভূম : বীরভূম জেলা বইমেলা কমিটি, ২০০২-০৩

২৫। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলার ভাস্কর্য। কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৮৬

২৬। কল্যাণী মন্ডল
রাঢ় ও ঝাড়খন্ডের সংস্কৃতি সমন্বয়, কলকাতা : সাহিত্যিকা, ১৯৯৫

২৭। কিশোরীরঞ্জন দাস
বীরভূমের লোকসংস্কৃতি পরিচিতি, মুর্শিদাবাদ : গণকণ্ঠ প্রকাশন, ১৯৮৫

২৮। কিশোরীলাল সরকার
হেতমপুর কাহিনী—বীরভূম, ২য় স, ১৩১৭ ব, (হেতমপুরের জমিদারগণের ইতিহাস)

২৯। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
বাংলার বাউল, কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪

৩০। ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী
বাংলার সাধনা। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪

৩১। গীতিকণ্ঠ মজুমদার
বীরভূমের ইতিহাস প্রসঙ্গে। কলকাতা : সাহিত্যশ্রী, ১৯৯৪ (প্রবন্ধ)

৩২। গুণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পরিবেশ বাস্তব ও গ্রামীণ প্রযুক্তি। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পঃ বঃ সরকার, ২০০৩

৩৩। গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত
পীঠস্থানের দেশ বীরভূম। সিউড়ি : শ্রীশ্রী সারদা মুদ্রণ ও প্রকাশনী, ১৩৯১

৩৪। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
বাংলার লৌকিক দেবতা। কলকাতা : দে'জ ১৯৭৮

৩৫। গৌরীহর মিত্র
বীরভূমের ইতিহাস। সিউড়ি, রতন লাইব্রেরী, ১৯৩৬ ২য় খন্ড

৩৬। গৌরীহর মিত্র
বীরভূমের ইতিহাস, সিউড়ি : বীরভূমের সাহিত্য পরিষদ, ১৩৪৩ ব

৩৭। চিত্তরঞ্জন দেব
তারাপীঠের একতারা, কলকাতা : প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ১৯৬০

৩৮। ডবলিউ ডবলিউ হান্টার
গ্রামবাংলার ইতিকথা, কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৮৪

৩৯। তথ্যের আলোকে বীরভূমের পঞ্চায়েত নির্বাচন
(১৯৭৮—২০০৩) সিউড়ি, বীরভূম : ধূসরমাটি

৪০। তারাপদ সাঁতরা
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসাধক, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০

৪১। দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও বরুণ চক্রবর্তী সম্পাদিত
বাংলার লোকসংস্কৃতি। কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০১

৪২। দুর্গা ব্যানার্জি
স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে বীরভূম—সাঁইথিয়া, বীরভূম : তনুশ্রী ব্যানার্জি, ১৯৯৯

৪৩। দুলাল চৌধুরী
বাংলার লোক উৎসব। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭

৪৪। দুলাল চৌধুরী
শান্তিনিকেতন উৎসব ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯০

৪৫। দেবকুমার চক্রবর্তী
বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি। কলকাতা : পূর্ত বিভাগ, প. ব সরকার, ১৯৭২

৪৬। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া। কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৭২

৪৭। নন্দদুলাল আচার্য
রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা : লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৩

৪৮। নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভদ্রপুর ইতিবৃত্ত, বহরমপুর : গ্রন্থকার, ১৩১৭ (মহারাজা নন্দকুমারের জন্মভূমি ভদ্রপুরের ইতিহাস)

৪৯। নীহাররঞ্জন রায়
বাঙালির ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৪

৫০। পঞ্চানন মন্ডল
পুঁথি পরিচয়, কলকাতা : বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৩৫৮ (১৩৬৪—২য় খন্ড, ১৩৬৯—৩য় খন্ড ১৩৮৬—৪র্থ খন্ড বীরভূম থেকে প্রকাশিত)

৫১। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, কলকাতা : আনন্দ, ১৯৯৪। ৬৪ পৃ, ৩০.০০ (ইতিহাস)

৫২। প্রতাপনারায়ণ রায়
বীরভূমের ইতিহাস, বীরভূম : বার্তা প্রেস, ১৯১১ (বীরভূম জেলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ)

৫৩। প্রদ্যোতকুমার মাইতি
বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি, কলকাতা : পূর্বাদ্রি প্রকাশন, ১৯৮৮

৫৪। প্রণব রায়
বাংলার মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮

৫৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী, বোলপুর : বিশ্বভারতী, ২০০০ (আলোচনা)

৫৬। প্রমীলচন্দ্র বসু
গ্রন্থকার-নামা / প্রমীলচন্দ্র বসু, কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৩৯

৫৭। বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত)
বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, কলকাতা : অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫

৫৮। বরুণ রায় (সম্পাদিত)
বীরভূমি-বীরভূম, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, ২০০৪, ৩য় খন্ড

৫৯। বিজয়কুমার দাস
বীরভূম, সাঁইথিয়া : রানার সাহিত্য প্রকাশনী, ১৪০৯

৬০। বিনয় ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা : প্রকাশ ভবন, ১৯৭৬

৬১। বিনায়ক
রাঙামাটির পথে পথে, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯৭

৬২। বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
তারাপীঠ মহাপীঠ, (১ম খন্ড), কলকাতা : জয় তারা পাবলিশার্স, ১৩৯৭

৬৩। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি, কলকাতা : বাক্‌শিল্প, ১৯৯০

৬৪। ভব রায়
রাঢ় বাংলার মাটি মানুষ ও সংস্কৃতি, কলকাতা : মডার্ন কলাম, ১৯৯০

৬৫। ভূপতিরঞ্জন দাস
পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ ও দর্শন, কলকাতা : শরৎ পাবলিশিং

৬৬। মহকুমা সাক্ষরতা সমিতি
মহকুমা পরিচয় : বোলপুর, বোলপুর : মহকুমা সাক্ষরতা সমিতি, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৫

৬৭। মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী
বীরভূম রাজবংশ, কলকাতা : বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ১৩১৬ ব.। (বীরভূম জেলার ইতিহাস ও শাসনব্যবস্থা)

৬৮। মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, সম্পাদিত
বীরভূম বিবরণ, হেতমপুর বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি, ১৩২৩, ৩য়।

৬৯। মিহির চৌধুরী কামিল্যা
আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি—২য় সং, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৬ ব.।

৭০। মিহির চৌধুরী কামিল্যা
রাঢ়ের গ্রাম্যদেবতা, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯ (লোকসংস্কৃতি)

৭১। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কবিকঙ্কন চণ্ডী, কলকাতা : বসুমতী প্রেস, ১৯৮০

৭২। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
চণ্ডীমঙ্গল, সুকুমার সেন সম্পাদিত, নিউদিল্লি : সাহিত্য একাদেমি, ১৯৭৫

৭৩। মুক্তিপদ দে
তীর্থময় বীরভূম, শান্তিনিকেতন : উমা দে, ১৯৮২

৭৪। মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী
বাংলার কীর্তন গান, ২য় সং, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮

৭৫। রঞ্জন গুপ্ত
রাঢ়ের সমাজ ও অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, বীরভূম (১৭৪০—১৮৭১), কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০১

৭৬। রঞ্জন গুপ্ত
রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গোড়ার কথা কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০১ (ইতিহাস)

৭৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন (১—২), কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৮২ (দর্শন)

৭৮। রমারঞ্জন দাস
পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি, কলকাতা : ফার্মা কে এল এম

৭৯। রবীন বল সম্পাদিত
বাংলায় ভ্রমণ, ৩য় সং, কলকাতা : শৈব্যা, ১৯৯৭

৮০। রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলাদেশের ইতিহাস, ৭ম সং, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ১৯৮১

৮১। রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলাদেশের ইতিহাস, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৯৮

৮২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার ইতিহাস, কলকাতা : দে'জ, ১৪০৫

৮৩। শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তারাপীঠ, তারাপীঠ : দুর্গাশঙ্করী চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮২

৮৪। শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
তারাপীঠ—৩য় সং, তারাপীঠ, বীরভূম : দুর্গাশঙ্করী চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮৯

৮৫। শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

৮৬। শীলা বসাক
বাংলার ব্রতপার্বণী, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮

৮৭। সত্যনারায়ণ দাশ
বীরভূম জেলার গ্রামনাম, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫

৮৮। সত্যনারায়ণ দাশ
বীরভূম জেলার গ্রামনাম, ভাগুনবাড়ী, বারাণসী : লেখক, ১৯৮৭

৮৯। সত্যনারায়ণ দাশ
বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ, কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮৮ (ভাষাতত্ত্ব)

৯০। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
বিবাগী মাটী বীরভূম, বোলপুর : প্রত্নপ্রদীপ, ১৯৯৪

৯১। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
বীরভূমকে জানুন, ৪র্থ সংস্করণ, শ্রীপাঠমুলুক, বোলপুর : প্রত্নপ্রদীপ, (১৯৯৪)

৯২। সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
বীরভূম পরিচিতি—২য় সং, শ্রীপাঠমুলুক, বীরভূম : প্রত্নপ্রদীপ

৯৩। সুকুমার সেন
বাংলা স্থাননাম, ২য় সং, কলকাতা : আনন্দ, ১৩৮৯

৯৪। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, কলকাতা : চতুষ্কোণ, ১৯৮৭ (স্মৃতিকথা)

৯৫। সুধীরকুমার দাঁ
রাঢ়ের জননী সর্বমঙ্গলা, বর্ধমান : রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

৯৬। সুধীর চক্রবর্তী
বাংলার বাউল ফকির, কলকাতা : পুস্তক বিপণি

৯৭। সুধীররঞ্জন দাস
আমাদের শান্তিনিকেতন, বোলপুর : বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৫৯

৯৮। সুহাস দাস
রাজনগরের ইতিহাস, কলকাতা : ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স হাউস, ১৪০৪

৯৯। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০

১০০। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বীরভূমের বিবরণ, ২য় খণ্ড, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম, অনুসন্ধান সমিতি, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

১০১। হিতেশরঞ্জন সান্যাল
বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সঞ্জয় বক্সি, সুতপা চ্যাটার্জি, মৌটুসি বসাক, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী পাল ও মহম্মদ শামিম।

লেখক : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক

জীবিকার তাগিদে শহরে, বীরভূমের বিসয়পুর গ্রামের বহুরূপী সৌজন্যে : কালান্তর

বহুরূপী গোপাল সেনাপতি